সত্তা লৌকিক প্রমাণের দ্বারাই বাধিত হয়ে যায়; কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা বাধিত হয় কেবলমাত্র বৈদিক প্রমাণের দ্বারাই।

তৃতীয়তঃ, উপরের শ্লোকে পুনরায় বলা হয়েছে যে—প্রাতিভাসিক সত্তা যখন বাধিত হয় তখন প্রমাতা বা ভ্রমকারীও সেই সঙ্গে বাধিত হন না—রজ্জু-সর্প ভ্রমের নিরসন হ'লে কেবল সর্পটিই বাধিত বা অসৎরূপে প্রমাণিত হয়, ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বয়ং নয়। কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা যখন বাধিত হয়, তখন প্রমাতা বা ভ্রমকারীও সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়ে যান। জগৎ যখন ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে বাধিত হয়ে অসৎ প্রতিপন্ন হয়, তখন ভ্রান্ত ব্যক্তিও তাই হ'য়ে যান, তখন একমাত্র ব্রহ্মই সত্যরূপে প্রকাশিত হন।

চতুর্থতঃ, প্রাতিভাসিক হ'ল ব্যবহারিকের মধ্যে, বা ভ্রমের মধ্যে ভ্রম। অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তা সমগ্র সংসারই ত প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট্ বিশ্বজনীন ভ্রম। কিন্তু তার মধ্যেও, সাধারণ দিক্ থেকে, লোক-ব্যবহার নির্বাহের জন্য প্রমা ও অপ্রমা, সৎ ও অসতের, নিত্য ও অনিত্য প্রভৃতির মধ্যে ভেদ-স্বীকার করা হয়। যেমন, রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান; রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান; রজ্জু সৎ বস্তু, সর্প অসৎ বস্তু; রজ্জু নিত্য, সর্প অনিত্য ইত্যাদি। এরূপে—প্রাতি-ভাসিকের তুলনায় ব্যবহারিক সৎ ও শাশ্বত।

পঞ্চমতঃ, প্রাতিভাসিক সত্তা সাধারণতঃ ব্যক্তি-গত; অর্থাৎ এরূপ ভ্রম সাধারণতঃ সকলেরই সমকালে, সমভাবে, যুগপৎ হয় না; বিভিন্ন ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, বিভিন্ন সময়ে হয়। যেমন, স্বপ্নদ্রষ্টা একাকীই সেই সকল স্বাপ্ন পদার্থকে প্রত্যক্ষ ক'রে ভ্রমগ্রস্ত হন, অন্যেরা নয়; রজ্জুকে সর্প ব'লেও ভ্রম করেন একজন, বা দু'তিন জনই মাত্র এক কালে ও একসঙ্গে। অবশ্য, সার্বজনীন প্রাতিভাসিক সত্তা বা ভ্রম যে নেই তা নয়; যেমন সূর্যের উদয়াস্ত এবং গতি প্রত্যক্ষ, কিন্তু সার্বজনীন ভ্রম। তা সত্ত্বেও বলা চলে যে, প্রাতিভাসিক সত্তা বা ভ্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত; দু'একটি ক্ষেত্রে সার্বজনীন। অপর পক্ষে, ব্যবহারিক সত্তা বা ভ্রম সাধারণতঃ সার্বজনীন, অর্থাৎ জীবন্মুক্তদের বাদ দিয়ে অন্যান্য সকলের ক্ষেত্রেই সমকালে, সমভাবে, যুগপৎ হয়।

উপরের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তা সাধারণ লক্ষণানুসারে সমধর্মীয় হ'লেও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল-স্থায়ী, দুরপনেয় ও সার্বজনীন ব'লে ব্যবহারিক সত্তা উচ্চতর সত্তা।

এরূপে, চারটি পক্ষ সম্ভবপর: পারমার্থিক সত্তা (ব্রহ্ম), ব্যবহারিক সত্তা (জগৎ), প্রাতিভাসিক সত্তা (স্বপ্ন, রজ্জু-সর্পাদি সাধারণ ভ্রম), অসৎ (আকাশকুসুম)।

এদের মধ্যে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তা 'মিথ্যা'। 'মিথ্যার' সংজ্ঞা ও লক্ষণ সম্বন্ধে বিশদ-তরভাবে আলোচনা পরে করা হবে।

অদ্বৈত বেদান্ত-দর্শনের মতে—এই জড়, এই জগৎ কিছুকালের জন্য যেন মানুষের স্বরূপ ঢেকে রেখেছে, প্রকৃতপক্ষে তার স্বরূপের কোনই পরিবর্তন হয় নি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ষড়্‌গোস্বামীর কথা*

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বাংলার আধ্যাত্মিক দুর্গতি তখন চরমে। নর-নারী ভোগের পঙ্ককুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ভগবানের দিকে কারও মন নেই। ভক্তির ধারা শুষ্ক পাণ্ডিত্যের সাহারায় নিশ্চিহ্ন।

'নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্মুখ।
নিত্য সংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুখ॥'

লোকের মতিগতি দেখে করুণ-হৃদয় শ্রীঅদ্বৈতের মনে পর্বতপ্রমাণ দুঃখ, ভাবেন, শয়নে স্বপনে কেবলই ভাবেন, লোকের কল্যাণ হবে কিসে। ভাবতে ভাবতে দিগন্তে আলোর নিশানা পেয়ে গেলেন।

'আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥'

তবেই জীবের পক্ষে সম্ভব কৃষ্ণোন্মুখ হওয়া। অদ্বৈতাচার্য একমনে তাই কৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। সেই ডাকে দয়াল ভগবান নেমে এলেন ধূলির ধরণীতে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন: 'প্রেমনাম প্রচারিতে এই অবতার'। চৈতন্য-অবতারে জীবের সংসারাসক্ত চিত্তকে কৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ করবার জন্যে। মহাপ্রভুর এই লীলায় যাঁরা ছিলেন তাঁর প্রধান সহায় তাঁরাই হ'লেন ছয় গোস্বামী। এই ছয় গোস্বামীকে প্রণতি জানিয়ে ভক্ত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখেছেন:

শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
ইঁহা সবার পাদ-পদ্মে কোটী নমস্কার॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো এত বড়ো একজন সাধক এবং কবি নিজের শিক্ষাগুরু ব'লে যাঁদের পাদপদ্মে প্রণতি রেখেছেন তাঁরা যে স্মরণীয় এবং বরণীয়—এতে কোনই সংশয় নেই। এঁদের বৈরাগ্যপূত জীবনের সাধনাকে সহায় ক'রে মহাপ্রভুর ধর্ম দিকে দিকে এমন বিস্তার লাভ করেছে।

ছয় গোস্বামীর জীবন আলোচনা করলে দেখা যাবে—ভক্তি অধিকারীদের মধ্যে যাঁদের বলা হয়েছে উত্তম অধিকারী এঁরা সেই ভাগ্যবানদের স্তরে। এঁরা সকলেই শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যুক্তিতে সুনিপুণ। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হ'লে, বুদ্ধির মধ্যে সত্যের উজ্জ্বল দীপ্তি না থাকলে—যাকে তাকে দিয়ে তো নবধর্মকে জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়! তাই দেখতে পাই—মহাপ্রভু স্বয়ং কাশীধামে সনাতনকে দুই মাস ধ'রে ভাগবতাদি শাস্ত্রের যত গূঢ় মর্ম শেখাচ্ছেন। সনাতনের অনুজ শ্রীরূপকেও সর্বতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবীণ করলেন মহাপ্রভু।

শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্বতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবীণ করিলা॥
শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিল।
প্রভু-আজ্ঞা অনুসারে সব আচরিল॥
(চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা)

কিন্তু কেবল পাণ্ডিত্য দিয়ে অন্যের জীবনে রূপান্তর ঘটানো সম্ভব নয়। তাই তো মহাপ্রভুর জীবনের একটি মূল কথা হ'ল: 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও।' ষড়্‌গোস্বামীর জীবনে এই সত্যেরই দিব্যোজ্জ্বল অভিব্যক্তি। শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব-লক্ষণগুলির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে ছয় গোস্বামীর প্রত্যেকেরই অপূর্ব জীবন। এই সব লক্ষণ হ'ল:

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥

* অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক-শরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥
(চৈতন্য-চরিতামৃত—মধ্যলীলা, পরিচ্ছেদ-২২)

গৌড়েশ্বর হুসেনশাহের মুখ্যমন্ত্রী এবং অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি সনাতন। মহাপ্রভুর বৈরাগ্যোজ্জ্বল প্রেমধর্মের বন্যায় তখন 'শান্তিপুর ডুবুডুবু ন'দে ভেসে যায়।' সনাতনের মনের মধ্যে কখন দিগন্তের ডাক এসে পৌঁছেছে। মুক্তির জন্যে প্রাণের মধ্যে কী ব্যাকুলতা। এমন সময় মহাপ্রভু এসে রূপ-সনাতনের বাসভূমি রামকেলী গ্রামে উপস্থিত। নবধর্মের জয়ধ্বজাকে দিগ্‌দিগন্তে বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে রূপ-সনাতনের মতো উত্তম অধিকারীকে তাঁর প্রয়োজন ছিল। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে দুই ভাই লাভ করলেন নূতন জীবন। যাঁরা ছিলেন ঘরের মানুষ তাঁরা বৈরাগীর দীন-হীন বেশে পথে এসে দাঁড়ালেন। ঠিকই বলেছেন শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার:

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লব-মাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥
(মধ্যলীলা, পরিচ্ছেদ-২২)

রূপ গৌড়াধিপ হুসেনশাহের রাজস্ববিভাগে সর্ব শ্রেষ্ঠপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দুই ভায়ের মধ্যে অনুজ রূপই প্রথমে গৃহত্যাগ করেন। অগ্রজ সনাতনের গৃহত্যাগের পথে বহু অন্তরায় দেখা দিল। সনাতন রাজকার্য করতে একান্ত নারাজ, হুসেন-শাহও এমন একজন দক্ষ রাজপুরুষকে ছেড়ে দিতে একান্ত অনিচ্ছুক। টানাটানির মধ্যে প'ড়ে সনাতন কারারুদ্ধ হ'লেন। কিন্তু বৈরাগ্যের বাঁশি যাঁর প্রাণের মধ্যে বেজে উঠেছে তাঁকে কারাগারের বন্ধন কতক্ষণ বেঁধে রাখবে? অদ্ভুত উপায়ে কারার দুয়ার খুলে গেল। সনাতন মুক্তি পেয়ে সোজা এসে কাশীধামে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হ'লেন। অঙ্গে ভগ্নীপতির দেওয়া মূল্যবান একখানি ভোটকম্বল, আর পরিধানে একখানি মলিন বসন। বৈরাগীর ঐশ্বর্যের শেষ চিহ্ন দেখে 'ভোটকম্বল পানে প্রভু চাহে বার বার।' সনাতন বুঝতে পারলেন, প্রভুর অনুগামী হ'তে গেলে যাকে বলে 'অকিঞ্চন'—তাই হ'তে হবে। যেমন সংকল্প তেমনি কাজ। গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে সনাতন কম্বলের বিনিময়ে একজনের কাঁথা নিয়ে চন্দ্রশেখরের বাসায় ফিরে এলেন। সনাতনের অঙ্গে কাঁথা দেখে প্রভুর কী আনন্দ!

'প্রভু কহে—উহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল যে কৃষ্ণ তোমার॥'

মহাপ্রভু তাঁর পার্শ্বচরগণকে একদিকে যেমন সযত্নে ভাগবত-আদি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম শিখিয়েছেন অন্য দিকে তেমনি ত্যাগের জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে তাঁদের জীবনকে অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের মতো নির্মল ক'রে তুলেছেন। শুধু পাণ্ডিত্য দিয়ে তো মানুষের বুদ্ধিকে স্পর্শ করা যায়; তার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটানোর জন্য দরকার সাধুর পবিত্র জীবনের স্পর্শের যাদু। তাই সংযমের উপরে, ত্যাগের উপরে মহাপ্রভুর এত জোর। সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামী সংসারত্যাগী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। জ্যেষ্ঠতাতদের মতো জীবও পরম পণ্ডিত ছিলেন। পিতা অনুপমের মৃত্যুর পর জীব গোস্বামী কাশীতে বেদান্তাদি শাস্ত্র শিক্ষার পর বৃন্দাবনে যান। শ্রীজীব ছিলেন বৃন্দাবনের প্রাণ। বৃন্দাবন তখন ছিল বৈষ্ণব সমাজের বিশ্ব-বিদ্যালয়, আর সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীজীবের অধ্যাপনায় বিদ্যার্থীদের জ্ঞানের পিপাসা হ'ত পরিতৃপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ঋষিদের লক্ষ্য ক'রে লিখেছেন। 'নীরব বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল।' ছয় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাসের জীবনও বৈরাগ্যের কী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছয় গোস্বামীর অন্যদের মতো রঘুনাথের দৈন্যও নীরব বৈরাগ্যে

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের এই ধনী কায়স্থ-সন্তান ছিলেন লক্ষপতি গোবর্ধনের একমাত্র পুত্র। কিন্তু অনন্ত যাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে দিগন্তের পানে, গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-সম্পদের নীড়ের মধ্যে তাঁর জীবন কেমন ক'রে অবগুণ্ঠিত হ'য়ে থাকবে? পুত্রের বৈরাগ্য দেখে পিতা রঘুনাথের বিবাহ দিলেন সুন্দরী কন্যা দেখে। পাখী কিন্তু শিকল কেটে একদিন মহাকাশে ডানা মেললো। মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে ফিরে এলেন। রঘুনাথ অনাহারে অনিদ্রায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে চৈতন্যের চরণপ্রান্তে নিপতিত হ'লেন। মহাপ্রভুর পার্শ্বচরের মধ্যে আরও দুই রঘুনাথ ছিলেন। দয়াল ঠাকুর গৌরাঙ্গদেব রঘুনাথ দাসকে স্বরূপ দামোদরের হাতে সঁপে দিলেন এবং তাঁর নূতন নামকরণ করলেন, 'স্বরূপের রঘু।' ষোল বৎসর কাল রঘুনাথ মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে বাস করেন। তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত হয় বৃন্দাবনে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন দাস রঘুনাথের অন্তরঙ্গ সেবক।

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে বেঙ্কট ভট্টের গৃহে অতিথি ছিলেন। বেঙ্কট-পুত্র বালক গোপাল মহান্ অতিথির সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন। গোপালের ইচ্ছা সংসার ত্যাগ ক'রে অতিথির সঙ্গে তখনই বেরিয়ে পড়েন। সাধু-সঙ্গের গুণে বালকের প্রাণে জেগেছে মুক্তির ক্রন্দন। কিন্তু মহাপ্রভু মাতা-পিতার জীবদ্দশায় কোন গৃহস্থ ভক্তকে সংসার ত্যাগের উপদেশ দেন নি। যাবার সময় পিতাকে ব'লে গেলেন—গোপালকে যেন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা না হয় এবং তাকে যেন পড়িয়ে শুনিয়ে সুপণ্ডিত করা হয়। গোপাল ভট্ট শেষে সংসারত্যাগী হন এবং বৃন্দাবনে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

সর্বশেষে গোস্বামী রঘুনাথ ভট্টের কথা। কাশীধামে অবস্থানকালে মহাপ্রভু তপন মিশ্রের গৃহে আহার করতেন, থাকতেন চন্দ্রশেখরের বাটীতে। তপন মিশ্রের বালকপুত্র রঘুনাথ প্রভুর প্রেমে আত্মহারা। দাক্ষিণাত্যের বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপালের মতো এই বালককেও মহাপ্রভু এমন টানে টানলেন যে সেই টানে রঘুনাথও শেষ পর্যন্ত বিরাগী হ'য়ে গেলেন। রঘুনাথ কিছুকাল পরে পুরীতে মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় নেন। কিন্তু তাঁর বাপ-মা তখনও জীবিত। তাই প্রভু তাঁকে মাত্র আটমাস কাছে রেখে কাশী পাঠিয়ে দিলেন। শুধু ব'লে দিলেন বিবাহ না ক'রতে এবং কোন বৈষ্ণব পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়তে। রঘুনাথ ভট্টও গোপাল ভট্টের মতোই বৃন্দাবনে শেষজীবন যাপন করেন।

উত্তরকালে যাঁরা বৃন্দাবনকে বৈষ্ণব সাধনার মহাতীর্থে পরিণত করেন এবং মহাপ্রভুর সাধনার ধারক ও বাহক হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে রূপান্তর আনেন সেই ষড়্গোস্বামীর প্রত্যেকেরই জীবন জ্ঞানে এবং প্রেমে জ্যোতির্ময়। এঁরা প্রত্যেকেই নমস্য। এঁদের চরণপদ্মে কোটী কোটী প্রণতি।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাব ভারতের সর্বত্র। যেখানেই ভক্তিমার্গ প্রচলিত সেখানেই তিনি আদৃত, উপাসিত; সেখানেই তাঁহার সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী সযত্নে পঠিত।

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রার্থনা—কেন ও কত প্রকার ?

স্বামী জীবানন্দ

অন্তরের অন্তস্তলে যে ইচ্ছা নিগূঢ়ভাবে নিহিত, তাকে জাগরিত করবার জন্য প্রাণের যে আবেদন তাই তো প্রার্থনা—বাসনা-পূরণের আকুতি।

যা আমার নেই তার অভাব সর্বদা আমাকে পীড়া দেয়, আবার যা আছে তা রক্ষার জন্য ব্যাকুল হই। না পাওয়া জিনিসটি পাবার জন্য, আর পাওয়া জিনিসটিকে রক্ষার জন্যই সাধারণতঃ আমাদের যত কিছু প্রার্থনা।

নির্ধনের প্রার্থনা—অর্থকষ্ট দূর করবার জন্য, বিদ্যাহীনের বিদ্যার জন্য, স্বাস্থ্যহীনের কামনা স্বাস্থ্য, রোগীর রোগমুক্তির আবেদন, অপুত্রকের পুত্রকামনা, যশঃপ্রার্থীর যশের আকাঙ্ক্ষা—যার যেটি নেই সেটি পাবার জন্য তার অন্তরের গভীর প্রার্থনা।

যে শরীরটি পেয়েছি সেটি যাতে নীরোগ থাকে, যে বিষয়সম্পত্তি আমার রয়েছে তা যাতে নষ্ট না হয়, যে বিদ্যা ও সদ্‌গুণ লাভ করেছি—তাও যাতে ঠিক থাকে—তার জন্য প্রার্থনা।

আবার এই সব সম্পদ্ আরও পাবার জন্য প্রার্থনা। অপরের অনেক সম্পত্তি ও সম্মান দেখে, প্রতিবেশীর সচ্চরিত্র বিদ্বান্ ছেলেটির সঙ্গে নিজের মূর্খ অপোগণ্ড সন্তানটির পার্থক্য ভেবে প্রাণ হিংসায় জ্বলে উঠলে মনের গোপন কোণে অন্যের অকল্যাণ কামনাও হয় না কি ?

প্রার্থনা নানা ভাবে আসে। যখন নদীবক্ষে তরীখানি ডুবুডুবু হয়—তখন বুক দুরুদুরু করে ওঠে—ভয়ে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' ব'লে প্রার্থনা ! যখন করাল মৃত্যু গ্রাস করতে ছুটে আসে—তখন বাঁচবার জন্য চোখের জলে বুক ভেসে যায়—প্রার্থনা হয় 'রক্ষা কর'। যখন সমস্ত সম্পত্তি শত্রুর কবলিত হচ্ছে, নিঃস্ব হয়ে বাঁচব কেমন ক'রে—এই চিন্তায় পাগলের মতো ছুটে বেড়াই, তখনও প্রার্থনা করি 'রক্ষা কর' ব'লে। ভয় ও ভাবনাকে অবলম্বন ক'রেই এই সব প্রার্থনা।

শিশুর প্রার্থনা তার খেলার জগৎকে অবলম্বন ক'রে—যা সে দেখে, যেটি তার ভাল লাগে সেটি সে চায়। কিশোর যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলেরই প্রার্থনা নিজ নিজ চিন্তা চাহিদা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে। যে বালক খেলার জিনিস পাবার জন্য কত ইচ্ছা করেছিল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে জিনিসগুলির প্রতি টান মন থেকে চলে যায়—সেগুলি আর তাকে ভোলাতে পারে না। বয়স যত বাড়ে, নতুন নতুন জিনিসের প্রতি অনুরাগ ও আসক্তি তত বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধাবস্থায় যখন লোকে আত্মবিশ্লেষণ করে—তখন না ভেবে পারে না যে, ছোটবেলা থেকে কত অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে মনকে লিপ্ত ক'রে শুধু নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হয়েছে—বহু অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রার্থনা চিত্তকে কেবল ভাবাক্রান্ত ক'রেই তুলেছে।

ভিখারী ধনীর দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে কখনো পায়, কখনো বা বিফল হয়। মানুষের কাছে প্রার্থনা অনেক সময়েই বৃথা যায়, কারণ দেওয়া না দেওয়া দাতার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। না-পাওয়া তবু তো ভাল, কিন্তু অনাদর বা লাঞ্ছনা বড়ই পীড়াদায়ক। সাধারণতঃ প্রত্যেক মানুষই ভিক্ষুক ; তার কামনা-বাসনার শেষ নেই, তাই মানুষের কাছে প্রার্থনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ফল হয় এবং পরিবর্তে আসে হতাশা, দুঃখ ও মানসিক অশান্তি। কিন্তু ভগবান যিনি এই দুনিয়ার মালিক ও সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী, যিনি যন্ত্রী-রূপে সকলকে যন্ত্রের মত চালাচ্ছেন তাঁর কাছে ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করলে তিনি মনস্কামনা পূর্ণ ক'রে দেন।

ঈশ্বর কল্পতরু! কল্পবৃক্ষের নিকট যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়—কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকে না। কিন্তু সাবধানে প্রার্থনা না করলে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিকার সেই তরুতলে বিশ্রামরত পথিকের মতই ব্যাঘ্রের কবলিত হ'তে হয়। পথিক বেশ তো ভাল ভাল জিনিস (?) চেয়েছিল,—পেয়েছিলও, কিন্তু কী কুক্ষণে তার মনে বাঘের কথা এল—আর যায় কোথা। ব্যাঘ্রের আবির্ভাবে সব শেষ!

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কল্পতরু হয়েছিলেন—সব কিছু দেবার জন্য মুক্তহস্ত, যে যা চায় তাকে তাই দেবেন। সংসারের শোকে দুঃখে জ্বালাযন্ত্রণায় পীড়িত—মায়া-মোহে আচ্ছন্ন অচৈতন্য মানুষ তাঁর চারদিকে ভিড় জমিয়েছে—কি চাইতে কি চেয়ে ফেলবে তার তো ঠিক নেই—হয়তো লাউ কুমড়ো আলু পটল চেয়ে বসবে। তাই কি করুণাবতার রামকৃষ্ণ সকলের প্রার্থনার আগেই 'তোমাদের চৈতন্য হোক' বলে আশীর্বাদ করলেন? ভাবটি এই—যে যা প্রার্থনা করে করুক, কিন্তু সে যেন তার মানবজীবনের উদ্দেশ্যটি ভুলে না যায়।

যত দিন ভোগবাসনা ষোল আনা মনকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে তত দিন 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি' প্রার্থনা ছাড়া অন্য প্রার্থনা হয় কি? অবশ্য অনেক সাধক 'রূপ' অর্থে পরমার্থ রূপ, 'জয়' অর্থে আধ্যাত্মিক উন্নতি, 'যশ' অর্থে তত্ত্বজ্ঞানলাভের যশ এবং 'শত্রু'নাশ অর্থে কাম ক্রোধাদি রিপু দমন প্রার্থনা করেন। এরূপ অর্থ অতি উত্তম—যাঁরা এইরূপ প্রার্থনা করেন তাঁরা ধন্য। কিন্তু সাধারণ মানুষের মন যে স্তরে থাকে ও যে পরিবেশের মধ্যে তারা জীবন যাপন করে—তাতে প্রার্থনার সময় পার্থিব ভোগ-সুখ ও বিলাস-বৈভবের কথাই মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। দেবতার উদ্দেশ্যে একটি প্রণামের বিনিময়ে কত কী প্রার্থনা। —ভাল শরীর, সাংসারিক উন্নতি, বিদ্যা মান যশ, শত্রুনাশ ইত্যাদি—হয়তো আর একটি প্রণামের বিনিময়ে 'সোনার থালে নাতির সঙ্গে খাওয়া'র প্রার্থনা হ'ল। একটির বিনিময়ে দশটি পাবার ইচ্ছা—এ তো নিছক ব্যবসাদারি।

ভোগের বাসনা মন থেকে যত দূর হ'তে থাকে উচ্চতর জিনিসের আকাঙ্ক্ষা ততই মনকে অধিকার করে। ভোগ্যবস্তুগুলি কত ক্ষণস্থায়ী—ঠিক ঠিক ধারণা হ'লে মন শাশ্বত বস্তুর দিকে ধাবমান হয়; 'চিটে গুড়' আর ভাল লাগে না, 'মিছরির পানা'র জন্য মন ছটফট করে। তখন অনন্ত ভোগের সামগ্রী কেউ যদি সামনে রেখে যত ইচ্ছা ভোগ করতে অনুমতি দেয়, তার কণামাত্রও ভোগ করতে ইচ্ছা হয় না—তখনই কণ্ঠে নচিকেতার মতো তীব্র বৈরাগ্যের সুর ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে:

'অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব, তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে।'—সকল জীবনই ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণিক জীবনে ভোগের সময় কই? তোমার রথ নৃত্যগীত তোমারই থাকুক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রার্থনা—

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
> কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
> ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥
> —ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতাসুন্দরী।
> শুদ্ধা ভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি॥

এ যে উচ্চস্তরের প্রার্থনা—সে স্তরে না উঠলে মন তা ধারণা করতে পারে না। এখানেও চরম বৈরাগ্যের সুর অনুরণিত, তার সঙ্গে এসে মিশেছে—অহৈতুকী ভক্তি। প্রকৃত ভক্ত শুদ্ধা ভক্তিই প্রার্থনা করেন—কোন কিছুর বিনিময়ে নয়। ইহ ও পরলোকের সব কিছুই তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর।

ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের কণ্ঠেও প্রার্থনার এই একই সুর:

> যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
> ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

'মোহাচ্ছন্ন যারা তাদের বিষয়ের উপর যে প্রীতি রয়েছে, অনুরূপ তোমার স্মরণে রত আমার হৃদয় থেকে সেই রকম প্রীতি বা অনুরাগ কখনও যেন অন্তর্হিত না হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বুঝি বলেছেন বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টানটুকু ভগবানকে দিতে।

রামনাম-সঙ্কীর্তনের সময় যে প্রার্থনাটি করা হয় সেটিও ভাবে পরিপূর্ণ,—অন্তর্যামী ভগবান, আমার চিত্ত কামাদিশূন্য কর :

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ॥

'হে রঘুনাথ! আমি সত্য বলছি—আর আপনিও সকলের অন্তরাত্মারূপে জানেন যে, আমার হৃদয়ে অন্য কোন বাসনা নাই। হে রঘুশ্রেষ্ঠ, আমাকে একান্ত নির্ভরশীল ভক্তি প্রদান করুন—আমার মনকে কামাদি-দোষশূন্য করুন।'

প্রার্থনার উদ্দেশ্য চিত্তকে নির্মল ও মনকে বাসনামুক্ত করা। নির্মল দর্পণে বা পরিষ্কার জলে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায়—সেইরূপ শুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবানের রূপ প্রতিবিম্বিত হয়।

কি ভাবে প্রার্থনা করতে হয়—ছেলেদের শেখাবার জন্যই যেন শ্রীশ্রীমা নিজের জীবনে মাত্র দুটি জিনিস প্রার্থনা করলেন, (১) জ্যোৎস্নার মত নির্মল চিত্ত, (২) নির্বাসনা। 'নির্বাসনা' চাওয়ার মধ্যে প্রার্থনার সব কিছুই নিহিত রয়েছে—এ যেন একেবারে মূল ধ'রে আকর্ষণ! এরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা আর নেই! মনকে বাসনামুক্ত না করতে পারলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ সুদূর-পরাহত থেকে যায়; তাই মা 'নির্বাসনা' ছাড়া আর কিছু চাইলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দিয়ে প্রার্থনার যে বাণী নির্গত হয়েছে তা ভক্তিসাধনার মহামন্ত্র। জগন্মাতার কাছে তিনি চেয়েছেন 'শুদ্ধা ভক্তি'! প্রার্থনা তাঁর নিষ্কাম :

'মা, আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত। দেহসুখ চাই না মা! লোকমান্য চাই না, (অণিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না, কেবল এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, নিষ্কাম অমলা অহৈতুকী ভক্তি। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই; তোমার মায়ার সংসারের, কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখনও না হয়। মা! তোমা বই আমার আর কেউ নেই, আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—কৃপা ক'রে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

বুদ্ধের যে মৈত্রীভাবনা সে তো সর্বভূতের জন্য কল্যাণ-প্রার্থনা। যে কল্যাণচিন্তা ২৫০০ বছর আগে নিভৃতে ব'সে আকাশে বাতাসে দিগ্‌দিগন্তে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আজও তা মানুষের অন্তর স্পর্শ না ক'রে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন প্রার্থনা করলেন নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে যাবার জন্য—সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে যে ভাব ঢুকিয়ে দিলেন তা প্রকাশ পেল নরনারায়ণ-সেবার মাধ্যমে। শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কেন, সামান্য একটি কুকুরকে অভুক্ত দেখলেও বেদনায় স্বামীজীর চিত্ত ভরে উঠত।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্‌দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

এই প্রার্থনা যেন তাঁর অন্য সব প্রার্থনাকে ব্যাপ্ত ক'রে ছিল।

কো নু স স্যাদুপায়োঽত্র যেনাহং সর্বদেহিনাম্।
অন্তঃপ্রবিশ্য ভূতানাং ভবেয়ং দুঃখভারভাক্॥
ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥

'এমন কি উপায় আছে যাতে আমি সকল প্রাণীর

অন্তরে প্রবেশ ক'রে সদা তাদের দুঃখভারের ভাগী হতে পারি ? আমি রাজ্য স্বর্গ বা মুক্তি চাই না, শুধু দুঃখতপ্ত প্রাণিগণের আর্তিনাশ প্রার্থনা করি।' —এ-ও স্বামীজীর ভাবের প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন মুখ এক ক'রে প্রার্থনা করতে বলেছেন, তা নইলে ভাবের ঘরে চুরি হবে। মুখে উচ্চারিত হচ্ছে জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তির প্রার্থনা—ভিতরে কিন্তু কামনা বাসনা গজগজ করছে। ভাবের ঘরে চুরি: সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে যে প্রার্থনা 'আর পারি না, মরণ দাও ভগবান' তার উত্তরে সত্যই যদি মরণ আসে তবে সেই মৃত্যুপ্রার্থিনী কাঠকুড়নী বুড়ীর মতো তাকে এই ধরনের কথাই না ব'লে থাকা যায় না 'আমার মাথায় কাঠের বোঝাটা একটু তুলে দাও না, বাবা!'

নির্জনে কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করতে বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কান্নার স্বর যেন অন্যের কানে না পৌঁছায়, কেবল যাঁর জন্য ক্রন্দন তিনিই যেন শুনতে পান! যত গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে—প্রার্থনার শক্তি তত বেশী। ঐকান্তিক প্রার্থনার অমোঘ শক্তি। প্রার্থনার দ্বারা অন্তর্নিহিত শক্তি জাগরিত হয়। এই সৃষ্টিরহস্য ও বিশ্ব-প্রপঞ্চের মূলেও প্রার্থনা। ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন 'আমি এক, বহু হব—একোঽহং বহু স্যাম্'। প্রার্থনা ও তপস্যার দ্বারা স্রষ্টা সৃজন-ক্ষমতা লাভ করলেন। আমরাও নিজেদের ইচ্ছাশক্তিকে যে ভাবে চালিয়েছি ও যে ভাবে প্রার্থনা করেছি তদনুযায়ী শরীর মন লাভ করেছি। প্রার্থনা ইচ্ছা-শক্তিরই বাঙ্ময় রূপ। স্বামীজী বলেছেন: 'নিজের ইচ্ছাশক্তিই প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকে—তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধর্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণা অনুসারে সেটা বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। আমরা তাকে বুদ্ধ, যীশু, জিহোবা, আল্লা বা অগ্নি, যেমন ইচ্ছা নাম দিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে আমাদের আত্মা। খৃষ্ট, বুদ্ধ এঁরা বাহিরের অবলম্বন, বাস্তবিক আমরাই আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিই।' উপনিষদে আছে যে সাধক একান্ত-ভাবে স্বরূপ-উপলব্ধির জন্য প্রার্থনা করেন, তাঁর নিকটেই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা উদ্‌ঘাটিত হন:

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।

অনন্ত কাল ধরে আমরা যার অনুসন্ধানে রত, —সেই পরম সত্যকে বরণ করার জন্য জ্ঞান-সাধক প্রার্থনাটি যেন আমাদের অন্তরে সদা জাগরূক থাকে:

অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

'অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার হ'তে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে চল। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে সদাই রক্ষা করো।'

দেশের যুবকদের এমন প্রার্থনা হওয়া উচিত যাতে তারা তেজ বীর্য ও শক্তির অধিকারী হ'তে পারে, দরকার হ'লে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে দাঁড়াতে পারে। বীরের জন্য বৈদিক প্রার্থনা:

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্যং মহি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।

'তুমি তেজ, আমায় তেজস্বী কর; তুমি বীর্য, আমায় বীর্যশালী কর; তুমি বল, আমায় বলবান্ কর; তুমি ওজঃ, আমাকে ওজস্বী কর; তুমি অন্যায়-দ্রোহী, আমাকে অন্যায়দ্রোহী কর; তুমি সহনশক্তি, আমাকে সহিষ্ণু কর।'

ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন কুসুমকোমলভাব ও কেবল নৃত্যগীতের সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হ'য়ে যুবকদের

আজ নামতে হবে কর্মক্ষেত্রে—যেখানে আলস্যের স্থান নেই—অনাচারের প্রশ্রয় নেই। নিজের স্বার্থকে তুচ্ছ ক'রে সকলের মঙ্গলের জন্য সমবেত প্রচেষ্টার আজ একান্ত প্রয়োজন।

একা চললে হবে না—স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ ক'রে এক মন এক প্রাণ হ'য়ে চলার পথে অগ্রসর হ'লে অসীম শক্তি স্ফুরিত হবে; এ যুগে সমষ্টির শক্তিই শক্তি—'সঙ্ঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে'। এইজন্য সমবেত প্রার্থনাও আবশ্যক।

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

ঋষির আশীর্বাণী: 'তোমাদের সকলের সঙ্কল্প, হৃদয়, অন্তঃকরণ সব এক সুরে বাঁধা হোক—যাতে তোমাদের পরম ঐক্য লাভ হয়, তাই হোক।'

তিমিরাভিসার

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

বাঁশী বাজে 'রাধা' 'রাধা'!
অই নাম ছাড়া বাজিতে জানে না,
অই নামে সুর সাধা।
শুনি সেই ধ্বনি রাধা নহে থির,
বুকে জাগে তার বেদনা-গভীর,
প্রাণের আবেগ উথলিয়া উঠে,
নাহি মানে কোন বাধা।
বাঁশী বাজে—'রাধা' 'রাধা'।

বরিষার মেঘ-দামে,
দিগ্‌দিগন্ত ভরেছে তখন,
যামিনী মধ্য-যামে।
গগনে উঠিছে অশনির ধ্বনি,
দামিনী চমকে, চমকে ধরণী,
ঊর্ধ্ব হইতে ঝর-ঝর-স্বনে
জলধর-ধারা—নামে!
বাঁশী বাজে—'রাধা' নামে!

কেমনে রহে সে ঘরে।
কানু-অনুরাগে জর-জর হিয়া,
দু'আঁখিতে বারি ঝরে!
একে ঘোরা রাতি ভরা আঁধিয়ার,
দুর্যোগময় বন-কান্তার,
তবু অভিসারে চলে বিরহিনী
চলে বঁধুয়ার তরে।
বাঁশী বাজে প্রেম-ভরে!

বাঁশী বাজে, বাঁশী বাজে।
চমকিত হ'য়ে শুনিছে শ্রীমতী
আপন মনের মাঝে!
মন্থর-পদে যত আগুসারে,
সাথে সাথে যেন হেরে বঁধুয়ারে,
মনে হয় যেন সেই মনোচোরা,
তাহারি হিয়ায় রাজে।
'রাধা' নামে বাঁশী বাজে।

রাধা চলে—রাধা চলে।
প্রাণের দয়িত আর কত দূরে—
কোন্ কুঞ্জের তলে?
কেঁদে উঠে প্রাণ ব্যাকুল বিরহে,
বেদনার দাহে সারা তনু দহে,
অবলা নারীর আর কত সহে,
চরণ কেবলি টলে!
বাঁশী বাজে পলে পলে!

এই ত' সে চিত-চোর!
'রাধা' 'রাধা' নামে বাজায় বাঁশরী
আপনার ভাবে ভোর!
গিরিধারী পাশে মিলিল শ্রীরাধা,
ঘন বরিষার আর নাহি বাধা,
দুঁহু হিয়া আজ দুঁহু প্রেমে বাঁধা,
প'রে মিলনের ডোর!
বাঁশী আজ ভাবে ভোর!

সাধু শ্রীজ্ঞান-সম্বন্ধর্

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

বেদারণ্যমে বসে এই প্রবন্ধ লিখছি, কাজেই এখানে জ্ঞান-সম্বন্ধর্ যে অলৌকিক ঘটনা সম্পাদন করেছিলেন তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বেদারণ্যম্ তাঞ্জোর জেলায় সমুদ্রের ধারে অবস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম। মাদ্রাজ থেকে এর দূরত্ব ২২০ মাইল। ঘূর্ণিবাত্যায় সেবা করার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে এখানে এসেছি। বেদারণ্যম্ অতি প্রাচীন স্থান। এখানে শিবের বিখ্যাত মন্দির আছে; শিবের নাম শ্রীবেদারণ্যেশ্বর। কথিত আছে, পুরাকালে চার বেদ স্বয়ং আবির্ভূত হ'য়ে বেদারণ্যেশ্বরের পূজা করেছিলেন। তারপর থেকে মন্দিরের সুবৃহৎ প্রধান প্রবেশদ্বার আপনা-আপনি বন্ধ হ'য়ে যায়, কারণ সে দরজা দিয়ে আর কেহ মন্দিরে প্রবেশ করতে সাহস করে নি। পূজার জন্য পুরোহিতরা দরজাতে ছোট একটি ছিদ্র ক'রে তাই দিয়ে যাতায়াত করতেন।

জ্ঞানসম্বন্ধর্ ও আপ্পার্ যখন এই মন্দিরে আসেন তাঁরা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে প্রধান দরজা দিয়েই প্রবেশ ক'রে ভগবানের দর্শন করবেন। দরজা খোলার জন্য প্রথমে আপ্পার্ দেবতায় স্তুতিগান করেন, কিন্তু তাতেও দরজা খোলে না! অতঃপর আপ্পার্ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে জ্ঞানসম্বন্ধর্ দেবতার উদ্দেশ্যে এক অপূর্ব ভক্তিরসাত্মক স্তব রচনা ক'রে গান করেন। দেবতার হৃদয় দ্রবীভূত হ'ল এবং সমবেত অসংখ্য ভক্ত নরনারী অবাক্ বিস্ময়ে দেখল যে বহুকালের বন্ধ দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। আনন্দে মগ্ন হয়ে সাধুদ্বয় মন্দিরে প্রবেশ-পূর্বক ভগবানের পূজা করলেন। পূজান্তে বাইরে এসে জ্ঞানসম্বন্ধর্ আর একটি স্তব গান করাতে দরজা আবার বন্ধ হ'য়ে গেল। উপস্থিত পূজারীবৃন্দ জ্ঞানসম্বন্ধের পদতলে পতিত হয়ে আবেদন জানাল, যে প্রয়োজন-মত তারাও যেন প্রার্থনা জানালে দরজা খুলে যায় ও বন্ধ হ'য়ে যায়। সাধুরা বললেন, 'আমরা যে যে স্তব গান করলাম তোমরাও ভক্তিভরে ঐগুলি গান করলে দরজা খুলবে ও বন্ধ হবে।' তদবধি আজ পর্যন্ত মন্দিরে ব্রহ্মোৎসবের সময় অসংখ্য ভক্ত নরনারী-পরিবৃত হ'য়ে পূজারীরা সেই স্তব গান ক'রে বছরে একবার সেই দরজা খোলেন এবং উৎসবান্তে আবার স্তব গান ক'রে দরজা বন্ধ করেন। অবশ্য, এখন আর দরজা আপনা-আপনি খোলে না বা বন্ধ হয় না; কারণ সে জ্ঞান-সম্বন্ধই বা কোথায়, আর সে ভক্তিই বা কোথায়?

বেদারণ্যমে কয়দিন মহানন্দে কাটিয়ে সব দল-বল নিয়ে জ্ঞানসম্বন্ধর্ মাদুরাভিমুখে যাত্রা করলেন। মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরা দ্বিতীয় বৃহত্তম ও প্রাচীনতম শহর। মীনাক্ষী এই শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মীনাক্ষীদেবীর মন্দির দাক্ষিণাত্যের মন্দির-গুলির মধ্যে বৃহত্তম বললেও অত্যুক্তি হবে না। জ্ঞানসম্বন্ধের সময়ে কূন পাণ্ড্য নামে পাণ্ড্যবংশীয় এক রাজা মাদুরায় রাজত্ব করতেন। 'কূন' অর্থে কুব্জ বা বিকৃতদেহ। বুদ্ধির বিকৃতিবশতঃ তিনি জৈনধর্ম অবলম্বন করেন ব'লেও কেহ কেহ তাঁকে 'কূন পাণ্ড্য' বলতেন। পরে তিনি 'সুন্দর পাণ্ড্য' নামেও খ্যাতিলাভ করেন। তখন মাদুরা শহর ও আশেপাশের গ্রামগুলিতে জৈনদের বিশেষ আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল। রাজার সমর্থন পেয়ে জৈনরা নানাপ্রকার অত্যাচার করতেন এবং বলপ্রয়োগে বহুলোককে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। জৈনদের মধ্যে কেহ কেহ মন্ত্রাদি জানতেন এবং ময়ুরের পাখা দিয়ে নানারূপ তুকতাক করতেন।

সাধারণ লোক এতে ভয় পেয়ে সহজেই তাদের ধর্মে দীক্ষিত হ'ত। শৈবদের, তথা ঐ রাজ্যের হিন্দুদের সে এক মহা দুর্দিন।

রাজা এবং বহু প্রজা জৈনধর্মাবলম্বী হ'লেও রাণী মাঙ্গারকারসি ও প্রধান মন্ত্রী কুলশেখর কিন্তু শৈব ছিলেন। জ্ঞানসম্বন্ধের খ্যাতির কথা তাঁদের কানে এল এবং ধর্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁরা জ্ঞানসম্বন্ধরকে মাদুরায় আসবার জন্য সকাতর অনুরোধ জানিয়ে গোপনে দূত প্রেরণ করেন। তিনি রাজী হলেন এবং পথে অন্যান্য মন্দিরাদি দর্শনান্তে মাদুরায় এসে মঠে আশ্রয় নিলেন। জৈনরা এ খবর শুনে অত্যন্ত আশঙ্কান্বিত হলেন। বুদ্ধির বিভ্রমবশতঃ জ্ঞানসম্বন্ধকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা অবলম্বন করলেন এক অতি হীন ও জঘন্য পন্থা। গভীর রাতে যখন সকলে নিদ্রাগত, তখন জৈনরা জ্ঞানসম্বন্ধের কুটিরে দিলেন আগুন লাগিয়ে। কিন্তু ভগবান ত নিজেই গীতায় বলেছেন, 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' অপরের চীৎকারে জ্ঞানসম্বন্ধ বেরিয়ে এসে মাদুরার বিখ্যাত শিব চোকনাথের উদ্দেশে এক স্তব রচনা করেন। আগুন নিবে গেল। রাজার সম্মতিক্রমে জৈনরা তাঁর কুটিরে আগুন দিয়েছে শুনে তাঁর অত্যন্ত রাগ হ'ল এবং তিনি প্রার্থনা করলেন, যাতে ঐ আগুন ব্যাধিরূপে রাজার শরীর আক্রমণ করে। তাই হ'ল। তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হ'য়ে রাজা ছটফট করতে লাগলেন এবং রোগমুক্তির জন্য জৈন পুরোহিতদের ডেকে পাঠালেন। তারা এসে ময়ূরের পাখা বুলিয়ে অনেক ঝাড় ফুঁক ক'রল কিন্তু ব্যাধির কোনও উপশম হ'ল না। অবশেষে রাণীর অনুরোধে কুন পাণ্ড্য জ্ঞানসম্বন্ধরকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি এসে শিবের উদ্দেশ্যে এক স্তব গান করলেন এবং প্রসাদী ভস্ম রাজার অঙ্গে লেপন ক'রে দিতেই রাজা সুস্থ হ'য়ে উঠলেন। জৈনরা লজ্জা পেয়েও দমিত হ'ল না। তাদের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞানসম্বন্ধের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করার জন্য তারা কোনও রকমে আরও দুটি পরীক্ষায় জন্য রাজাকে রাজী করা'ল। পরীক্ষা এইভাবে হ'ল: জৈনরা জ্ঞানসম্বন্ধরকে ব'লল, 'আমরা আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি স্তব লিখব। তুমিও তোমার ভগবান সম্বন্ধে পত্রে একটি স্তব লেখ। আমরা উভয়ে সেই পত্র প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ ক'রব। যাদের ঈশ্বর সত্য ও মহত্তর তাদের পত্র আগুনে দিলেও পুড়বে না। যাদের ঈশ্বর নিকৃষ্ট ও মিথ্যা তাদেরটি পুড়ে যাবে। জ্ঞান-সম্বন্ধ রাজী হলেন। এই পরীক্ষা দেখবার জন্য হাজার হাজার লোক সমবেত হ'ল। সপার্ষদ রাজাও উপস্থিত হলেন। উভয় দলই স্তব-লেখা পত্র দুটি জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ ক'রল। নিমেষে জৈনদের পত্রটি ভস্মসাৎ হ'ল, কিন্তু জ্ঞানসম্বন্ধের পত্রটি যথাপূর্ব রয়ে গেল। শিয়ালির সাধুকে সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল। পরাজয় স্বীকার করার জন্য বলা সত্ত্বেও জৈনরা রাজী হ'ল না। রাজা তাঁর অসুখের ব্যাপারে জৈনদের প্রতি কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু এই ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতায় ও সাধুত্বে তাঁর সন্দেহ আরও দৃঢ় হ'ল। তিনি শৈবধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হবার জন্য জ্ঞানসম্বন্ধরকে অনুরোধ জানালেন, কিন্তু জৈনরা রাজার পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চেয়ে কোনও রকমে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করে; এবং নিম্নলিখিত শেষ পরীক্ষাটি গ্রহণের জন্য রাজাকে রাজী করায়।

বৈগাই নদীর তীরে মাদুরা শহর অবস্থিত। এর স্রোতের খুব জোর ব'লে একে বেগবতীও বলা হয়। তখন বর্ষাকাল। নদীর কানায় কানায় জল এবং প্রচণ্ড স্রোত, যেন হাতীকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জৈনরা বলল, 'আমরা আমাদের প্রভু অর্হতের সম্বন্ধে পত্রের ওপর একটি স্তব লিখব এবং জ্ঞানসম্বন্ধও তার ভগবান সম্বন্ধে আর একটি পত্রে স্তব লিখবে। উভয় পত্রই স্রোতের মাঝ-

খানে স্থাপন করা হবে এবং যার ভগবান সত্য ও মহৎ তার পত্র স্রোতের বিপরীত দিকে যাবে। পরীক্ষা দেখবার জন্য বেগবতীর তীরে সমস্ত শহর ভেঙে পড়ল। রাজাও সদলবলে উপস্থিত। জৈনরা তাদের পত্র স্রোতে নিক্ষেপ করা মাত্র উহা মুহূর্তে স্রোতের অনুকূলে অর্থাৎ নীচের দিকে ভেসে গেল, কিন্তু আশ্চর্যের ও বিস্ময়ের বিষয় যে শিব স্মরণ ক'রে জ্ঞানসম্বন্ধর্ তাঁর পত্র স্রোতের মধ্যস্থলে স্থাপন করলে সেটি ধীরে ধীরে স্রোতের বিপরীত দিকে যেতে লাগল। জ্ঞানসম্বন্ধের জয় দিতে দিতে সকলে তাঁর পদতলে পতিত হ'ল। রাজাও তাঁর পায়ে প'ড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন এবং তাঁর সকাতর প্রার্থনায় জ্ঞানসম্বন্ধর্ রাজাকে পুনরায় শৈবধর্মে দীক্ষিত করলেন।

জৈনদের শঠতা ও জ্ঞানসম্বন্ধের প্রতি তাদের অত্যাচারের জন্য রাজা মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন, 'এই সব ধূর্তদের যথোপযুক্ত শাস্তি দাও'। ভয়ে বহু জৈন দেশত্যাগী হ'ল। ঘরে আগুন দেওয়ার অপরাধে এবং জোর ক'রে হাজার হাজার লোককে অন্য ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য শাস্ত্র ও পণ্ডিতদের বিধান অনুযায়ী বহু জৈনকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।

মাদুরা থেকে বিদায় নিয়ে জ্ঞানসম্বন্ধর্ বিখ্যাত রামেশ্বর মন্দির দর্শন ক'রে পথিমঙ্গাই নামক এক শহরে এলেন। বৌদ্ধদের এটি একটি প্রধান ঘাঁটি। এরা শৈবদের অত্যন্ত ঘৃণা ক'রত। এখানেও এক সভায় বৌদ্ধদের সাথে জ্ঞানসম্বন্ধের এক শিষ্যের তর্ক হ'ল। বৌদ্ধরা ক্রমান্বয়ে পরাজিত হওয়ায় অবশেষে প্রায় সকলেই শৈবধর্ম গ্রহণ ক'রল। এইভাবে জ্ঞানসম্বন্ধের চেষ্টায় শৈবধর্ম, তথা হিন্দুধর্ম স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অতঃপর জ্ঞানসম্বন্ধর্ ত্রিবাত্তুর শিবমন্দির দর্শনান্তে শ্রীকালহস্তীশ্বর-মন্দিরে গমন করেন। এখানকার প্রধান ভক্ত ব্যাধ কানাপ্পার ভক্তির কথা স্মরণ ক'রে তাঁর চোখে জল এল। কানাপ্পা সম্বন্ধে তিনি সুন্দর স্তব রচনা করলেন। এখানে কয়দিন মহানন্দে কাটিয়ে জ্ঞানসম্বন্ধর্ মাদ্রাজ শহরের দিকে রওনা হলেন। মাদ্রাজ শহরের দক্ষিণাংশ ময়লাপুর নামে খ্যাত। তামিল ভাষায় 'ময়লাই' অর্থ ময়ূর। কথিত আছে এখানে দেবী পার্বতী ময়ূরের রূপ ধ'রে মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন। তদবধি এই অঞ্চল ময়লাপুর নামে প্রসিদ্ধ। এখনও ময়লাপুরস্থিত কপালীশ্বর নামক বিখ্যাত শিবমন্দিরের পাশেই মন্দিরের 'স্থলবৃক্ষ'-সংলগ্ন একটি ছোট মন্দিরে পাথরের একটি ছোট শিবলিঙ্গ এবং তার পাশেই শ্রীভগবতীর ময়ূর-মূর্তি রয়েছে, যেন তিনি শিবকে পূজা করছেন।

মাদ্রাজ শহরে এটিই সব চেয়ে বড় মন্দির। এই ময়লাপুরে শিবনেশন চেট্টি নামে এক ধনী শিবভক্ত বাস করতেন। পুস্পাবাঈ নামে তাঁর একটি সর্বগুণসম্পন্না ভক্তিমতী সুন্দরী কন্যা ছিল। 'পুস্পাবাঈ' অর্থ কেউ কেউ বলেন পুষ্পকন্যা। বলাবাহুল্য শিবনেশন কন্যা-গতপ্রাণ ছিলেন। পুস্পাবাঈ রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে আসত এবং পিতাপুত্রীতে মালা গেঁথে রোজ ভগবান কপালীশ্বরের পূজা করতেন। একদিন ভোরে পুস্পাবাই বাগানে ফুল তুলছে, এমন সময় এক বিষধর সর্প তেড়ে এসে তাঁকে দংশন ক'রল। সঙ্গে সঙ্গে বিষের তীব্র জ্বালায় পুস্পাবাঈ মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে যায়। কন্যাকে বাঁচাবার জন্য পিতা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'। স্নেহময় পিতা হাহাকার ক'রে উঠলেন। তাঁর দুঃখ দেখে উপস্থিত সকলের হৃদয় বিগলিত হ'ল; অনেকেই অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।

মন্দিরের অদূরেই পুস্পাবাঈ-এর প্রাণহীন দেহের সৎকার করা হ'ল। চিতা নির্বাপিত হ'লে পিতা অস্থিগুলি সংগ্রহ ক'রে একটি স্বর্ণপাত্রে সযত্নে রক্ষা করলেন। দুইজন পরিচারিকা উহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হ'ল এবং শিবনেশন রোজ কন্যার

উদ্দেশ্যে অস্থিপাত্রের সামনে খাদ্য ও পানীয় উৎসর্গ করতেন। অনেকে মনে ক'রল কন্যার শোকে পিতা বোধহয় পাগল হ'য়ে যাচ্ছেন।

জ্ঞানসম্বন্ধের মাহাত্ম্যের কথা শিবনেশন পূর্বেই শুনেছিলেন এবং তাঁর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়েছিলেন। শ্রীকালহস্তীশ্বর থেকে জ্ঞানসম্বন্ধর্ যখন ময়লাপুরে পৌঁছলেন বহু লোক তাঁর দর্শন লাভ করে ধন্য হ'ল। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে শিবনেশন তাঁর দর্শনে ছুটলেন, কিন্তু কন্যার কথা তাঁকে কিছুই বললেন না। অপরের মুখে জ্ঞানসম্বন্ধর্ পুম্পাবাঈ-এর কথা শুনলেন। শিবনেশনের দুঃখের কথা স্মরণ ক'রে এবং তার অবস্থা দেখে সাধুর হৃদয় বিগলিত হ'ল।

অতঃপর হাজার হাজার ভক্ত-সমাবৃত হ'য়ে তিনি কপালীশ্বর মন্দিরে শিবকে দর্শন ও পূজা ক'রে মন্দিরের প্রবেশদ্বারের পশ্চিমদিকে উপবেশনপূর্বক শিবনেশনকে বললেন, 'কই তোমার কন্যার অস্থি-পূর্ণ পাত্রটি এখানে নিয়ে এস তো।' সকলেই মনে ক'রল জ্ঞানসম্বন্ধর্ অলৌকিক কিছু করবেন। সুপ্রশস্ত মন্দিরপ্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেল। পাত্রটি সম্মুখে স্থাপিত হ'লে কিছুক্ষণ মুদ্রিত নয়নে থেকে তিনি কপালীশ্বর শিবের এক স্তব রচনা ক'রে ভক্তিগদগদকণ্ঠে তা গান করতে শুরু করলেন। সেই স্তবে তিনি শিবের কাছে করুণকণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন—পুম্পাবাঈ যেন তাঁর কৃপায় পুনর্জীবিতা হয়। ভক্তের আকুল প্রার্থনা ও আবদার ভগবানের হৃদয় স্পর্শ ক'রল। সমবেত সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলেন যে অস্থিপূর্ণ পাত্রটি ধীরে ধীরে নড়তে আরম্ভ করেছে। আশ্চর্যের বিষয় স্তব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটি ভেঙে গেল এবং তা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল একটি অতি কমনীয়া বালিকা—ইনি আর কেহই নহেন, ইনিই পুম্পাবাঈ। পিতাপুত্রী সাধুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন। সমবেত সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল এবং দেবতারা জ্ঞানসম্বন্ধের উপর পুষ্পবৃষ্টি করলেন। বহু জৈন এবং বৌদ্ধও এই ঘটনা দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা জ্ঞানসম্বন্ধের অলৌকিক কাণ্ড দেখে সকলেই শৈবধর্ম গ্রহণ করলেন। পুনরায় সাধুর চরণে প্রণত হ'য়ে বললেন শিবনেশন, 'স্বামিন্, এই কন্যাকে বহু পূর্বেই আপনার নামে উৎসর্গ করেছিলাম—আপনি কৃপা ক'রে একে গ্রহণ করুন।' জ্ঞানসম্বন্ধর্ তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন, 'এ আমার কন্যাস্বরূপা। কপালীশ্বর মহাদেবের অসীম কৃপা প্রদর্শনের জন্যই এই কন্যার জীবন দান করলাম।'

এর পর জ্ঞানসম্বন্ধর্ বিশ্রামলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর জন্মস্থান শিয়ালি এলে গ্রামের ব্রাহ্মণরা জ্ঞানসম্বন্ধর্‌কে ধরে বসলেন যে তাঁকে বিবাহ করতে হবে। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি সে দায়িত্ব বহনে অক্ষম।' ব্রাহ্মণরা নানাভাবে যুক্তিতর্কের অবতারণা ক'রে বললেন, 'আপনি বৈদিকধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। বৈদিক নিয়ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণের বিবাহ করা উচিত।' সকলের অনুরোধ ও আকূতি জ্ঞানসম্বন্ধর্ এড়াতে পারলেন না। বিখ্যাত শিবভক্ত নাম্বি অন্দরনাম্বির সুলক্ষণা কন্যার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হ'ল। বহু ব্রাহ্মণ ও শিবভক্ত সমবেত হ'লেন। জ্ঞানসম্বন্ধর্ তিরুমানম্ মন্দিরে গিয়ে শিবকে পূজা ক'রে এসে কন্যার গলায় পরিণয়তালি পরিয়ে দিলেন। দাক্ষিণাত্যে বিবাহের সময় স্বামী কন্যার গলায় একটি স্বর্ণ 'তালি' (মাদুলির ন্যায়) পরিয়ে দেন উহাকে 'সুমঙ্গলী'ও বলা হয়। স্বামী যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন ঐ তালি প্রত্যেক স্ত্রী সব সময় ধারণ ক'রে থাকেন। উহাই সধবার চিহ্ন।

বিবাহান্তে জ্ঞানসম্বন্ধর্ ভাবলেন, 'প্রকৃত সুখ ও শান্তি বিবাহ দ্বারা পাওয়া অসম্ভব। একমাত্র শিবসাযুজ্যেই উহা সম্ভব।' এই ভেবে তিনি প্রার্থনা আরম্ভ করলেন। কথিত আছে, ভক্তের প্রার্থনায়

শিব এক বিরাট অগ্নিমূর্তি ধারণ ক'রে জ্ঞানসম্বন্ধের সামনে এলেন। সকলে আশ্চর্য হ'য়ে দেখল যে দাউ দাউ ক'রে অগ্নি জ্বলছে, কিন্তু তার মধ্যে একটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। জ্ঞানসম্বন্ধর্ সকলকে বললেন, 'মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, শীঘ্র সকলে এস',—এই ব'লে তিনি সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রী ও সমবেত ভক্তগণসহ সেই প্রজ্জলিত অগ্নিতে প্রবেশ ক'রে চিরতরে শিবসাযুজ্য লাভ করলেন। কর্তব্য সমাপনান্তে এইভাবে এক মহান্ আচার্যের জীবনের অবসান হ'ল।

* * *

স্তব রচনা করার এক অদ্ভুত শক্তি দিয়েছিলেন ভগবান জ্ঞানসম্বন্ধকে। তামিল ভাষায় তিনি প্রায় ৩৮৪০টি শ্লোক একশত প্রকার বিভিন্ন ছন্দে রচনা করেন। শৈবধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অভিমত পরিষ্কাররূপে তাঁর রচনার মাধ্যমে আমরা পাই। শিবের সাকার ও নিরাকার দুটি রূপের কথাই তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে ঈশ্বর এক এবং অনন্ত; যিনি জ্যোতিরও জ্যোতি, তিনিই আবার বিভিন্নরূপে স্থান কাল ও পাত্রভেদে অবতীর্ণ হন। তিনি কেবল মঙ্গলই করেন। অন্যায় বা মন্দের ছায়া পর্যন্ত তাঁতে নাই। তিনি জীবনের জীবন এবং ভক্তের হৃদয়কে তিনি সাময়িক সুখদুঃখের পারে নিয়ে গিয়ে অনন্ত শান্তিতে পূর্ণ করেন ও মধুময় করেন। জ্ঞানসম্বন্ধের মতে—তপস্বী অপেক্ষা ভক্ত শ্রেষ্ঠ। তিনি ভক্তিকেই মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলেছেন। তিনি বলতেন, ভক্তিপুষ্প প্রস্ফুটিত হ'লে মুক্তি লাভ হয়। ভগবান ভক্তের সঙ্গ চান—তিনি ভক্তাধীন, একথা তিনি একাধিক বার বলেছেন।

ষোল বছর তিনি স্থূল শরীরে ছিলেন; তাঁর হৃদয় ছিল ভক্তিতে পরিপূর্ণ, অন্তর ছিল জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, জীবন ছিল আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ এবং কর্ম ছিল সর্বদা অপরের সেবা। জগতের সর্বজীবের কল্যাণের জন্য তিনি বার বার সকরুণ প্রার্থনা জানিয়েছেন তাঁর ইষ্টদেবকে। তাঁর প্রার্থনার মন্ত্র ছিল, 'জগৎ থেকে পাপ তাপ চলে যাক, সকলে শান্তিতে থাকুক এবং সকলে ভগবানের সান্নিধ্যলাভ ক'রে চিরশান্তির অধিকারী হোক।' এই সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত তামিল স্তবক-টির অনুবাদ দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি:

গো-ব্রাহ্মণ দেবতা সকল হউক শান্তিময়,
শীতল বৃষ্টি ধরায় ঝরুক—রাজার হউক জয়।
সকল অশুভ ধ্বংস হউক—শিব-নাম-মহিমায়,
দুঃখ ও শোক নিঃশেষ হোক পৃথিবীর সীমানায়।

ভ্রান্তি

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর

আপনি হ'য়ে রূপের রাজা বৃথাই মনের ভ্রান্তিতে,
রূপ-পিয়াসী রূপের নেশায় চল্‌লি কোথায় প্রাণ দিতে?
ভোগবিলাসী, ভোগ না ক'রে আপন বিরাট সত্তারে,
কার কাছে কি ভিক্ষা মেগে হাত বাড়ালি পথ-ধারে?

নাভির মূলে বদ্ধ রেখে গন্ধে ভরা কস্তুরি—
মৃগের যেমন গন্ধ খুঁজে কানন-ভ্রমণ দস্তুর-ই,
নিজকে নিজে যে না জানে—পশুর মত মূর্খতায়,
পাওয়া ধনে হারায়ে সে তেমনি কেবল দুঃখ পায়।

প্রাচীন ভারতে দুর্ভিক্ষের প্রতীকার-ব্যবস্থা

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতবর্ষ ধনধান্যপূর্ণ সম্পৎশালী দেশ বলিয়া পরিগণিত। প্রাচীন ভারতে খাদ্যাভাব ছিল না, দুর্ভিক্ষের ধ্বংসকর করাল মূর্তি জনগণ দেখিতে পাইত না—এরূপ প্রাচুর্য ও সম্পদের বর্ণনাই আমরা সাধারণতঃ পাইয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন পুস্তকাদিতে, বিশেষতঃ বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের স্থানে স্থানে দারুণ খাদ্যাভাব ও হৃদয়বিদারক দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জাতক ও অবদান-গ্রন্থাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। উত্তম শস্যোৎপাদনের জন্য ইহাকে প্রধানতঃ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল থাকিতে হয়। প্রাচীন ভারতেও অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টির জন্য শস্যোৎপাদনের বিঘ্ন উপস্থিত হইত—ফলে সময়ে সময়ে খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। এমন কি যথাসময়ে বৃষ্টি না হইলে শস্যহানি হইত এবং খাদ্যাভাবে জনগণ দুঃখ পাইত। ভারতবর্ষের মতো কৃষিপ্রধান দেশে দুর্ভিক্ষ হইত না বা হইবে না—এরূপ কল্পনা করা নিরর্থক।

বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রাচীন ভারতে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব-প্রতীকারের জন্য রাষ্ট্র সর্বদাই সজাগ ও সক্রিয় ছিল, কর্তব্যপালন ও দায়িত্ব-স্বীকারে পশ্চাৎপদ ছিল না। কৌটিল্য তাঁহার রাষ্ট্রনীতি-সম্বন্ধীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্রে' দুর্ভিক্ষ-প্রতীকারের জন্য রাষ্ট্রের নীতি হিসাবে কতিপয় উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। সর্বসাধারণের মধ্যে সমভাবে বিতরণের (ভক্ত-সংবিভাগ) জন্য খাদ্যশস্য-সংগ্রহ (ভক্তোপগ্রহ), খাদ্যের বিনিময়ে বা মূল্যবাবদ রাস্তা-ঘাট-সেতু-বাঁধ-দুর্গাদি নির্মাণরূপ লোককল্যাণকর কার্যের প্রবর্তন, ঘাটতি-অঞ্চলগুলি হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল অঞ্চলসমূহে সুশৃঙ্খল লোকবিনিময়, জলসেচ, খাল-খননাদি, লৌকিক উপায়ে পতিত জমির সংস্কারসাধন ও উহাতে শস্যোৎপাদনের চেষ্টা এবং অন্যান্য উর্বর ভূমিতে ব্যাপকভাবে 'অধিক-ফসল-ফলাও' অভিযানের প্রচলন প্রভৃতি কার্যকর উপায় দ্বারা কৌটিল্য শাসকগণকে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ ও প্রতীকার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। (কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র-৩য় অঃ, ৭৮তম প্রকরণ)

দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য কৌটিল্য যে-সকল উপায় *নির্দেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে একটি বিশেষরূপে* প্রণিধানযোগ্য। দুর্ভিক্ষের সময় ধনিগণের উপর অত্যধিক কর ধার্য করিয়া তাহাদিগকে অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করার নীতি অবলম্বন করিবার জন্য কৌটিল্য শাসকগণকে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই একটি অত্যাবশ্যক উপায়, কারণ দারুণ অন্নাভাবের দিনে জাতীয় অর্থসঙ্কট চরম অবস্থায় উপনীত হইলে, রাষ্ট্র এরূপ একটি কার্যকর উপায় অবলম্বন করিয়া দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হইতে পারে।

'রেশনিং' বা মাথাপিছু খাদ্যবরাদ্দের প্রথা (ভক্ত-সংবিভাগ) দ্বারা প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র কিরূপে দুর্ভিক্ষ-প্রতীকারের চেষ্টা করিত উহার বিশদ বর্ণনা বৌদ্ধ অবদানগুলিতে পাওয়া যায়। 'দিব্যাবদানে' বর্ণিত আছে—দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী হইলে প্রজাহিতৈষী রাজা কনকবর্ণ দুর্ভিক্ষের কবল হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য রাজ্যের লোকগণনা এবং খাদ্যসম্পদের মোট হিসাব করাইলেন। রাজা সমস্ত খাদ্যশস্য ক্রয় করিলেন এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলি হইতে আরও শস্য আমদানি করিয়া সঞ্চয়ের শস্যভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিলেন। এরূপে ব্যাপক শস্যসংগ্রহ-নীতি অবলম্বন করিবার

সঙ্গে সঙ্গে রাজা প্রত্যেক প্রজার মধ্যে সমভাবে নির্দিষ্ট খাদ্য-বরাদ্দের ভিত্তিতে খাদ্য-বিতরণের নিমিত্ত প্রতিগ্রামে, পল্লীতে, শহরে, নগরে সরকারী শস্য-ভাণ্ডার (কোষ্ঠাগার) স্থাপন করেন। রাজ্যের সমগ্র শাসনযন্ত্র এরূপ সততা ও আন্তরিকতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল যে প্রজাগণ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকালের সঞ্চিত খাদ্যশস্য নিঃশেষিত হওয়ায় রাষ্ট্রপরিচালিত নীতি ভাঙিয়া পড়ে। তখন রাজার দয়াদাক্ষিণ্য-বশতঃ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন হয়। রাজা নিজের সমগ্র খাদ্যশস্যভাগ বোধিসত্ত্বকে অর্পণ করিয়া সেইবার প্রজাদের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। কনকবর্ণের এই উপাখ্যানে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য ভারতের একজন শাসকের আন্তরিক অনুরাগ ও সহানুভূতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

'অবদানশতকে' আমরা বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টার উল্লেখ দেখিতে পাই। দুর্ভিক্ষের বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত নিজের ব্যবহারের জন্যে রাজকীয় ভাণ্ডারে রক্ষিত সমস্ত আহার্য ও পানীয় দ্রব্য দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাগণের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করিতে আদেশ দিলেন। রাজা ঘোষণা করিলেন যে তিনি প্রজাগণের সমপর্যায়ভুক্ত—প্রজাদের দুঃখ তাঁহার নিজের দুঃখ, তাঁহার নিজের আহার্যভাগ ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ প্রজাবর্গের প্রাপ্য। রাজ্যের লোকসংখ্যাগণনা এবং সঞ্চিত-শস্যভাণ্ডারের পরিমাণ-নির্ধারণের পর নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, প্রত্যেক প্রজার জন্য এক বরাদ্দ (ভাগ) এবং রাজার জন্য দুই বরাদ্দের ব্যবস্থা হইলে উপস্থিত অন্নকষ্টের হাত হইতে দেশবাসিগণ রক্ষা পাইতে পারে। লোকগণনার সময় ভুলক্রমে এক ব্যক্তি বাদ পড়িয়াছিল এবং সে যখন তাহার দাবি উপস্থিত করিল, তখন রাজা তাঁহার নিজস্ব অতিরিক্ত বরাদ্দ ছাড়িয়া দিয়া প্রজার সমপর্যায়ভুক্ত হইলেন।

উপরি-উক্ত দুইটি উপাখ্যানেই দুর্ভিক্ষপীড়িত ও ভীতিবিহ্বল প্রজাদের দুঃখ-অপনোদনের জন্য রাজ্যশাসকগণের আন্তরিক সহানুভূতি, অনুপম সহৃদয়তা ও দৃষ্টান্তস্থানীয় স্বার্থত্যাগের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শাসকবর্গের প্রত্যেকেই সততা, একনিষ্ঠা, প্রেম ও উদ্যমের সহিত দুর্ভিক্ষ-নিবারণের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের দুঃখনিবারণ রাজ্যসরকারের সর্বাগ্র দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। শাসক-গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য অবলম্বিত রাষ্ট্রনীতিকে সর্বাংশে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিয়াছিল।

গ্রন্থাদিতে বর্ণিত উপাখ্যান ছাড়াও আমরা দুই হাজার বৎসরের অধিক কাল পূর্বের ভারতে দুর্ভিক্ষ-প্রতীকার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য উৎকীর্ণ লিপির সন্ধান পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে দুইটি শিলালেখের উল্লেখ করিতেছি—একটি তাম্র ও অপরটি প্রস্তর-ফলকের উপর খোদিত। আশ্চর্যের বিষয়, কৌটিল্যের দুর্ভিক্ষনীতি এবং বৌদ্ধ অবদান-সমূহে বর্ণিত শাসকগণের দুর্ভিক্ষনীতির সহিত এই দুইটি শিলালিপিতে উক্ত দুর্ভিক্ষ-নিবারণের উপায়-গুলির স্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

তাম্র-ফলকটি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার সোগৌরা নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফলকটির পাঠোদ্ধার করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহাতে খাদ্যাভাবের সময়ে ও আসন্ন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় দুর্ভিক্ষ প্রতীকারের জন্য রাজ্যের শাসক নির্দেশ জারি করিয়াছেন। ফলকটি রাজ্যের প্রকাশ্যস্থানে শস্যভাণ্ডারের প্রাচীরগাত্রে প্রোথিত করা হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মী হরফে অনুশাসনলিপিটি লিখিত। শ্রাবস্তীর মন্ত্রি-পরিষদ্ কর্তৃক আদেশটি ঘোষিত হইয়াছিল এবং ইহাতে উষাগ্রাম বা বাস-গ্রামের শস্যভাণ্ডারগুলির উল্লেখ আছে। রাজার

আদেশের মর্মার্থ এই—শস্যভাণ্ডারগুলিতে সঞ্চিত খাদ্যশস্য কেবল অনাবৃষ্টির সময়ে খরচ করিতে হইবে, প্রাচুর্যের সময়ে খরচ করিতে পারিবে না। স্পষ্টরূপেই বুঝা যায়, প্রাচীন ভারতে দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য রাজ্যসরকারগুলি যথাসময়ে খাদ্যশস্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিয়া সমভাবে সকলের মধ্যে বিতরণের দায়িত্বপালনে তৎপর ছিল।

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর আর একটি প্রস্তরফলক উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার মহাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকার ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, পুণ্ড্রনগর ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির অধিবাসিগণের দুর্ভিক্ষক্লেশ দূর করিবার জন্য তত্রত্য 'মহামাত্র'-শ্রেণীর কর্মচারিগণের উপর মৌর্যযুগের কোনও শাসক এক আদেশ জারি করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ প্রতীকারের জন্য দুইটি উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল (১) প্রথম উপায়—গ্রামণী বা গ্রামের নেতাকে সরকার হইতে বিনাসুদে ঋণ-দান। পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রকে এই আদেশ পালন করিতে বলা হইয়াছে। (২) দ্বিতীয় উপায়—সরকারী শস্যভাণ্ডার হইতে ধান্য-বিতরণ। সরকার ইচ্ছা করেন, এই দুইটি উপায় অবলম্বন করিলে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের ক্লেশ অপনোদিত হইবে। সরকারী আদেশে ইহাও বলা হইয়াছিল—সম্পদ্ ও প্রাচুর্যের দিন ফিরিয়া আসিলে অধিবাসিগণকে সরকারী ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং খাদ্যশস্য সরকারী শস্যভাণ্ডারে ফেরত দিতে হইবে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকারের মতে নদীতীরবর্তী পুণ্ড্রনগর বন্যার জলে ভাসিয়া যাওয়ায় নগরবাসিগণের গৃহগুলি বিনষ্ট হয় এবং দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এই হেতু জনগণের পুনর্বাসনের জন্য সরকারী ঋণদান ও খাদ্যবিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন ভারতের সরকারী দুর্ভিক্ষ-প্রতীকার নীতি সুপরিকল্পিত ছিল এবং নিপুণতার সহিত পরিচালিত হইত। দুর্ভিক্ষ-নীতি পরিচালনে শাসকবর্গ ও সর্বশ্রেণীর কর্মচারিগণের সহৃদয়তা, নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, সততা ও কর্মকুশলতা যথার্থই প্রশংসনীয় ছিল। দুই হাজার বৎসরের অধিককাল পূর্বে ভারতে রাজ্যের বিভিন্ন-স্তরের কর্মচারিগণের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজা-নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ ও সহযোগিতা এবং শাসক-প্রধানদের পুরোবর্তী হইয়া প্রজাদের ক্লেশনিবারণের জন্য নিরলস চেষ্টা ও উদ্যম বর্তমান ভারতের কর্মী ও কর্মচারিগণকে দেশের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের অভাব ও তজ্জনিত দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে উদ্বুদ্ধ করুক।

জ্যোতির জোয়ার

শ্রীসুধীর গুপ্ত

জ্যোতির সমুদ্র হ'তে এসেছে জোয়ার,
উথলিয়া—উচ্ছলিয়া—উল্লসিয়া যায়;
তরঙ্গ ঢলিয়া পড়ে তরঙ্গের গায়,
সঙ্গীত-মুখর হ'ল মোর চারিধার।
নামিল আলোর ঢল্ রুক্ষ মৃত্তিকার
জীর্ণ-দীর্ণ সৈকতের সূক্ষ্ম বালুকায়,
পিপাসা পূরিয়া গেল এক লহমায়;
জ্যোতিতে ভরিয়া গেল পারাবার-পার।

পরিচিত পরিবেশ নিরানন্দকর
আনন্দ-সুন্দর হ'ল রহস্য-নিবিড়;
খেলিছে—দুলিছে ওই জ্যোতির সাগর—
হিল্লোলে হারায় সত্তা মৃত্তিকার তীর,
ডুবে যায়—গ'লে যায়। সীমার ভিতর
এ কোন্ অচিন্ত্য লীলা চলিছে জ্যোতির!

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কথা

শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ যে ক'টি সন্তানের হাত ধ'রে বাংলার অঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিল সেদিন কে জানত যে তারা শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার ইতিহাসে চিহ্নিত প্রাণ। শুধুই কি শ্রীরামকৃষ্ণেরই অন্তরঙ্গ তাঁরা? সমগ্র বিশ্বের ব্যথাতুর মানবতা, যথার্থ উন্নতিকামী হৃদয়, আজও কি তাদের ভাবময় জীবনের অভাব বোধ করে না?

অন্তরের প্রেরণাই তত্ত্বজিজ্ঞাসু নরেন্দ্রকে এনেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে। নবীন সেদিন যেন মাথা নত করেছিল প্রাচীনের কাছে। তৎকালীন নবীনদের প্রতিনিধি নাস্তিক্যবাদের তরঙ্গ-দোলায় দোলায়িত হ'য়ে, মানুষ যে সত্যে চির প্রতিষ্ঠিত সেই সত্যকে পুরোপুরি না পেয়ে, উদ্বেলিত হ'য়ে ছুটে এসেছিল প্রাচীনের প্রশান্ত আশ্রয়ে, সন্দেহ-আকুলিত বিশ্বে নিজের স্বরূপ জেনে নিতে। দক্ষিণেশ্বরের গবেষণাগারে এমনি ক'রে শুধু নরেন্দ্রই আসেননি এসেছিলেন শরৎ শশী এবং আরও অনেকে।

কুড়ি বছরের যুবক শশীও অধ্যাত্মতৃষ্ণা নিবৃত্তির আশা নিয়ে আসেন। গুরু সেটি বুঝেছিলেন, তাই তার পিপাসা মিটিয়েছিলেন—তার প্রাণঢালা সেবা গ্রহণ ক'রে।

শশী প্রায় তিন বছর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা ও সঙ্গ করার সুযোগ পান। এই স্বল্পকালের মধুর স্মৃতি, শিক্ষা ও দীক্ষা তাঁকে সারাটি জীবন শ্রীরামকৃষ্ণময় ক'রে তুলেছিল। কায়, মন ও বাক্যের ত্রি-সাধনায় তিনি জানতেন—দেহ দিয়ে তাঁর সেবা করবো, মন দিয়ে তাঁকে মনন করবো, বাক্য দিয়ে কেবল তাঁর কথাই কইব, তাঁর প্রসঙ্গ করবো। 'তুমি গুরু তুমিই আমার সর্বস্ব, তোমার সুখে আমার সুখ, তোমার প্রদর্শিত পথই আমার পথ, আমার নিজের বলতে যদি কিছু থাকে সে কেবল তুমিই আছ'—এই ছিল তাঁর ভাব। এ ভাবের সাক্ষী ছিল নিষ্ঠা; আর তা যেন মূর্তি ধরেছিল রামকৃষ্ণানন্দ-রূপে। জীবনে কোন বাধাই তাঁকে টলাতে পারে নি, কোন আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে টানতে পারে নি। মঠজীবনের গুরুভাইরা চললেন সবাই তীর্থপর্যটনে, তিনি রইলেন মঠে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের পাশে।

এই নিষ্ঠার আর একটি দিক আছে। গুরুকে ভালবাসি; তাই গুরুর প্রিয় যারা তাদেরও ভালবাসি, মানি ঠিক গুরুর মতই, তখন নিজেকে বড় করি না। গুরুভায়ের আদেশ পালন করি, হ'লেই বা সে গুরুভাই সমবয়সী। গুরুর সঙ্গে যুক্ত যা, তাকে ভালবাসা মানে তো গুরুকেই ভালবাসা, আদর্শকে ভালবাসা। তাই স্বামীজী যখন তাঁকে মাদ্রাজে যেতে বললেন, অমনি অত সাধের, অত প্রিয় ঠাকুর সেবা ছেড়ে চলে গেলেন দাক্ষিণাত্যে। এ যে গুরুরই আদেশ!

তখনকার মাদ্রাজ এখনকার মত ছিল না। তাঁকে পরিবেশ তৈরী ক'রে নিতে হ'ল। সে দেশের ভাষা জানা নেই, বেশী কেউ চেনা নেই, কাজ করার উপযোগী সুযোগ সুবিধা নেই, অভাবের অভাব নেই। যা হ'লে বেশ মনের মত হয়, তার কিছুই নেই; আছে নিষ্ঠা, আছে বিশ্বাস; আছে ধর্মব্যাখ্যার, বই লেখার ও বক্তৃতা করার ক্ষমতা; আছে ব্রত উদযাপন করার মনোবল, আছে সকলের জন্ম কল্যাণ-চিন্তা। তাই কারুর কাছে মুখ ফুটে কোন দিন কিছুই চান নি; শুধু নির্ভর করেছিলেন ঠাকুরের ওপর। গুরু-ভক্তিই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল। ভাবতেন ঠাকুর ঘরে রয়েছেন শ্রীপ্রভু, তিনিই কর্তা, আমি কিছু নই; চালক তিনি।

তিনিই আমার জাগ্রত জীবন্ত দেবতা ; জল পড়লে তাই ঠাকুরের মাথায় ছাতা ধরছেন, গরম হ'লে হাওয়া করছেন "প্রাণনাথ, জীবনবল্লভ" বলে আকুল আকুতি জানাচ্ছেন ; ঠাকুরকে নিবেদন না ক'রে কোন কিছুই গ্রহণ করছেন না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মাদ্রাজে এলেন,—রামকৃষ্ণ-সংঘে তিনি "রাজা মহারাজ"। তাই তাঁর সঙ্গে রাজার মত ব্যবহার। সর্বদা তাঁর তুষ্টি-সাধন প্রচেষ্টা নিজেকে তাঁরই অধীন ভেবে।

শ্রীমা সারদাদেবী দক্ষিণ ভারতের তীর্থপর্যটনে গেলে তাঁর যাবতীয় বন্দোবস্ত শশী মহারাজ নিজেই করলেন—তাঁকে সাক্ষাৎ জগদম্বাজ্ঞানে পূজা ও স্তবস্তুতি ক'রে আশীর্বাদলাভ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ সন্তানদের প্রত্যেকের এক এক দিকে বিশেষত্ব। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মধ্যে বিশেষত্ব কি—যা আমরা নিতে পারি ? ঠাকুর যেন তাঁকে সাধক জীবনের প্রথম-অবস্থার আদর্শরূপে গঠন ক'রে গেছেন। সাধনার আরম্ভকালে সাধকের কেমন ক'রে চলতে হয়, তার প্রতিটি খুঁটিনাটি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনে পরিস্ফুট, যা আমাদের অনুকরণীয়, অনুসরণীয়।

সাধক জীবনের প্রথমেই চাই গুরু-সেবা, গুরু-ভক্তি, নিষ্ঠা, ধ্যান-ধারণা ; প্রথম প্রেরণাকে পাকা করার জন্যেই কর্মের যোগ। আমাদের মধ্যে মাত্র কয়েক জন ছাড়া সকলেরই প্রথম প্রয়োজন হয় অনুষ্ঠানমূলক সাধনার। ভাব প্রভৃতি ত পরের কথা, মুষ্টিমেয় কয়েক জনেরই জন্য।

শশী মহারাজের জীবনে দেখতে পাই ভাবময় হ'য়ে পূজা আরাত্রিক করা, শুধু আরাত্রিকাদি কেন—সব কাজই ভাবে তন্ময় হ'য়ে করছেন। ভাব ও অনুষ্ঠানের দ্বি-ধারা তাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছিল।

সচরাচর তিন শ্রেণীর সেবক দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর যারা—তারা সেব্যের মন বুঝেই সেবা করে, তাদের কিছু বলতে হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর যারা—তাদের একবার ব'লে দিতে হয় আর কখনও ভুল হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর যারা তাদের বার বার বলতে হয়, আর তারা বার বার ভুলে যায়। শশী মহারাজ নিশ্চয়ই প্রথম স্তরের সেবক ছিলেন, কেননা তিনি সেবা করতেন মনের ভাব বুঝে।

কাশীপুরে সবাই সাধন ভজনে মগ্ন, শশী মহারাজ, কেবল সেবা ক'রে চলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের। তিনি কিছু চান না। দাস্যভাবের প্রতিমূর্তি শ্রীহনু-মানের মতো ইষ্ট-সেবার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত।

'মন্নাথ যে জগন্নাথ,' 'মদ্‌গুরু যে জগদ্‌গুরু'—সেইটি তিনি তাঁর 'গুরু ও ঈশ্বর' শীর্ষক যুক্তিপূর্ণ একটি প্রবন্ধে দেখিয়ে গেছেন। সে লেখার মর্মকথা হ'ল :—

ঈশ্বর অসীম। অসীমতা সম্পূর্ণরূপে একক। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—একজন ব্যতীত দু'জন ঈশ্বর হ'তে পারেন না, কারণ দুই 'অসীম' স্ববিরোধী। জীবাত্মা সসীম ; তাই ঈশ্বরকে জানা ও তিনি কেমন মুখে বলা—তার পক্ষে অসম্ভব, কারণ সসীম কখনও অসীমকে জানতে পারে না। সসীম মন অসীম মনের গভীরতা কত—জানেনা বলেই সৃষ্ট জীবের পক্ষে অসীমের ক্রিয়াকলাপ জানা অসম্ভব।

সসীম, পরিমাণে যত বড়ই হোক না কেন অসীমের তুলনায় তা অনন্তগুণে ক্ষুদ্র বা শূন্যবৎ, কেননা অসীম সসীমের চেয়ে অনন্তগুণে বড়। তাই সৃষ্ট পদার্থ ঈশ্বরের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে নগণ্য, আর তাই তারা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। সৃষ্টি স্বাধীন নয় ব'লে, মন সীমাবদ্ধ ; তাই কেমন ক'রে নিজেদের চালাতে হয় তা জানে না ব'লে তাদের ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হওয়া উচিত ; ঈশ্বর সর্বশক্তি-মান, সর্বজ্ঞ প্রভু ; জীব যদি মৃত্যুর হাত থেকে, অগণন দুঃখের হাত থেকে বাঁচতে চায় তাহ'লে তাকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হ'তে হয় ; যখন তারা ঈশ্বরকে হাত ধ'রে নিয়ে যেতে দেয়, যখন নিজের বুদ্ধিতে

চলে না তখনই তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্ঞানের বিকাশ হয়।

কিন্তু প্রভুর মনকে কেমন ক'রে জানা যাবে? স্বষ্ট জীবের তো তা জানার ক্ষমতা নেই। অনন্ত প্রেমময় ভগবান তাই অংশতঃ নিজেকে প্রকাশ করেছেন বেদের মধ্যে, জগতের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে—বাইবেল, কোরান, জেন্দাবেস্তা প্রভৃতির মধ্যে। বেদ প্রভৃতিকে মানাই ধর্মকে মানা। ঈশ্বরেব অনুগত যে, তাকে তাই ধার্মিক বলে।

মানুষ যখন শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করে, অসৎ ব্যবহার করে তখন ঈশ্বরকে—নিজেকেই নিজের ব্যাখ্যাতা হ'তে হয, তখন ধর্মস্থাপনেব জন্যে তাঁকে অবতীর্ণ হ'তে হয়।

এই অবতারেরাই গুরু বা জগতেব প্রকৃত শিক্ষক, এই সব দেহধারী ঈশ্বরকে মেনে বা পূজো ক'রে আমরা ঈশ্বরেরই আজ্ঞা পালন ও পূজো ক'বে থাকি। এই সব গুরুই শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। তাই একমাত্র ঈশ্বরই মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারেন, আর কেউ নয। ভগবান অবতীর্ণ হ'লে মানুষের মতই আচার ব্যবহার করেন এবং তাঁর আগমনে অধর্মের নাশ ও ধর্মের রক্ষণ হয়। তিনি আবার যখন স্বধামে গমন করেন তখন তাঁর শক্তি শিষ্যদের দিয়ে যান। তাঁর প্রদত্ত শক্তির বলে এঁরাও মানবকুলের গুরু হন। এই গুরুশক্তি আবার শিষ্য থেকে প্রশিষ্যে গমন ক'রে লোককল্যাণ করতে থাকে; কিন্তু কালক্রমে এই শক্তি যখন খুব হীনবল হ'য়ে যায় এবং তৎকালীন ক্রমবর্ধমান অধর্মশক্তির ওপর প্রভুত্ব করতে পারে না, তখনই আবার ঈশ্বর নেমে আসেন তাঁর স্বষ্ট জীবের মধ্যে তাঁর মহিমা প্রতিষ্ঠাকল্পে।

হিন্দুরা গুরুবাদ মানে। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের একজন গুরু থাকেন। যখন বিভিন্ন বংশের কুল-গুরুগণ স্বধর্ম-ভ্রষ্ট হয়ে শিষ্যদের বিশ্বাস হারায় তখন জগতে আবার অবতারের আসার প্রয়োজন হয়। আজ এই যুক্তিবাদের যুগে শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশ্বাস করতে চান না এই তত্ত্ব। অবনত অবস্থায় তথাকথিত গুরুদের যখন তাঁরা ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখেন—তখন ধর্মের ওপর তাঁদের আর বিশ্বাস থাকে না। সেই জন্যেই দেখি শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে ধর্মের প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা, শেষ পর্যন্ত নাস্তিকতা। এরা জগৎ থেকে ধর্মকে মুছে ফেলতে চায়। বলে, ধর্ম কতকগুলো কুসংস্কারের সমষ্টিমাত্র, যত শীঘ্র ধর্ম নষ্ট হ'যে যায়—ততই মানব সমাজেব পক্ষে মঙ্গল।

ভারতে যে ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা দেখা যায়—এর মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষাব ফলে মানুষের মনে হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠানাদিকে কুসংস্কার ব'লে ভাবা এবং এই সব সংস্কারমুক্ত একটি ধর্মের চাহিদা। কুলগুরুরা শিক্ষিতদের আস্থা হারিযেছিলেন, কেবল কয়েকজন শিক্ষিত, এবং অধিকাংশ অশিক্ষিত ব্যক্তি এই প্রকার গুরুর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। এদের ধারণা—'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়'। গুরু কি করেন তা আমরা দেখব না, তাঁর মন্ত্রকে আমরা চাই—এই মন্ত্র স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে ব'লে তার শক্তি অসীম। এই রকম লোকের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণতঃ কিন্তু সকলে চায গুরুর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব—যার ছায়াতলে তারা আশ্রয় নেবে। সে রকম গুরুর অভাব আছে ব'লেই তারা ধর্মবিহীন জীবন যাপন করে এবং ঈশ্বরের পূজার পরিবর্তে নিজেদেরই পূজো ক'রে থাকে।

যখন এই ভাব প্রবল হ'ল—"এই জীবনই সব। পরকাল ব'লে কিছু নেই, এমন ঈশ্বর কেউ নেই যার কাছে আমাদের নিজেদের কর্মের জন্যে দায়ী হ'তে হবে। যত পার খাও—দাও, আনন্দ কর। অপরের কাছ থেকে ভালবাসা পেতে হ'লে তার সঙ্গেও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। সমাজই আমাদের

ভগবান, কেননা সমাজ থেকেই আমরা সাহায্য পাই, কোন অদৃশ্য ঈশ্বর আমদের সাহায্য করেন না। অদৃশ্য সত্তাকে বিশ্বাস করা নিছক বোকামি, এবং কুসংস্কার। ও সব আমরা চাই না।" তখন নিজেরই প্রতিজ্ঞা-অনুযায়ী তাঁকে আসতে হ'ল, এবং এইবার তিনি এলেন সব জাতি ও সব ধর্মের হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। কাল তাঁকে চেয়েছিল এবং সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কোন্‌টা গ্রাহ্য, কোন্‌টা ত্যাজ্য—না জেনে তাঁরই বহু সন্তান যখন তাঁকে আকুল আকূতি জানিয়েছিল এই ধূলির ধরণীতে পদার্পণের জন্যে, তখন তিনি সে ডাক অবহেলা করতে পারেন নি।

[৯ই শ্রাবণ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জন্মতিথি]

স্বর্গাশ্রমে—সন্তবাণী

'আনন্দ'

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা—হৃষীকেশের ওপারে স্বর্গাশ্রমে গঙ্গাতীরে সাধুদের কুটিয়া দেখিব; দেখিব সংসারের কোলাহল হইতে দূরে—সমাজ ও সভ্যতাকে পিছনে ফেলিয়া, হিমালয়ের পাদদেশে খরস্রোতা শান্তি-শীতলা ভাগীরথীতীরে বিরক্ত-মহাত্মাগণ কিভাবে জীবন কাটান,—কিভাবে বিবেকবৈরাগ্য অবলম্বনে শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি অর্জন করিয়া মুমুক্ষুতা সহায়ে তাঁহারা জ্ঞানের পথে জীবন্মুক্তির প্রতি অগ্রসর হন।

একদিন ইচ্ছা করিয়াই একলা স্বর্গাশ্রমের পরিত্যক্ত কুটিয়াগুলি দেখিয়া আসিলাম। গঙ্গার তীরে কুটিয়ার সারি।

একটি একটি করিয়া কত কুটিয়ায় গেলাম, ভাবিতে লাগিলাম—কত বৈরাগ্য, কত অনুরাগ লইয়া সাধক এখানে আসিয়াছিলেন; নিত্যগঙ্গাস্নান, ছত্রে ভিক্ষান্ন-গ্রহণ, সাধ্যমত সাধনভজন, কতদিন করিয়াছিলেন বা করিতে পারিয়াছিলেন—কে তাহা জানে? হয়তো ব্যাধি আসিয়া কাহারও দেহকে আক্রমণ করিয়াছিল, বাসনা আসিয়া কাহারও বা মনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে। কেহ বা ফিরিয়া গিয়াছে। কেহ বা জীবনপণ করিয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাধনপথে অচল অটল থাকিয়া এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন! বন্ধু-বিহীন স্থানে সাধক নিজেকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য দেওয়ালে গেরি মাটির টুকরা দিয়া লিখিয়াছিলেন:

শ্বাসে শ্বাসে নাম রটো, বৃথা শ্বাস মত খওঁ।
কো জানে কৌন শ্বাস, আযন্ হো কি নেহি আউ॥

কোন সাধক হয়ত সারাজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন শ্রীতুলসীদাসের একটিমাত্র দোঁহা। তাহাতেই তাঁহার অন্তর বাহির আলোয় আলোময় হইয়া গিয়াছে। প্রাচীরগাত্র হইতে সেই অপরূপ দোঁহাটি আমার হৃদয়ে উৎকীর্ণ করিয়া আনিলাম—

রামনাম মণি দীপ ধরু, জীহ দেহলী দ্বার।
তুলসী জো চাহসি, ভীতর বাহির উজিয়ার॥

হে তুলসী—যদি তোমার ভিতর বাহির দুই-ই এক-সঙ্গে উজ্জ্বল করিতে চাও, তবে দেহরূপ ঘরের দ্বারদেশে চৌকাঠে—জিহ্বায়—'রামনাম' রূপ মণি দীপ ধারণ কর।

আর একটি কুটিয়ায় দেখিলাম—একটি বাঙালী সাধক তাহার জীবনের শেষ অনুভূতি-বাণী জগৎকে দিয়া জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছে। সেই বাণী আজও জল্‌ জল্‌ করিয়া জ্বলিতেছে ও বলিতেছে:

দেহদৃষ্টি যত হয়, ততই মরণ ভয়।
আত্মদৃষ্টি যত হয়, ততই অমৃতময়॥

রাত্রির ঘন অন্ধকারে কুটিয়ায় বসিয়া এই সকল অজ্ঞাত সাধকদের জীবন ও সাধনা অনুধ্যান করিতে লাগিলাম।

কুটির-শিল্পে সাবান

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

ব্যাপক অর্থে "সাবান"

'সাবান' সম্বন্ধে অনেকেরই অস্ফুট ধারণা আছে, সঠিক ধারণা নাই। কোন কোন মহলে আবার ইহা অশুচি পর্যায়ভুক্ত! ভ্রান্তি-নিরসন-কল্পে প্রথমেই সাবানের সংজ্ঞা-প্রকরণ আবশ্যক।

উদ্ভিজ্জ ও জান্তব তৈল ও চর্বির সহিত ক্ষার মিশ্রিত করিলে 'সাবান' উৎপন্ন হয়। নারিকেল, বাদাম, তিল, তিসি, মহুয়া, রেড়ি, তুলাবীজ, সরিষা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তৈল এবং তিমি প্রভৃতি যাবতীয় মৎস্যের তৈল—সংক্ষেপে আমরা যে সকল তৈল বা চর্বির সহিত সচরাচর পরিচিত—প্রত্যেকে বিশেষ অবস্থা-নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট মাত্রায় ক্ষার-সংযোগে 'সাবান' উৎপন্ন করে। তবে কোন তৈল হইতে উৎপন্ন সাবান 'নরম', পক্ষান্তরে অপরাপর চর্বিজাত সাবান 'শক্ত'—ইহাই পার্থক্য। বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার্য সরিষার তৈল হইতেও সুচারুরূপে সাবান তৈয়ারি করা যায়; তবে ইহার মূল্য অধিক হওয়ায় ইহা হইতে সাবান প্রস্তুত হয় না। উপর্যুক্ত তৈল বা চর্বিসমূহ আর কিছুই নহে—কতকগুলি অম্ল (এইগুলিকে মেদাম্ল বা Fatty Acids বলা হয়) ও গ্লিসারিণের সমাহার। ঐ সকল মেদাম্ল সোডিয়ম বা পটাসিয়ম নামক মৌলিক পদার্থের ক্ষার সংমিশ্রণের ফলে বিভিন্ন মেদাম্লের লবণ প্রস্তুত করে। বিজ্ঞানে এই লবণগুলির ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত নাম—'সাবান'! প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, খনিজ তৈল—পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি হইতে সাবান প্রস্তুত করা যায় না। খনিজ তৈল সমূহের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

ব্যাপারটি একটু প্রাঞ্জল হওয়া প্রয়োজন। এক্ষণে লবণগুলি কি? লবণ বলিতে আমরা নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যটিকেই বুঝি—কিন্তু রসায়নে 'লবণ' বলিতে শুধু ইহাকেই বুঝায় না। বহুসংখ্যক যৌগিক পদার্থকে 'লবণ'রূপে গণ্য করা হয়, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত 'নুন'! ইহা নির্দিষ্ট মাত্রায় সোডিয়ম (ক্ষার-জনক) ও ক্লোরিন (অম্ল-জনক) মৌলিক পদার্থদ্বয়ের রাসায়নিক মিলনের ফল; তুল্যভাবে সাবানও সোডিয়ম বা পটাসিয়ম ক্ষার এবং মেদাম্লের সংযোগ-জাত। ক্ষার ও অম্লের সংযোগে গঠিত—লবণের সহিত সাবানের ইহাই সাদৃশ্য।

দুইটি সাধারণ ক্ষার—কষ্টিক সোডা ও কষ্টিক পটাস্; ইহারাই যথাক্রমে সোডিয়ম ও পটাসিয়ম সরবরাহ করে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ক্ষারাত্মক পদার্থও রহিয়াছে, সেগুলি হইতেও সাবান তৈয়ারী হয়—তবে সাধারণ নহে, বিশেষ পর্যায়ের সাবান। কষ্টিক সোডা বা পটাস্-জাত সাবানকে যেমন সোডিয়ম বা পটাসিয়ম-সাবান বলা হয়, তদ্রূপ ক্যালসিয়ম সাবান (জল নিরোধক প্রলেপ-রূপে ব্যবহৃত), বেরিয়ম সাবান, এলুমিনিয়ম সাবান (মুদ্রণের কালিতে ও জল-দুর্ভেদ্য আস্তরণ হিসাবে ব্যবহৃত), ম্যাগনেসিয়ম সাবান, দস্তা সাবান (মলম তৈয়ারিতে লাগে), তাম্র সাবান (পাটসংরক্ষণে ও কীটঘ্নরূপে মূল্যবান্) ও অন্যান্য বহু সাবানের প্রচলন হইয়াছে। তবে সচরাচর সাবানের সহিত ইহাদের এক প্রধান প্রভেদ আছে। সাধারণ সাবানের ন্যায় ইহারা জলে দ্রব হয় না। এই সব সাবানের প্রচলিত নাম 'শিল্প সাবান'। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্তমানে 'সাবান' শব্দের অর্থ ব্যাপক, মাত্র গাত্র বা বস্ত্র-পরিষ্কারক পদার্থ হিসাবেই তাহা সীমাবদ্ধ নহে;

যদিও সাধারণতঃ সাবান অর্থে তাহাই বুঝায়, এবং আমাদের আলোচনা এই প্রচলিত অর্থে আমরা নিবদ্ধ রাখিব।

যে-সকল সাবানের সচরাচর সম্মুখীন হওয়া যায়, তাহারা নিম্নোক্ত যে-কোন পর্যায়ভুক্ত হইবে—(১) বস্ত্রাদি পরিষ্কারক বা কাপড়-কাচা, (২) প্রসাধনী বা গায়ে মাখা তৎসহ ক্ষৌরকর্মে ব্যবহৃত, (৩) সমুদ্র-জলে ব্যবহারোপযোগী, (৪) বয়নশিল্পে প্রযুক্ত এবং (৫) ঔষধার্থে ব্যবহৃত। এইগুলি আবার কঠিন, তরল বা নরম অবস্থায় প্রাপ্য।

ভারতে সাবান-শিল্পের সূচনা

অতঃপর বহুভাবে শাখায়িত সাবান-শিল্পের অভ্যুত্থান এ দেশে কিরূপে ও কখন হইল—এই কৌতূহল নিবৃত্ত হওয়া দরকার। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশব্যাপী স্বদেশী-আন্দোলনের যে বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, যখন "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় করে নে রে ভাই" এইরূপ নির্দেশ আসিল, সে দিনের সেই দেশমাতৃকার উদ্দেশে নেতৃবৃন্দের উদার আহ্বানে স্বদেশ-হিতৈষণার যে অমোঘ বাণী শোনা গিয়াছিল—তাহারই প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব শুধু স্বদেশী বস্ত্রশিল্পের উপরেই পড়ে নাই; উপরন্তু বঙ্গের সেই বিদেশী পণ্য-বর্জন আন্দোলনে যে কয়েকটি শিল্পের বীজ উপ্ত হয়, ভাবীকালে তাহা হইতেই বিরাট মহীরুহের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাই বঙ্গদেশে স্বদেশী বস্ত্র, স্বদেশী সাবান ও স্বদেশী দিয়াশলাই শিল্পের আদি কথা। তখন ইহা কুটিরশিল্প; ভারী ভারী যন্ত্র সহযোগে বিজ্ঞানসম্মতরূপে এ দেশে সাবান তৈয়ারির প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। উদ্যোক্তারূপে কলিকাতার নিকটবর্তী বাগমারী অঞ্চলেই সেই সময় ছোট ছোট কারখানা স্থাপিত হয় এবং কাপড়-কাচা সাবান তৈয়ারিতে এই অঞ্চল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এখনও এই স্থানে বহু কারখানা কুটিরশিল্পরূপে বিদ্যমান। ক্রমে এই কুটিরশিল্প একদিকে যেমন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি সুদূর লাহোর, অমৃতসর প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রসারলাভ করে।

এ দেশে সাবান উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ

সাবান প্রস্তুতের দুইটি প্রধান প্রণালী—(১) বাষ্প-সংযোগে এবং (২) অগ্নিসংযোগে। এই সব ক্ষুদ্রাকার কারখানায় কড়াই-এর তলদেশে অগ্নি-সংযোগ করিয়া সাবান প্রস্তুত হয় বলিয়া এই পদ্ধতি "কড়াই"-পদ্ধতি নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। উপযুক্ত ক্ষারের অভাবে এই সব কারখানায় প্রায়শঃ স্বভাবজাত সাজিমাটি ও চুন ব্যবহৃত হয়। কড়াই-পদ্ধতিতে শিল্প অসংগঠিত কুটিরশিল্পের আকারে কারখানার সংখ্যা এবং তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। এতদতিরিক্ত সুসংগঠিত পন্থায় প্রথমোক্ত প্রণালীর কয়েকটি কারখানাও বঙ্গে আছে। ভারতের মোট সাবান উৎপাদনের এক বিরাট অংশ বঙ্গেরই অবদান। উদাহরণস্বরূপ ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতে ১,৩০,০০০ টন সাবান প্রস্তুত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বোম্বাই প্রদেশের ও বঙ্গের উৎপাদন পরিমাণ যথাক্রমে ৫৫,০০০ ও ৪১,০০০ টন। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ফলেও বঙ্গ তথা ভারতের সাবান শিল্প সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইওরোপের সর্বত্রই খাদ্যের ন্যায় সাবানও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ভারতে এই নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা প্রয়োজন হয় নাই।

দেশে সাবান উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিদেশ হইতে আমদানি ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। সে বেশী দিন পূর্বের কথা নহে—যখন দেশকে সম্পূর্ণরূপে বিদেশী আমদানির উপর নির্ভর করিতে হইত। ১৯৪৯ খৃঃ প্রথম সাতমাসে মোট ১,০৫৭ এবং ১৯৪৮ খৃঃ মোট ১৮,৩০৫ টন সাবান

আমদানি হয় ; ঐ বৎসর প্রথম নয় মাসে ভারতের সাবান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯০,২৩৬ টন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের কথা উল্লেখ করা যায়—তখন ১৬,৬০০ টনে দাঁড়ায়। আর ১৯৩৯-৪০খৃঃ আমদানি আরও অধোগতি প্রাপ্ত হয়—মাত্র ১,৬৬০ টন। পরে অবশ্য কাঁচামালের অবস্থার অবনতি হওয়ায় আমদানি কিছু বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে মোট সাবান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৮০,০০০ ও কিঞ্চিন্ন্যূন ১,০০,০০০ টন।

দেশে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, তেমনি ভারত মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে সাবান রপ্তানি আরম্ভের সুযোগ পাইল।

সাবানের কাঁচামাল

উদ্ভিজ্জ তৈল উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান সর্বাগ্রে। কিন্তু প্রাণিজাত চর্বির (যেমন ভেড়া, শূকর, প্রভৃতি) এদেশে নিতান্তই অভাব—সেজন্য মুখ্যতঃ অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের আমদানির উপর নির্ভর করিতে হয়। সাবান তৈয়ারি কেবল মাত্র একটি তেল বা চর্বির দ্বারা করা হয় না—কয়েকটি চর্বির সংমিশ্রণে সাবান প্রস্তুত করা হয়। সেই হিসাবে উত্তম সাবান প্রস্তুতের জন্য প্রাণিজাত চর্বি অপরিহার্য। অবশ্য বাংলাদেশেই প্রাণিজাত চর্বি সাবান-প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয় ; ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এই শ্রেণীর চর্বি অশুচি ও অস্পৃশ্য গণ্য হওয়ায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না।

জান্তব চর্বি ব্যবহৃত না হইলে, তাহার পরিবর্তে বনস্পতি (বা Hydrogenated oil) এবং মহুয়া তৈল দ্বারা সাবান প্রস্তুত এদেশে প্রচলিত আছে ; পরিতাপের বিষয়, তাহাতে প্রাণিজাত চর্বির মতো সুফল লাভ হয় না।

ভারতীয় বনস্পতি-শিল্পের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নহে—মাত্র ত্রিশ বৎসরের পূর্বেও ইহা প্রয়োজনীয় শিল্প হিসাবে নগণ্য ছিল, বর্তমানে ইহা ভারতের একটি প্রধান শিল্প এবং প্রায় অর্ধশত কারখানা সম্মিলিতভাবে উৎপাদন-রত। মূল্য লাভজনক, বিভিন্ন পর্যায়ের গলন-বিন্দু সমন্বিত, গন্ধহীন ও সাদা এই জিনিসটি অবশ্য উদ্ভিজ্জ বা প্রাণিজাত তৈল বা চর্বি অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী ও পচন-নিরোধক।

সাবানের অপর প্রয়োজনীয় উপাদান নারিকেল-তৈল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে—যেমন সুন্দরবনে, প্রচুর নারিকেল জন্মিলেও আহার্যরূপে ব্যবহারের ফলে তৈল-নিষ্কাশনের জন্য অল্প পরিমাণেই পাওয়া যায়। কেরালায় ও ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেই নারিকেল হইতে অধিক পরিমাণ তৈল নিষ্কাশিত হয়।

সাবান প্রস্তুতকালে তৈল বা চর্বির পরেই প্রয়োজন ক্ষারের, বিশেষতঃ কষ্টিক সোডার। ভারতে বর্তমানে প্রায় ৭২,০০০ টন পরিমাণ ইহার চাহিদা। বঙ্গে রিষড়া অঞ্চলে কষ্টিক সোডা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত হয় ; তবে কয়েকটি সুবৃহৎ কাগজের কলেও আত্ম-স্বচ্ছলতার জন্য কষ্টিক সোডা উৎপাদন করা হয়। ভারতীয় উৎপাদনের পরিমাণ—উপর্যুক্ত চাহিদার অর্ধেক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম। সুতরাং চাহিদার অবশিষ্টাংশ বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। এতদতিরিক্ত গুঁড়া সোডারও (বা Soda Ash) প্রয়োজন হয়।

প্রসাধনী সাবানের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক দ্রব্য গন্ধবহ তৈল (বা Essential oils). বর্তমানে ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্যের অধিকাংশই কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্য। তথাপি গোলাপ নির্যাস, খস্, চম্পক, গন্ধরাজ শ্রেণীর গন্ধ ও বঙ্গের কেওড়া চিরকাল সকলের আদরণীয় হইয়া থাকিবে। দক্ষিণ ভারতে চন্দনাদি গন্ধবহ তৈলবৃক্ষের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী।

সাবানের জন্য আরও অনেক শ্রেণীর জিনিসের প্রয়োজন হয়—তবে বিশেষ বিশেষ প্রকারের সাবানের নিমিত্ত। সাবানের সহিত প্রয়োজন-মত

সোডিয়ম-সিলিকেট, সোপ-ষ্টোন, লবণ, গন্ধক, কার্বলিক এসিড প্রভৃতি সংযুক্ত করা সময় সময় প্রয়োজন হইয়া পড়ে। স্বচ্ছ সাবানের জন্য সুরাসার (বা Alcohol) অতি প্রয়োজনীয়।

সাবান-কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত স্থান

সাবানের মুখ্য কাঁচামাল—তৈল, চর্বি ও ক্ষার, সেজন্য সাবান-কারখানা স্থাপন করিতে হইলে এই সকল কাঁচামালের সান্নিধ্য প্রয়োজন; নচেৎ পরিবহন সম্পর্কিত প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। জলপথ বা রেলপথের নিকটে স্থান নির্বাচিত হইলে কাঁচামাল আনয়নের একদিকে যেমন কোন চিন্তা থাকে না, অন্যদিকে পণ্যদ্রব্য বাজারে পাঠাইবারও কোন অসুবিধা হয় না। তবে স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপন্ন সাবান মোটর লরী বা ঐরূপ যানেই প্রেরিত হইতে পারে।

সাবান-শিল্পের উন্নতিবিধানার্থে কয়েকটি কথা

সাবান-উৎপাদনের পরিমাণ, অল্প বা বেশি, যাহাই হউক না কেন, সাবান-প্রস্তুত-প্রণালী বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে হওয়া উচিত। অযৌক্তিক ও নিরর্থকভাবে অনভিজ্ঞ কারিগরদের দ্বারা প্রস্তুত সাবান অধিকাংশ সময়েই যে শুধু নিকৃষ্ট শ্রেণীরই হয়—তাহা নহে, পরন্তু এরূপভাবে প্রস্তুত সাবানের মানেরও (Standard) কোন স্থিরতা থাকে না।

দেশের খাদ্য-সংরক্ষণের সহিত সামঞ্জস্য বিধানার্থে এবং মূল্যের প্রতিযোগিতায় বাঁচিতে হইলে অখাদ্য তৈল ও চর্বির দ্বারা সাবান তৈয়ারি করিতে হইবে। বাদাম, নারিকেল, তিল প্রভৃতি যে সকল তৈল খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেগুলি সাবানে ব্যবহার না করা ভাল; একান্তই যদি করা হয়, তবে তাহা যতদূর সম্ভব স্বল্প মাত্রায় করাই যুক্তিযুক্ত। দরিদ্র দেশে খাদ্যবস্তুর অপচয় করা ঠিক নয়।

অভক্ষ্য তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত হইলে উৎপাদন মূল্যও কম হয়। নিম, মহুয়া, তিসি, তুলাবীজ, বনস্পতি, মোম প্রভৃতি যত অধিক পরিমাণে সাবান-প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইবে ততই আহারোপযোগী তৈল উদ্বৃত্ত থকিবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে তৈল বা চর্বির পরিবর্তে বহু সময় মেদাম্লসমূহ সাবান প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়। তৈল ও চর্বি হইতে গ্লিসারিণ বাহির করিয়া লইলেই মেদাম্লসমূহ অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং স্বভাবতই মেদাম্লসমূহের মূল্য তেল বা চর্বি অপেক্ষা কম হইবে। আর এই মেদাম্ল সাবান প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইলে সুবিধার মাত্রা দ্বিগুণিত হয়—কারণ মেদাম্লসমূহ অনায়াসে অপেক্ষাকৃত স্বল্প-মূল্যের ক্ষার, গুঁড়া সোডা (বা Soda Ash) সাহায্যে সাবানে পরিণত হয়। এদেশে অবশ্য মেদাম্ল-প্রস্তুতকারী কোন প্রতিষ্ঠানের কথা জানা নাই, অতএব উহা আমদানি করিয়া যখন এবং যেখানেই সম্ভব, বিশেষতঃ কুটিরশিল্পে, মেদাম্ল ব্যবহার করিলে ঐ সাবান অনায়াসেই প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে।

নারিকেল-তৈল সাবান-প্রস্তুতের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে: ইহার মূল্য অধিক এবং ইহা মনুষ্য-ভক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত। নারিকেল-তৈলের তুল্য তৈলের সন্ধান বিজ্ঞানীরা বহুদিন যাবৎ করিতেছেন যাহাতে—নারিকেল-তৈলের ব্যবহার কমানো যায়, সেই আশায়। তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে সফলও হইয়াছেন। নহুর-বীজ-তৈল (দার্জিলিং, কারশিয়ং, জলপাইগুড়ি এবং চট্টগ্রামে জাত), রয়না (পূর্ববঙ্গের জাত) পুণাল বা পোলাং তৈল—ইহারা নারিকেল তৈলের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে বর্তমান জ্ঞান অধিক নহে এবং উৎপাদন পরিমাণও কম। গবেষণার ফলে ইহাদের সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইবার রহিয়াছে। তবে যতই নারিকেল-তৈলের তুল্য তৈল আবিষ্কৃত হউক

না কেন, ইহার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য চিরকাল থাকিবে মনে হয়, তাহার কারণ ইহার রসায়নগত ধর্মসমূহ ও গুণাবলী। একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া গেল : সমুদ্রের লবণাক্ত জলে অন্য কোন সাবান অনুপযোগী; একমাত্র নারিকেল-তৈলোদ্ভূত সাবানই সমুদ্রজলে ব্যবহারোপযোগী ও দ্রব হয়। প্রচুর ফেনা উৎপাদনে নারিকেল-তৈলের সমকক্ষ অন্য কোন তৈলের কথা এদেশে বর্তমানে জানা নাই।

ক্ষার হিসাবে সচরাচর কষ্টিক সোডার পিণ্ড বা খণ্ড ব্যবহার করা হয়। যদি তৎপরিবর্তে কষ্টিক সোডার দ্রবণ (যাহা Caustic Soda Lye নামে বিক্রয় হয়) ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উৎপাদন খরচ যথাসম্ভব কম হইবে। অবশ্য জিনিসটি সর্বত্র পাওয়া সম্ভব নয়, ইহাও উল্লেখযোগ্য।

সাবানে ভেজাল বর্জনীয়। তথাকথিত সাবানের বহু নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতে প্রকৃত সাবান অপেক্ষা ভেজালের মাত্রা অনেক বেশী। সোনার পাথরবাটি'র ন্যায়ই এইগুলি হাস্যোদ্দীপক ও অলীক ; কারণ সাবানের নামে ও ছদ্মবেশে এইগুলি সাবান ব্যতীত যাবতীয় অন্য কিছু।

সাবানের সহিত সিলিকেট মিশ্রিত করিবার রীতি আছে। শতকরা ৫ ভাগের বেশী ইহা সাবানে ব্যবহৃত হওয়া অভীপ্সিত নহে—এই মাত্রায় ইহা সাবানের মালিন্যমোচক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ইহার ঊর্ধ্ব মাত্রায় ইহাকে সাবানের ভেজাল-রূপে গণ্য করা হয়। আর বাজারে এমন সাবানের সংখ্যা বিরল নহে, যাহার ভিতর অত্যধিক মাত্রায় সিলিকেট, লবণ, চুণ, সাজিমাটি প্রভৃতি ভেজাল দিয়া সাবানের আকার বৃদ্ধি ও তাহার তুলনায় মূল্য আশাতীতরূপে কম করিবার প্রয়াস দেখা যায়। অবশ্য কারখানার শ্রমিকদের জন্য হাতের ঝুলকালি তুলিতে যে সব সাবান প্রস্তুত করা হয়, প্রয়োজনবোধেই সেগুলির ভিতর প্রচুর পরিমাণে বালি বা ঐ শ্রেণীর জিনিস মিশ্রিত করিতে হয়।

কুটির-শিল্পে প্রস্তুত সাবানের মানের (standard) নির্দিষ্ট সীমারেখা, স্থিরতা ও সামঞ্জস্য রাখিলে ক্রেতার বিশ্বাস ও পৃষ্ঠপোষকতা অটল থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সময় পৃথক পৃথক প্রকারের সাবান বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির করিলে ক্রেতাদের সেই প্রকারের সাবানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া বিচিত্র নহে। সাবানের মানের স্থিরতা রাখিবার জন্য প্রস্তুতকারকের কোনরূপ শৈথিল্য থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। এইজন্য সামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কাপড়-কাচা অপেক্ষা গায়ে-মাখা সাবানের মানের স্থিরতা রক্ষা কত বেশী প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। কোমল ত্বকের উপর কোনরূপ অপক্রিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রসাধনী সাবানের সর্বাগ্রে সুনির্দিষ্ট মান থাকা প্রয়োজন। অঙ্গরাগের সাবানে সামান্য মাত্রায়ও রাসায়নিকভাবে অসংযুক্ত, অনাবদ্ধ ও শিথিল ক্ষার (Free alkali) ত্বকের যথেষ্ট ক্ষতি করে। সেইজন্য কড়াই-পদ্ধতির দ্বারা উত্তম প্রসাধনী সাবান তৈয়ারি অসম্ভব। তজ্জন্য বিস্তৃততর ব্যবস্থাদি ও যন্ত্রপাতি-সম্বলিত বাষ্পীয় প্রণালীই শ্রেয়ঃ।

তবে কার্বলিক, গন্ধক ও চালমুগরা শ্রেণীর সাবান প্রধানতঃ কুটির-শিল্পরূপেই বাংলাদেশে প্রস্তুত হয়। ইহাদের চাহিদাও যথেষ্ট। বাংলাদেশে কুটির-শিল্প-জাত কাপড়-কাচা সাবানের চাহিদা পর্যাপ্ত। ভাল কাঁচা মাল ব্যবহার করিয়া, সাবান প্রস্তুতকালে কোন কিছুর অপচয় নিবারণ দ্বারা, বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্দিষ্ট মানের সাবান উচিত মূল্যে বাজারে বাহির করিলে কুটিরশিল্প-জাত সাবান জন-মন অধিকার করিবে নিঃসন্দেহে। যোগ্যস্থলে ক্রেতৃগণ কুটির-শিল্পোৎপন্ন সাবানের প্রতি আস্থা রাখিলে ও সহযোগিতা করিলে, বঙ্গের এই কুটিরশিল্প কোনদিন লোপ পাইবে না। বলা বাহুল্য সুবৃহৎ সুসংগঠিত কারখানাগুলির সহিত প্রতিযোগিতার

ফলে কুটিরশিল্পসমূহকে সর্বদাই শঙ্কাগ্রস্ত থাকিতে হয়।

বিজ্ঞানে উন্নত দেশসমূহের তুলনায় আমাদের ভারতবর্ষে মাথাপিছু সাবানের ব্যবহার নিতান্তই অল্প। নূতন নূতন ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত সাবান ঐ সব দেশে যে পরিমাণে জনসাধারণ ব্যবহার করে, তাহা আমাদের কল্পনাতীত। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জন-প্রতি সাবান ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২৩৪ পাউণ্ড। তা ছাড়া সেখানে সাবানের অনুকল্পসমূহ* (Soap substitute অথবা Soapless Soap) যথেষ্ট মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। ইংলণ্ডে এক সময় জন-প্রতি সাবান ব্যবহারেব পরিমাণ ছিল ২২ পাউণ্ড, ভারতে ঐ পরিমাণ এক পাউণ্ডেরও কম বা তাহার কাছাকাছি! বিষয়টির গুরুত্ব ইহা হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে। উপরন্তু এতদ্দেশে সাবানের অনুকল্প কচিৎ ব্যবহৃত হয়।

দেশমাতৃকার প্রতি মমত্ববোধে একদা যে শিল্পের আরম্ভ হইয়াছিল, আজও তাহা সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইলে দেশের ও দশের—উভয়েরই মঙ্গল। সাবানের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবার অর্থ—জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতনতা। আর "পরিচ্ছন্নতা দেবতার সমীপবর্তী"—এ প্রবাদ যদি সত্য হয়, তবে পরিচ্ছন্নতা-রক্ষাকল্পে সাবানের প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে।

* লেখকের প্রবন্ধ—উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৫৬ দ্রষ্টব্য।

তপোবনে

শ্রীমতী শুক্লা মজুমদার

ওই দূর বনানীর শ্যাম বনচ্ছায়
স্বচ্ছতোয়া তটিনীর তটে নিরালায়—
অনন্ত ওঙ্কারধ্বনি আনন্দগম্ভীর,
সীমার বাঁধনে বাজে অসীমের বেদনা গভীর।
পরম আনন্দবার্তা এ মর্ত্য ভুবনে,
অন্তহীন সুধা ঢালে আতপ্ত এ তৃষিতের প্রাণে।
ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল ওইখানে একদিন নারীর জিজ্ঞাসা,
অমৃতের লাগি তার জেগেছিল শাশ্বতী পিপাসা।
কেটে গেছে ভারতের সে মধুর আলোক-লগন,
শ্রুতির সাগর-মাঝে অনন্তের অমৃত-মন্থন।
ভারতের তপোবনে সৃষ্টির সে উষার উদয়!
চিরন্তন আত্মা সেথা লভিয়াছে আসন অক্ষয়।

শ্রীরামকৃষ্ণে মহাপ্রভুর ভাব*

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ফাল্গুনী পূর্ণিমা আমাদের কাছে দ্বিধা পবিত্র, দ্বিবিধরূপে ধন্য। প্রথমতঃ পরমপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র দোললীলা-তিথিরূপে; দ্বিতীয়তঃ কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের শুভ আবির্ভাব-তিথিরূপে। এ-ছাড়া উত্তর ভারতের ফাগুয়া বা হোলির এবং সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত বসন্তোৎসবের আবির-কুঙ্কুমের রঙ মিশে এই দিনটিকে অতি বিচিত্র ও অভিনব রূপ দান করেছে। অধিকন্তু ঋতুশ্রেষ্ঠ মধুবসন্তের পূর্ণিমায় পূর্ণ শশীর শুচিস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারার অমল ধবল শুভ্রতার আবেদনও আমাদের হৃদয়পুরে প্রচুর আনন্দের দোলা সৃষ্টি করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একাধারে শুধু 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' নন, তাঁর মহাজীবনে তথাগত বুদ্ধের অফুরন্ত ত্যাগ, আচার্য শঙ্করের অপরিসীম জ্ঞান এবং মহাপ্রভু চৈতন্যের অপরিমেয় প্রেমভাবের অভিনব সমাবেশ লক্ষিত হয়। অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ—কেহ কেহ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সকল দেবদেবীকে বিলীন হ'তে দেখেছিলেন। সাধনকালের ইতিহাসে পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম ও সকল মতের দুশ্চর সাধনায় যখন যে দেবদেবীর দর্শন লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই তাঁর শ্রীঅঙ্গে লীন হ'য়ে গেছেন। শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ-পুঁথিকার পরম ভক্তিভরে গে'য়েছেন :

বিরাট আলয় যেন ঠাকুরের দেহ।
নাম রূপ জগতের সম্মিলনা গৃহ॥
যাবতীয় দৃষ্টরূপ দেহে লীন পায়।
বিরাট বিগ্রহ তনু রামকৃষ্ণ রায়॥

বস্তুতঃ ধর্মসংস্থাপন যুগাবতারের পরম লীলা। গভীর শ্রদ্ধাভরে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবন অনুধ্যান করলে দেখা যায়—তিনি যে কেবল সকল ধর্ম-মতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন সকল ধর্মের সংস্থাপক এবং সর্বধর্মস্বরূপ। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণতি জানিয়েছেন :

ওঁ সর্বধর্মস্থাপকস্ত্বং সর্বধর্মস্বরূপকঃ।
আচার্যাণাং মহাচার্যো রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

এত কথা ব'লে দীর্ঘ ভূমিকা করার উদ্দেশ্য এই যে পরমপুরুষোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবন-রত্নাকরে 'দম-সামর্থ্যে ডুব দিলে' ভাগ্যবান ভক্তগণ তাঁতে শ্রীগৌরাঙ্গ-রত্নেরও সন্ধান অবশ্য পাবেন।

আজকের গৌর-পূর্ণিমায় পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এবং তাঁদের অগণন সাঙ্গোপাঙ্গের পদরেণুপূত এই মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর মহাভাব তথা শ্রীগৌরলীলা অনুধ্যানের পরম সার্থকতা রয়েছে। এই বলরাম-মন্দিরের মহিমা-কীর্তন-প্রসঙ্গে মনে হয় :

ধন্য ভক্ত বলরামবসুর ভবন।
প্রভুর লীলায় যেন শ্রীবাস-অঙ্গন॥

শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনার গুরু সর্বতন্ত্রসিদ্ধা ভৈরবী যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনমাত্রই বুঝেছিলেন—'এবার নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব',—অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একাধারে শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে একসঙ্গে লীলা করছেন। ভৈরবীর আগমনের কিছুকাল পূর্ব হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুর অসহ্য গাত্রদাহে বিষম কষ্ট ভোগ-করছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রমুখ সেকালের বিখ্যাত কবিরাজগণের দ্বারা বহু চিকিৎসা করিয়েও কোনো ফল হয়নি। ব্রাহ্মণী কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের গাত্রজ্বালার কথা শোনামাত্রই বুঝতে পেরেছিলেন

* গত দোল-পূর্ণিমায় বলরাম-মন্দিরে আলোচনা-অবলম্বনে

যে, এ শারীরিক ব্যাধি নয়—'যোগজ বিকার'। ব্রাহ্মণী শ্রীমদ্‌ভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র থেকে নানা বচন উদ্ধার ক'রে বলেন যে, সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভৃতির জীবনে হুবহু এই সকল লক্ষণ প্রকটিত দেখা যায়।

ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঐ গাত্রদাহ উপশমের ভক্তিশাস্ত্র-নির্দিষ্ট উপায়ও বলেন যে, কযেকদিন সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য ধারণ ও সর্বাঙ্গে সুবাসিত শ্বেত-চন্দন অনুলেপন করলেই ঐ দাহ প্রশমিত হবে। ব্রাহ্মণীর কথামত মাত্র তিনদিন ওরূপ করা হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসহ্য গাত্রদাহ একেবারে প্রশমিত হ'যে গেল। ব্রাহ্মণীর এই সহজ ব্যবস্থায় তাঁর গাত্রদাহ নিবারণ হ'তে দেখে মথুরবাবু প্রভৃতি এমনকি স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরও চমৎকৃত ও বিমুগ্ধ হ'লেন।

ভৈরবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে কামারপুকুর হ'তে পালকি চড়ে শিহড় গ্রামে—ভাগনে হৃদয়রামের বাড়ি যাওয়ার পথে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ হ'তে দুটি অতি সুদর্শন কিশোর-বয়স্ক বালক বহির্গত হ'য়ে আনন্দে আহ্লাদে পথে ও মাঠে খেলতে খেলতে পালকির সঙ্গে সঙ্গে শিহড়ের দিকে যেতে থাকেন। অবশেষে তাঁরা আবার ঠাকুরের দেহের মধ্যে প্রবেশ করেন। ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে প্রসঙ্গক্রমে একদিন তাঁর এই অদ্ভুত দর্শনের কাহিনী শুনে বললেন—'বাবা, তুমি ঠিক দেখেছ; এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে একাধারে এসে তোমার ভিতরে রয়েছেন। সেইজন্যই তোমার ওরূপ দর্শন হয়েছিল।'

বিদুষী ভৈরবী শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-দেবের ভাব এমনি জীবন্তরূপে প্রকাশিত দেখে-ছিলেন যে, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেব জ্ঞান করতেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত তা প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে মথুরবাবুকে দিয়ে তিনি পণ্ডিতগণের সভা আহ্বান করান। ভৈরবী সেকালের প্রথিতযশা পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ প্রভৃতিকে শাস্ত্রীয় বিচার ও তর্কযুক্তির দ্বারা শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে দেন যে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই এবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। পণ্ডিতপ্রবর বৈষ্ণবচরণ যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর সকল যুক্তি সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন ক'রে মথুরবাবু প্রভৃতির সমক্ষে ঐ পণ্ডিত সভায় সশ্রদ্ধচিত্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে মহামহান্ত পুরুষ বলে স্বীকার করেন।

বৈষ্ণবচরণ প্রসঙ্গতঃ বলেন—"যে প্রধান উনিশ প্রকার ভাব বা অবস্থার সম্মিলনকে ভক্তিশাস্ত্র 'মহাভাব' বলে নির্দেশ করেছেন এবং যা কেবল একমাত্র ভাবময়ী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা ও প্রেমাবতার ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেই এ পর্যন্ত লক্ষিত হয়েছে, কী আশ্চর্য ঐ মহাভাবের সকল লক্ষণই এঁর মধ্যে প্রকটিত। জীবের বহু সৌভাগ্যক্রমে যদি কখনও জীবনে মহাভাবের আভাস উপস্থিত হয, তবে ঐ উনিশ প্রকারের অবস্থার ভেতর দুই পাঁচটা অবস্থাই প্রকাশ পায়। জীবের শরীর ঐ উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ ধারণ করতে কখনও সক্ষম হয না।" পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণের এই মন্তব্য শুনে মথুরবাবু প্রমুখ উপস্থিত সকলেই একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে বিস্ময়ে মথুরবাবুকে বললেন—'ওগো বলে কি? মহাভাব। যা হোক বাপু, রোগ নয় শুনে মনটায় আনন্দ হচ্ছে।'

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সাধ হ'ল শ্রীচৈতন্যদেবের নগরসঙ্কীর্তন দর্শন করার। তিনি ভাবনেত্রে তখনই ঐ দিব্য দৃশ্য দর্শন করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই দর্শনের কথা লীলাপ্রসঙ্গে সুন্দরভাবে বর্ণিত রয়েছে—'সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—অসীম জনতা, হরিনামে উদ্দাম উন্মত্ততা। আর সেই উন্মাদ

তরঙ্গের ভিতর শ্রীগৌরাঙ্গের উন্মাদন আকর্ষণ!' 'নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুকে লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া ঐ জন-তরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন করিতেছেন।' 'সেই অপার জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানের পঞ্চবটীর দিক্ হ'তে ঠাকুরের ঘরের সম্মুখ দিয়া অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন, উহারই ভিতর যে কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিতে চির অঙ্কিত ছিল, বলরামবাবুর ভক্তিজ্যোতিঃপূর্ণ মুখখানি তাহাদের অন্যতম।' অন্যত্র উল্লিখিত রয়েছে কথামৃত-কার ভক্তিভাজন মাষ্টার মহাশয়কেও শ্রীশ্রীঠাকুর চৈতন্যদেবের ঐ দলে দর্শন করেছিলেন ভক্তপ্রবর বলরাম, পরমভক্ত 'শ্রীম'—এঁরা শ্রীচৈতন্যলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পার্ষদ ছিলেন,—শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি হ'তে আমরা একথা বিশ্বাস ক'রে থাকি।

শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থে পূজ্যপাদ মাষ্টার মহাশয়ের আবাল্য ঐকান্তিক অনুরাগ দেখা যায়। দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণসহ ভগবৎপ্রসঙ্গে রত শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রথম দিনেই দর্শন করামাত্র মাষ্টার মহাশয়ের ভক্তিস্নাত শুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা উদিত হয়: 'যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ-স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণ-কীর্তন করিতেছেন।' মাষ্টার মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে গৌরাঙ্গদেবের লক্ষণগুলি ও মহাভাবের প্রকাশ দর্শন ক'রে এমনি বিমুগ্ধ হন যে, একদিন তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন— 'দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন। অদ্ভুত মহা-পুরুষ! ঠিক চৈতন্যদেবের মতই তাঁর মুহুর্মুহুঃ ভাব ও সমাধি হয়। অদ্ভুত ঈশ্বরপ্রেমিক, ঈশ্বর ছাড়া কিছুই জানেন না। ভগবানের নামে সর্বদাই মাতোয়ারা। যেন সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গদেব।' মাষ্টার মহাশয় মহাভাগ্যবান্, সন্দেহ নেই। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাজীবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাভাব জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় গৌরলীলা দর্শন করেছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে:

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব নীলাচল বা ৺পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহে লীন হ'য়ে নিত্য লীলা প্রাপ্ত হন। শ্রীশ্রীঠাকুর ৺গয়াধাম ও পুরীক্ষেত্রে গমন করেন নি। গয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎপত্তিস্থল এবং পুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুর মানবলীলা-সম্বরণ-স্থল। গয়া ও পুরী-দর্শনে যাবার কথায় ঠাকুরের মনে একটা অব্যক্ত ভাবের সঞ্চার হ'ত। ও-সব স্থানে গেলে হয় তো তিনিও মহাপ্রভুর মতই লীন হ'য়ে যেতেন। তিনি বলতেন, গয়া ও পুরীতে গেলে তাঁর শরীর থাকবে না। এমনি গভীর সমাধিস্থ হবেন যে, তা থেকে তাঁর মন আর নিম্নে মনুষ্যলোকে ফিরে আসবে না।

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ কলুটোলার হরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবতের মধুর কথকতা শুনতে শুনতে এমনি ভাবাবিষ্ট ও আত্মহারা হ'য়ে পড়েন যে, দ্রুত ছুটে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট আসনের ওপর দণ্ডায়মান হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হস্ত উত্তোলন ক'রে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হ'লেন। তাঁর প্রেমানুরঞ্জিত প্রিয়দর্শন জ্যোতির্ময় শ্রীমুখ-কমলের অদৃষ্টপূর্ব দিব্য হাসি দর্শন ক'রে সকলের মনে হ'ল যেন তিনি ভাবমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে তন্ময় হ'য়ে গিয়েছেন। তাঁর কর্ণমূলে বহুক্ষণ ধরে শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করলে তাঁর ভাব উপশম হ'ল। কালনার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ ভগবানদাস বাবাজী মহারাজ কলুটোলার হরিসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের 'চৈতন্য-আসন'-গ্রহণের কথা শুনে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে মথুর বাবুর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনে গমন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব সম্বন্ধে তিনি প্রথমে

সন্নিহান ছিলেন। তাঁর শ্রীমুখের কথা—"ভাবতুম পুরাণ ভাগবত কোথাও কোন নামগন্ধ নেই—চৈতন্য আবার অবতার! ন্যাড়া নেড়ীরা টেনেটুনে বানিয়েচে আর কি।—কিছুতেই ও কথা বিশ্বাস হ'ত না।" পুঁথিতেও আছে :

শ্রীপ্রভুর পূর্বেকার আছিল ধারণা।
সন্দেহ গৌরাঙ্গদেব অবতার কি না॥
পুরাণ কি ভাগবতে নাই কোন তত্ত্ব।
সন্দেহে দোলায়মান মিথ্যা কি এ সত্য॥
নবদ্বীপ আগমনে মিলিবে নিশ্চয়।
দরশন গৌরাঙ্গদেব যদি সত্য হয়॥
সেই হেতু বর্তমানে হেথা আগমন।
এখানে সেখানে থাকে তত্ত্ব অন্বেষণ॥

যা হোক, শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের অদ্ভুত অনুভূতির কথা শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গ থেকে উদ্ধার করছি :

"মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম যদি (চৈতন্যদেব) অবতারই হন ত সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ দেখবার জন্য এখানে ওখানে, বড় গোঁসাইয়ের বাড়ী, ছোট গোঁসাইয়ের বাড়ী, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়াতে লাগলুম। কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না।—সব জায়গাতেই এক একটি কাঠের মুরত হাত তুলে খাড়া হয়ে রয়েছে দেখলুম। দেখে প্রাণটা খারাপ হ'য়ে গেল। ভাবলুম কেনই বা এখানে এলুম। তারপর ফিরে আসব ব'লে নৌকায় উঠচি এমন সময়ে দেখতে পেলুম—অদ্ভুত প্রিয়দর্শন দুটি সুন্দর ছেলে।—এমন রূপ আর কখন দেখিনি। তপ্ত-কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা ক'রে জ্যোতির মণ্ডল। হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ পথ দিয়ে ছুটে আসছে। অমনি 'ঐ এলোরে, ঐ এলোরে' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। ঐ কথা ব'লতে না ব'লতে তারা নিকটে এসে এই শরীরের ভিতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান-হারা হ'য়ে পড়ে গেলুম। জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল বলে ধরে ফেলল। এই রকম ঢের দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে বাস্তবিক অবতার—ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাজীবনের এই ঘটনাটিও—"এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব" ভৈরবী ব্রাহ্মণীর এই উক্তির মর্মার্থ উদ্ঘাটন করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নবদ্বীপ থেকে ফেরার পথে কালনায় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ভগবানদাস বাবাজীকে দেখতে যান। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধি, ঈশ্বরানুরাগ, শুদ্ধভক্তি এবং সুতীব্র ব্যাকুলতা দর্শন ক'রে বাবাজী অতিশয় মুগ্ধ হ'লেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে অতিশয় উন্নত স্তরের মহাপুরুষ ব'লে সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেন। বাবাজী যখন জানলেন ইনিই কলুটোলার হরিসভায় 'শ্রীচৈতন্যের আসন' গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর সমস্ত ক্ষোভ বিদূরিত হ'ল। তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্তব্য করেন—'ঠিকই হয়েছে। ইনি শ্রীচৈতন্যের আসনে বসার যথার্থই যোগ্য। এঁতে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকটিত দেখছি তা সমস্তই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।'

শ্রীক্ষেত্র পুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সার্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্যকে ষড়্ভুজ হ'যে দর্শন দিযেছিলেন।

"দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজ-রূপ।
পাছে শ্যাম বংশী-মুখ স্বকীয় স্বরূপ॥"

ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ-মূর্তির প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। দক্ষিণেশ্বরে তিনি নিজ ঘরের দেয়ালে ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গের পট রেখেছিলেন। তিনি একবার গরানহাটায় শ্রীষড়্ভুজ-গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ দর্শনে গিয়েছিলেন। শোনা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীলাটু মহারাজকে ষড়্ভুজ-রূপে দর্শন দান করেন—ওপরের হস্তদ্বয়ে শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর্বাণ, মধ্যের হস্তদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের মোহন-বংশী এবং নিম্নের হস্তদ্বয়ে স্বকীয় বরাভয়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরেরও শ্রীহরিনামে এবং সঙ্কীর্তনে ঐকান্তিক অনুরাগ দেখা যায়। পানিহাটীর প্রসিদ্ধ চিঁড়ার মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ কযেকবারই যোগদান করেছিলেন এবং প্রত্যেক বারেই সঙ্কীর্তনানন্দে ভক্তমণ্ডলীকে উন্মত্ত ক'রে তোলেন এবং নিজেও মুহুর্মুহুঃ ভাবস্থ ও সমাধিস্থ হন। শিহড়ের সন্নিকটে ফুলুই-শ্যামবাজার নামক গ্রামে সঙ্কীর্তন শুনতে গিয়ে হরিপ্রেমে উন্মত্ত হ'যে

আহারনিদ্রা ভুলে তিনি তিন দিন কেবল শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন করেন এবং প্রেমের আবেশে উদ্দাম নৃত্য করেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর জীবনেও দেখা যায় সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে তিনি রাঢ়দেশে আহার-নিদ্রা ভুলে তিন দিন অবিরাম সঙ্কীর্তন ক'রে ঈশ্বরপ্রেমে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেন।

চৈতন্যদেবের মত ঠাকুরেরও শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ দেখা যায়। ভক্তগণের সঙ্গে তিনি মাহেশের রথ দেখতে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভু পুরীধামে রথের সম্মুখে বিরাট জনতার মধ্যে যেমন প্রেমাবেশে উদ্দাম নৃত্য ও শ্রীহরি-সঙ্কীর্তন করেছিলেন, ভক্তগণ-সঙ্গে মাহেশের রথ দেখতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণও রথের সম্মুখে বিশাল জনমণ্ডলীর মধ্যে ভাবোন্মত্ত হ'য়ে উদ্দাম নৃত্য ও সঙ্কীর্তন করেছিলেন এবং নিজহস্তে রথের রজ্জু আকর্ষণ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব দারুব্রহ্ম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে মধুরভাবে আলিঙ্গন করবার জন্য অস্থির হ'য়ে ছুটে যেতেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে :

আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইয়া অস্থিরে॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িল প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন মাহেশে গিয়েছিলেন সেই সময়ে তাঁর দুরারোগ্য গলরোগের সূচনা হয়েছে এবং তিনি তাতে কষ্টও পাচ্ছেন। কিন্তু তিনি সমস্ত কষ্ট অগ্রাহ্য ক'রে ভক্তগণ-সঙ্গে নৌকাযোগে মাহেশ গেলেন জগন্নাথ-দর্শনে। মন্দিরের সন্নিকটে একটি বাটীর ত্রিতলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। সেদিন গলার যন্ত্রণা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তাঁর আহারের খুবই কষ্ট হ'ল।

যথাসময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ পুষ্পমাল্য-বস্ত্র-চন্দনাদির দ্বারা সুসজ্জিত ক'রে রথে তোলা হ'ল। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর মৃদঙ্গ প্রভৃতি উচ্চরোলে ধ্বনিত হ'ল। মহা কোলাহল। লোকে লোকারণ্য। জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখর। শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে তিনি দ্বিতলে নেমে এলেন। ভাবের ঘোরে তাঁর শ্রীঅঙ্গ টলমল করছে এবং ক্রমশঃ আবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিনি আর ওপরে থাকতে পারলেন না। আবেগভরে নীচে নেমে এলেন এবং ছুটে চললেন মহাভাবে টলতে টলতে রথের অভিমুখে। এমন সময় রথের রজ্জু ধ'রে যাত্রিগণ টান দিয়েছে, ঘর ঘর্ শব্দ ক'রে সুবৃহৎ রথ চলতে লাগল।

"প্রভুরও হইল মন রথ টানিবারে।
দ্রুতপদে প্রবেশিলা জনতা ভিতরে॥
উপনীত একেবারে বিষম সঙ্কট।
রথের ঘূর্ণায়মান চক্রের নিকট॥
মহাভাবগ্রস্ত এবে বাহ্য মোটে নাই।
আপনে আপন হারা জগৎ গোঁসাই॥"—পুঁথি

রথযাত্রা-উৎসবে বলরাম-মন্দিরেও শ্রীশ্রীঠাকুরের অতি অপরূপ মোহন-লীলার বর্ণনা পুঁথিতে রয়েছে :

"আষাঢ়ে রথের দিনে শহরে গমন।
ভক্ত বসু বলরাম তাঁহার ভবন॥
তাঁহার মন্দিরে জগন্নাথের মূরতি।
অন্নভোগরাগ সহ সেবা নিতি নিতি॥
শ্রীকরে রথের রজ্জু করি আকর্ষণ।
মহাভাবে ধরিলেন মধুর কীর্তন॥
কভু রজ্জু পরিহরি প্রমত্ত কীর্তনে।
অপূর্ব প্রভুর লীলা ভক্তগণ সনে॥
তালে তালে বাজরোল উঠে অনিবার।
প্রভুর নৃত্যন তাহে করিয়া হুঙ্কার॥"

এই বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে মধুরভাবে শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহকে ছুটে আলিঙ্গন করতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েন এবং হাতে দারুণ আঘাত পান। শ্রীবৃন্দাবনেও তিনি অনুরূপ ভাবাবেশেই ব্রজেশ্বর বাঁকাবিহারীকে আলিঙ্গন করার জন্য অস্থির হ'য়ে ধেয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরলীলায় ভক্তপার্ষদগণসহ অত সঙ্কীর্তন ও নৃত্য ক'রেও মহাপ্রভুর সাধ মেটেনি; তাই পুনরায় তিনি দেহ ধারণ ক'রে লীলা করবেন,

সঙ্কীর্তনানন্দ সম্ভোগ করবেন—তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁর শ্রীমুখেই পাওয়া যায় :

পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরের মধুর-লীলাস্মৃতি-বিজড়িত শ্রীধাম বৃন্দাবন আবিষ্কার করেছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগ ও তীব্র আকর্ষণ দেখা যায়। যখন মথুরবাবুসহ তিনি বৃন্দাবনধামে যান তখন তাঁর নিত্যই কত ভাবোদয় হ'ত। সেখানে সুপ্রসিদ্ধা বৈষ্ণব-সাধিকা শ্রীমতী গঙ্গামায়ীর কুঞ্জ-দর্শনে শ্রীশ্রীঠাকুর গমন করলে গঙ্গামায়ী ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা-রূপে দর্শন ক'রে আত্মহারা হন। তিনি এইজন্য তাঁকে 'দুলালী' ব'লে সম্বোধন করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের পবিত্র রজঃ এনে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং ধ্যান করার জন্য নিজ হস্তে সেখানে তুলসী-কানন রচনা করেছিলেন। সেই থেকে তিনি দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীকে শ্রীধাম বৃন্দাবন জ্ঞান করতেন।

ভক্তিশাস্ত্রমতে সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রেমে চির আবদ্ধ থেকে তাঁরই ইঙ্গিতে ভক্তগণের অভীষ্ট পূর্ণ করেন। সুতরাং শ্রীমতীর কৃপা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের করুণা-লাভ অসম্ভব। তিনি শ্রীগোবিন্দের মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত না করলে তাঁর দর্শন হয় না। তাই মধুরভাবের সাধন-কালে শ্রীরামকৃষ্ণ রাধারাণীর কৃপা লাভের জন্য তাঁর চরণকমলে দিবারাত্র ব্যাকুল বিনতি ও আকুল প্রার্থনা নিবেদন করতে থাকেন। হৃদয়ের তীব্র ব্যাকুলতায় অচিরেই তিনি শ্রীমতীর দর্শনলাভে ধন্য হন। ঐ দিব্যদর্শন সম্বন্ধে তিনি বলতেন—"শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে সর্বহারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্তির মহিমা ও মাধুর্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশর পুষ্পের কেশরসকলের ন্যায় গৌরবর্ণ দেখেছিলাম।" যা হোক, শ্রীমতী রাধিকা ঐ-ভাবে ঠাকুরকে দর্শন-দানে কৃতার্থ ক'রে তাঁর শ্রীঅঙ্গে বিলীন হ'য়ে যান। সেই হ'তে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুকাল নিজেকে সাক্ষাৎ ব্রজরাণী জ্ঞান করতেন। ফলে ঐ কালে তিনি আপনার পৃথক অস্তিত্ববোধ একেবারেই হারিয়ে ফেলে শ্রীমতীর সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে তাদাত্ম্য অনুভব করতেন। বস্তুতঃ ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের প্রাবল্যে তাঁর মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় মধুরভাবের পরাকাষ্ঠা প্রসূত মহাভাবের সকল প্রকার লক্ষণই প্রকটিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর ভাব সাধনকালের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের প্রাবল্যে হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণায় সময় তাঁর দেহের রোমকূপ-সমূহ থেকে বিন্দু বিন্দু শোণিত নির্গত হ'ত। তার ফলে তাঁর দেহের গ্রন্থিসকল শিথিল হ'য়ে প'ড়ত এবং তাঁর দেহ নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হ'যে মৃতের মত প'ড়ে থাকত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং শ্রীমতী রাধারাণীর জীবনে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে হুবহু এই সকল লক্ষণ প্রকটিত দেখা যায়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে একাধারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধিকা—এই যুগলমূর্তির একত্র প্রকাশ জ্ঞান করা হয়ে থাকে। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেম ও ভাবময়ী শ্রীরাধিকার অতুল ভাবের ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেব। যা হোক, ভক্তভৈরব শ্রীগিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা শ্রীঅতুলচন্দ্র কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে একদিন একান্ত অভাবনীয় উপায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে একাধারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজরাণী শ্রীরাধার যুগল রূপের প্রকাশ দর্শন ক'রে বিমুগ্ধ ও কৃতার্থ হয়েছিলেন। অতুলচন্দ্র দেখেন—

"শ্রীপ্রভুর এক অঙ্গ ভাগে আধা আধা।
দক্ষিণাঙ্গ কৃষ্ণ রূপ বাম অঙ্গ রাধা॥
কৃষ্ণাঙ্গে নীলিমাকান্ত নয়নরঞ্জন।
রাধা অঙ্গ ঢল ঢল সোনার বরণ।"

* * *

অন্তরঙ্গ-জীবনে মহাভাবের লীলা-আস্বাদন এবং সাধারণভাবে ভক্তিযোগের প্রবর্তন—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেই প্রকাশিত দেখা যায়।

সুললিত ছন্দে স্বামী অভেদানন্দ-রচিত উভয়ের একাত্ম্য-সূচক স্তব দ্বারাই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি :

কলিমল-হর-নাম-কীর্তনং ঘোষয়ন্তং
করধৃতজলপাত্রং দণ্ডিনং হেমবর্ণম্।
ভবজলনিধিপোতং কৃষ্ণচৈতন্য-রূপং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অজ্ঞের বিজ্ঞতা

ঘোষে আচার্য : ব্রহ্ম শুষ্ক, রসের খবর রাখে না তো সে।
আমাদেরি হবে করতে সরস অগুণ ব্রহ্মে প্রেমের রসে।
ভক্ত হাসে : কী বলছ ঠাকুর—ছবি আঁকো তাঁর, তাঁরে না চিনি'?
ব্রহ্ম নীরস! হায় রে বিশ্বে নিখিল রসের উৎস যিনি?
সেদিন একটি শিশু বলছিল আর এক শিশুকে—হায় কপাল।
"জানিস! আমার মামার গোয়ালে করে গুঁতোগুঁতি ঘোড়ার পাল!"

ক্ষুদ্রের দর্প

শশী কয় : "সাগরে আমিই তো মাপিব,
ছিলাম সে জঠরে, মথি' ফের জানিব।"
রবি কয় : "দূর দূর! আমারি তো তাপে জল
মেঘ হয় রোজ—তাই আমি পাব তার তল।"
লবণের পুতুল সে হেসে বলে : "কী জ্বালা;
আমি প্রতি বিন্দুতে রই তার—যা পালা—
দেখ্ : আমি এক্ষনি মেপে দেব ব'লে—আয়!"
দেয় ডুব যেমনি সে যায়—টুপ্—গ'লে হায়!

শতাব্দ-সাধনা

যে যেথা ছিল লুটে সাধুর পায়, বহি' অর্ঘসম্ভার, রত্নমণি :
না জানি সন্ন্যাসী দেখাতে এল কোন্ সিদ্ধি অদ্ভুত—রোমাঞ্চনী।
ভক্ত ভেটি' কহে কৃতাঞ্জলি : "মুনি, বর্ষ শত ঘোর তপের ফলে
কী দেববাঞ্ছিত পেলে প্রেমের ধন, বিলাতে এলে যারে?" তাপস বলে :
"প্রেম কি? দেখ্ মূঢ় বিভূতি-বিস্ময়!" লক্ষ পুরবাসী আত্মহারা :
পদব্রজে মুনি গঙ্গা হয় পার!! জয়ধ্বনি করে সবাই তারা!
ভক্ত এক কড়ি মূল্যে খেয়া করি' গঙ্গা তরি' বলে : "প্রভু, প্রণাম!
ধন্য তুমি হে, শতাব্দ-সাধনায় লভিলে—এক কড়ি যাহার দাম।"

সমালোচনা

Significance and Importance of Jatakas—By Gokuldas De, M. A. (Gold Medalist). Published by Calcutta University, 1951. Pages 184+13, Price Rs. 7/-.

ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ জাতকনিচয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে জাতকনিচয়ের ক্ষেত্রও তেমনি। অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে মহাশয় বিগত ৩৮ বৎসর পালি সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া এই পুস্তকখানিতে তাঁহার গবেষণামূলক তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেগুলি প্রণিধানযোগ্য। এই পুস্তকে তিনি বৌদ্ধধর্মের আদি ইতিহাসের উপর অনেক আলোক সম্পাত করিয়াছেন। তাঁহার মতে জাতকনিচয় অনেকাংশে লোকসাহিত্য, যাহাতে নীতি ও ধর্মের উপদেশগুলি গল্পাকারে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই গল্পগুলিতে প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারা ও মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের আদি ভিত্তি দেখানো হইয়াছে। পুস্তকখানি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া রচিত হইয়াছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের একটি সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়াছেন। যাঁহারা এই বিষয়ে জিজ্ঞাসু, তাঁহারা এই পুস্তকের দ্বারা প্রভূত উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

Democracy in Early Buddhist Sangha—By Gokuldas De, M. A. (Gold Medalist). Published by Calcutta University, 1953. Pages 120+12; Price: Paper cover Rs 5/-, Cloth-bound Rs. 9/-.

এই পুস্তক বৌদ্ধ সঙ্ঘের গণতন্ত্রবাদ বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার পালি বিনয়-পিটকের মহাভাগগন্থ প্রথম চারি অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে অনুভূত হয় যে বিরাট বৌদ্ধসঙ্ঘের পবিত্রতা, স্থায়িত্ব, ও লোককল্যাণকারিত্ব রক্ষা করিবার জন্য প্রাচীন বৌদ্ধগণ কত প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং সব ব্যবস্থার মূলে গণতন্ত্রবাদ পরিস্ফুট। গ্রন্থকার অতি নৈপুণ্য ও কৃতকার্যতার সহিত প্রাচীন পালিগ্রন্থ হইতে বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া পাঠকগণের সমক্ষে ধরিয়াছেন। বর্তমান যুগে যে কোন ধর্মসঙ্ঘের পক্ষে ইহা অতি প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ।

—মৈথিল্যানন্দ

মাঘোৎসবের উপদেশ—শিবনাথ শাস্ত্রী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; ২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩১৯; মূল্য—আড়াই টাকা।

ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাস উনিশ শতকের জাতীয় জাগরণে বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—মোটামুটিভাবে এই কয়জনের নাম, ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের ইতিহাসে সর্বাধিক স্মরণীয়। খ্রীষ্টধর্মের আদর্শের দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত এই নব-বৈদান্তিকদের মধ্যে এক রামমোহন ছাড়া আর সকলেরই উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম। খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের রীতি-অনুসারে প্রার্থনা-সভায় ভাষণ-দানের মধ্য দিয়ে এই সগুণ ব্রহ্মের সঙ্গে ভক্তহৃদয়ের গভীর সম্বন্ধের পরিচয় ফুটে উঠতো দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথশাস্ত্রী প্রমুখ আচার্যদের প্রার্থনায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মব্যাখ্যাগুলি একাধারে জ্ঞান, ভক্তি ও ভাবাশিল্পের সার্থক সংমিশ্রণ। শিবনাথ শাস্ত্রীর ধর্মব্যাখ্যান অনেকটা তথ্য ও যুক্তিকেন্দ্রিক, সেইসঙ্গে সরল বিশ্বাস ও আন্তরিক ভক্তির সুরে মহিমান্বিত। বিভিন্ন ধর্ম-

মতের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার ফলে শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষণমালায় একটি উদার মননভূমির পরিচয় মেলে। "মাঘোৎসবের উপদেশ"—এমনি একটি ভাষণ-সংগ্রহ। এই সংগ্রহটিতে—ঈশ্বরের মনোনীত কে? ধর্মলাভের অধিকারী কে? ধর্মের সম্ভাবনীয়তা, পরিত্রাতা ঈশ্বর, জাতীয় সাধনা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধর্ম, ধর্ম: প্রাণে পাওয়া—প্রভৃতি নিবন্ধে লেখকের সার্থক প্রকাশভঙ্গী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সঙ্গে তদ্গতপ্রাণ সাধকের পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধনপন্থার পৃথক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও মৌলিক সত্যের ক্ষেত্রে সকল দেশের সকল যুগের সাধকদের কণ্ঠ এক। "ধর্ম: প্রাণে পাওয়া" নিবন্ধটির বক্তব্য কেবল ব্রাহ্মদের জন্য নয়, সব সত্যান্বেষীর পক্ষেই স্মরণীয়—"এক সচ্চিদানন্দ, চিন্ময়, নিরাকার নির্বিকার পরমাত্মা, যাঁর তত্ত্ব সাধুর উক্তিতে ও জীবনে প্রকাশিত, তাহা মানবাত্মাতে শক্তিরূপে স্থাপন ও জীবন গঠন করবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ। উপনিষৎ, বাইবেল, কোরান থেকে যদি পাঁচটা বচন তুলে দি, তা হ'লে কি ব্রাহ্মধর্ম পেয়েছি? তা নয়। প্রাণে কি পেয়েছি? তুমি কি সচ্চিদানন্দ অনাদি ঈশ্বরকে প্রাণের কাছে পেয়েছ? যদি বলা যায় 'পেয়েছি', তা হ'লে ঠিক জানা হয়েছে।"

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

মন্দিরের চাবি—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত। দি বুক কোম্পানি লিমিটেড, ৪।৩ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা—১৮৫; মূল্য—২৲ টাকা।

আজও সমাজের এক অংশ দেবতার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত—এই চিন্তাই সংবেদনশীল কবির চিত্তকে ব্যথিত করিয়াছে; তাই তিনি এই অন্যায়ের অবসান চান—সর্বস্তরের মানবের পুণ্যমিলনে সুস্থ সবল সুন্দর সমাজ দেখিতে চান। কবি মুক্তির ও মিলনের পূজারী—রাষ্ট্রীয় কি সামাজিক—সকল ক্ষেত্রেই; বিশেষতঃ অস্পৃশ্যতা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য তাঁহাকে ব্যথিত করে; তাই ঐ সকল বিষয়-বস্তু লইয়া অনেকগুলি কবিতা রচিত হইয়াছে। 'মন্দিরের চাবি,' 'দীনেশ গুপ্তের শেষ পত্র,' 'বিদ্রোহী', 'হরি-মন্দির,' স্বাধ্য অধিকার প্রভৃতি কবিতাগুলিতে কবির ভাষা ভাব ও ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ১৯৩১ খৃঃ পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, ২৪ বৎসর পরে সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া দেওয়ায় ইহা নব সজ্জায় পুনরায় আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

সংকলিতা—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রকাশক—সুনীল দাস, ২৬বি ক্রিস্টোফার রোড; কলিকাতা-১৪। পৃষ্ঠা—১৭২; মূল্য—চার টাকা।

বহু দিন ধ'রে বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত স্বরচিত কবিতাগুলিকে লেখক সন্নিবদ্ধ করেছেন 'সংকলিতা'য়; উদ্দেশ্য—বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে নিজের স্থানটুকু ক'রে নেওয়া।

কবিতাগুলি পূজা, প্রকৃতি, পরিস্থিতি, অতি আধুনিক, প্রেম, শিশুকবিতা, ব্যঙ্গকবিতা প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত; সনেট্, গান, কণিকা, চৌপদী, অনুবাদ—কাব্যের সকল ক্ষেত্রেই লেখক নিজের প্রতিভার পরীক্ষা করেছেন। মনে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তীর্ণ হয়েছেন।

নিঃসংশয়ে এটুকু ব'লব—প্রায় শতাধিক কবিতায় লেখকের কবিপ্রাণ নানাভাবে নানা ভাষায় স্পন্দিত, যা অপরের প্রাণেও স্পন্দন জাগায়; এইতো কবির সব চেয়ে বড় সার্থকতা!

মীমাংসাপ্রকাশঃ—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, কাব্যবেদপুরাণস্মৃতিতীর্থ প্রণীত; প্রকাশক—সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ, হাওড়া; পৃষ্ঠা—৭৬; মূল্য—২৲।

জৈমিনির পূর্বমীমাংসা ভারতীয় ষড়্দর্শনের অন্যতম; ইহা ভারতের অমূল্য সম্পদ। উত্তর

মীমাংসা অর্থাৎ বেদান্তের অনুশীলনে পূর্বমীমাংসার জ্ঞান অপরিহার্য। পূর্বমীমাংসা বিপুলায়তন এবং ইহার অধ্যয়নে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়। গ্রন্থকার মূল মীমাংসা শাস্ত্র হইতে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সরল সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকটির 'মীমাংসা-প্রকাশঃ' নামকরণ করিয়াছেন। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও প্রয়োজনের দিক হইতে পুস্তকটি ক্ষুদ্র নহে। বিশেষ করিয়া পরীক্ষার্থী ছাত্রসমাজে ইহার সমাদর হইবে।

বিদ্যামন্দির পত্রিকা —সপ্তম বার্ষিক সংখ্যা—১৯৫৭। সম্পাদনায় ব্রহ্মচারী শ্যামাচৈতন্য, অধ্যাপক শ্রীসুপ্রিয়কুমার কর এবং ছাত্রপক্ষে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা প্রভৃতি চারজন।

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের (আবাসিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ) বার্ষিক পত্রিকাটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। কি প্রবন্ধ নির্বাচনে, কি মুদ্রণ-পারিপাট্যে সুরুচির পরিচয় সর্বত্র। 'শিক্ষাপ্রসঙ্গে' সঞ্চয়নটি দিগ্‌দর্শনে সহায়তা করে। সচিত্র প্রবন্ধ 'ভারততীর্থে'—শিক্ষক-সাহচর্যে ছাত্রদের উত্তর ভারত ভ্রমণের শুধু কাহিনী নয়—শিক্ষার পরিপূরক বলিয়াও মনে হয়। সম্পাদকীয় ও বিভিন্ন বিবরণীসহ মোট পঁয়ত্রিশটি প্রবন্ধ, তাহার মধ্যেই তিনটি গল্প এবং সাতটি কবিতা রহিয়াছে। ছয়টি ইংরেজী প্রবন্ধের প্রথমটি স্বামী অতুলানন্দজীর স্মৃতিকথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাব্দী-বৎসরে এই সংখ্যাটি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হইয়া পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

ত্রয়ী (বার্ষিক পত্রিকা)—প্রথম সংখ্যা ১৯৫৭। সম্পাদক—শ্রীতারাপদ ঘোষ।

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির—লাইসেনসিয়েট ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগের ছাত্রসংসদ্-প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকাটি পরিকল্পনায় এবং বিষয়বিন্যাসে সত্যই অভিনব। কারিগরের কালি-ঝুলি-মাখা হাতে কবি ও লেখকের কালিকলম যে নতুন গতি-ভঙ্গি নিয়ে নতুন সৃষ্টি করতে সক্ষম—তার প্রমাণ এই 'ত্রয়ী'। চব্বিশটি বাঙলা রচনার মধ্যে অনেকগুলি কবিতা ও একটি নাটিকা, তার পাশে 'অটোমেটিক নেম-প্লেটে' সিরিজ প্যারালেলের বৈদ্যুতিক সংযোগ —এক অপূর্ব সৃষ্টি। ষোলটি ইংরেজী প্রবন্ধের অধিকাংশই প্রায়োগিক বিজ্ঞান-বিষয়ক। Reality in Imagination—কবিতাটি মৌলিক, ও আনন্দপ্রদ। সম্পাদনা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ।

মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকা

Upanishadic Stories and Significance—by Swami Tattwananda, published by Sri Ramakrishna Advaita Asrama, Kaladi. pp 164—price Rs 2.

স্বামী তত্ত্বানন্দ-লিখিত 'উপনিষদের গল্প ও তাহার তাৎপর্য'—সাত পৃষ্ঠা তত্ত্বপূর্ণ ভূমিকার পর ১৯টি গল্পে—উপনিষদের গভীর আত্মজ্ঞানের কথা উপনিষদেরই গল্পাশ্রয়ে সরলভাবে বলা হইয়াছে। নচিকেতা, ভৃগু, সত্যকাম, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী, নারদ-সনৎকুমার প্রভৃতি গল্পগুলি নূতনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

Anirvan—(Students' Volume) No 3. May 1957. published by Ramakrishna Mission, Social Education Organisers' Training Centre, Belur Math, Howrah pp 20.

ভারতের অবনতির প্রধান কারণ—শিক্ষা-দীক্ষা অতি অল্প সংখ্যক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ, অতএব উন্নতির জন্য প্রথম ও প্রধান কর্তব্য জনসাধারণে শিক্ষাবিস্তার। এতদুদ্দেশ্যে সরকারী পরিকল্পনায় মিশনের তত্ত্বাবধানে বেলুড়ে জনশিক্ষা-মন্দিরে যে সংগঠক-শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় পঞ্চাশ জন শিক্ষক ও কর্মী সেখানে ট্রেনিং পাইতেছেন। 'অনির্বাণ' তাঁহাদেরই মুখপত্র। শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন-বিষয়ক বারো তেরোটি সুচিন্তিত এবং অভিজ্ঞতা-প্রসূত প্রবন্ধ ঐ সকল বিষয়ে আগ্রহান্বিত বা ঐ সকল ক্ষেত্রে সেবানিরত ব্যক্তিদের যথেষ্ট উদ্দীপনা দিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্য-বিবরণী

কলিকাতাঃ ইন্‌ষ্টিটিউট অব্‌ কালচার

১৯৫৩-৫৫ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণীতে এই কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানটির অভাবনীয় বিস্তৃতি ও উন্নতি পরিস্ফুট। নিয়মিত কার্যের মধ্যে—গীতা, উপনিষদ্‌, ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের ব্যাখ্যামূলক পাঠ; সাপ্তাহিক বক্তৃতায় দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণের সমাজ ও কৃষ্টিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাববিনিময়ের জন্ত আন্তর্জাতিক আলোচনা-পরিষদ্‌; গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও গবেষণা-গার, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, ভারতীয় ভাষায় ক্লাস; শিল্প-প্রদর্শনী, গ্রন্থপ্রকাশন, সংবাদপত্রিকা; অতিথি-ভবন ও ছাত্রাবাস।

আলোচ্য বর্ষে দেশবিদেশের মনীষি-প্রদত্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৬০০ শত বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গকে নানাবিষয়ে অবহিত করিয়াছে। প্রকাশন-বিভাগে এই কালে—Cultural Heritage of India (ভারত-কৃষ্টির উত্তরাধিকার) গ্রন্থাবলী, ৩য় (দর্শন) ও ৪র্থ (ধর্ম) খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

বিরাট পরিকল্পনা লইয়া প্রতিষ্ঠানটি নিকটেই প্রশস্ত পরিবেশে সরিয়া যাইতেছে, দক্ষিণ কলিকাতায় লেকের নিকট ২'৩৩ একর জমি ক্রয় করা হইয়াছে—কার্য-বিবরণীতে নির্মীয়মাণ হর্ম্যের প্ল্যান ও প্রতীক চিত্র—যেমনই বিস্ময়কর তেমনই আশাসঞ্চারী। শীঘ্রই ইহার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হউক এবং পূর্ণ-পরিণত প্রতিষ্ঠানটি সমাজের নূতন কৃষ্টিচেতনা জাগরিত করুক।

রহড়া (২৪ পরগণা) : রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম ৩৩ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত বহু বিভাগ-সমন্বিত বৃহৎ আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে প্রধানতঃ দরিদ্র মেধাবী মাতাপিতৃহীন অনাথ বালকেরাই প্রবেশের সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে; বহুমুখী বিদ্যালয় (Muti-purpose School), জেলা গ্রন্থাগার, ডাকঘর, কর্মি-ভবন, একটি প্রশস্ত ছাত্রাবাস এবং বয়নশিল্পগৃহ। এই নির্মাণকার্যের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৮৯,৪৭৬৲ টাকা। আশ্রমসংলগ্ন দুইখণ্ড জমিও আলোচ্য বর্ষে কেনা হইয়াছে। গত ২৪শে জুন, ১৯৫৬ পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বহুমুখী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক, শিল্প প্রভৃতি সকল বিভাগেরই ক্রম-বর্ধমান প্রসার ও উন্নতি লক্ষণীয়। আলোচ্য বর্ষে মোট ৩৪৬টি বিদ্যার্থী এই আশ্রমে শিক্ষালাভ করিয়াছে। প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল শতকরা শত; ১৯৫৬ খৃঃ ১৯ জন পরীক্ষা দেয়, সকলেই পাস করে; একটি বালক বৃত্তি পায়।

রাঁচিঃ টি. বি স্যানাটোরিয়াম—এই প্রতিষ্ঠানে ১৯৫৬ খৃঃ কার্য-বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত গতিতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে—তাহার পরিচয় এই বিবরণীতে পাওয়া যায়। বর্তমানে এখানে ৫০টি ব্লক আছে; অস্থায়ী রোগী-ভবন, রন্ধনাগার ও ভোজনালয়, কর্মিভবন, ঝাড়ুদার-পল্লী, ধোপাঘাট, ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস, ক্ষুদ্র অতিথিভবন প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত; এতদ্ব্যতীত সবজিবাগান ও সুদৃশ্য পুষ্পোদ্যান এবং জল-সংরক্ষণ ব্যবস্থা এখানে দর্শক-বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে মোট ১৬২টি শয্যা (Bed) আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যক্ষ্মা-সেবা অতি প্রয়োজনীয় এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ। যক্ষ্মা-প্রতিষ্ঠানকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন।

প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দ ইহার সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চিন্তা করিতেছেন :—প্যাথলজি গৃহ, চিকিৎসক ও কর্মিগণের জন্য উপযুক্ত ভবন, আধুনিকতম রন্ধনশালা, স্যানাটোরিয়ামে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন, প্রাক্তন রোগীদিগের জন্য বাসস্থান, বহির্বিভাগ-সমন্বিত সাধারণ চিকিৎসালয় (যেহেতু ৯ মাইলের মধ্যে কোন চিকিৎসালয় নাই), বৈজ্ঞানিক ধোলাইখানা।

জন্মোৎসব

সোনার গাঁ (ঢাকা)—গত ১০ই হইতে ১২ই জ্যৈষ্ঠ—সোনার গাঁ রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন উষাকীর্তনের পর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া পল্লী-পরিক্রমা হয়। অপরাহ্ণে বিরাট জনসভায় পূর্বপাকিস্তানের স্বাস্থ্য-সচিব শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সত্যকামানন্দ সুললিত ভাষায় স্বামীজীর জীবন-আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন—স্বামীজী কোন ধর্ম-বিশেষের জন্য নয়, তিনি মানুষের কল্যাণ-কামনায় জীবনপাত করেন। দ্বিতীয় দিবসে নারায়ণগঞ্জ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিঃশঙ্কানন্দজীর সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়।

শেষ দিন উৎসব মহোৎসবের আকার ধারণ করে। মধ্যাহ্নে ৪০০০ নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। অপরাহ্ণে এক বিরাট জনসভায় বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী সভাপতিরূপে মধুর ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলেন, নিস্তব্ধ জনতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শুনিয়াছিল। সন্ধ্যারতির পর 'নচিকেতা' নাটক অভিনীত হয়।

বালিয়াটি (ঢাকা): বার্ষিক উৎসব—রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১০ই হইতে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত মহা আনন্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১২ই মধ্যাহ্নে প্রায় ২০০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে স্থানীয় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি হয়। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ দুই দিন সন্ধ্যায় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

ছায়াচিত্রযোগে প্রচারকার্য

গত মার্চ হইতে ১৬ই জুন পর্যন্ত—'বিশ্ব-সভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবদান' 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ,' 'মাতা সারদা দেবী,' 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও আর্যসভ্যতা' সম্বন্ধে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বাগেরহাট, খুলনা, যশোহর, নড়াইল, বরিশাল, চাঁদপুর, ফরিদপুর, বালিয়াটী, মির্জাপুর, হবিগঞ্জ, নরসিংদী, শ্রীহট্ট ইত্যাদি অঞ্চলে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী মোট ৬৫টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৫০টি ছায়াচিত্রসহ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সহস্র সহস্র নরনারী উক্ত সভাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন।

সাপ্তাহিক ধর্মসভা

বলরাম-মন্দির (কলিকাতা): আলোচিত বিষয়

এপ্রিল: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা, আচার্য বিবেকানন্দ, ভাগবত ও প্রেমধর্ম, গীতার বাণী।

মে: বাল্মীকি-রামায়ণ, সনাতনধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান, বুদ্ধের জীবনী ও বাণী, ধর্ম ও বিজ্ঞান।

জুন: প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের প্রয়োগ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, যুগমানব বিবেকানন্দ, ভাগবত ও প্রেমধর্ম, রথোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ।

স্বামী যুক্তানন্দ, স্বামী বীতশোকানন্দ, পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী, স্বামী দেবানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং বেতার-কথক সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিভিন্ন দিনে বলেন।

আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার

সানফ্রান্সিস্কো: উত্তর কালিফর্নিয়া বেদান্ত-সমিতি

[২৯৬৩ ওয়েব্‌ষ্টার ষ্ট্রীট্, সানফ্রান্সিস্কো-২৩]

প্রতি রবিবার বেলা ১১ টায় ও প্রতি বুধবার রাত্রি ৮টায় সোসাইটির নিজস্ব অডিটোরিয়মে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ বা সহায়ক স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ বেদান্ত-বিষয়ক বক্তৃতা দেন।

ফেব্রুআরি: সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন, ধর্মজীবনে ক্রিয়া-কাণ্ডের স্থান, বিশ্ব-ঐক্যের আধ্যাত্মিক ভিত্তি, ঈশ্বর কিভাবে মানুষের সঙ্গে মেশেন? দৃষ্টি যদি একাগ্র হইত, ধ্যান অভ্যাস করিব কেন? ধর্মজীবনের ছয়টি সহায়, ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ —যাঁহাকে দেখিয়াছি।

মার্চ: ঈশ্বর, দেব-মানব ও অবতারের পার্ষদভক্ত; শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানবের উত্তরাধিকার; শান্তি নয়—তরবারি, প্রতিটি মানুষ—একটি রহস্য, শ্রীরামকৃষ্ণের নারীভক্তবৃন্দ, সুপ্তির আধ্যাত্মিক অর্থ, আত্মা—এক না বহু? যুগে যুগে ভারতীয় মহাপুরুষগণ।

এপ্রিল: আমাদের দুঃখের কারণ, প্রবর্তকের সাধনা, বেদান্তের বৈশিষ্ট্য কি? উন্নত সাধকের সাধনা, বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বর ও মানব সম্বন্ধে ধারণা, পুনরুত্থান সম্বন্ধে—খৃষ্টান ও হিন্দু দৃষ্টি-ভঙ্গি, চাই অনুভূতির ধর্ম—শুধু বিশ্বাসের নয়; আমরা যা হয়েছি, তা কেন হয়েছি?

মে: আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ, স্বাভাবিক মানবের আধ্যাত্মিক মানবে রূপান্তর (নবাগত স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রথম ভাষণ, ৫ই), দৃশ্য ও অদৃশ্য ঈশ্বর, ভাবাবেগকে কিরূপে ধর্মভাবে পরিণত করা যায়? শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তগণ; চাও, খোঁজ এবং দরজায় ধাক্কা দাও; শক্তির উৎস, মৃত্যুকে জয় করা যায়, বেদান্তের নীতি ও আচার্যগণ।

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৮টায় স্বামী অশোকানন্দ বেদান্তদর্শনের তত্ত্ব ও সাধনা সম্বন্ধে সবিস্তারে অধ্যাপনা করেন, বর্তমানে মুণ্ডক-উপনিষদ্ আলোচিত হইতেছে। রবিবার সকালে সমবেত শিশুদিগকে বিভিন্ন ধর্মগুরুর কথা বলিয়া উদারধর্মভাবের শিক্ষা দেওয়া হয়।

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে ২৭শে জানুআরি রবিবার স্বামী নিখিলানন্দের বক্তৃতা—'বিবেকানন্দের বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বিষয়ক ভবিষ্যদ্-দৃষ্টি'। তৎসহ ছিল ভারতীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান।

ফেব্রুআরি: পাপ ও উদ্ধার বিষয়ে হিন্দুমত, অন্তরাত্মার দীপ্তি, মানব-জীবনের অর্থ, ধর্মের মৌলিক আদর্শ।

মার্চ: প্রার্থনা ও পরিপূরণ, ঈশ্বরানুভূতির চারিটি সোপান, ঈশ্বরকৃপার অর্থ, ভালবাসার কৌশল।

এপ্রিল: বেদান্তের দৃষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব, আত্মসংযমের ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞান, সাহস ও ও আনন্দের সহিত মৃত্যুবরণ (গুডফ্রাইডে), অমৃতত্বের সন্ধানে মানুষ (ইষ্টার), কর্তব্য ও মুক্তি।

মে: জীবনের লক্ষ্যচতুষ্টয়, সিদ্ধিলাভের উপায়, বুদ্ধবাণী—শান্তি ও জ্ঞান (তৎসহ ভারতীয় সঙ্গীত), মায়া বা সমষ্টি-অজ্ঞান।

এই বক্তৃতা-সূচী ব্যতীত নিয়মিতভাবে প্রতি মঙ্গলবার স্বামী ঋতজানন্দ গীতা ও প্রতি শুক্রবার স্বামী নিখিলানন্দ উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন।

বিবিধ সংবাদ

নানাস্থানে উৎসব

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২ তম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পূজা পাঠ ভজন প্রসাদ-বিতরণ ও আলোচনাসভা প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সংক্ষিপ্ত উৎসব-সংবাদ পরিবেশিত হইল :

কলাইঘাট (রাণাঘাট, নদীয়া) : বক্তা—স্বামী পুণ্যানন্দ ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। কলাইঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুর সহিত আগমন করিয়াছিলেন, সেই স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া স্থানীয় ভক্তবৃন্দ উৎসবের আয়োজন করেন।

নাটশাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (মেদিনীপুর) : বক্তা—স্বামী সুশান্তানন্দ (সভাপতি), শ্রীসূর্যকুমার চক্রবর্তী, শ্রীসুধীরকুমার পাল প্রভৃতি। সভান্তে 'শ্রীরামকৃষ্ণ'-সম্বন্ধে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। ১০ হাজার নরনারী উৎসবে যোগদান করেন।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (পূর্ণিয়া) : বক্তা—স্বামী পরশিবানন্দ (সভাপতি), স্বামী অনুপমানন্দ। আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী পরশিবানন্দ মহারাজ।

আরিট (খেপুত, মেদিনীপুর) : বক্তা—স্বামী বিশ্বদেবানন্দ (সভাপতি), স্বামী সুশান্তানন্দ প্রভৃতি। ছায়াচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা ও কালীকীর্তন উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল।

টাংলা (আসাম) : বক্তা—স্বামী সৌম্যানন্দ মহারাজ (সভাপতি) ও স্বামী চণ্ডিকানন্দ। স্বামী গহনানন্দ ছায়াচিত্র-সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীর বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। স্থানীয় উদ্বাস্তুগণ কর্তৃক 'নিমাই-সন্ন্যাস' লীলাযাত্রা অভিনীত হয়। তিনদিন ধরিয়া উৎসব চলে।

বেলগাছিয়া (অনাথদেব লেন, কলিকাতা) : অনুন্নত শ্রেণী-দ্বারা পরিচালিত 'রামকৃষ্ণ-যুবকসঙ্ঘ' কর্তৃক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা—স্বামী জীবানন্দ, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, ডাঃ তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় (সভাপতি), শ্রীসন্তোষকুমার দাশগুপ্ত।

ইম্ফল (মণিপুর) : বক্তা—স্বামী পুরুষাত্মানন্দ, স্বামী শিবরামানন্দ, শ্রীসুকুমার পাগাড়ে (সভাপতি), অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীযোগেন্দ্র সিংহ (মণিপুরী ভাষায়), অধ্যাপক শ্রীনীলকান্ত সিংহ (ইংরেজীতে)।

বিজ্ঞান-সংবাদ

আণবিক : গত ২৫শে জুন—অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র উদ্যোগে ভারতের চার জন বৈজ্ঞানিক আণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন তাহা নিউ দিল্লী হইতে বেতারযোগে প্রচারিত হয়।

ডক্টর কৃষ্ণান্, ডক্টর কোটারি, ডক্টর মাহেশ্বরী এবং ডক্টর খানেলকার বিভিন্ন দিক হইতে সমস্যাটির আলোচনা করেন।

[প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর] গত ১২ বৎসরে বাতাসে তেজস্ক্রিয়তা বাড়িয়াছে কিনা প্রশ্নের উত্তরে স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ডঃ কৃষ্ণান্ বলেন : অপরিহার্য কারণে স্বাভাবিকভাবেই আমরা খানিকটা তেজস্ক্রিয় হইয়া উঠিয়াছি। মহা-জাগতিক রশ্মি বিকীরণের ফলেও বাতাসের নাইট্রোজেন হইতে অবিরত তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ উৎপন্ন হইতেছে এবং মানুষের শরীরের উপাদানেও উহা নিহিত রহিয়াছে। উদ্ভিদ্ হইতে আমরা যে কার্বন সংগ্রহ করি তাহা যদিও তেজস্ক্রিয় নয়—তথাপি তাহাতে অল্পপরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা লক্ষিত হয়।

এই তেজস্ক্রিয়তা ক্ষতিকারক কিনা জিজ্ঞাসিত

হইয়া তিনি বলেন : ব্যক্তিবিশেষ সম্ভবতঃ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াও এই বিকীরণ সহ্য করিতে পারে ; অবশ্য ইহার একটা সীমা আছে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানুষ তো রঞ্জন-রশ্মির (এক্স-রে) সম্মুখীন হইতেছে।

আণবিক বিস্ফোরণজাত পদার্থনিচয়ের বিপদ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া প্রতিরক্ষা বিভাগের মন্ত্রণাদাতা ডঃ কোঠারি বলেন : আমরা যখন এই জাতীয় বিপদের কথা বলি তখন অবশ্যই বড় বড় বিস্ফোরণের ব্যাপারই চিন্তা করি ; এই সময়ে উদ্ভূত নানা তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু ক্যালিয়মের সমগোত্রীয় ষ্ট্রন্সিয়ম-৯০, মাটিতে পড়িয়া খাদ্যের মাধ্যমে ইহা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, এবং অস্থিতে সঞ্চিত হইয়া উহা ক্রমশঃ ক্ষতিসাধন করে। বেশির ভাগ মানুষ উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতেই ক্যালসিয়ম সংগ্রহ করে, ইহার অপর উৎস দুগ্ধ আমাদের দেশে দুর্লভ। ইওরোপ এবং আমেরিকার অধিবাসিগণের শতকরা ৮০ জন দুগ্ধ হইতেই অস্থির জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ম সংগ্রহ করে। উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে ক্যালসিয়ম সংগ্রহকারী আমাদিগের ষ্ট্রন্সিয়ম-বিপদ দুগ্ধ হইতে ক্যালসিয়ম সংগ্রহকারীদের অপেক্ষা দশগুণ বেশি।

*   *   *

আমেরিকার নোবেল লরিয়েট বৈজ্ঞানিক ডক্টর লিনাস পলিং একটি টেলিভিসন আলোচনায় বলিয়াছেন, অনুষ্ঠিত আণবিক পরীক্ষাগুলির ফলে দশলক্ষ মানুষের জীবন ৫।১০ বৎসর করিয়া কমিয়া যাইবে ; দুইলক্ষ শিশু শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে। অল্প তেজস্ক্রিয় বিকীরণও ক্যান্সার এবং রক্তদুষ্টি উৎপন্ন করে।

(সংক্ষিপ্ত সংবাদ : লস এঞ্জেলিস—জুন ৩, রয়টার)

মেরুর জ্যোতি—মেরু প্রদেশে অন্ধকার রাত্রে আকাশে এক রকম জ্যোতি দেখা যায়, তাকেই মেরুর জ্যোতি বলে। যে সময়ে সূর্যে কলঙ্ক দেখা যায় তখন মেরু অঞ্চলের অনেক দূরেও, যেমন ফ্রান্স বা জার্মানিতে, এই জ্যোতি কখনও কখনও দেখা যায় ; একবার সিঙ্গাপুরেও নাকি দেখা গিয়াছিল। এর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে এই আলোর খেলা আনন্দের থেকে ভয়েরই সঞ্চার করে।

উত্তর গোলার্ধে এই জ্যোতি উত্তর দিকে ভোরের আলোর মত দেখায় তাই এর নাম অরোরা বোরিয়ালিস্, দক্ষিণে এর নাম অরোরা অষ্ট্রেলিস্।

সম্প্রতি এর কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানী গবেষণা চলেছে। জানা গেছে এগুলির ঘটনাস্থল সাধারণতঃ ৫০।৬০ মাইলেরও উর্ধ্বে। সূর্য থেকে আলোক-রশ্মি ছাড়াও কতকগুলি বৈদ্যুতিক বস্তুকণা (+ ও −) বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবীর চুম্বক-শক্তির আকর্ষণে মেরু অঞ্চলের দিকে ছুটে। গতিপথে ইহারা আকাশের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস-কণার সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে এই কিরণের সৃষ্টি হয়। আগামী আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণায় এ সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জানা যাবে।

(Endeavour—Jan.' 57)

বিশ্বব্যাপী ভূতাত্ত্বিক গবেষণা

১লা জুলাই, ১৯৫৭ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ ১৮ মাস ধরিয়া ৭০টি দেশের প্রায় ১০,০০০ বৈজ্ঞানিক সংঘবদ্ধভাবে বিশ্বব্যাপী এক নূতন ধরণের গবেষণার অভিযান চালাইবেন ; এই জন্য এই বৎসরটিকে বলা হইবে আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্ত্বিক বৎসর (International Geophysical Year —সংক্ষেপে I. G. Y).

মেরু অঞ্চল পর্যবেক্ষণের জন্য এই প্রকার আন্তর্জাতিক গবেষণা দুইবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে ; প্রথম ১৮৮২-৮৩ খৃঃ, দ্বিতীয় ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে। এইগুলিকে বলা হয় প্রথম ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মেরু বৎসর। বিশেষ ভাবে মেরু অঞ্চলের তথ্য-সংগ্রহের জন্য নানা স্থানে অস্থায়ী পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ঐ সময় বহু তথ্য সংগৃহীত হয়।

বর্তমান গবেষণার বিষয় পৃথিবী ও তৎসংশ্লিষ্ট

যাবতীয় কিছু ; জল, স্থল, বায়ুমণ্ডলে তন্ন তন্ন করিয়া প্রায় বারোটি বিভিন্ন বিজ্ঞানের নূতন তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।

আবহ বিজ্ঞান (Meteorology) এই গবেষণার একটি প্রধান এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। শুধু আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়াই বড় কথা নয়, নিরাপদ ও দ্রুত বিমান-চালনার জন্ম বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের (বিশেষত ২০,০০০ হইতে ৪০,০০০ ফুট উর্ধ্বে) বায়ু চলাচলের তথ্য একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

অতঃপর পৃথিবীর চৌম্বকশক্তি সম্বন্ধে গবেষণা প্রয়োজন, কারণ কম্পাসের কাঁটা ঠিক উত্তর দিক দেখায় না এবং নানা কারণে স্থান-কালভেদে উহা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। সৌরকলঙ্ক-বৃদ্ধিকালে, বিশেষত মেরু অঞ্চলে চৌম্বক ঝড় (বা Magnetic Storm) দেখা যায়, তখন কম্পাস মোটেই নির্ভরযোগ্য থাকে না। জল পথে ইহা খুবই বিপজ্জনক। এ বিষয়েও পৃথিবীব্যাপী তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। এই সঙ্গে সম্পর্কিত মেরুজ্যোতির কারণও আশা করা যায় আবিষ্কৃত হইবে।

মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic ray) অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিতেছে এবং অলক্ষ্যে বিশেষতঃ বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে নানা পরিবর্তন ঘটাইতেছে তাহা এখনও মানুষের অজ্ঞাত। এ জন্ম রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতির সাহায্যে এ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা হইবে।

আয়ন মণ্ডল (Ionosphere) পৃথিবীর উর্ধ্বে ৬০ হইতে ২৫০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত, ইহাকে বিদ্যুৎ-মণ্ডলও বলা যাইতে পারে; বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনে ইহার গুরুত্ব অনুভূত হইয়াছে, বজ্রবিদ্যুৎও এই মণ্ডলের ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। বেতারের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্ম এই মণ্ডলের আরও জ্ঞান আবশ্যক।

বায়ুমণ্ডলের পর জলমণ্ডল—ভূতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়। সমুদ্রস্রোত, বাণিজ্যবায়ু ও মৌসুমীবায়ুর সম্যক জ্ঞান সংগৃহীত হইলে জানা যাইবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার কোন স্থায়ী পরিবর্তন কিভাবে কতদিনে হইবে—বা হইতেছে কি না।

সর্বশেষে গবেষণার বিষয় ভূবিজ্ঞান; সাধারণ মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা নিকটতম ভূত্বক্—ভূকম্পন কেন হয় ইহার পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব কি না, পৃথিবীর অভ্যন্তরের তরল মণ্ডল (৪০০০ মাইল ব্যাসব্যাপী), আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা তথ্য সংগৃহীত হইবে।

এতদিন পদার্থবিদ্ ও রাসায়নবিদ্রা পরীক্ষাগারে বসিয়া একা একা গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু আজ বিরাট প্রয়োজনে এই বিরাট আয়োজন।

ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি প্রত্যেক দেশই এই বিরাট জ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

উদ্বোধনের গ্রাহক-সংখ্যা পরিবর্তন

উদ্বোধন-পত্রিকার বর্তমান গ্রাহকবর্গকে জানান যাইতেছে যে এই মাস – শ্রাবণ ১৩৬৪, হইতে তাঁহাদের গ্রাহক সংখ্যা (Subscribers' Number) পরিবর্তন করা হইল। পত্রিকার উপরে যে ঠিকানা থাকে তাহার পূর্বভাগেই এই গ্রাহকসংখ্যা থাকিবে। যদি কেহ ঠিকানা পরিবর্তন, বা পত্রিকা অপ্রাপ্তি প্রভৃতির জন্ম পত্র দেন, তাহা হইলে এই গ্রাহকসংখ্যাসহ নিজ নাম ঠিকানার উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না। ইতি—

—কার্যাধ্যক্ষ

উদ্বোধন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তুতিঃ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমলচতুর্ধুরীণ-বিরচিতা

ত্রেতায়াং রামভদ্রায় জগদ্ভ্রমণকারিণে।
দ্বাপরে কৃষ্ণরূপায় পাপতাপাদিকর্ষিণে ॥১
কলৌ শ্রীরামকৃষ্ণায় যুগ্মরূপপ্রধাবিণে।
নমঃ কোটীযুগব্যাপি-তপঃফলস্বরূপিণে ॥২

অবতীর্ণপরেশায় যতীন্দ্রস্য নমোঽস্তু তে।
যুগযুগাবতারাণাং সমষ্টয়ে নমোঽস্তু তে ॥৩
রামো দূর্বাদলশ্যামঃ কৃষ্ণোঽপি কৃষ্ণবর্ণকঃ।
মাতা তে কালিকা ঘোরা গৌরস্ত্বং শিবরূপকঃ ॥৪
নিষ্কলুষং জগৎ সর্বং নিষ্পাপং চিরশুভ্রকম্।
কৃতং ত্বয়া স্থিরজ্যোতিঃ প্রমূর্তব্রহ্মবর্চসম্ ॥৫
বিশ্বদীপস্বরূপায় ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় নরেন্দ্রধ্যানরূপিণে ॥৬

বামনস্য স্থিরা প্রজ্ঞা রামস্য সত্যনিষ্ঠতা।
বীর্যং নীতিশ্চ কৃষ্ণস্য ত্বয্যেব পূর্ণতাং গতা ॥৭
গৌরস্য প্রীতিভক্তী চ জ্ঞানকর্মসমন্বিতে।
ত্বয়ি রূপং পরং প্রাপ্তে রামকৃষ্ণ নমোঽস্তু তে ॥৮
সর্বধর্মপ্রপালিনে তৎসমন্বয়-কারিণে।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় সচ্চিদানন্দরূপিণে ॥৯

'তাবান্ পন্থা মতং যাবন্'—মহাবাণী-প্রচারিণে।
পরশিবস্বরূপায় 'জীবশিব'-বিঘোষিণে ॥১০
মাধ্যমেন মহাদেব্যা জননীসারদামণেঃ।
নারীশক্তেঃ প্রবোধায় সংসারারণ্যবাসিনে ॥১১

ঈশপ্রত্যক্ষতায়াশ্চ সাক্ষাৎপ্রমাণকারিণে।
নমো ভগবতে তুভ্যং ষড়ৈশ্বর্যপ্রকাশিনে ॥১২
পুত্রাধমযতীন্দ্রায় পাদরেণুপ্রদায়িনে।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় সারদাসাররূপিণে ॥১৩

অনুবাদ: ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী

যিনি ত্রেতাযুগে শ্রীরামরূপে জগৎকে আনন্দ দান করেছিলেন, যিনি দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণরূপে জগতের পাপ, তাপ প্রভৃতি হরণ করেছিলেন, যিনি কলিযুগে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মেলিত পূর্ণ রূপ ধারণ করেছিলেন, বিশ্বের কোটি কোটি যুগের তপস্যার ফলস্বরূপ সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম ॥ ১-২

তুমিই স্বয়ং অবতীর্ণ পরমেশ্বর; তোমাকেই যতীন্দ্রের প্রণাম। যুগে যুগে সকল অবতারের সমষ্টিস্বরূপ তোমাকেই প্রণাম ॥ শ্রীরাম দুর্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, শ্রীকৃষ্ণও কৃষ্ণবর্ণ। তোমার মাতা শ্রীকালিকাও ঘোরকৃষ্ণবর্ণা; কিন্তু শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের যুগ্মরূপ এবং শ্রীকালিকার পুত্র হয়েও, তুমি পিতা শিবেরই ন্যায় গৌরবর্ণ ॥ সমগ্র জগৎকে কলঙ্কহীন, পাপহীন, চিরশুভ্র, চিরজ্যোতির্ময় এবং ব্রহ্মলোকের মূর্ত প্রতিচ্ছবি করেছিলে তুমিই, এই উজ্জ্বলগৌররূপ ধারণ ক'রে ॥ যিনি বিশ্বের দীপ-স্বরূপ, যিনি ভক্তি ও মুক্তির প্রদাতা, যিনি শ্রীবিবেকানন্দের ধ্যানমূর্তি, সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম ॥ ৩-৬

সত্যযুগের অবতার শ্রীবামনের শাশ্বত জ্ঞান, ত্রেতাযুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, দ্বাপরযুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য-বীর্য এবং ধর্মনীতি—একমাত্র তোমাতেই পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে ॥ একই সঙ্গে, কলিযুগের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রীতি ও ভক্তি—জ্ঞান ও কর্মের সঙ্গে সমন্বিত হ'য়ে, তোমাতেই শ্রেষ্ঠ রূপ ধারণ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ! তোমাকেই প্রণাম ॥ যিনি সর্ব ধর্ম স্বয়ং পালন করেছিলেন, যিনি এইভাবে সর্ব ধর্মের সমন্বয় সাধন করেছিলেন, যিনি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মরূপী, সেই শ্রীরামকৃষ্ণকেই প্রণাম ॥ ৭-৯

"যত মত, তত পথ" এই মহামতবাদ যিনি প্রচার করেছিলেন, স্বয়ং পরম শিব-স্বরূপ হয়েও "জীবই শিব" এই মহাবাণী যিনি ঘোষণা করেছিলেন, মহাদেবী জননী সারদামণির মাধ্যমে, নারীশক্তির পূর্ণ জাগরণের নিমিত্ত যিনি সংসার-অরণ্যেই বাস করেছিলেন, "ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়"—এই মহাসত্য যিনি নিঃসংশয়ে প্রকাশ করেছিলেন,* এবং যাঁকে প্রত্যক্ষ ক'রেই আমরা তাঁর সাক্ষাৎ প্রমাণ পাই; ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, সৌভাগ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যরূপ এই ষড়ৈশ্বর্য যিনি পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন, সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকেই প্রণাম ॥ ১০-১২

যিনি অধম পুত্র যতীন্দ্রকে পাদরজঃ প্রদান করেছেন, যিনি জননী সারদামণির সাররূপ, সেই শ্রীরামকৃষ্ণকেই প্রণাম ॥

* শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে এই কথা বলেছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে

অবতার-উপাসনা

পশু বা পশুপ্রকৃতি মানব উপাসনা করে না, কারণ উপাসনা করিবার মতো মন বা বুদ্ধি তাহার এখনও বিকশিত হয় নাই; আর পরমহংসেরা উপাসনা করেন না—কারণ তাঁহাদের মনে উপাস্য-উপাসকের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে। এই দুই মেরুপ্রান্তের মধ্যবর্তী নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলেই সাধারণ মানুষের বসবাস। তাহাদের মন বুঝিয়াছে এই জগদ্ব্যাপারের পিছনে এক মহাশক্তি আছেন—যিনি এই জীব জগৎ চালাইতেছেন। সূর্য চন্দ্র নিয়মিত উঠিতেছে—শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নিয়মিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে—যথাসময়ে ফুল ফুটিতেছে, ফল ফলিতেছে, শস্য পাকিতেছে! তারপর জন্ম জীবন ও মৃত্যুর রহস্য বিরাট প্রশ্নের মতো তাহাদের সম্মুখে প্রতিদিন বিস্ময়ের সঞ্চার করিতেছে! মানুষ কোথা হইতে জন্মায়—মরিয়া কোথায় যায়? এ প্রশ্নও চিরন্তন। উন্নত মানব-মনের প্রশ্ন—মানুষ কেন জন্মায়!

শেষ প্রশ্নটি বাদ দিলে—অন্যগুলির সমাধানের জন্য আদিম মানুষই ভয়ে বিস্ময়ে প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে দেবতার কল্পনা করিয়াছিল—পরিশেষে 'এক সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর' তাহার প্রায় সকল প্রশ্নেরই সমাধান করিয়াছিলেন। একজন সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আছেন—তিনি সব করিতে পারেন এবং করিতেছেন—এই ভাবনায় আসিয়া মানব-মন একটা স্থিতিলাভ করে। স্বর্গে বা আকাশে অদৃশ্য ঈশ্বর আছেন—তাঁহার হাতে বজ্র, চক্ষে ভ্রূকুটি; তিনি রুষ্ট হইলে ঝড় বন্যা অগ্নি ভূমিকম্প প্রভৃতি দ্বারা মানুষকে ধ্বংস করেন, তিনি তুষ্ট হইলে সুবৃষ্টি দিয়া, শস্য ও গোধন বর্ধিত করিয়া, ফুলে ফলে বৃক্ষলতা সুসজ্জিত করিয়া মানুষকে পালন করেন। অতএব মানুষের কর্তব্য—তাঁহাকে সর্বদা তুষ্ট রাখা, তাই উপাসনা; তিনি রুষ্ট হন—এমন কাজ না করা, এবং তিনি সর্বদা তুষ্ট থাকেন—সকলে মিলিয়া এমন কাজ করা, এই ভাব হইতেই বিধি-নিষেধের ধর্মের উদ্ভব। তাহার মর্মকথা—'এইরূপ কর, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন, তুমি ইহপরলোকে সুখী হইবে; এইরূপ করিও না, ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হইবেন, তুমি ইহপরলোকে দুঃখ পাইবে। এই ঈশ্বরের আমরা দেখা পাই—বৈদিক ইন্দ্রে, গ্রীক জুপিটারে, ইহুদীর জিহোবায়।

ধীরে ধীরে যখন পিতার তত্ত্বাবধানে মানবগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল—তখন স্বভাবতই প্রত্যক্ষ পিতার পালনশক্তি অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া 'ঈশ্বর আমাদের পিতা' এই ভাবসম্বন্ধ স্থাপিত হইল, এবং মানব-মনের স্বভাবজ পিতৃভক্তির—বিশেষতঃ অদৃশ্য মৃত পিতার প্রতি পুত্রের ভক্তির অনেকখানি অদৃশ্য পিতা ঈশ্বরও অধিকার করিতে লাগিলেন! পরলোক পিতৃলোক স্বর্গলোক দেবলোক প্রভৃতির প্রয়োজন হইল—কারণ অনবরত যে মানুষ মরিতেছে তাহারা কোথায় যায়? সেখানে কি খায়? এ প্রশ্ন তো স্বাভাবিক। তাই পিতৃপুরুষের উপাসনা পিণ্ডাদি-দান আস্তিক্যবুদ্ধির তথা গোষ্ঠী-স্থাপনের এবং সমাজসংগঠনের একান্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানরূপে স্বীকৃত হইল।

মানুষের মন কিন্তু থামিয়া নাই, সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া চলিয়াছে। পিতৃ-উৎসর্গীকৃত, সত্যের জন্য সর্বত্যাগী, অতীব সাহসী নচিকেতা প্রশ্ন করিয়াছে—'বল যম, মৃত্যুর পরে কি?' শ্বেতকেতু ঋষি পিতাকে বলিতেছে—'বলুন পিতা, বলুন আমাকে—কি এমন জিনিস আছে, যাহা জানিলে সব জানা যায়?' মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করিতেছেন প্রব্রজ্যাগ্রহণেচ্ছু জ্ঞানী স্বামীকে—'যাহা দ্বারা আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে না—সেই সংসার লইয়া আমি

কি করিব?' সব শেষে আসিল প্রশ্নোপনিষদের ঋষির প্রশ্ন—'কাহসৌ পুরুষঃ?'

এক মন হইতে অন্য মনে প্রশ্ন সঞ্চারিত হইয়া চলিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত হইয়াছে এক দিব্য অভাববোধ! কে সেই পুরুষ? কোথায় সে?—যে সকলের অন্তরালে থাকিয়া সকলের অন্তর্যামী-রূপে এই জীবনের খেলা খেলিতেছে? উদ্যতবজ্র ঈশ্বরের প্রতি ভয় চলিয়া গিয়াছে, ভালবাসা আসিয়াছে, ধ্বনিত হইতেছে—'আত্মা প্রিয় ইত্যেব উপাসীত!' আত্মাকে প্রিয় জানিয়া উপাসনা কর।

পরমতত্ত্ব প্রথমে এক অখণ্ড সত্তারূপে ধ্যানমগ্ন মনের গোচর হইল; গভীরতর সাধনায় তিনি অন্তর্যামী চেতনারূপে অনুভূত হইলেন; সৎ-চিৎ-এর সাধনায় যেন কিসের অভাব ছিল। আবার সন্ধান চলিল, কি সেই বস্তু—যাহা হইতে সব কিছুর জন্ম—যাহাতে সব কিছু বিলীন হইতেছে? গভীরতম সাধনায় শেষের সন্ধান মিলিল—'আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।'—আনন্দ হইতেই সকলের জন্ম, আনন্দেই সকলে জীবিত, আনন্দেই সকলে বিলীন হয়। এই আনন্দতত্ত্বই মানব-মনকে প্রিয় হইতে প্রিয়তরের, প্রিয়তর হইতে প্রিয়তমের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছে। কোথায় সেই প্রিয়—সেই প্রিয়তর, প্রিয়তম আত্মা? দেহ মনের জালে জঞ্জালে কোথায় সে হারাইয়া গিয়াছে? সে আছে অতি কাছে, তবু অতিদূরে—'তদ্ দূরে তদ্বন্তিকে'! কখন পিতারূপে, কখন পতিরূপে কখন গুরু বা আচার্যরূপে যিনি মানুষকে পালন করিয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন—তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন, তাহার ভক্তি ভালবাসা শ্রদ্ধা আস্বাদন করিয়াছেন; তিনিও মানুষের মনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজ মুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া যেন ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে মানুষ হইয়া ধরা দিতে চাহিতেছেন। ঈশ্বর যেন ক্রমশঃ নিজেকে মানবীয় ভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য—ঈশ্বরের এই মানুষী লীলা!

জ্ঞানী সাধকগণ বলিয়াছেন, বেদান্তের আত্ম-তত্ত্ব—ব্রহ্মতত্ত্ব যদি বা বিচার-বুদ্ধি-সহায়ে কথঞ্চিৎ ধারণা হয়, অবতারতত্ত্ব বুদ্ধির অগম্য। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর কি করিয়া সসীম সার্ধত্রিহস্ত-পরিমিত শরীরে অবস্থান করেন? ইহা অসম্ভব, ইহা অবিশ্বাস্য! কিন্তু,—একটি 'কিন্তু'ই মনে হয় যেন সকল প্রশ্নের সমাধান, 'কিন্তু ঈশ্বর যে সর্ব-শক্তিমান্, তিনি যদি সব পারেন—পারেন না কি তিনি তাঁর সারটুকু লইয়া মানুষরূপে অবতীর্ণ হইতে?' জ্ঞানী যাহাই বিচার করুক, ভক্ত বিশ্বাস করে—তিনি শুধু যে পারেন তা নয়, সত্যই তিনি অবতীর্ণ হন! তাই তো দেখা যায়—বেদ-বিভাজক, বেদান্ত সূত্রগ্রথয়িতা, মহাভারতের লেখক দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের শেষ ও শ্রেষ্ঠ রচনা শ্রীভগবানের অবতার-লীলাবলী! শ্রীমদ্ভাগবতের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তিনি দেখিলেন—'বেদান্ত-সিদ্ধান্তো নৃত্যতি'।

ভারতের ইতিহাসে অবতারের পর অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতের বাহিরেও ঈশদূত, ঈশ্বরপুত্র বা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের আগমন লক্ষ্য করিয়া স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে অবতার-উপাসনাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম কিনা? বিচারপ্রবণ মনে অবশ্যই সন্দেহ উত্থিত হয়: মানুষমূর্তিতে ঈশ্বর-ভাবনা উচিত না অনুচিত? ঊনবিংশ শতাব্দীর মানব-মনের এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করিয়া ঈশদূত যীশু খৃষ্টের জীবন ও বাণী ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কী অপূর্ব ভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্ত করিয়াছেন অবতার-উপাসনার নিগূঢ় রহস্য:

"আমরা সকলেই জানি ঈশ্বর আছেন, অথচ কেহই তাঁহাকে দেখি নাই; কেহই তাঁহাকে বুঝি না। এই সব আলোকের দূতগণের একটিকে গ্রহণ কর। ঈশ্বর-সম্বন্ধে তোমার কল্পিত শ্রেষ্ঠ

ভাবাদর্শের সহিত তাঁহার তুলনা কর, দেখিবে তোমার 'ঈশ্বর' কত ছোট ; এবং এই অবতার পুরুষের চরিত্র তোমার ধারণাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই শরীরধারী ঈশ্বর—যে ভাব স্বীয় জীবনে অনুভব করিয়া যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন, তুমি তাহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ চিন্তাই করিতে পার না। তবে এই সকল দেবমানবের পদতলে পতিত হওয়া, ধরাতলবাসী দেবতাজ্ঞানে তাঁহাদের উপাসনা করা কি পাপ? যদি সত্যই তাঁহারা আমাদের ঈশ্বর-ধারণা হইতে অনেক বড় হন—তবে তাঁহাদের পূজা করায় ক্ষতি কি? ক্ষতি তো নাই-ই, বরং ইহাই একমাত্র সম্ভব ও সার্থক পূজার পদ্ধতি।

"সাধনা দ্বারা, ভাবমাত্র আশ্রয়ে অথবা তোমার খুশিমত যে কোন উপায়ে, যতই চেষ্টা কর না কেন—যতক্ষণ তুমি মানুষের পৃথিবীতে মানুষ, তোমার এই পৃথিবী মানবভাবে পূর্ণ, তোমার ধর্ম মানবধর্ম, তোমার ঈশ্বরও মানবরূপী! এবং তাহা হইতেই হইবে! তাই সকল ঈশ্বরাবতারই সকল যুগে সকল দেশে পূজিত হইয়াছেন।"

ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ

উপনিষদের আত্মতত্ত্বই যেন সচ্চিদানন্দঘন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সন্দিগ্ধ মানবকে শুনাইয়া ঘোষণা করিল:

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

আমি জন্মহীন অব্যয় আত্মা, তবু আমি জন্মগ্রহণ করি—আত্মমায়ায়; আমি নিখিল ভুবনের নিয়ন্তা ঈশ্বর—তবু আমি জীবদেহ স্বীকার করি নিজেরই মায়ায়—স্বীয় প্রকৃতিকে সহায় করিয়া!

তিনি জানেন—মানুষ তাঁহাকে বুঝে না, চিনিতে পারে না; কথনও বা অবজ্ঞা করিয়া অবহেলা করে, তাই করুণাঘন গুরুমূর্তি শ্রীভগবান্ বলিতেছেন:

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

তাঁহার অতুলনীয় মায়াতীত অব্যয় ভাব না জানিয়া, বুঝিতে না পারিয়া মানুষ তাঁহাকে মায়াধীন মানুষই মনে করে! কিন্তু শ্রীভগবানের প্রতিশ্রুতি:

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥

বারংবার জন্মমৃত্যুর পুনরাবর্তনে ক্লান্ত মানবের মুক্তিপথ নির্দেশ করিয়া নররূপী নারায়ণ বলিতেছেন হে অর্জুন, আমি নরলীলা করি, আমার সেই দিব্য জন্ম ও কর্ম যাহারা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে—তাহারাই জন্মমৃত্যুর বেদনাময় বন্ধন অতিক্রম করে, তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। কি উপায়ে?

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

জন্মমৃত্যুময় সংসারে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণস্বরূপ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী আমার দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া; দুস্তর এ পারাবার পার হইবার একটি উপায় আছে: যাহারা আমার প্রপন্ন হয় তাহারাই এই মায়া অতিক্রম করিতে পারে!

নিরাশার অন্ধকারে শ্রীভগবানের বাণীই আশার আলো!—পথের সন্ধান দেয়—পথ চলিবার শক্তি দেয়! ভগবদ্‌বাক্যই ভগবৎ-কথা আলোচনার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। গঙ্গাজলই যেমন গঙ্গাপূজার শ্রেষ্ঠ উপচার।

উপনিষদ্রূপ গাভীকে 'গোপালনন্দন' শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দোহন করিয়া যে উপাদেয় অমৃত রাখিয়া গিয়াছেন—মানুষ যুগযুগান্ত তাহা পান করিয়া জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার—অমৃতত্ব লাভ করিবার শক্তি পাইতেছে।

গীতা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়—আবার শ্রীকৃষ্ণ গীতার প্রতিমূর্তি, গীতায় যে শিক্ষা তিনি দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। তাহা বুঝিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য

জন্ম কর্ম বুঝিতে হইবে, কারণ গীতা শ্রীকৃষ্ণেরই জীবনদর্শন।

যজ্ঞ, উপাসনা, সাংখ্য ও যোগ প্রভৃতি প্রচলিত আপাত-বিরুদ্ধ ভাবসমূহের সমন্বয়ের প্রথম আচার্য শ্রীকৃষ্ণই বেদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। জ্ঞান, ভক্তি কর্ম ও যোগের কোনটিকেই তিনি ছোট বলেন নাই! পরিধিতে ভ্রাম্যমাণ বিন্দু ক্লান্ত হইয়া যদি স্থির কেন্দ্রে যাইতে চায় তবে তাহার অবলম্বনীয় যে কোন একটি ব্যাসার্ধ! ইহাই যোগরহস্য! ইহাই কর্মের কৌশল! যদি শান্তি চাও, শেষ চাও, তবে আর ঘুরিওনা—কেন্দ্রে চলো, যেখানে সকল কিছুর উৎস—সেইখানেই সব কিছুর শেষ!

শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের শ্রেষ্ঠ প্রচারক,—তিনি যাহা প্রচার করিয়াছেন আজন্ম তিনি তাহা আচরণ করিয়াছেন, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া জীবনের প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অবিরত কর্ম করিয়াছেন! তাঁহার শিক্ষা: কর্মের জন্য কর্ম কর, অনাসক্তভাবে কর্ম কর, আমার খেলার সাথী হইয়া কাজ কর, তবেই কর্ম বন্ধনের বা দুঃখের কারণ না হইয়া হইবে মুক্তির কারণ—আনন্দের কারণ!

শুধু অনাসক্ত কর্মেরই নয়, অনাসক্ত ভালবাসারও আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ! ভালবাসার জন্যই ভালবাসো—কোন কিছুর আশায় নয়, প্রতিদানের জন্য নয়।

অনাসক্তিতে আশা নাই, তাই নিরাশা নাই। অনাসক্তিতে বন্ধন নাই, অতএব বন্ধন হইতে মুক্তির প্রসঙ্গও নাই। অনাসক্তিতেই জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটিত! শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে এই বাণীই মূর্ত, মুখরিত।

বৃন্দাবনের লীলাবিতানে সে কি প্রেমের পরিবেশ। স্নেহপ্রেমপ্রীতিময় বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিতে পারে নাই! যখন মথুরা হইতে কর্তব্যের আহ্বান আসিল তখনই—মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তিনি চলিলেন অক্রূরের রথে, পিছনের দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইলেন না; দেখিলেন না নন্দ-যশোদার দলিত মথিত হৃদয়, শুনিলেন না শ্রীদাম-সুদামের আকুল আহ্বান, দেখিয়াও দেখিলেন না রথচক্রে লগ্ন ব্রজগোপীগণের দেহলতা!

মথুরায় রাজা কংসকে নিধন করিয়া বীর বালক নিজে না বসিয়া সিংহাসনে বসাইলেন যথার্থ অধিকারীকে, শৃঙ্খলিত মাতাপিতাকে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের বঞ্চিত হৃদয় বাৎসল্যরসে সিক্ত করিলেন।

দ্বারকায় রুক্মিণী-সত্যভামা-সমলংকৃত শ্রীকৃষ্ণ নির্লিপ্ত কর্মযোগী গৃহস্থের আদর্শরূপে বিরাজমান! বিদ্যায় বুদ্ধিতে রূপে গুণে তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ কি নিরভিমান! সকলের আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত!

মহাভারতের ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কী ঐ মহিমময় রূপ! রথী মহারথী পরিচালিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যেখানে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য উন্মুখ—মরণের সেই মহোৎসবে উভয় সৈন্যের মধ্যভাগে অর্জুনের কপিধ্বজরথে শান্ত দৃষ্টিতে সাক্ষীর মত তিনি সব দেখিতেছেন—ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান; বলিতেছেন ওঠ হে অর্জুন, ক্লৈব্য পরিহার কর—মরণের মহোৎসবে যোগ দাও, 'অবারিত স্বর্গদ্বার সম্মুখে তোমার! অন্যথায় অপযশে ভরিবে ভুবন।' কী পৌরুষব্যঞ্জক উদ্দীপনা!

রণক্ষেত্রের সেই অশান্ত পরিবেশে শান্তস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ হইয়া অর্জুনকে দিলেন আত্মজ্ঞানের উপদেশ, অনাসক্ত কর্মের প্রেরণা, সর্বশেষে উদ্‌ঘাটিত করিলেন জীবনের পরম রহস্য—শরণাগতি, সখা সুহৃদ্ প্রিয়তম শিষ্য অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত গীতার মর্মবাণী:

'সকল প্রকার বিধিনিষেধের ধর্ম, কাম্য কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে রক্ষা করিব, শোক করিও না!' বিষাদগ্রস্ত অর্জুন উঠিলেন এবং নিমিত্তমাত্র হইয়া গুরুরূপী সখা ও সারথির নির্দেশে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলেন, যশস্বী হইলেন। শ্রীভগবানও

ধর্মস্থাপন-রূপ লীলা সমাপ্ত করিয়া স্বরূপে বিলীন হইলেন।

ইহাই সেই জন্মহীনের জীবনাদর্শ—যাহা ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রতিফলিত ; ইহাই সেই পুণ্যশ্লোকের জয়গাথা—যাহা ভারতের ঘরে ঘরে পথে প্রান্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। কবির কাব্য, শিল্পীর শিল্প, ভক্তের সাধনা—সবার কেন্দ্র 'কৃষ্ণ'! এই কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া জননী দেবকীর মতো ভারত-জননীও অনুভব করিয়াছেন সেই সুখ 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'। তাই তো ভারত অতি দুঃখের রাত্রিতেও বিচলিত না হইয়া কারাগারে শৃঙ্খলিতা দেবকীর মতোই মন প্রাণ দিয়া যুগে যুগে তাঁহার কোলে কৃষ্ণের আবির্ভাব কামনা করিয়াছেন, ভগবানও যুগে যুগে তাঁহার হৃদয় আলোকিত করিতে আসিয়াছেন।

আসন্ন জন্মাষ্টমীর শুভবাসরে আমরা স্মরণ করি—সেই ধর্মস্বরূপ ধর্মসম্ভব ধর্মস্থাপক শ্রীকৃষ্ণকে, প্রণাম করি 'মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসং।'

পঞ্চশীল

'পঞ্চশীল'র কথাটি শোনে নাই—এমন লোক আজকাল আর নাই বলিলেই হয় ; সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা ও রেডিওর মাধ্যমে কথাটি ঘরে ঘরে পঁহুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসাধারণ ইহার যথার্থ ভাবসংগ্রহ করিতে পারিতেছে কিনা সন্দেহ, কারণ পঞ্চশীলের আধুনিক প্রচারকগণও ইহার সঠিক অর্থ সম্বন্ধে অবহিত বলিয়া মনে হয় না। নিত্যই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বক্তাদের উচ্চারণ-তারতম্যে এবং সংবাদপত্রে মুদ্রিত বানানের বৈচিত্র্যে। ইংরেজী পত্রিকার 'Pancha Sheela,' 'Pancha Sila' 'Punch Sil' বাঙলায় রূপান্তরিত হইয়া যখন 'পঞ্চশীলা', পঞ্চশিলা' বা পঞ্চশিল' আকারে দেখা দেয়—তখন সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে—বক্তা ও শ্রোতাদের, তথা লেখক ও পাঠকদের, কথাটির অর্থবোধ হইতেছে কিনা!

তা ছাড়া এই নাম-সাম্যের জন্য অনেকেরই ধারণা এই রাজনীতিক পঞ্চশীল বুঝিবা বৌদ্ধ ধর্মেরই পঞ্চশীল। দুইটির মধ্যে অবশ্য অহিংসার সূত্রে শান্তির একটি সাধারণ ভিত্তিস্থাপনের চেষ্টা রহিয়াছে, কিন্তু দুইটি 'পঞ্চশীল' সম্পূর্ণ পৃথক স্তরের।

বুদ্ধ-প্রচারিত 'পঞ্চশীল' আধ্যাত্মিক জীবনের মূল নীতি ; ইহা নূতন কিছু নয়। পুরাতন নিয়মের বাইবেলে মুশা-প্রবর্তিত আদেশ-দশক (Ten Commandments of the Old Testament)-এর ভাব ও ভাষা একই প্রকার। প্রাচীনকালে সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে সমাজকে সংগঠিত করিবার জন্য সর্বত্রই এই জাতীয় বিধি-নিষেধাত্মক নীতির প্রবর্তন দেখা যায়। এই সম্পর্কে মনু-নির্দিষ্ট ধর্মের দশ-লক্ষণও তুলনীয় :

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥

ধৈর্য, ক্ষমা, বহিরিন্দ্রিয় দমন, অচৌর্য, পবিত্রতা, অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্রার্থ বুঝিবার সদ্বুদ্ধি, অধ্যাত্ম বিদ্যা, যথার্থ ভাষণ, অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের লক্ষণ!

আর্যজাতি-নিষেবিত সদাচারগুলিই তথাগত বুদ্ধ আর্য-অনার্য-অধ্যুষিত ভারতভূমিতে ছড়াইয়া দেন। 'পঞ্চশীল' কথার অর্থও 'পাঁচটি সদাচার'—যেগুলি পালন করিলে কি ব্যষ্টি কি সমষ্টি—সকলেরই কল্যাণ হইবে।

বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ—এই ত্রিরত্নের শরণ বা ত্রিশরণ-মন্ত্র গ্রহণের পর শান্তিকামী মানব শীলপালন ও আদর্শ জীবন যাপনের প্রথম সোপান স্বরূপ পঞ্চশীল গ্রহণ করিবার সময় বলিত : (১) জীবহিংসা (২) চৌর্যবৃত্তি (৩) ব্যভিচার (৪) মিথ্যাভাষণ ও (৫) সুরাপান হইতে বিরত থাকিব। ব্যক্তিগত জীবনে এই নীতিগুলি আচরিত হইলে সমাজ-

জীবনেও যে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রেও একই ভাব: 'অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।' ২।৩০ চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনার প্রথম সোপান 'যম'—সেখানেও পঞ্চশীলেরই প্রয়োগ, শুধু পঞ্চম শীলটির পরিবর্তে 'অপরিগ্রহ' নীতি প্রযুক্ত।

সাধারণভাবে পঞ্চশীলের কথা বলিলেও শ্রীবুদ্ধ দশবিধ অশুভ পরিহারের উপদেশও দিয়াছেন। দেহের ত্রিবিধ অশুভ: হত্যা, চৌর্য, ব্যভিচার; জিহ্বার চতুর্বিধ অশুভ: মিথ্যাভাষণ, পরনিন্দা, শপথগ্রহণ, জল্পনা: মনের ত্রিবিধ অশুভ: লোভ, দ্বেষ ও ভ্রান্তি। এইগুলি পরিহার করিয়াই মানুষ পশুর স্তর হইতে মানুষের স্তরে উন্নীত হয়। সুস্থ ও নীরোগ জীবন ধারণের জন্য যেমন পরিষ্কার জল, বিশুদ্ধ বায়ু একান্ত প্রয়োজন; স্থায়ী সমাজ-গঠনের জন্য ঐ সুনীতিগুলিও একান্ত প্রয়োজন।

বুদ্ধের এবং তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিভিন্ন ধর্মের এই প্রকার বিধি-নিষেধের শিক্ষা ও উপদেশের বিষয় আলোচনা করিয়া, সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, মানুষ চিরদিন সর্বত্র ব্যক্তিগত জাতিগত সমাজগত জীবনে কতকগুলি মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, সমাধানের চেষ্টাও সর্বত্র প্রায় একই ধারায় চলিয়াছে; কি মনুর শিক্ষা, কি মুশার আদেশ, কি বুদ্ধের উপদেশ—সবগুলির মধ্যে একটি সাধারণ নীতি রহিয়াছে, তাঁহারা সর্বত্র মানবকে উন্নত করিতে চাহিয়াছেন।

তথাপি লক্ষণীয়—ঐ শিক্ষা ও উপদেশগুলির মধ্যে নিষেধের উপর এত জোর যে মনে হয়—ঐ সকল বহুল-আচরিত অন্যায় কাজগুলি সংযত করিবার জন্যই যেন লোকগুরুগণ বারংবার বলিয়াছেন 'এরূপ করিও না, ওরূপ করিও না!' যদি বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় তো নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে—এই সকল শিক্ষার অধিকাংশেরই প্রয়োজনীয়তা এখনও দূরীভূত হয় নাই; ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন অপেক্ষা ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসনের ক্ষমতা অধিক, ইহাও প্রত্যক্ষ সত্য।

ব্যক্তিজীবন শান্ত সংযত হইলে সমাজ সুনিয়ন্ত্রিত হইবে, সমাজ সুষ্ঠু পথে চলিলে জাতীয় জীবনে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অতঃপর দেখা দেয়—বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক সমস্যা। এখন আর কোন একটি জাতি ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক প্রাচীরের মধ্যে বাস করিতে পারে না; প্রাকৃতিক দিক দিয়া অবারিত সমুদ্রের পর অবাধ আকাশ দেশের সীমারেখা প্রায় বিলুপ্ত করিয়াছে, মানসিক দিক দিয়াও—উৎপন্নদ্রব্যের মতো ভাবরাশি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে।

চার বৎসর পূর্বে বাংডুং সম্মেলনে প্রধানতঃ ভারত ও চীনের উদ্যোগে বিশ্বশান্তির মহান উদ্দেশ্য লইয়া পঞ্চশীলের রাজনীতিক সংস্করণ প্রচারিত হয়; তাহার মর্মার্থ: (১) প্রত্যেকের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার, (২) অনাক্রমণ, (৩) একে অন্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, (৪) সমানাধিকার ও পারস্পরিক সম্মান, (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। শান্তির এই প্রযত্ন খুবই মহৎ এবং সময়োপযোগী, এবং এই প্রস্তাবও সাহসিকতা ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক; কিন্তু স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে—কতদিনে ইহা বিশ্বসংস্থায় স্বীকৃতি লাভ করিয়া কার্যকরী হইবে? প্রতিবৎসর ইহার প্রভাবে শান্তির পরিধি বর্ধিত হউক, ইহা সকলেরই আকাঙ্ক্ষা!

পরিশেষে বক্তব্য—উপরি-উক্ত রাজনীতিক পঞ্চনীতি বুদ্ধের পঞ্চশীলের প্রত্যেকটি হইতে এত পৃথক যে উহাদের 'পঞ্চশীল' নাম সাধারণের নিকট বিভ্রান্তিজনক! উভয়ে সমস্তরের নয়, উভয়ের উদ্দেশ্যও এক নয়। সমাজে—ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ 'পঞ্চশীল' বা 'টেন কম্যাণ্ডমেণ্ট্‌স্‌' প্রভৃতি প্রাথমিক নীতি-ধর্ম আচরণ করিয়া ত্যাগ তপস্যা সহায়ে স্বার্থকেন্দ্রিক ভোগপরায়ণ পশুজীবন অতিক্রম করিয়া যথার্থ 'মানব-ধর্ম' পালন করুক; তবেই সম্ভব হইবে 'বিশ্বজনীন নৈতিক উজ্জীবন'—যাহার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইতে পারে 'আন্তর্জাতিক অহিংসা-নীতি'। সমষ্টিশান্তির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ব্যষ্টি মানুষের মানসিক উন্নয়ন!

জন্মাষ্টমী-রাতে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অতীত দিনের স্মৃতি-সুরভিত ভরা ভাদরের রাতে,
তব জনমের ইতিহাস মোরে করেছে নিদ্রাহারা।
কংসকারার কাহিনী-জড়িত বর্ষা-মুখর ধারা
আমার মনের বন্দীশালায় মিশেছে কি তব সাথে ?
তোমারে ধেয়ানে ধরেছি দেবতা ! দুঃসহ বেদনায়
যন্ত্রযুগের কংস-নিধনে মানুষ তোমারে চায়।

মেঘে মেঘে ছুটে চলেছে বিজলী আকাশেতে গরজন,
আশা-হত প্রাণে ক্রন্দনধ্বনি স্রোতে ও বাতাসে ভাসে—
সারা নিখিলের জনারণ্যেতে তরু কিশলয় ত্রাসে
অসহায় হ'য়ে ডাকিছে তোমারে : মন যে গো উন্মন।
কোন্ গোকুলের গোপ-গৃহমাঝে রহিবে গোপনে প্রভু,
হৃদি-যমুনায় উর্মি ভীষণ,—পার হ'তে হবে তবু।

ওই গগনের নীল বাতায়নে মায়া-গুণ্ঠন ল'যে,
কে যেন চকিতে দাঁড়ায়ে সহসা নভোরেণু মেখে মেখে,
পৃথিবীর পানে ক্ষণিকের তরে দৃষ্টি-পলক রেখে—
লুকালো নীরবে ! অশ্রু তাহার সংসারে যায় ব'যে।
তুষারের বুকে অলকানন্দা নেমেছে কি অনুরাগে ?
দৈব দ্যুতির পরশ পেয়ে কি জীবনের আলো জাগে ?

ধ্যানের অতীত অরূপ আধার,—আধেয় বিরাট জানি,
তারি মাঝে তব সীমার মাঝারে নব নব লীলা চলে ;
ভুলায়ে রেখেছ জীবেরে নিয়ত কত না খেলার ছলে,
প্রকৃতির সাথে প্রণয় তোমার রচিছে বিশ্ববাণী,
বেদের বার্তা শুনাতে আবার—এ কি রূপে দিলে দেখা !
তোমার লীলার ইতিহাস কেন গগনের গায়ে লেখা ?

করে ধরি কবে চক্র আবার স্বরূপ দেখাবে নব,
দানব দলিতে পাঞ্চজন্য বাজাবে মাভৈঃ রবে !
অমৃতবার্তা শুনায়ে প্রেমের স্বর্গ রচিবে ভবে,
তুমি জেগে ওঠ,—প্রাণ-শিশু সাথে খেলা ছেড়ে দাও তব।
ধর্মবিহীন যুক্তিবাদের কণ্টক-পথ ধরি
কালের রাখাল দিন-ধেনু ল'য়ে চলে বেদনারে বরি।

কত পূতনার অত্যাচারেতে জর্জ্জর হ'ল ধরা,
কত শিশুপাল বকাসুর সনে ধ্বংসে কংস নাচে।
নিখিল ভুবনে হিংসা-দিগ্ধ আণব অস্ত্র সাজে!
মনের বনেতে হে পরম শিশু! শোভে কিগো খেলা করা ?
তোমার দিব্য শংখের রবে জাগাও জগত-জনে
জীবন-যুদ্ধে টেনে লও সবে—এ যুগের প্রয়োজনে।

অধিকারি-ভেদে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা

৺বিহারীলাল সরকার

[অপ্রকাশিত রচনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'গ্রন্থ নয় গ্রন্থি।' যাঁহারা গ্রন্থ হিসাবে শাস্ত্র পড়েন, তাঁহাদের নিকট শাস্ত্র হয় 'গাঁট' বা বন্ধন। শাস্ত্রপাঠের উদ্দেশ্য কতকগুলি কথা শিক্ষা করা নহে। শাস্ত্রপাঠের উদ্দেশ্য—জ্ঞান ও ভক্তিলাভ। যাঁহারা জ্ঞান ও ভক্তির জন্য শাস্ত্রপাঠ করেন, তাঁহাদেরই শাস্ত্রপাঠ সার্থক হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—কেবল শব্দব্রহ্মে যিনি অভিজ্ঞ, যিনি কেবল পাণ্ডিত্য অর্জনই করেন, সাধন দ্বারা শাস্ত্রার্থনিষ্ঠ হন না—অধ্যয়নের পারে যাইয়া পরব্রহ্ম ধ্যানাদি করেন না, তাঁহার শাস্ত্রপাঠ বন্ধ্যা গাভীর রক্ষকের শ্রমের ন্যায় বৃথা শ্রম মাত্র।

শাস্ত্রপাঠ দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরোক্ষ জ্ঞান হয় মাত্র। তারপর সেই প্রতিপাদ্য বিষয়কে অনুভব করিতে পারিলেই, অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেই শাস্ত্রপাঠের সফলতা হয়। শাস্ত্রপাঠের অন্তরায় কুতর্ক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'আম খেয়ে যাও, গাছে কত ডাল, কত পাতা, কত ফল আছে—শুনে কি হবে?' কিন্তু ইহাও স্বীকার্য, যুক্তির স্থান আছে—যুক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। মহাভারতে আছে: আপ্তবাক্য, সদাচার এবং যুক্তির সহিত যাহার ঐক্য আছে, তাহাই ধর্ম। যুক্তি অর্থে কুতর্ক নহে—শাস্ত্রপাঠের প্রধান সহায় অনুকূল যুক্তি। আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন, বিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা না করিয়া, শ্রুতি-অনুকূল যুক্তির আশ্রয় লইয়া শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। যুক্তি হইবে শ্রুতির সাহায্যকারী।

ভারতীয় আচার্যগণ শিষ্যের অধিকার বিবেচনা করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন শ্রীপার্থকে। 'নাত্যাসক্তা নাতিবিরক্তা' ব্রজগোপীদের ভক্তিশিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করেন। নির্বিণ্ণ উদ্ধবকে তিনি জ্ঞান-শিক্ষা দেন। শ্রীঅর্জুন বলিয়াছিলেন, 'ভৈক্ষ্য অবলম্বন করিব', কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তোমার কর্মে অধিকার—তুমি কর্ম কর'। আর মন্ত্রী উদ্ধবকে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, 'তুমি স্বজন-বন্ধুতে স্নেহ ত্যাগ করিয়া আমাতে সম্পূর্ণরূপে মন সমাধান করিয়া সমদ্রষ্টা হইয়া পৃথিবী পর্যটন কর।'

কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—নাম ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু শিক্ষা এক। শিক্ষার বিষয় সেই আত্মা। আত্মাকে উপলব্ধি করাই সকলের চরম উদ্দেশ্য। প্রেমের ভিতর দিয়া যাইলেও প্রাপ্য বস্তু সেই এক; আবার কর্মের মধ্য দিয়া যাইলেও, সেই একই লভ্য বস্তু আত্মা। হৃদয়ের ভালবাসা, মস্তিষ্কের বিচার-যুক্তি, কর্মপ্রচেষ্টা—তিনটি দ্বারাই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেই পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ভালবাসা প্রতিদান চাহে, কর্মী ফল চাহে, জ্ঞানের সাধক ব্রহ্মলোক বা মুক্তি চাহে। শ্রীভগবানের প্রতি প্রেম প্রতিদান চাহে না, নিষ্কাম কর্মী ফল চাহে না, জ্ঞানী কিছুরই অপেক্ষা করে না। ইহার কারণ এই যে, শ্রীভগবানের শিক্ষার মর্ম, 'সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—তিন গুণকেই অতিক্রম কর, গুণাতীত হও।' নির্গুণে প্রতিদান হয় না, নির্গুণে ফল অসম্ভব, নির্গুণে কেবল 'নিরপেক্ষ ভাব'। শ্রীকৃষ্ণের মতে মোক্ষের তিনটি উপায়—(১) ভক্তি (২) কর্ম (৩) জ্ঞান। বেদেও ব্রহ্ম, যজ্ঞ, এবং এই তিনটি 'যোগ' অর্থাৎ উপায় উল্লিখিত হইয়াছে। এই তিনটি উপায় ভিন্ন মোক্ষের অন্য উপায় নাই।

উপায় তিনটি বটে, কিন্তু স্বেচ্ছামত অবলম্বনীয় নহে; অবস্থানুযায়ী অবলম্বনীয়। সকাম ব্যক্তির পক্ষে কর্মযোগ। যিনি অত্যন্ত আসক্ত নহেন, অত্যন্ত বিরক্ত নহেন, তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ। আর যিনি অত্যন্ত বিরক্ত, তাঁহার পক্ষে জ্ঞানযোগ। শ্রীভগবান বলিয়াছেন: যাহারা দুঃখবুদ্ধিতে কর্মফলে বিরক্ত, সেই সব কর্মত্যাগীর পক্ষে জ্ঞানযোগ; আর যাহারা দুঃখবুদ্ধি-শূন্য এবং ফললাভে অবিরক্ত, তাহাদের পক্ষে কর্মযোগ; আবার ভাগ্য-বশতঃ যাহারা ভগবৎকথায় জাতশ্রদ্ধ কিন্তু বিষয়ে বিরক্ত নহে, কিংবা অত্যন্ত আসক্তও নহে, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ।

শ্রীভগবান সকাম কর্মীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন; ততদিন কর্ম করিবে, যতদিন না নির্বেদ উপস্থিত হয়, যতদিন না মৎ-কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা জন্মায়। 'বিরক্ত'জনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যখন যোগী কর্মেতে নির্বিণ্ণ এবং তৎফলে বিরক্ত হয়, তখন সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ধ্যানের অভ্যাস দ্বারা আত্মার ধারণা করিবে। ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'যাহারা মৎ-কথায় জাত-শ্রদ্ধ, সর্বকর্মে নির্বিণ্ণ কিন্তু কাম দুঃখাত্মক জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে অশক্ত, তাহারা ভক্তি অবলম্বন করিবে।' কামনা দুঃখের আকর বুঝিয়াও যাহারা ছাড়িতে পারিতেছে না, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ। বাসনায় অবিরক্ত জনসাধারণের পক্ষে কর্মযোগই প্রশস্ত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনেক শিষ্যের মধ্যে ঐ তিনটি যোগশিক্ষার মুখপাত্র-স্বরূপ তিনজনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়—শ্রীঅর্জুন, শ্রীরাধা এবং শ্রীউদ্ধব। বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীঅর্জুনের শিক্ষার স্থল কুরুক্ষেত্র; গোপিকাগ্রণী শ্রীরাধার শিক্ষাস্থল বৃন্দাবন; নিত্য অনুব্রত পার্ষদ শ্রীউদ্ধবের শিক্ষার স্থল দ্বারাবতী। প্রিয় সখা শ্রীঅর্জুনকে কর্মশিক্ষাই ভগবদ্গীতার বিষয়; ব্রজগোপীকে প্রেমশিক্ষাই শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের বিষয়; শ্রীউদ্ধবকে জ্ঞানশিক্ষাই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের বিষয়। কর্মী শ্রীঅর্জুনের নিকট তিনি ঐশ্বর্যময় ঈশ্বর; প্রেমপরায়ণা শ্রীরাধার চক্ষে

তিনি সৌন্দর্য-মাধুর্যময় ভগবান; জ্ঞানী শ্রীউদ্ধব বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিগুর্ণ পরমাত্মা।

ভগবান শ্রীবুদ্ধ, শ্রীযীশু, শ্রীশঙ্কর প্রমুখ পূজ্যপাদ ধর্মোপদেষ্টাগণের প্রকৃত মত হইতেছে, সন্ন্যাস ভিন্ন ঈশ্বরলাভের অন্য উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণই ভারতে একমাত্র ধর্মপ্রচারক, যিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে কর্মত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, ফলত্যাগ করিলেই হইল। কর্ম করিয়া ফল ত্যাগ করিতে পারিলে সংসারে থাকিয়াও উচ্চতম অবস্থা লাভ হইতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রচার করিয়াছেন, মানুষ ঈশ্বর-অর্চনা হিসাবে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, রাজকার্য, বাণিজ্য এবং পরিচর্যাদি করিয়াও সিদ্ধি-লাভ করিতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতে অধ্যাপক, রাজকর্মচারী, বণিক বা পরিচারক—কাহাকেও তাহার দৈনন্দিন কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে না; স্ব স্ব কর্ম করিয়াও তাহাদের ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেও গৃহে থাকিয়া গৃহীর মত সব কার্য করিতেন, যাহাতে লোকে কর্মত্যাগ না করে। জনসাধারণের জন্য কর্মই ধর্ম—ইহা শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বর উপাসনা করিতে তিনি নিষেধ করেন নাই। গীতাতে আছে, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে আছেন, সেই অন্তর্যামীকে আশ্রয় কর—শান্তি পাইবে। আচার্য শ্রীরামানুজ বলিয়াছেন, অর্চা অর্থাৎ প্রসিদ্ধ মন্দিরে যে সব বিগ্রহ আছেন, তাঁহাদের উপাসনা প্রথম করিতে হয়, তারপর বিভব অর্থাৎ রামাদি অবতারের উপাসনা; তাহাতে অধিকার হইলে সর্বশেষে অন্তর্যামীর উপাসনা। অতএব অন্তর্যামীর উপাসনা সকলের আয়ত্তাধীন নহে। নির্গুণ ব্রহ্ম-উপাসনা অতি কঠিন। ব্রহ্ম-উপাসনা দেহবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে দুষ্কর।

সাধনমার্গে দুইটি বস্তু অন্বেষণীয়, অবলম্বনীয়; এক 'আত্মা', অপরটি 'অবতার'। আত্মা বা অবতার মনঃকল্পিত নহে—অতি সত্যবস্তু। বিবেক বা বিচার দ্বারা আত্মার সন্ধান করিতে হয়, আর ভালবাসা দ্বারা অবতারের শ্রীপাদপদ্ম লাভ হয়। কর্ম দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইলে বিচার বা ভালবাসা প্রকাশ পায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমাকে যাহারা আশ্রয় করে, আমি তাহাদের সংসার হইতে উদ্ধার করি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'বাঁদর-ছানা আর বিড়াল-ছানা। বাঁদর-ছানা মাকে ধ'রে থাকে। বিড়াল-ছানা কেবল মিউ মিউ করে—তার মা মুখে ক'রে নিয়ে যেখানে রাখে সে সেখানে থাকে।' একটি স্বাবলম্বন, আর একটি নির্ভরতা। ব্রহ্ম-উপাসক নিজের পুরুষকারে ব্রহ্মলাভ করেন, এবং ভগবদুপাসককে শ্রীভগবান উদ্ধার করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'আমার উপাসককে আমি উদ্ধার করি। অত্যন্ত দুরাচারও যদি আমার ভজনা করে, সেও সাধু হইয়া যায়। আমার ভক্তের নাশ নাই। আমাকে পূজা কর, আমাকে পাইবে। আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।'

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছিলেন, 'উর্ধ্বরেতা অমল সন্ন্যাসীরা সাধনপ্রভাবে ব্রহ্মধামে যান, কিন্তু ধর্মপথে ভ্রমণ করিয়া ও তোমার চরিত বর্ণন দ্বারা আমরা দুস্তর সংসার-তমঃ উত্তীর্ণ হইব।' সার কথা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা কর, তাঁহাকে ভজনা কর, তাঁহাকে যজন কর, তাঁহাকে নমস্কার কর—নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণকে পাইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ভরসা দিয়াছেন, 'সর্ববিধ বাহ্য ধর্ম-কর্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব—কোন ভয় নাই।' শ্রীভগবানের এই অভয় বাণীর মূল্য স্বতন্ত্র!

শ্রীভগবানের চরিত-কথা ও তাঁহার বাণী—এই দুইটিই মহাতীর্থ। যে ইহাদের সেবা করিবে, সেই নিষ্পাপ হইবে—অমলাশয় হইবে—পবিত্র হইবে। পবিত্র হইলে আত্মতত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশিত হয়—অমল চক্ষুতে যেমন সবিতা আপনি প্রকাশিত হন।

শ্রীভগবানের কর্ম অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'আমি মানুষী তনু আশ্রয় করিয়াছি, সেইজন্য মূঢ়রা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া মানুষ ভাবে; তাহারা আমার ঈশ্বর-ভাব জানে না। অলৌকিক এবং পরের অনুগ্রহার্থ আমার জন্মকর্ম। ইহা যাহারা বুঝিতে পারে, তাহাদের দেহাভিমান চলিয়া যায এবং তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না।' শ্রীভগবানের বাণীর মহিমা অপার। তিনি ইহাও বলিযাছেন: আমার বাণী যে 'জপ' রূপে পাঠ করে, সে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকে প্রসন্ন করে। আমাব উপদেশ যে শ্রবণ করে, তাহার আমাতে পরাভক্তি হয়, সে আর কর্মে বদ্ধ হয় না।

শ্রীভগবানের চরিত-কথা এবং তাঁহাব বাণী বা উপদেশ ছাড়াও আর একটি বস্তু আছে—সেটি তাঁহার শ্রীমূর্তি। কুরুক্ষেত্রে নরলোক-বীরগণ সেই শ্রীমূর্তি দর্শন করিযা পরকালে পরমগতি লাভ করিযাছিল। বৃন্দাবনে সেই শ্রীমূর্তিতে ব্রজাঙ্গনাদেব নয়ন-সংলগ্ন হইলে তাহাদের সমাধি হইত। সেই ভাবমূর্তি তিনি রাখিযা গিযাছেন, সর্বনেত্রের প্রিয সেই তনু মঙ্গলময,—উপাসনাকালে সেই শ্রীমূর্তির সাক্ষাৎকার হয়।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রেব মতে, আনুমানিক ১৫১৯ খৃষ্টপূর্ব বৎসরে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবুদ্ধের এক হাজার বৎসব পূর্বে এবং শ্রীযীশুর দেড় হাজার বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধরিতে হইবে। মহাপ্রয়াণের সময তাঁহার বয়স ১২৫ বৎসর হইযাছিল। শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের ৩৬ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৪৩০ খৃষ্টপূর্ব বৎসরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। স্বতন্ত্র-তন্ত্রে আছে, 'ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে, রোহিণী নক্ষত্রে, বুধবারে, মধ্য-রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু—তিনি স্বয়ং ভগবান।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "জ্ঞান আর বিজ্ঞান। জ্ঞান মানে জানা—ঈশ্বরের বিষয় শোনা; জ্ঞানে ঈশ্বর আছেন, এই অস্তিমাত্র বোধ হয়। আর বিজ্ঞানে তাঁহার দর্শন হয়—তাঁহার সহিত আলাপ হয়। কাঠে অগ্নিতত্ত্ব আছে, ইহা শোনা এক, আর কাঠ জ্বেলে ভাত রেঁধে খাওয়া আর এক ব্যাপার।" যদি শ্রীকৃষ্ণের রূপ চিরকাল না থাকিত, তাহা হইলে বিজ্ঞান সম্ভব হইত না। শ্রীকৃষ্ণের রূপ আছে, সেইজন্য বিজ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, 'আমি ব্রহ্মের প্রতিমা—আমি ব্রহ্ম-জ্যোতিঃঘন—ব্রহ্মণোহস্য প্রতিষ্ঠাহম্।'

শ্রীকৃষ্ণ কল্পতরু। তাঁহাকে যে ভাবে ডাকা হয়, সেই ভাবে তিনি সাড়া দেন। তাঁহার আশ্রয়ে সাংসারিক দুঃখও নাশ হয়। শ্রীভগবান বলি-য়াছেন, 'আমার ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন করি।' শ্রীকৃষ্ণের আশ্রযে সাহস বাড়ে। আর একটি মহাগুণ—তাঁহার আশ্রয় লইলে অধঃপতন হয় না—'ন প্রচ্যবন্তি মার্গাৎ।' উপাসকের মনে বিশ্বাস থাকে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের পূজার জন্য কিছু সংগ্রহ করিতে হয না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'সামান্য পত্র পুষ্প ফল তোয ভক্তির সহিত অর্পিত হইলে আমি গ্রহণ করি। তাহাও যদি না সংগ্রহ হয়, তবে—যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু কর আমাকে অর্পণ কর, তাহা হইলেই আমার পূজা হইবে।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট জ্ঞান শিক্ষা পাইয়া শ্রীউদ্ধব পরিশেষে বলিয়াছিলেন, 'হে অরবিন্দলোচন! যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা তোমার পদাম্বুজ আশ্রয় করিয়া থাকেন; কারণ ঐ পদাম্বুজ আনন্দপরিপূরক পরমানন্দ।' দেবতারাও বলিয়াছেন, 'তোমার পাদপদ্ম অশুভ বিষয়-বাসনার দাহক।' শ্রীকৃষ্ণের চরণ পবিত্র, বিশ্বব্যাপী—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ অতিক্রম করিয়া বর্তমান; 'চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণম্'। শ্রীউদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'জ্ঞানের

ফল মোক্ষ, কৃষ্যাদির ফল অর্থ। যোগের ফল অণিমাদি সিদ্ধি, দণ্ডনীতির ফল ঐশ্বর্য, কর্মের ফল স্বর্গ, কিন্তু আমি তোমার চতুর্বর্গ-ফলদাতা।'

মহাজ্ঞানী শ্রীউদ্ধবের যেমন শ্রীকৃষ্ণে অধিকার, সমাজ চক্ষে হেয় কুব্জারও সেইরূপ তাঁহাতে অধিকার। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান—তিনি যে সকল প্রাণীর নিজ জন! শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'কেউ কি বানের জলে ভেসে এসেছে? চাঁদামামা যে সকলের মামা।'

পরমভাগবত শ্রীভীষ্ম দেখিতেন—শ্রীকৃষ্ণ নিরুপাধি পরম ব্রহ্ম; আর সাধারণ নরনারী সাংসারিক সঙ্কটে তাঁহাকে মাত্র বিপত্তারণ মধুসূদন বলিয়া জানে। তাহাদেরও শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ অধিকার আছে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে যেমন বুঝাইয়াছেন, সে সেইরূপ বুঝিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যার যা পেটে সয়—কেউ কালিয়া পোলাও হজম করতে পারে, কেউ বা মাছের ঝোল পারে।' শ্রীভগবান যে অকিঞ্চনের ধন—অনাথের নাথ—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়!

সংসারে দেখা যায়, নিজ পিতা বর্তমানে, পুত্র যেরূপ সনাথ ও নিশ্চিন্ত থাকে, পিতৃহীন বালক কি সেইরূপ নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতে পারে? শরীরী পিতার বাণী শোনা যায়—শরীরী পিতার দয়া বোধগম্য হয়; কিন্তু অশরীরী পিতার সহিত ঐরূপ ব্যবহার হয় না। ঈশ্বর অশরীরী পিতা, আর শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ অবতার শরীরী; পিতা চলিয়া যাইলেও তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি সন্তানের কত উপকারে আসে! নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ অমূল্য অক্ষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা ও চরিত-কথা পঞ্চম বেদ মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ এবং অন্যান্য পুরাণ হইতে আমরা অনায়াসে পাইতে পারি। আমরা সেই অমৃতের অধিকারী—কর্মদোষে বা বুদ্ধিভ্রংশ হেতু সেই পিতৃ-ত্যক্ত অমূল্য সম্পদ হইতে আমরা যেন বঞ্চিত না হই! ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু॥

বিভিন্ন যোগের অধিকারী নির্ণয়

(উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥

নির্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেম্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২০।৬,৭,৮)

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য—'

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যার আঁধার নামে জীবনের গোধূলি-আকাশে।
বৃথায় কাটানু কাল খেলা-ঘরে পুতুল-খেলায়।
কীর্তির ভেলায় চড়ি মৃত্যুরে লঙ্ঘিব—এই আশে
সযত্নে লিখিনু নাম বালুময় সাগর-বেলায়।

ধরণীর সব কিছু একদিন হ'য়ে যায় ধূলি।
হায় মূঢ়! কীর্তি দিয়ে চেয়েছিলে ভরিবারে হিয়া!
জানিতে না, খ্যাতি—সে তো মূল্যহীন অচল আধুলি।
অন্তরে প্রচ্ছন্ন গ্লানি এতকাল বেড়ালে বহিয়া!

একদা এ ভারতের তপোবনে মেঘমন্দ্রস্বরে
ঋষিকণ্ঠ উচ্চারিল: আনন্দ—সে ভূমাতে কেবল!
অল্পে সুখ নাই। হায়, জানিলাম এতকাল পরে,
কামনার পরিণতি—দীর্ঘশ্বাস, তিক্ত অশ্রুজল।

আমার আনন্দ আছে, হে ঈশ্বর, কেবল তোমাতে।
চরণারবিন্দে তব শান্তি মোর অনির্বচনীয়।
তোমার বাহিরে আমি কাঁদি শুধু মৃত্যু-যাতনাতে।
তৃষিত আত্মার মম তুমি স্বচ্ছ সুস্নিগ্ধ পানীয়।

তোমার নামের যাদু ছিন্ন করি দিবে মায়া-ডোর।
মানুষ মনেতে বদ্ধ, মনে মুক্ত। বিশ্বাসেই ত্রাণ।
তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি সখা মোর!
আমার ঐশ্বর্য তুমি! তুমি বিদ্যা, তুমি মোর প্রাণ।

মৃত্যুর শৃঙ্খলে বদ্ধ! অমৃত-সিন্ধুর তীরে নাও।
অন্ধকার হ'তে লও আলোকেতে, হে জ্যোতির জ্যোতিঃ!
অ'জ্ঞ আমি নিরাশ্রয়! হে ঈশ্বর, আমারে শোনাও,
'কল্যাণ যে করে বৎস, তার কভু হয় না দুর্গতি!'

শোনাও অভয়মন্ত্র, 'এসো সর্ব ধর্ম তেয়াগিয়া!
আমারে আশ্রয় করো; সুনিশ্চিত করিব উদ্ধার
সর্বপাপ হ'তে। নিত্য জাগি আমি তোমারই লাগিয়া।
যে মোর শরণাগত—আমি বহি যোগক্ষেম তার!'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি

[অতীত ও বর্তমান]

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

"জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।"
(শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৩১।১)

'হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার জন্মবশতই ব্রজভূমির এই মহত্ত্ব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে। আর সেই হেতু ইহা ইন্দিরার (লক্ষ্মীর) চিরন্তন নিবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে।'

সে আজ প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বের কথা। গিবি গোবর্ধন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মুসলমান যুবক টঙ্গাচালক কণ্টকাকীর্ণ উচ্চভূমির উপর অবস্থিত একটি মসজিদের পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়া বলিল: বাবাজী যাইয়ে—ভগ্ওয়ান্‌কা জনম্‌ভূম্ দেখিয়ে—বাবাজী, ভগবানের জন্মভূমি দেখে এস। 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি' নামক একটি দ্রষ্টব্য স্থান আছে, কিন্তু তাহার যে এই প্রকার অবস্থা, তাহা বাবাজীর জানা ছিল না। যাই হোক বাবাজী তো কোন প্রকারে কণ্টকগুল্মপ্রাচীর ভেদকরত মসজিদের পশ্চাদ্‌ভাগে উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া একটি ছোট্ট পথে মসজিদ-প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইল; আর তাহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি—ইহা শ্রবণ করিয়া ভারাক্রান্তচিত্তে সেই স্থানেই তাহার প্রণতি জানাইয়া প্রস্থান করিল।

সম্প্রতি ৺জন্মাষ্টমী তিথিতে পুনরায় উক্ত মহাতীর্থে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি ও পুস্তিকা* ইত্যাদি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই উদ্বোধনের শ্রদ্ধেয় পাঠকপাঠিকার সম্মুখে অর্ঘ্যরূপে উপস্থাপিত করিতেছি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল ভারতের, তাহা নহে—তিনি সমগ্র বিশ্বের এক মহান্ জ্যোতিষ্ক। শ্রীবৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে, কুঞ্জে কুঞ্জে ও যমুনা-পুলিনে সেই বালগোপালের লীলামাধুর্য স্মরণ করত আজিও লক্ষ লক্ষ নরনারী পুলকিতচিত্তে প্রেমাশ্রু-বর্ষণ করিতেছে। কিন্তু সেই লোকোত্তর মহাপুরুষের জন্মভূমি হইবার সৌভাগ্য যে ভূখণ্ড অর্জন করিয়াছে, শূরসেন প্রদেশের প্রধান নগরী সেই মথুরাতে এবং যে-স্থানে নন্দগোপগৃহে তাঁহার বাল্যলীলাসকল প্রেমবিহ্বল গোপ-গোপীগণের চিত্ত হরণ করিত, মা যশোদা যে-স্থানে দুরন্ত গোপালের দুরন্তপনায় বিব্রত হইতেন, সেই গোকুলে [বর্তমান নাম—'পুরাণা গোকুল' বা মহাবন], তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন বর্তমানে বস্তুতঃ কিছুই নাই বলিলেই চলে। শেষোক্ত স্থলে কোন প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষের ন্যায় পরিদৃষ্ট একটি বহুবিস্তৃত উচ্চ ভূমির উপরিভাগে মাননীয় সরকার বাহাদুর কর্তৃক পুরাতত্ত্বসংরক্ষণ আইনানুসারে সংরক্ষিত, সুদৃশ্য কারুকার্যমণ্ডিত বহু স্তম্ভবিশিষ্ট একটি বিস্তৃত দালান [বর্তমানে ইহার নাম—চৌরঙ্গী খাম্বা] এবং তাহা হইতে কিয়দ্দূরে অন্য একটি উচ্চস্থানে মা যশোদার সূতিকাগার নামে প্রসিদ্ধ কয়েকটি ক্ষুদ্র গৃহ ব্যতীত আর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। এই দালান এবং ক্ষুদ্র গৃহ কয়টি কোন্ সময়ে কাহাদ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। প্রত্ন-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান হইলে কালে তাহা অবশ্যই জানা যাইবে। পাণ্ডাগণ উক্ত দালান ও ক্ষুদ্র গৃহগুলিকে যথাক্রমে নন্দরাজার বৈঠক ও মা যশোদার সূতিকা-গাররূপে পরিচয় প্রদান করে। শেষোক্ত স্থলে সন্তানক্রোড়ে বাসুকীছত্র বসুদেবের যমুনা-উত্তরণ, যশোদার সদ্যোজাতা কন্যার সহিত পুত্র-বিনিময়

* ব্রজ-সাহিত্য-মণ্ডল হইতে প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থানকা ইতিহাস" ও অন্যান্য পুস্তিকাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য।

ইত্যাদির সূচক দু-একটি চমৎকার দেওয়ালচিত্র ও বালকৃষ্ণের মূর্তি প্রভৃতি আছে।* "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ"—জনশ্রুতি একেবারে মূল ঘটনা বিরহিত হয় না—পৌরাণিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত এই ঐতিহ্য-প্রমাণ অনুসারে ইহা স্বীকার করিলে অন্যায় হইবে না যে—সুদূর প্রাচীনকালে এই ভূখণ্ডই নন্দকিশোরের বাল্যলীলাভূমি হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল। অনতিদূরে যমলার্জুন ভঙ্গের স্থান, যে স্থলে উদ্‌খলবদ্ধ বালগোপাল অর্জুনবৃক্ষদ্বয়কে ভগ্ন করিয়াছিলেন এবং প্রায় এক মাইল দূরে যমুনার উপর ব্রহ্মাণ্ডঘাট, যে স্থলে বালক কৃষ্ণ স্বীয় ক্ষুদ্র মুখগহ্বরে মাতাকে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা পরিদৃষ্ট হয়। এই স্থলদ্বয়ও প্রাচীন বলিয়াই প্রতিভাত হইল। এতদ্ব্যতীত একটি প্রাচীন মন্দিরে দ্বারকাধীশ ও মথুরাধীশ নামক দুইটি অতি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তিও পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কারাভাবে সকল মন্দিরই কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ। পরবর্তী কোন সময়ে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের কোন আচার্য কর্তৃক 'নয়া গোকুল' নামে একটি নাতিবৃহৎ শহর 'পুরাণা গোকুল' হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে যমুনাতীরে শ্রীশ্রীবালগোপালজীর মন্দিরসহ স্থাপিত হইয়াছে। পুরাণা গোকুল হইতে প্রায় এক মাইল দূরে "রমণরেতী" [ক্রীড়াক্ষেত্রভূত বালুকারাশি] নামক উদাসী সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক স্থাপিত অপর একটি লীলাস্থলও প্রদর্শিত হয়। "বেণুবাদনরত চঞ্চল শ্যাম" এই পুণ্যভূমির কোন্ স্থলে বিচরণ করিয়াছিলেন, আর কোন্ স্থলে করেন নাই, তাহা নিরূপণের কোন উপায় নাই। ব্রজভূমির সকল স্থানই তাঁহার চরণরেণুস্পর্শের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিলেও, যমুনার অনতিদূরে বালুকাপূর্ণ একটি ভূখণ্ড ব্যতিরেকে প্রাচীনত্বের কোন নিদর্শন আমরা এই শেষোক্ত স্থলে পাইলাম না।

নয়া গোকুলেও পুরাণা গোকুলের ন্যায় প্রাচীনত্বের কোন নিদর্শন নাই।

*　　*　　*

এক্ষণে আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 'জন্মভূমি' বিষয়ে আলোচনা করিব। 'পশ্চিম রেলওয়ের' মথুরা জংশন ষ্টেশন হইতে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে যে ছোট রেলপথ ও সুবিস্তৃত রাজপথ গিয়াছে, জংশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে রেলপথ ও রাজপথের বামপার্শ্বে যে সুবিস্তৃত উচ্চ ভূমি পরিদৃষ্ট হয়, সেইস্থলেই উক্ত ভূখণ্ড অবস্থিত, যাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম চরণস্পর্শের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল। উহাই ছিল পুরাণবর্ণিত 'কংস-কারাগার', উক্ত স্থলেই "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" শ্রীভগবান দেবকীমাতার ক্রোড়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পুরাণকারগণ বলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র 'বজ্র' উক্ত স্থলেই সেই সুপ্রাচীনকালে কেশবদেবের মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। কালপ্রভাবে সেই মূর্তি ও সেই মন্দির কি প্রকারে বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়াছে, তাহা নিরূপণের কোন উপায় আজ আর নাই। বর্তমান সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ উক্ত স্থলে খনন-কার্যের দ্বারা যে সকল নিদর্শন পাইয়াছেন এবং বিদেশী ভ্রমণ-কারিগণ মথুরা ও তত্রস্থ শ্রীশ্রীকেশবদেব সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল আলোচনা করত পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে—এই জন্মভূমির উপর বহুবার বহু বিশাল মন্দির নির্মিত হইয়াছে এবং কালপ্রভাবেই হউক বা যবনাদির আক্রমণের ফলেই হউক, পুনঃ পুনঃ সেই সকল মন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছে।

* অত্রস্থ পূজারী ব্রাহ্মণ সখেদে বলিলেন, "নবাব বাদশাহ-গণ এই মন্দিরে সেবাপূজার জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহার পাট্টা এখনও আমাদের নিকট আছে, কিন্তু কালপ্রবাহে উক্ত জমি আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। সেবাপূজার কোন ব্যবস্থাই এখানে নাই। উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীসম্পূর্ণা-নন্দ, মথুরা পুরাতত্ত্বসংরক্ষণাগারের অধ্যক্ষ মহোদয় প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি-প্রদত্ত স্থানটির প্রাচীনত্বসূচক সহানুভূতিপূর্ণ সাক্ষ্যপত্র পূজারী আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

আর উক্ত স্থলে শুধু যে শ্রীশ্রীকেশবদেবের মন্দিরই ছিল—তাহা নহে, উহার চতুষ্পার্শ্বে বৌদ্ধ ও জৈনগণের অনেক স্তূপ ও মন্দির বর্তমান ছিল। এক্ষণে মথুরা প্রত্নতত্ত্বশালায় একটি চমৎকার বুদ্ধমূর্তি পরিদৃষ্ট হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে জন্মভূমির নিকট একটি কূপ খননকালে প্রায় অভগ্ন অবস্থাতেই তাহা ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে, উহার পাদপীঠে উৎকীর্ণ শিলালেখ হইতে অবগত হওয়া যায়—ভিক্ষুণী জয়ভট্টা কর্তৃক ২৩০ সম্বতে (৫৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে) উহা স্থাপিত হইয়াছিল—'যশা' নামক বিহারে। জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের এক মূর্তিও উহার নিকটবর্তী স্থলে পাওয়া গিয়াছে। 'এরিয়ান' নামক ইউনানী লেখক স্বরচিত 'ইণ্ডিকা' নামক পুস্তকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমসাময়িক (খৃঃ পূঃ ৩২৫-২৯৮) মেগাস্থিনিস্ কর্তৃক লিখিত বিবরণের আলোচনা প্রসঙ্গে 'শূরসেন' নামক সমৃদ্ধ জনপদ মথুরা নগরী, কেশবপুরা (কট্‌রা কেশবদেব, বর্তমান জন্মভূমি) ও যমুনা নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে বর্ণিত আছে, মথুরা প্রদেশের জনসমুদায় 'হিরাক্লিজকে' (শ্রীকৃষ্ণকে) সম্মানসহকারে পূজা করিয়া থাকে। টলেমী মথুরাকে 'দেবগণের নগর' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্লিনি নামক অন্য ইওরোপীয় পণ্ডিতও কেশবপুরা ও যমুনা নদীর বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মেগাস্থিনিসের ভারতে আগমনের বহুপূর্বেই কেশবপুরাতে (বর্তমান জন্মভূমিতে) শ্রীশ্রীকেশবদেবের (শ্রীকৃষ্ণের) মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। তদ্বিষয়ক কোন স্পষ্ট প্রমাণ কিন্তু অদ্যাপি হস্তগত হয় নাই। উক্ত জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণবিষয়ক প্রথম শিলালেখ যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা মহাক্ষত্রপ শোডাসের সময়ের (খৃঃ পূঃ ৮০-৫৭)। ব্রাহ্মীলিপি ও সংস্কৃত ভাষায় তাহাতে এই প্রকার লিখিত আছে—"বসুনা ভগবতো বাসুদেবস্য মহাস্থানে চতুঃশালং তোরণং বেদিকা প্রতিষ্ঠাপিতা প্রীতো ভবতু বাসুদেবঃ স্বামিস্য * মহাক্ষত্রপস্য শোডাসস্য সংবর্তয়াতাম্"—ভগবান্ বাসুদেবের মহাস্থানে চতুর্দ্বারযুক্ত মন্দির, তোরণ ও বেদিকা মহাক্ষত্রপ শোডাসের রাজত্বকালে বসুকর্তৃক স্থাপিত হইল। এই শিলালেখটি মথুরার প্রত্নতত্ত্বশালায় রক্ষিত আছে। খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্বে যে রাজপুতানায় চিতোরগড়ের নিকটবর্তী ঘোসুণ্ডী নগরে এবং মধ্যপ্রদেশের বিদিশাতে (বর্তমান ভীলসার নিকটবর্তী বেসনগরে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি পূজিত হইত, এতদ্বিষয়ে কয়েকটি শিলালেখ সম্প্রতি জন্মভূমিতে খননকার্যের সময় পাওয়া গিয়াছে।

মহাক্ষত্রপ শোডাসের পরবর্তিকালীন যে দুইটি শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার একটি মহাভাগবত রাজাধিরাজ সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (চতুর্থ শতাব্দী), অপরটি তাঁহার পরবর্তী কোন গুপ্তবংশীয় সম্রাটের। উক্ত শিলালেখদ্বয়ের কিঞ্চিৎ অংশ খণ্ডিত হইলেও, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে গুপ্তসম্রাট্‌গণ কর্তৃক উক্ত স্থলে মন্দির নির্মাণ ও নানাপ্রকার সংকার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আগমন করেন। তল্লিখিত বিবরণেও মথুরা নগরী, যমুনা নদী, তাহার উভয় পার্শ্বে বৌদ্ধসংঘারাম ও স্তূপের বর্ণনা আছে। কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষাংশে ও স্কন্দগুপ্তের শাসনকালে বর্বর হূনগণের আক্রমণে মথুরানগরী এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সংঘারামসমূহের মধ্যে কতকগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ও কতকগুলি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। শ্রীশ্রীকেশবদেবের মন্দির এই সময়ে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ক কোন স্পষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

* এই প্রকার পাঠই সম্ভবতঃ শিলালিপিতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ছাপানো পুস্তকেরও এই প্রকার পাঠ।

চৈনিক পরিব্রাজক 'হিউএন চাং' ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তল্লিখিত বিবরণে স্পষ্ট-ভাবে কেশবদেবের মন্দিরের উল্লেখ না থাকিলেও, তৎকালে মথুরাতে পাঁচটি বৃহৎ দেবমন্দির ও কুড়িটি সংঘারামের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত পাঁচটি দেবমন্দিরের মধ্যে একটি অবশ্যই শ্রীশ্রীকেশবদেবের হইবে, ইহা অনুমান করা চলিতে পারে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত স্থলে খননকার্যের সময় একটি খণ্ডিত শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায়—মহারাষ্ট্রাধিপতি রাষ্ট্রকূটবংশীয় কৃষ্ণরাজ, কর্ক এবং তৃতীয় গোবিন্দদেব কর্তৃক এই জন্মভূমিতে মহৎ কোন পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ হূন আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত কেশবদেব-মন্দির উক্ত রাজবংশীয়গণ-কর্তৃক পুনঃ স্ব-মহিমাতে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল।

অতঃপর আসিল মূর্তিভঙ্গকারী গজনীর সুলতান মামুদের আক্রমণ। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নবম ভারতাক্রমণকালে মথুরা নগরী বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। মামুদের মন্ত্রী 'অল্-উত্বী' তল্লিখিত 'তারিখে-যামিনী' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—'সুলতানের আজ্ঞায় এমন একটি সুন্দর সুবিস্তৃত বিশাল মন্দির ধ্বংস করা হইল, যাহাকে স্থানীয় লোক দেবগণ-কর্তৃক নির্মিত বলিয়া থাকে। স্বয়ং সুলতানই বলিয়াছেন—এই প্রকার একটি সুবিশাল ইমারত নির্মাণ করিতে কমপক্ষে ১০ কোটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) আবশ্যক এবং বহু সুদক্ষ কারিগর নিযুক্ত করিলেও দুইশত বৎসরের কম সময়ে এই প্রকার ইমারত নির্মিত হইতে পারে না। সুলতানের আজ্ঞায় উক্ত মন্দির বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত হইল। ২০ দিন ব্যাপিয়া মথুরা শহরে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চলিল। তাহার ফলে সুবর্ণনির্মিত পাঁচটি দেবমূর্তি—পাওয়া গেল, যাহার একটির ওজন ১৪ মণ। উহার মূল্য কমপক্ষে ১৪ হাজার দীনার। উক্ত পাঁচটি দেবমূর্তির চক্ষুই বহুমূল্য মণির দ্বারা নির্মিত ছিল। একশত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে এই সমস্ত মূর্তি ও অন্যান্য লুণ্ঠিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্য গজনীতে প্রেরিত হইল।"

১২০৭ সম্বতের (১১৫০ খৃঃ) একটি শিলালেখ এই জন্মভূমিতে পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে অবগত হওয়া যায়—রাজা বিজয়পালদেব কর্তৃক মামুদ-বিধ্বস্ত শ্রীশ্রীকেশবদেবের মন্দির পুনরায় নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য বহু ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল এবং 'জজ্জ' প্রমুখ ১৪ জন প্রধান নাগরিক এই মন্দিরের ব্যবস্থাপক-রূপে বিনিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে সম্ভবতঃ রাজা বিজয়পাল দেব কর্তৃক নির্মিত এই মন্দিরেই শ্রীশ্রীকেশবদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। অথবা এমনও হইতে পারে যে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যে মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন তাহা রাজা বিজয়পাল-দেব কর্তৃক নির্মিত মন্দির নহে; কারণ তৎকালে দিল্লী আগ্রা ও মথুরা প্রদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং এই প্রকারও হইতে পারে যে—বিজয়পাল দেব কর্তৃক নির্মিত মন্দির মুসলমানগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং অন্য কোন ধর্মপ্রাণ রাজা কর্তৃক নির্মিত মন্দিরই তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে নিশ্চিত কোন প্রমাণ অদ্যাপি হস্তগত হয় নাই। ১২শ শতাব্দী হইতে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে সিকান্দার লোদীর রাজ্যারোহণ সময় পর্যন্ত জন্মস্থানের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা দুরূহ।

ফিরিস্তা নামক মুসলমান লেখকের বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কোন সময়ে সিকান্দার লোদী কর্তৃক কেশবদেবের মন্দির ও যমুনার ঘাটসমূহ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অতঃপর আসিল মোগলগণের রাজত্ব। মহানুভব সম্রাট্ আকবরের সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দির, গোবর্ধনে হরিদেবের মন্দির প্রভৃতি নির্মিত হইলেও মথুরাতে কেশবদেবের মন্দির নির্মিত হইতে

পারে নাই। তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ওড়চ্ছারাজ্যের বুন্দেলা-নরেশ বীরসিংহদেব কর্তৃক এই জন্মভূমিতে ২৫০ ফুট উচ্চ এক বিশাল মন্দির ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। ইহার কারুকার্য ও শিল্পকলা এতই উচ্চশ্রেণীর ছিল যে তৎকালে সমগ্র উত্তর ভারতে এই প্রকার মন্দির ছিল না। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পরিব্রাজক ট্রাভার্নিয়ার, ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে পরিব্রাজক বার্নিয়ার এবং তৎপরবর্তিকালে ইটালীদেশীয় পরিব্রাজক মনুচী ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহারা সকলেই বীরসিংহদেব কর্তৃক নির্মিত এই মন্দিরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ট্রাভার্নিয়ারের বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায়—কোন সময়ে যমুনা নদী কেশবদেবের মন্দিরের নিকটেই প্রবাহিত হইত। তৎকালে তাহা দূরে সরিয়া গিয়াছিল। [এখনও যমুনা জন্মভূমি হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত]। মন্দিরটি নিম্নভূমিতে অবস্থিত হইলেও ৫।৬ ক্রোশ দূর হইতে তাহা পরিদৃষ্ট হইত, এতই ছিল তাহার উচ্চতা। মনুচী লিখিয়াছেন: জন্মাষ্টমীর দিন মন্দিরে যে আলোকসজ্জা হইত, তাহা আগ্রা হইতে স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হইত এবং বাদশাহ তাহা দেখিতেন।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পৌত্র—সম্রাট্ শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো ১৬৫৪ সালে মথুরা প্রদেশ জায়গীররূপে প্রাপ্ত হন। বীরসিংহদেব কর্তৃক নির্মিত মন্দিরে বহু ব্যয়ে তিনি একটি বৃহৎ বেদিকা নির্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থাবশতঃ ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ভ্রাতা ঔরঙ্গজেব কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব দারাশিকো-কর্তৃক কেশবদেবের মন্দিরে বেদিকা নির্মাণের বিষয় জানিতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তিনি উক্ত বেদিকা ধ্বংস করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন, তাঁহার মথুরাস্থিত ফৌজদার আবদুল কর্তৃক রাজাজ্ঞা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়। উক্ত সময়েই ধর্মান্ধ সম্রাট 'কাফের'গণের ৺বৃন্দাবনস্থ ও মথুরাস্থিত সমস্ত মন্দির, পাঠশালা প্রভৃতি ধ্বংস করিবার ও তাহাদের পূজা পাঠ ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু নানা কারণে সেই আদেশ তৎকালে পালিত হইতে পারে নাই। হিন্দুগণ উক্ত রাজাজ্ঞা শ্রবণ করত মন্দিরের মায়া ত্যাগ করিয়া দেবমূর্তিগুলিকে গোপনে স্থানান্তরে প্রেরণ করেন। এই সময়েই বৃন্দাবনের গোবিন্দদেব, মদনমোহন ও গোপীনাথ প্রভৃতি বিগ্রহগুলি রাজপুতানায় জয়পুর ও করৌলী প্রভৃতি স্থানে নীত হয়। কেশবদেবের বিগ্রহ যে কোথায় প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, তাহা মথুরার দক্ষিণ-পূর্বকোণে কোনস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। অতঃপর কয়েক মাস পরে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব স্বয়ং মথুরাতে আগমন করিয়া মহাত্মা বীরসিংহদেব কর্তৃক নির্মিত সেই বিশাল মন্দির ধ্বংস করেন। বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির প্রভৃতিও এই সময়ে উক্ত ধর্মান্ধ নরপতি কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। এই সময়ে যে সকল দেবমূর্তি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা রাজাজ্ঞায় আগ্রাতে প্রেরিত হয় এবং তত্রস্থ দেওয়ান-ই-খাসের নিকটবর্তী ছোট মসজিদের [যাহাতে সম্রাট শাহজাহান বন্দীদশায় আবদ্ধ ছিলেন] সিঁড়ির নিম্নদেশে প্রোথিত হয়, উদ্দেশ্য সকলের পদাঘাতে উক্ত দেবমূর্তিসকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। অতঃপর এই ধর্মান্ধ সম্রাট্ বীরসিংহদেব-নির্মিত সেই সুবিস্তৃত মন্দিরের ভিত্তির পূর্বভাগে মন্দিরে ব্যবহৃত প্রস্তরগুলির দ্বারাই একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যাহা অদ্যাপি উক্তস্থলে পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই সময়ে উক্ত মোগল সম্রাট্ নাম বদলাইয়া মথুরার 'ইসলামাবাদ' এবং বৃন্দাবনের 'মোমিনাবাদ' নাম দেন। এই নামদ্বয় কিন্তু সরকারী কাগজ-পত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, জনগণ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই।

ঔরঙ্গজেবের পরবর্তীকালে 'জন্মভূমি' উপেক্ষিত অবস্থাতেই বহুকাল পড়িয়া থাকে। অতঃপর মথুরা প্রদেশ জাঠগণের অধিকারে আসে। তাঁহারা মথুরার ধর্মীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করেন। মথুরার ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। অতঃপর জয়পুরের নৃপতিগণ মথুরাতে দপ্তরখানা দুর্গ ও সেনানিবাস ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এই সময় 'জন্মভূমি' কিছুকাল সরকারী দপ্তররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। অতঃপর মথুরামণ্ডল মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিকারে আসে। এই সময় গোয়ালিয়ররাজ মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া 'জন্মভূমি'র উপর একটি মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা করেন। কিন্তু বারাণসীর পণ্ডিতগণের প্রতিকূলতায় তাহা সম্ভব হয় নাই। তিনি 'জন্মভূমি'র সন্নিকটে একটি সরোবর খনন করেন, বর্তমানে উক্ত সরোবরের নাম 'পোতরা কুণ্ড'। অজ্ঞলোকে বলে—জননী দেবকী এই সরোবরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া স্নান করেন।' ইহাই হইল শ্রীকৃষ্ণ-জন্মভূমির প্রাচীন ইতিহাস।

*　　*　　*

ইদানীন্তনকালের ইতিহাস এই—১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মারাঠাগণকে পরাজিত করিয়া ইংরাজগণ মথুরার আধিপত্য লাভ করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে বারাণসীরাজ পাটনীমল শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি ও তৎসংলগ্ন স্থান সকল নিলামে ক্রয় করেন। তিনি উক্তস্থলে মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পূর্ণ হয় নাই। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে মহামনা মদনমোহন মালবীয়জী রাজা শ্রীযুগলকিশোর বিড়লার সহায়তায় বারাণসীরাজের উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে উক্ত ভূমি ক্রয় করেন। কিন্তু মন্দিরনির্মাণের ইচ্ছা থাকিলেও, তিনি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পূজ্য মালবীয়জীর ইচ্ছানুসারে বিড়লাজী কর্তৃক ১৯৫১ সালে একটি 'জন্মভূমি ট্রাষ্ট' গঠিত হইয়াছে। যাহার মধ্যে শ্রীবিড়লা প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ধন-কুবেরগণ আছেন। এই ট্রাষ্টের উদ্দেশ্য 'জন্মভূমি'র উপর শ্রীশ্রীকেশবদেবের মন্দির পুনর্নির্মাণ এবং কটরা কেশবদেবের অর্থাৎ 'জন্মভূমি'র চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানের পুনরুদ্ধার। এই স্থলে এই প্রকার সংস্থা তাঁহারা সংগঠিত করিতে ইচ্ছা করেন, যাহা হইবে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির একটি সুবিশাল কেন্দ্র। সম্প্রতি কয়েকবার শ্রমদানের ফলে স্থানটি পরিষ্কৃত হইয়াছে; ২৫ বৎসর পূর্বে যে কণ্টকগুল্মাকীর্ণ পতিতভূমি দেখিয়াছিলাম, তাহা আর নাই। জন্মভূমির পূর্বাংশে অবস্থিত মসজিদবাটীর পশ্চিমাংশ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং ওড়চ্ছারাজ বীরসিংহদেব কর্তৃক নির্মিত মন্দিরের সমগ্র ভিত্তিটি (কয়েকটি ভূনিম্নস্থ কক্ষসহ) খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। উক্ত ভিত্তির উপর মসজিদের ঠিক পশ্চাদ্‌ভাগে একটি চন্দ্রাতপের নিম্নদেশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্তি স্থাপন করত আজ জন্মাষ্টমীর দিন আনন্দোৎসব হইতেছে। বহু ভক্ত নরনারীর সমাবেশে স্থানটি আজ মুখরিত। শুনিলাম এই উৎসব মাসাধিককাল পর্যন্ত চলিবে। উত্তর প্রদেশ সরকার উক্ত স্থলে কৃষি ও স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। লোকনৃত্য রাসলীলা ও নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। অস্থায়ী দোকানপাটও কয়েকটি খুলিয়াছে। মন্দিরভিত্তির পুরোভাগে উত্তর-প্রদেশ সরকার কর্তৃক 'এনামেল ধাতুপাত্রে' অঙ্কিত দুইটি বিজ্ঞপ্তিপত্র ইংরেজী ও হিন্দীভাষায় প্রদর্শিত; যাহার বাংলা মর্মানুবাদ এই—

"কৃষ্ণচবুতারা নামে প্রসিদ্ধ এই স্থানটি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি। কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে মথুরার শাসক কংসের কারাগৃহে প্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই স্থানটিতেই। এইস্থলে ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত অনেকগুলি শিলালেখ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রামাণ্য বলে ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে শকরাজ শোদাসের

রাজত্বকালে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সম্মানের জন্য এখানে একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। অতঃপর খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে গুপ্তবংশীয় শাসক চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এখানে একটি সুবৃহৎ সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএনচাং এই মন্দিরটি দর্শন করেন। গজনীর সুলতান মামুদ ১০১৭ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটি ধ্বংস করেন। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা বিজয়পালদেব কর্তৃক অন্য একটি মন্দির এই স্থলেই নির্মিত হয়। ইহাও খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে সিকান্দার লোদী কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শেষ স্মৃতিচিহ্ন এইস্থলেই ওড়চ্ছার রাজা বীরসিংহদেব কর্তৃক ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। বিদেশী পরিব্রাজক ট্রাভার্নিয়ার, বর্নিয়ার এবং মনুচী এই মন্দিরটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব এই মন্দিরটি ভূমিসাৎ করেন এবং সেই মন্দিরের বৃহৎ ভিত্তির পূর্বাংশে তাঁহার আজ্ঞায় একটি মসজিদ্ নির্মিত হয়। এই জন্মভূমির স্মৃতিরক্ষার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতায় এক্ষণে এখানে একটি উপযুক্ত স্মৃতিভবন নির্মিত হইবে।"

আমরা নিশ্চয়ই উদ্গ্রীব হইয়া সেই শুভ দিনটির প্রতীক্ষা করিব।

এই পরিচয় তোমার সাথে?

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর

তুমি, এমনি নিবিড়, এমনি গভীর।
লীলাচঞ্চল দেবতা মোর!
বরষার এই ঘন ঘটা-রূপে
নয়নে জীবনে ঘনালে ঘোর?

মেঘ-মেদুর হৃদয়-আকাশে
ক্ষণিক চকিত বিজলি চাওয়া,
বজ্রবেদন হানো ঘন ঘন—
এই কি তোমার পরশ পাওয়া?

দুঃখ-নিশার নিরাশার শ্বাসে
এমনি সজল বাতাসে ভরা,
করুণা-ধারায় আঁখির তারায়
এমনি অঝোর ঝরনে ঝরা!

দেয়া-গরজনে বাঁশরীর ধ্বনি
নিশীথ রাত্রে ঘুম ভাঙায়
মালতী-কুঞ্জে নীপের পুঞ্জে,
অবশ হিয়ায় দোল লাগায়।

মধুর মিলনে নিঠুর বিরহে
এমনি সরস শ্যামলিমায়,
অনুভবে মন ছায় অনুক্ষণ
ধরি ধরি করি, ধরা না যায়।

অধীর উতল স্রোত-ছলছল্
জীবন-নদীর পারাপারে,
স্তিমিত আলোকে পলকে পলকে
খেয়া-তরী পাওয়া বারে বারে—

কেয়া-কণ্টকে আঙুলিয়া রাখা
রক্ত ঝরানো বনের পথে,
আপনা-হারানো ভাবে বিস্ময়ে—
এই পরিচয় তোমার সাথে?

শ্রীকৃষ্ণের মহানুভবতা

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

আজ প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে তাঁহার মহিমোজ্জ্বল জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী অনুধ্যান করিলে তাঁহার অশেষ মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

শ্রীকৃষ্ণ কংসবধ করিয়া স্বীয় মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া মস্তকের দ্বারা তাঁহাদের পাদস্পর্শ করিয়া বন্দনা করিলেন। দেবকী ও বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে জগতের ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং স্নেহ প্রদর্শন করিতে পারিলেন না, কেবল কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার নিকট গমন করিয়া বিনয়াবনত হইয়া 'হে মাতঃ! হে পিতঃ!' বলিয়া সাদরে ডাকিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের প্রীতি জন্মাইয়া বলিলেন, 'এতদিন কংসের ভয়ে আমাদের চিত্ত সর্বদা উদ্বিগ্ন ছিল, আমরা অসমর্থ ছিলাম, আপনাদের সেবা করিতে পারি নাই; অতএব এতদিন আমাদের নিরর্থক অতিবাহিত হইয়াছে। হে মাতঃ! হে পিতঃ! আমরা পরাধীন ছিলাম, দুরাত্মা কংস আমাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়াছে, আমরা আপনাদের সেবা করিতে পারি নাই, অতএব আপনারা আমাদিগকে ক্ষমা করুন।'

"তন্নাবকল্পয়োঃ কংসান্নিত্যমুদ্বিগ্নচেতসোঃ।
মোঘমেতে ব্যতিক্রান্তা দিবসা বামনর্চতোঃ॥
তৎক্ষন্তুমর্হথস্তাত! মাতর্নৌ পরতন্ত্রয়োঃ।
অকুর্বতোর্বাং শুশ্রূষাং ক্লিষ্টয়োর্দুর্হৃদা ভৃশম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৪৫

* * *

যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ ও কুকুর প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ কংসের ভয়ে আকুল হইয়া নানাদিকে অবস্থান করিতেছিলেন এবং প্রবাস-ক্লেশে কাতর হইয়া পড়িতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই জ্ঞাতিদিগকে এবং বান্ধবগণকে নানা দিক হইতে আনাইলেন এবং আশ্বাস দিয়া ও অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে ধনসম্পত্তি দান করিয়া নিজ নিজ গৃহে বাস করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া তাঁহারা পরম আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

* * *

শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিয়া সুদামা নামক এক ভক্ত মালাকারের ভবনে বিনা নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইলেন। সে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হঠাৎ দর্শন করিয়া শির নত করিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং ভক্তিভরে তাঁহার অর্চনা করিয়া তাঁহাকে মাল্য প্রদান করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে প্রণত ও শরণাপন্ন দেখিয়া কৃপা করিলেন এবং তাহার প্রার্থিত—ভগবানে অচলা ভক্তি, ভক্তগণের প্রতি সৌহার্দ্য এবং সর্বভূতে দয়ারূপ বর প্রদান করিলেন। সে আর কিছু প্রার্থনা না করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে পার্থিব বহু বর দিলেন।

* * *

পরম ভক্ত অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গৃহে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে ভগবদ্বোধে অভ্যর্থনা, অর্চনা, সেবা ও স্তুতিবাদ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে বলিলেন, 'হে তাত! আপনি আমাদের গুরু, পিতৃব্য এবং শ্লাঘ্য বন্ধু, আমরা সর্বদা আপনাদের রক্ষা, পোষণ ও অনুকম্পার পাত্র; কারণ আমরা আপনাদের পুত্রতুল্য।'

"ত্বং নো গুরুঃ পিতৃব্যশ্চ শ্লাঘ্যো বন্ধুশ্চ নিত্যদা।
বয়স্তু রক্ষ্যাঃ পোষ্যাশ্চ অনুকম্প্যাঃ প্রজা হি বঃ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৮

তিনি আরও বলিলেন, 'হে পিতৃব্য! আপনার মত মহাভাগ সাধুদের সর্বদা সেবা করা কর্তব্য। জলময় তীর্থসমূহ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন না, মৃত্তিকা ও শিলাময় তীর্থক্ষেত্রসমূহ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন না এবং দেবগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন না, তাঁহারা সকলে দীর্ঘকাল সেবিত হইয়াই পবিত্র করিয়া থাকেন। আপনার মত সাধুব্যক্তি কিন্তু দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন।'

"ন হ্যম্মযানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৪৮

* * *

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের মঙ্গল-কামনায় তাঁহাদের ভাল-মন্দ জানিবার জন্ম অক্রূরকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাঠাইবার কালে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে বলিয়াছিলেন, 'আপনি হস্তিনাপুরে গমন করুন। ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবগণের প্রতি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহার সম্প্রতি ভাল কি মন্দ তাহা জানিয়া আসুন। তাহা জানিলে আমরা আমাদের সুহৃদ্‌গণের মঙ্গল যেরূপে হইতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিব।'

"গচ্ছ জানীহি তদ্‌বৃত্তমধুনা সাধ্বসাধু বা।
বিজ্ঞায় তদ্বিধাস্যামো যথা শং সুহৃদাং ভবেৎ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৪৮

* * *

রুক্মিণীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া একদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, 'হে রাজপুত্রি! ঐশ্বর্যশালী রাজগণ তোমাকে লাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। তোমার ভ্রাতা ও পিতা তোমাকে তাঁহাদিগের করে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ তোমাকে লাভ করিবার জন্ম তোমার পিতৃভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তুমি সেই সকল প্রার্থিগণকে ত্যাগ করিয়া কেন আমাকে পতিত্বে বরণ করিলে? আমি জরাসন্ধ প্রভৃতি বলবান্‌দের সহিত শত্রুতা করিয়াছি। তাহাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্র মধ্যে আশ্রয় লইয়াছি। আমি প্রায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছি। এরূপ অযোগ্য আমাকে তুমি কি কারণে পতিত্বে বরণ করিলে? হে সুন্দরি! যাহাদের পথ জানা যায় না এবং যাহারা লোকাতীত আচরণ করিয়া থাকে, তাদৃশ পুরুষগণের অনুবর্তন করিলে রমণীগণ প্রায়ই ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। আমি এবং আমার অনুরক্ত জনগণ নিষ্কিঞ্চন। যাহাদের কিছুই নাই, তাহারাই আমাদের জন এবং আমরা তাহাদের নিত্য প্রিয়। অতএব আঢ্য ব্যক্তিরা প্রায়ই আমাকে ভজনা করে না।'

"নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে॥"
—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৬০

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন যে ভিক্ষুকগণই তাঁহার বৃথা প্রশংসা করিয়া থাকে—"ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা"। এই উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মহত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। যেহেতু নিষ্কিঞ্চন ও ভিক্ষুকদের প্রতি তাঁহার হৃদ্যতা অসাধারণ।

* * *

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে যাইবার পূর্বে জরাসন্ধকে বধ করা উচিত—এই কথা যাদবগণ পুনঃ পুনঃ জিদ্ করিয়া বলিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধব মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, 'হে উদ্ধব! তুমিই আমাদের বন্ধু, কর্তব্য এবং অকর্তব্য বিষয়ে তুমিই পরম দ্রষ্টা, মন্ত্রণাসাধ্য বিষয়সমূহে তুমি অভিজ্ঞ, অতএব উপস্থিত কি করা উচিত, তুমি বল; তুমি যাহা বলিবে, আমরা তাহাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ

করিব এবং তদনুসারে কার্য করিব।' জরাসন্ধকে প্রথমে জয় করা কর্তব্য—উদ্ধব মহাশয় এই সিদ্ধান্ত দিলে শ্রীকৃষ্ণ তদনুসারে কার্য করিলেন।

* * *

রাজসূয় যজ্ঞে কোন্ ব্যক্তি অর্ঘ্য পাইবার যোগ্য —এই বিষয় লইয়া সভামধ্যে সভ্যগণ আলোচনা করিতে লাগিলেন। বহু যোগ্য ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাই তাঁহারা অনেক আলোচনা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন মাদ্রীপুত্র সহদেব সভামধ্যে বলিতে লাগিলেন, 'যাদবগণের অধিপতি ভগবান্ কৃষ্ণই অগ্রপূজা পাইবার যোগ্য। কারণ, বর্তমান সময়ে তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা মহত্তর কোন ব্যক্তি নাই।'

"তস্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে দীয়তাং পরমার্হণম্।"

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৭৪

প্রধানগণ সভামধ্যে 'সাধু, সাধু' বলিয়া উঠিলেন এবং সহদেবের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠিরাদি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এমন সময় শিশুপাল স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া সভামধ্যে বাহু উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে কঠোর বাক্য বলিতে লাগিলেন, 'হে সভ্যগণ! বলবান্ কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, এই জনশ্রুতি সত্য। যেহেতু বালক সহদেবের কথায় প্রধানগণের বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটিল। হে সভ্য-শ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সকলে পূজনীয় পাত্র নিরূপণে অভিজ্ঞ; সুতরাং কৃষ্ণ অগ্রপূজা পাইবার যোগ্য—সহদেবের এই বালভাষিত আপনারা গ্রহণ করিবেন না।' তৎপরে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে কুলকলঙ্ক, কুলভ্রষ্ট, ধর্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী গো-পালক বলিয়া সভামধ্যে তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন। উহা সহ্য করিতে না পারিয়া সমবেত সাধু ব্যক্তিগণ সভাত্যাগ করিয়া গেলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সিংহ যেরূপ শৃগালের রবে নীরব থাকে, প্রথমে সেইরূপ নীরব রহিলেন, কিছুই বলিলেন না :

"নোবাচ কিঞ্চিদ্ভগবান্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্।"

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৭৪

* * *

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতরা গোপীগণকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের মহানুভবতাবশতঃ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'হে প্রিয়তমাগণ! তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার ভজনা করিয়াছ এবং শুদ্ধভাবে আমার আশ্রয় লইয়াছ। আমি তোমাদের প্রত্যুপকার করিতে দেব-পরিমিত আয়ু দ্বারাও সক্ষম হইব না। তোমাদের সৎকার্যের দ্বারাই আমার ঋণ পরিশোধ হউক।'

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৩২

* * *

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা শ্রীদাম অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। জিতেন্দ্রিয় ও নিঃস্পৃহ হইয়া যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যের দ্বারা জীবনধারণ করত গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত ছিলেন। অর্থাভাবে তিনি মলিন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া থাকিতেন। তাঁহার পত্নীও তাঁহার ন্যায় গুণযুক্তা ছিলেন এবং জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া থাকিতেন। তিনি পতির জন্য যদৃচ্ছালব্ধ আহার্য বস্তু রন্ধনাদি করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন। পতিব্রতা ব্রাহ্মণপত্নী একদিন চিন্তায় অবনম্রা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পতিকে বলিলেন, 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার বাল্যসখা বলিয়া শুনিয়াছি। তিনি এখন দ্বারকার অধিপতি। আপনি দারিদ্র্যে কষ্ট পাইতেছেন জানিতে পারিলে তিনি আপনাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন।

আপনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, আপনি তাঁহার সমীপে গমন করুন।' ব্রাহ্মণী প্রতিবেশী স্বজনগণের নিকট হইতে চারি মুষ্টি চিপিটক যাচ্ঞা করিয়া আনিলেন এবং উহা জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করিয়া সেই উপহার পতির হস্তে প্রদান করিলেন। শ্রীদাম ইতস্ততঃ করিয়া দ্বারকার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং কোনক্রমে শ্রীকৃষ্ণের রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন রুক্মিণীদেবীর পর্যঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দূর হইতে মলিন, দরিদ্র শ্রীদামকে দেখিতে পাইয়া সহসা উত্থিত হইলেন এবং নিকটে আগমন করিয়া আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বাল্যসখাকে শ্রীকৃষ্ণ পর্যাঙ্কে বসাইয়া পূজা করিলেন এবং তাঁহার চরণযুগল ধৌত করিয়া সেই জল নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সোল্লাসে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের হস্তধারণ করিলেন এবং একত্রে গুরুগৃহে বাসের কথা ও বাল্যকালের মনোহর কাহিনীসকল বলিতে লাগিলেন. শ্রীদাম চিপিটক উপহার আনিয়া লজ্জায় শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারিতেছেন না—ইহা শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'হে সখে! তুমি তোমার গৃহ হইতে আমার জন্ম কি উপহার আনয়ন করিয়াছ?' শ্রীদাম শ্রীপতিকে চিপিটক উপহার দিতে পারিলেন না, অপিচ লজ্জিত ও অধোমুখে হইয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ চিপিটকগুলি কাড়িয়া লইলেন এবং বলিলেন, 'হে সখে! তুমি ত আমার প্রীতিকর উপহার আনিয়াছ, এতক্ষণ কেন বল নাই?' এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক মুষ্টি চিপিটক পরম তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। দরিদ্র শ্রীদাম দ্বারকাপতির মহানুভবতা দেখিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

* * *

অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান আহত হইলে উত্তরাদেবী করুণ আর্তির সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্বীয় সন্তানের জীবন ভিক্ষা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার কাতরতায় কৃপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, 'আমি জীবনে কখনও পরিহাস করিয়াও মিথ্যা বলি নাই, আমি কখনও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করি নাই,—এই সকলের বলে উত্তরার সন্তান জীবন লাভ করুক'—এই কথা বলিবামাত্র অভিমন্যুর সন্তান কাঁদিয়া উঠিয়াছিল।

* * *

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, 'আমি নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্বৈর, সমদর্শী মুনির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি, যেহেতু তাঁহার চরণরজঃ দ্বারা নিজেকে পবিত্র করিতে পারিব।'

"নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১।১৪

এই প্রকারের ভক্তবৎসলতা ও ভক্তকে সম্মান-প্রদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয় না।

* * *

রুক্মিণী প্রেরিত এক ব্রাহ্মণ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া স্বীয় আসন হইতে নামিলেন এবং তাঁহাকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইলেন। দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ পূজা করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার স্বীয় হস্ত দ্বারা তাঁহার চরণদ্বয় সম্মর্দন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'যে সকল ব্রাহ্মণ স্বলাভ-সন্তুষ্ট, সাধু, সকল ভূতের সুহৃত্তম, নিরহঙ্কার, এবং শান্ত—তাঁহাদিগকে আমি মস্তক অবনত করিয়া বার বার নমস্কার করি।'

"বিপ্রান্ স্বলাভসন্তুষ্টান্ সাধূন্ ভূতসুহৃত্তমান্।
নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্ নমস্যে শিরসাঽসকৃৎ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৫২

মৃগ মনে করিয়া জরা নামক ব্যাধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। ব্যাধ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-তলে মস্তক রাখিয়া নিপতিত হইয়াছিল। সে তাহার কৃতকর্মের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, তাহাকে সংহার করা হউক, শ্রীকৃষ্ণ তাহার কোন অপরাধ দেখিলেন না, বরং বলিলেন, 'হে ব্যাধ! তুমি ভয় করিও না। গাত্রোত্থান কর। তোমার এ কার্য আমারই অভিলষিত। এক্ষণে তুমি আমার আজ্ঞায় সুকৃতি-গণের লভ্য স্বর্গলোকে গমন কর।'

"মাভৈর্জরে! ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে।
যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্॥"

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১।৩০

মহামানব শ্রীকৃষ্ণের মহানুভবতার অন্ত নাই। যতই তাঁহার বিষয়ে অনুধ্যান করা যায়, ততই তাঁহার মহৎ চরিত্রের পরিমাপ করিতে পারা যায় না।

একান্তিকা

[ইন্দিরা দেবীর হিন্দী ভজনের অনুবাদ]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ, গাহিব তব নাম
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম।

জগত হ'তে দূরে—সুদূরে—পুলিনে গঙ্গার
তারকা যেথা তুষার চুমে গহন-ঝঙ্কার,
একটি ছোট মন্দির হে বিরচি' নাথ তব
কলিতে ফুলে সাজায়ে বেদী সেথায় অভিনব
হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ গাহিব তব নাম
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম।

শ্যামল শেজ বিছাব আমি সেথা শৈলাচলে,
বাতাস গাবে ঘুমপাড়ানি তারার আঁখিতলে,
ঘুমাব আমি করিয়া শুধু তোমারি নাম ধ্যান,
ভাঙিলে ঘুম প্রথম তব গাহিব নাম গান ঃ
হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ নবঘনশ্যাম
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম।

সে-নিরালায় রবে না কেহ আপন পর আর,
বৈরী নয়, বন্ধু নয়, কান্ত পরিবার,
মুখে কেবল তোমারি নাম রহিবে সাথী বঁধু,
তোমারি রবো সেবিকা রাঙি তোমারি রঙে শুধু ঃ
হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ গাহিয়া তব নাম
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম।

এমনি প্রেমে ডাকিব—চেয়ে ও-রাঙা পায়ে ঠাঁই
তোমারে শুধু দেখিব—আঁখি রাখিব হে যেথাই।
প্রেম আমার তোমারে বঁধু আনিবে বেঁধে না কি?
মীরার হে গোপাল, দেখিব কেমনে দাও ফাঁকি ঃ
ডাকার মতো ডাকিব যবে একবার ও-নাম
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম।

ভক্তি-পথ

স্বামী জীবানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসংখ্য উপদেশের মধ্যে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন ক'রে দেওয়ার বাণীই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাকে তিনি বার বার শুনিয়েছেন: মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ।

এখন প্রশ্ন আসে,—ভগবান লাভ ক'রে কি হবে? উত্তর: দুঃখের হাত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে—জীবন মধুময় হবে। গীতায় আছে:

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

আমরা যে আনন্দ থেকে এসেছি—সেই আনন্দ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই। ঈশ্বরই সেই আনন্দস্বরূপ। তিনি রসস্বরূপ 'রসো বৈ সঃ'—পরম-প্রেমস্বরূপ।

প্রেমময় ঈশ্বরকে পাবার জন্য বহু সাধক ও বহু আচার্য নিজেদের উপলব্ধি থেকে লোককল্যাণার্থে বিভিন্ন মতের ও পথের নির্দেশ দিয়েছেন। যে-কোন একটি মত বা পথকে অবলম্বন ক'রে ঐকান্তিকী নিষ্ঠায় গুরুনির্দিষ্ট সাধন-পথে অগ্রসর হ'তে থাকলে সাধক যথাকালে সকলের একই গন্তব্যস্থল ঈশ্বরে পৌঁছুতে পারে। ভক্তিপথই সর্বসাধারণের উপযোগী এবং সর্বাপেক্ষা সহজ সরল ও প্রশস্ত পথ।

ভক্তি-পথ সহজ কেন? প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই আছে ভালবাসার অন্তঃসলিলা রস-নির্ঝরিণী। মানুষে আবার এই হৃদয়াবেগ অধিকতর। ভালবাসার তিনটি রূপ—শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহ। গুরুজনদের উপর ভালবাসার যে প্রকাশ তাকে বলা হয় শ্রদ্ধা, সমবয়স্কদের প্রতি প্রকাশিত হ'লে প্রীতি বা সখ্য—আর কনিষ্ঠদের উপর ভালবাসার যে বাহ্য প্রকাশ তার নাম স্নেহ। শ্রদ্ধা প্রীতি ও স্নেহের বন্ধনে সকলেই বদ্ধ। মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি—এই অনুরাগ যখন ঈশ্বরে নিবেদিত হয় তখন এর নাম হয় ভক্তি। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেছেন, ঈশ্বরে পরম অনুরক্তিই ভক্তি—'সা পরানুরক্তি-রীশ্বরে'। দেবর্ষি নারদের মতে ভক্তি হচ্ছে—ঈশ্বরের উপর পরম প্রেম—'সা ত্বস্মিন্ পরম-প্রেমরূপা'। পরম অনুরাগ আর পরম প্রেম একই। পরিবর্তনশীল জগতে সবই ক্ষণস্থায়ী—অতএব জাগতিক ভালবাসাও ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র প্রেমময় ঈশ্বর বা পরমাত্মাই নিত্য বা অবিনাশী; সেইজন্য ঈশ্বরের উপর প্রেমও নিত্য ও অবিনাশী. যে অনুরাগ আমাদের স্বাভাবিক, অন্য কোথাও থেকে আনতে হয় না—তা মানুষকে না দিয়ে ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে পারলেই হ'ল। ভক্তিপথে হৃদয়াবেগের শুধু 'মোড়' ফিরিয়ে দেওয়া—তাই এ পথ সহজ।

আবার মানুষের আছে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি স্বাভাবিক বৃত্তি। যদি কামনা করতেই হয় তবে ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা ঐশ্বর্য প্রার্থনা না ক'রে সকল সুখৈশ্বর্যের উৎসস্বরূপ ভগবানকেই চাই না কেন? যদি ক্রোধ না যায় তবে মানুষের উপর ক্রুদ্ধ না হ'য়ে ভগবৎকৃপা লাভ হ'ল না ব'লে তাঁরই উপর ক্রোধ করি না কেন? কাম ক্রোধ লোভ মান-অভিমান সবই তাঁকে কেন্দ্র ক'রে হোক। ভক্তি-পথে নিজস্ব বৃত্তিগুলিকে জোর ক'রে ছাড়তে হয় না—শুধু ভগবানের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হয়, তাই এ পথ সহজ।

শরীর-মনকে কেন্দ্র ক'রে যতক্ষণ অহংকার অভিমান ততক্ষণ নিজেকে শরীর-মনের অতীত ব'লে চিন্তা করা কষ্টকর। আবার রাজযোগ দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাও সুকঠিন। তাই ভক্তিমার্গই প্রশস্ত।

বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলের পক্ষেই ভক্তি-পথ উপযোগী ও সহজ।

অদ্বৈতসিদ্ধিকার আচার্য মধুসূদন সরস্বতী ভক্তির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এই ভাবে: দ্রবী-ভাবপূর্বিকা মনসো ভগবদাকাররূপা সবিকল্পবৃত্তি-র্ভক্তিরিতি—অর্থাৎ ভগবৎপ্রেমে দ্রবীভূত হ'য়ে ভগবানের সঙ্গে চিত্তের যে তদাকার ভাব তা-ই ভক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান স্বয়ং ভক্তির লক্ষণ নিম্নোক্তরূপ বলেছেন:

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তম॥

শ্রীভগবানের গুণগান শ্রবণমাত্রই তাঁর প্রতি সমুদ্রগামিনী গঙ্গার স্রোতোধারার মত চিত্তের যে অহেতুক অবিচ্ছিন্ন গতি তা-ই ভক্তি।

ভক্তি দুই প্রকার: (১) গৌণী, (২) পরা। সাধনাবস্থার ভক্তির নাম গৌণী ভক্তি, আর সিদ্ধাবস্থার ভক্তির নাম পরাভক্তি। গৌণী ভক্তি আবার দুই প্রকার: (১) বৈধী, (২) রাগাত্মিকা। শ্রীগুরুর উপদেশানুসারে এবং শাস্ত্রের সহায়তায় শ্রীভগবানের উপর প্রীতি উৎপাদনের জন্য যে সাধন তাকে বলা হয় বৈধী ভক্তি। 'বিধিসাধ্যমানা বৈধী সোপানরূপা।' (দৈবীমীমাংসা-দর্শন)

সাধন-পথে অগ্রসর হওয়ার সোপান-স্বরূপ বৈধী ভক্তির নয়টি অঙ্গ যথাক্রমে:

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

হে ঈশ্বর! কর্ণকুহরে যেন অহর্নিশি তোমারই বাণী প্রবিষ্ট হয়, মুখে সর্বদা যেন তোমারই কথা উচ্চারণ ও তোমার নাম-গুণ গান করি, তোমার স্মরণ-মননে পূজা-বন্দনা-সেবায় যেন আমার কাল কাটে, সংসারে একমাত্র তুমিই আমার বন্ধু—একমাত্র প্রভু, আমি তোমার দাস, তোমার শরণাগত, তোমারই উপর আমার আত্মসমর্পণ—এই ভাবে বৈধী ভক্তির সমস্ত অঙ্গের সাধন দ্বারা চিত্ত নির্মল হ'লে সাধকের অন্তঃকরণ শ্রীভগবানের যথার্থ মন্দিরে পরিণত হয়, তখন তাঁর চিত্তে অবিরল প্রেমধারা প্রবাহিত হ'তে থাকে। ভগবৎপ্রেমের এই অবস্থার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণে মহর্ষি অঙ্গিরা বলেছেন: 'রসানুভাবিকানন্দ-শান্তিদা রাগাত্মিকা।' রাগাত্মিকা ভক্তির উদয়ে সেই রসস্বরূপ—আনন্দ-স্বরূপের অনুভব হয়, পার্থিব শোক-দুঃখ মান-অপমানের বহু ঊর্ধ্বে তখন মন অবস্থান করে এবং অপার শান্তি অনুভূত হয়।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রিয়তম ভগবান ব্যতীত আর কিছুই চান না। সাংসারিক সুখ, ভোগবিলাস তাঁর নিকট অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সমস্ত ভূমণ্ডলের আধিপত্য এবং অণিমাদি সিদ্ধিও তাঁর কাম্য নয়।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥

ভাগবত, ১১।১৪।১৪

প্রকৃত ভক্তের অষ্টবিধ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। এইরূপ ভক্তের মধ্যে নানা অলৌকিকত্ব দেখা যায়; তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও আনন্দ প্রকাশ করেন, কখনও বা মৌন-ভাবে অবস্থান করেন।

ক্বচিদ্ রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥

ঐ: ১১।৩।৩২

পরাভক্তির অবস্থায় ভক্ত ভগবানের চিন্ময়রূপ দর্শন ক'রে কৃতকৃত্য হন। পরাভক্তি লাভ হ'লে

জ্ঞানের প্রকাশ হয়। বস্তুতঃ পরাভক্তি ও পর-জ্ঞান একই। গন্তব্য স্থলে পৌঁছে গেলে আর বিভিন্নতা থাকে না, বিভিন্নতা কেবল সাধন-মার্গে। জ্ঞানমার্গের সাধক 'আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই' এইরূপ 'নেতি নেতি' ক'রে বিচারের দ্বারা নিজেকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত-স্বরূপ আত্মা-রূপে—'শুদ্ধ অহং'-রূপে উপলব্ধি করেন, সর্বভূতও তাঁর কাছে 'আত্ম'-রূপে প্রতিভাত হয়। ভক্ত কিন্তু 'নাহং নাহং, তুঁহু, তুঁহু'—ভাবে বিভোর হ'য়ে সতত নিজেকে ভগবানের দাস বা সন্তান মনে ক'রে নিজের 'কাঁচা আমি'টাকে নাশ ক'রে দেন—তিনি সর্বত্র সকল প্রাণীর মধ্যে ভগবানকে দেখেন আর বলেন, 'হে ভগবান, একমাত্র তুমিই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিরাজমান; তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই, তোমাকে ছাড়া আর কিছুই দেখি না।' সিদ্ধাবস্থায় ভক্ত এবং জ্ঞানী উভয়েই উচ্চতম স্তরে উঠে যান—যেখান থেকে দেখলে সব কিছু এক, সমান; তবে পার্থক্য শুধু ভাষার অর্থাৎ 'আমি' এবং 'তুমি'র—ভক্তের 'বিরাট তুমি' আর জ্ঞানীর 'বিরাট আমি'র লক্ষ্য বস্তু একই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়। সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই। স্বপ্নবৎ বলে না, তবে বলে তিনিই সব হয়েছেন, মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা রূপ। পাকা ভক্তিলাভ হ'লে এইরূপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জমলে ন্যাবা লাগে; তখন দেখে যে সবই হলদে। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে, আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হ'ল। পারার হ্রদে সীসে অনেক দিন থাকলে পারা হ'য়ে যায়। কুমুরে পোকা ভেবে আরশুলা নিশ্চল হ'য়ে যায়; নড়ে না, শেষে কুমুরে পোকাই হ'য়ে যায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হ'য়ে যায়। আবার দেখে—'তিনি'ই আমি, আমিই 'তিনি'।"

সতত তদ্গতচিত্ত ভক্তকে ভগবান বুদ্ধিযোগ দেন, তাঁর হৃদয়ে জ্ঞানের দীপ প্রজ্বলিত ক'রে সমস্ত অজ্ঞান দূর ক'রে দেন। বস্তুতঃ প্রকৃত ভক্ত ও প্রকৃত জ্ঞানী উভয়েই জাতিগত, সম্প্রদায়গত ভেদের বহু ঊর্ধ্বে; শুচি-অশুচির অতীত অবস্থায় তাঁদের স্থান। যেখানে তাঁরা বিচরণ করেন সে স্থান পবিত্র হয়, যাঁরা তাঁদের দর্শন লাভ করেন তাঁরাও পবিত্র হন।

ভক্তিপথে কৃতকৃত্য সাধকের—জ্ঞানীর মতোই মৃত্যুভয় নেই। মৃত্যু যদি আসে তবে ভক্তের মনে হয়—ভগবানের দূত এসেছে। ভগবানের মন্দির এই শরীর তিনিই দিয়েছেন, তিনিই যখন খুশি নিয়ে নিতে পারেন—তবে মৃত্যুভয়ে হৃদয় কম্পিত হবে কেন? সংসারে আত্মীয় পরিজনের বিয়োগেও ভক্ত শোকগ্রস্ত হন না। জ্ঞানীর তো কথাই নেই—জ্ঞানী নিজেকে পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি ক'রে ভূমানন্দে পূর্ণ হয়ে যান—আত্মারাম তিনি, তাঁর কাছে শোক-মোহের স্থান কোথায়?

ভক্ত ভগবানকে আস্বাদন করতে চান,—ভক্ত চিনি হ'তে চান না, চিনি খেতে ভাল বাসেন।

অনন্ত ভগবান ভক্তের ভক্তিহিমে জমে গিয়ে সান্তরূপে তাঁর কাছে ধরা দেন—এ যেমন অলৌকিক, তেমনি বিস্ময়কর। এতকাল যাঁর প্রতীক্ষারত ছিলেন তাঁকে কাছে পেয়ে ভক্ত প্রেমভক্তির আস্বাদন করতে থাকেন। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর—এই পঞ্চভাবের কোন একটি অবলম্বন ক'রে ভক্ত নরশরীরে অবতীর্ণ ভগবানকে আস্বাদন ক'রে ধন্য হন। শান্ত ভক্ত উচ্ছ্বাসহীন, শ্রদ্ধা-ভক্তির মাধ্যমে তিনি ভগবানের লীলারস উপভোগ করেন। দাস্য ভক্তির সেব্যসেবক ভাব—ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে সাধকের অপার আনন্দ, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। সখ্য ভাবের সাধক মনে করেন ভগবান তাঁর সখা, তাই বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে লৌকিক ব্যবহার তিনি সবই ভগবানের উপর

প্রদর্শন করেন। বাৎসল্য ভাবে ঈশ্বরকে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে বিযুক্ত ক'রে নিজের সন্তানরূপে ভাবনা করা হয়। সর্বশেষে মধুর ভাব; এতে শ্রীভগবানকে পতিভাবে ভাবনা কর্তব্য।

নররূপধারী ভগবানের চরিত্র এমনি বিপুল এবং বিরাট যে মানুষের পক্ষে তার পূর্ণ ধারণা ও অনুধ্যান সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণকে মা-যশোদা তাঁর স্নেহের দুলাল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারেন নি, বাৎসল্য রসে তিনি ছিলেন সিক্ত--ওতপ্রোত। অর্জুনের কাছে কৃষ্ণ তাঁর সখা—সারথি। দেহভাব-বিবর্জিতা শ্রীরাধা ও গোপীরা জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পতিভাবে চেয়েছিলেন।

আর একটি ভাব আছে যেটি অতি পবিত্র এবং সকলেরই অনুভবের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ নেই।' ঈশ্বরকে মাতৃরূপে কল্পনা ক'রে সাধক ভক্ত নিজের উপর পাঁচ বছরের অবোধ শিশুর ভাবটি আরোপ করেন—মার জন্য কাঁদেন, মার কাছে আবদার করেন। তাঁর রাগ অভিমান সবই শিশুর মতো।

অনন্ত ভগবানের অনন্ত নাম। তিনিই সৃষ্টি করেছেন নিজের বহু নাম এবং সেই সব নামে অপার শক্তি ঢেলে দিয়েছেন—এমন শক্তি যে নাম জপের ফলে জীবের মোহ বন্ধন কাটে—দেহমন শুদ্ধ হ'য়ে যায়। তাই বলা হয় 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'; 'নাম ও নামী এক'। নামের দ্বারাই নামীর দর্শন লাভ হয়। নাম-স্মরণের নিয়মিত কোন স্থান কাল নেই, যখন খুশি অনুরাগের সহিত নাম করতে পারলেই হ'ল। 'শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ অবিরাম' এই কথাটি যেন ভক্তের কণ্ঠহার। শ্রীশ্রীমা বলতেন, ঘড়ির কাঁটা যেমন টিক্ টিক্ করে, তেমনি নিরন্তর অন্তরে নাম জপ করতে হয়।

ভক্তিলাভের প্রধান উপায় ব্যাকুলতা—অন্তরে অভাববোধ এবং অভ্যাস—সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা। ভক্তিমার্গে শরণাগতির স্থান অতি উচ্চে—সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় নিজেকে ভগবানের ইচ্ছায় সমর্পণ করা। তিনি যখন যে ভাবে রাখেন সেই ভাল—সুখ দুঃখ সব তাঁরই দান—শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় বিড়াল-ছানার মতো হওয়া—কখনও হেঁসেলে, কখনও বা পালঙ্কের উপর। মাতৃনির্ভর হ'তে পারলেই নির্ভয়ে থাকা যায়। 'উলটু জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ।' জলের শরণাগত হ'য়ে মাছ অক্লেশে স্রোতের বিপরীত মুখে কেমন চলতে থাকে—শক্তিধর গজরাজ ভেসে যায়। 'জো যাকে শরণ লিয়ে সো রাখে তাকো লাজ'; ভক্তি-পথের শেষ কথা—শরণাগতি। শরণাগতির জন্যই ভগবান ভক্তাধীন হ'য়ে পড়েন।

চির-আনন্দময়

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দে

এ মোর জীবন তোমারি সৃজন
এই জানি পরিচয়,
তোমারি মহিমা নিয়ত গাহিয়া
হয় যেন মোর লয়।

জাগাতে জীবন নিবারিতে ক্ষুধা
জননীর বুকে তুমি দাও সুধা
তোমারি ত মায়া, তুমিই মুক্তি
চির-আনন্দময়!

সুখে দুখে তুমি জীবনে মরণে
জাগ্রত বরাভয়।

কবি বিদ্যাপতি

শ্রীপ্রণব ঘোষ

দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণসেনদেবের রাজসভার অন্যতম কবি জয়দেব রচনা করেন 'শ্রীগীতগোবিন্দ' তাহা একই সঙ্গে "মঙ্গলমুজ্জ্বলম্ গীতি" এবং "মধুর কোমলকান্ত" পদাবলী। কালিদাসের মেঘদূতের পর আর কোন কাব্য এমনভাবে ভারতভূমির সর্বত্র রসিকজনবন্দনীয় হয় নাই। দেখিতে দেখিতে ইহার প্রভাব অপরাপর সাহিত্যে দেখা দিল। বাংলার নিকটতম প্রতিবেশী মিথিলা। মৈথিলী সাহিত্যে এ প্রভাবের গীতিময় প্রকাশ দেখা দিল হরিসিংহদেবের সভাকবি উমাপতি উপাধ্যায়ের 'পারিজাতহরণ'—নাটকে। এই নাটকের মৈথিলী-ভাষায় লেখা একুশটি গানে জয়দেবের পদাবলীর পরবর্তী রূপ দেখিতে পাই। অনুমান করা চলে যে, মৈথিলী ভাষায় এ পদাবলীর ধারা ছিল জনপ্রিয় এবং প্রবহমান। তাই একশত বৎসর পরে পঞ্চদশ শতকে 'শ্রীবিদ্যাপতি ঠকুর' অবহট্‌ঠে কাহিনীমূলক কাব্যরচনা করিলেও পদাবলী রচনা করিলেন মৈথিলীভাষায়। ইঁহার পরবর্তী তিনজন ও পূর্ববর্তী একজন 'বিদ্যাপতি'র নাম পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়, মধ্যযুগের কাব্যধারায় 'বিদ্যাপতি' নামটি ছিল উপাধি।

আমাদের আলোচ্য কবি "বিদ্যাপতি"—কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ প্রমুখ মিথিলাধিপতিগণের সভাকবি। ইঁহার চম্পূকাব্য "কীর্তিপতাকা" ও "কীর্তিলতা"; গদ্যগ্রন্থ—"ভূ-পরিক্রমা", "পুরুষ-পরীক্ষা"; পূজাপদ্ধতিগ্রন্থ "গঙ্গাবাক্যাবলী" ও "শৈব-সর্বস্বসার"; সর্বশেষ তিনটি গ্রন্থ—"বিভাগসার", "দানবাক্যাবলী", ও "স্মৃতিনিবন্ধ"। কেহ কেহ অনুমান করেন—"মণিমঞ্জরী" এবং "গোরক্ষবিজয়"—এই দুইটি সংস্কৃত নাটক বিদ্যাপতিরই রচনা। বিদ্যাপতির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার মৈথিল পদাবলীতে। দেবসিংহের পূর্ববর্তী কোন মৈথিল রাজার উল্লেখ তাঁহার পদাবলীতে নাই। এজন্য অনুমান করা চলে দেবসিংহের রাজত্বকাল হইতেই বিদ্যাপতির পদাবলী রচনা আরম্ভ।

বিদ্যাপতির প্রথম সৃষ্টি 'কীর্তিলতা।' ইহার ভাষা অবহট্‌ঠ বা প্রাচীন অপভ্রংশ। রচনারীতি, সংক্ষিপ্ত বাক্যের তীব্রতা উপমাসৌকর্য এবং ছন্দো-বৈচিত্র্যের দিক দিয়া 'কীর্তিলতা' বিদ্যাপতির নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিদ্যাপতির বাস্তবদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হিন্দুমুসলমানের সংঘাত ও সমন্বয়ে তরঙ্গিত মিথিলার সমাজ-জীবন। ঘটনা ও ভাবের স্পন্দন অনুসরণ করিয়া কবি এ কাব্যে যে ছন্দস্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছেন তাহা অপূর্ব। আরও একটি দিকে 'কীর্তিলতা'র সার্থকতা আছে। বিদ্যাপতি ছিলেন সৌন্দর্যের চিরমুগ্ধ বাক্‌শিল্পী। সেই সৌন্দর্যবন্দনার প্রথম আভাসটি আছে 'কীর্তিলতা'র নারীসৌন্দর্য বর্ণনায়। পদাবলীতে শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি এই সৌন্দর্যসন্ধানী দৃষ্টিরই তিল আহরণের অমৃতফল।

তবু 'কীর্তিলতা'য় কবি সিদ্ধ নহেন—প্রথম স্তরে উপনীত প্রবর্তক মাত্র। কীর্তিলতার ছন্দ অসম, ভাষায় আতিশয্য বারংবার দেখা দেয়, আর কলা-কৌশল—প্রথম সৃষ্টির শিথিলতাকে ঘনবন্ধনে বাঁধিতে পারে না। কিন্তু বিদ্যাপতির পদরচনার গাঢ়বদ্ধ রূপটি 'কীর্তিলতা'র নানা জায়গায় দেখিতে পাই। স্থানে স্থানে ইহার বাক্যবিন্যাস প্রবাদসুলভ সংহতি লাভ করিয়াছে—

মানবিহুনা ভোঅনা, সত্ত ক দেলে রাজ।
শরণ পইঠ্‌ঠে জীঅনা তীনু কাঅর কাজ॥

মানবিহীন ভোজন, শত্রুগ্রস্ত রাজ্য, ও শরণাগত হইয়া জীবন রক্ষা—এই তিনটিই কাতরের কার্য।

'কীর্তিপতাকা'য় বিদ্যাপতি শিবসিংহের যশ গাহিয়াছেন। শিবসিংহের রাজত্বকালেই বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদ রচিত হয়। অবহট্ঠ হইতে ব্রজবুলিতে কাব্যরচনার প্রেরণা কিভাবে আসিল, তাহা বিস্ময়কর মনে হইলেও বিদ্যাপতির ভাষানির্বাচন-শক্তির প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই। মৈথিলী ও অবহট্ঠের মিশ্রণে রচিত এ ভাষাটির অপূর্ব নমনীয়তা ইহাকে পদসাহিত্যের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। 'ব্রজবুলি' নামটি অবশ্য একালের দেওয়া, প্রাচীন কবিদের কেহই 'ব্রজবুলি' কথাটি ব্যবহার করেন নাই। আধুনিক কালে ব্রজের ভাষা মনে করিয়া বাঙালীরা ইহাকে ভুল করিয়া 'ব্রজবুলি' নাম দিয়াছেন। ব্রজের ভাষা 'ব্রজভাখা' আধুনিক হিন্দীরই শাখা।

গীতগোবিন্দের পদাবলী সাজানো হইয়াছে--নাটযাত্রার অনুসরণে। ফলে ইহার মধ্য দিয়া বেশ একটি ঘটনাপরম্পরা ও নাটকোচিত উত্তরণের অনুভব মনে জাগে। মিলন, বিরহ ও ভাবসম্মেলনে এবং সখীদের দ্বারা লীলায়িত রাধাকৃষ্ণলীলা-বর্ণনায় জয়দেব ছিলেন প্রথম পথিকৃৎ। জয়দেবের পদাবলীর উত্তরসূরী বিদ্যাপতি এই নাটকীয় ধারা তাঁহার পদাবলীর ধারার মধ্যেও অলক্ষ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন। সেই সঙ্গে সখীদের প্রাধান্য তাঁহার কাব্যে আরও স্পষ্ট। কিন্তু পূর্বরাগের পরিকল্পনায় বিদ্যাপতিই প্রথম পদরচনার কৃতিত্বের অধিকারী। পরবর্তী কবি 'বড়ু চণ্ডীদাসে'র "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে"ও আমরা পূর্বরাগের পদ পাই না। যদিও 'চণ্ডীদাস' নামাঙ্কিত পদাবলী-সাহিত্যে পূর্বরাগের অজস্র উদাহরণ মেলে। এ দুই কবি এককালের কি না, সে সম্বন্ধে আজও নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। কিন্তু বিদ্যাপতির ঐতিহাসিক পরিচিতি সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত; তাই, পূর্বরাগের প্রথম পদাবলী-রচয়িতার সম্মান তাঁহাকেই অর্পণ করিতে হয়।

পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহ অবধি বিদ্যাপতি যে পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্তরালে সংস্কৃত সাহিত্যের যুগসঞ্চিত প্রেমকাব্য সহায়তা করিয়াছে। নারীহৃদয়ের ক্রমবিবর্তনে প্রেমের বিকাশ প্রতিটি স্তরে সংস্কৃত কবিগণ অপূর্ব সার্থকতার সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ঐশ্বর্যভাণ্ডার হইতে তিল তিল গ্রহণ করিয়া যে তিলোত্তমাকে বিদ্যাপতি রূপ দিয়াছেন, সে লাবণ্যময়ীর পরিচয় কিন্তু কোন অনুকরণেই আবদ্ধ নহে। রূপদক্ষ কবি তাহার মধ্যে এমন একটি প্রাণময় গতি সঞ্চার করিয়াছেন, এমন একটি কল্পনার অলৌকিক অঞ্জন পরাইয়া দিয়াছেন, যাহার ফলে পদাবলী-সাহিত্যের চিরপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে।

পূর্বরাগের মতো বয়ঃসন্ধির সুন্দর পদগুলিও বিদ্যাপতির নিজস্ব সংযোজন। দেহপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের সূক্ষ্ম সুকুমার পরিবর্তনগুলি কবি নিপুণ তুলিকার দ্বারা রেখায় রেখায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অভিসার পদাবলীরও আদিতে আছেন বিদ্যাপতি। সংস্কৃত সাহিত্যে অভিসারের চিত্র আছে নায়িকার অসংবরণীয় হৃদয়াবেগের প্রতীকরূপে। কিন্তু বাধা বিঘ্ন সঙ্কটের মধ্য দিয়া শ্রীরাধার অভিসারকে বিদ্যাপতি যে গভীরতর স্পর্শ দিয়াছেন তাহার ব্যঞ্জনা অধ্যাত্মধর্মী। অভিসারের পরে আশানুরূপ সার্থকতা বিদ্যাপতির 'মিলন'-পদাবলীতে নাই। কিন্তু মাথুর-বিরহের বিদীর্ণ আকুলতা অলঙ্কারশাস্ত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অনন্তলোকে উত্তীর্ণ।

জয়দেবের কাব্যে ভাবমিলনের সামান্য স্পর্শ দেখি এই ছত্রটিতে—

"মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥"

কিন্তু বিদ্যাপতি বিরহের ব্যথাবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণটিতে ধ্যানতন্ময়া শ্রীরাধার মানসনেত্রে যে প্রিয়তমের আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন, তাহাতে মানবহৃদয় প্রেমের শাশ্বত সত্যস্বরূপকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের বিরহই হয়তো ইহলোকের কাহিনীগত সত্য, কিন্তু বিদ্যাপতি ইহাকেই চরম বলিয়া ভাবেন নাই। রাধিকার তদ্‌গত হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের আবির্ভাব ঘটাইয়া শ্রেষ্ঠ কবিকল্পনার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীরাধার রূপবর্ণনায় বিদ্যাপতির উপমা :

লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার॥

আর একটি স্থলে কবি বলিতেছেন—এ রূপ যেন :

কনকলতা অবলম্বন উয়ল
হরিণহীন হিমধামা॥

—নিষ্কলঙ্ক চাঁদ উঠিয়াছে কনকলতাকে অবলম্বন করিয়া। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের উপমায় সখী বলিতেছেন :

খোঁজল সকল মহীতল গেহ।
খীর নীর সম না হেরল নেহ॥

এমন অবিচ্ছেদ্য প্রেম একমাত্র রাধাকৃষ্ণের।

অভিসারিকা রাধা—

বরিস পয়োধর ধরণী বারি ভর
রয়নি মহা ভয়ভীমা।
এইও চললি ধনি নিজ গুণ মনে গুণি
তনু সাহস নাহি সীমা॥
দেখি ভবনভিতি লিখন ভুজগপতি
জসু মনে পরম তরাসে।
সে সুবদনি করে ঝপইত ফণিমণি
বিহুসি আইলি তুহুঁ পাসে॥

এমন দুর্যোগময়ী বর্ষার অন্ধকার রজনীতে, প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত সর্প দেখিয়া যাহার ভয় হয়, সে নির্ভয়ে সাপের মাথার মণি দুইহাতে আবৃত করিয়া তোমার কাছে আসিয়াছে। এ প্রেমকে বাধা দিবে কে? কবি কল্পনার আতিশয্যবশতঃ সাপের মাথার মণি হইতে বিচ্ছুরিত আলোককেও কবি অভিসারের বিঘ্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু অভিসারের দুর্নিবার গতি-সংকেতটি এখানে চমৎকার ফুটিয়াছে। অভিসারের পর মিলন, কিন্তু সে তো জীবনের মতো কাব্যেও ক্ষণস্থায়ী। বিদ্যাপতির পদাবলীতে বিরহই রসোত্তীর্ণ।

বিরহিনীর চিরকালের বেদনায় রাধা বলিয়াছেন—

অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ-মেহে।
ই নব যৌবন বিরহে গমাওব
কি করব সো পিয়া-নেহে॥
হরি হরি কো ইহ দৈব-দুরাশা।
সিন্ধু নিকট যদি কণ্ঠ সুখাএব
কো দুর করব পিয়াসা॥

সূর্যতাপে অঙ্কুর যদি শুষ্ক হয়, তবে বারি-বর্ষণে কি ফল হইবে? বিরহদীর্ণ এ জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটি চলিয়া গেলে আর কি হৃদয় তেমন করিয়া প্রিয়-আহ্বানে সাড়া দিবে? হায় এ কি দুরাশা, সিন্ধুতীরে আসিয়া যদি কণ্ঠ শুকায় তবে কে সেই পিপাসা দূর করিবে? আর এ বেদনার কথা আমি কাহার কাছে বলিব—এ প্রেমের স্মৃতি যে অন্তরের অন্তঃস্থলে আমরণ আগুন হইয়া দগ্ধ করিতে থাকিবে, তবু সংসারের মানুষকে ডাকিয়া বলিবার উপায় নাই—

চোর-রমণি জনি মনে মনে রোতই
অম্বর বদন ছিপাই।
দীপক লোভ সলভ জনি ধাএল
সে ফল ভুজইও চাই॥

চোরের রমণী যেমন অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া গোপনে কাঁদিতে বাধ্য হয়, তেমনি তো আমার ক্রন্দন। প্রদীপের শিখা দেখিয়া উন্মত্ত পতঙ্গ ধাবিত

হইয়াছিল ; তাহার ফল তো ভোগ করিতেই হইবে। তারপর একদিন—

অনুখন মাধব মাধব সুমরইত
　　সুন্দরি ভেলি মধাই।
ও নিজ ভাব সুভাবহি বিসরল
　　অপনে গুণ লুবুধাই ॥"

—প্রিয়তমকে ভাবিতে ভাবিতে রাধা সেই প্রিয়তমের স্বরূপেই রূপান্তরিতা হইলেন। এমনি অনুভবের মধ্য দিয়া একদিন শ্রীরাধা ভাবনেত্রে দর্শন করিলেন—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু,
　　পেখনু পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল কহি মাননু
　　দশ দিশ ভেল নিবদন্দা ॥

যিনি বাহিরে ছিলেন বলিয়া অদর্শনের বেদনা, আজ অন্তরের মন্দিরে তিনি চিরদিনের জন্ম আসিয়াছেন—আর তো দুঃখ নাই।

কি কহব রে সখি, আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥

ভক্তকবির এমন অলোক কল্পনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া যখন শুনি তাঁহার অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা—

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দএ তুলসী তিল দেহ সোপল
　দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥

তখন গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সম্মিলিত সুরটি বৈষ্ণব কবিদের অন্তরের বাণী বহন করিয়া আনে।

সন্দেহ নাই, পদাবলীতেই বিদ্যাপতির প্রতিভার সানন্দ বিকাশ। তাঁহার অপরাপর রচনার মধ্যে এক 'কীর্তিলতা' ছাড়া আর কোথাও এই অমর প্রতিভার উপযুক্ত নিদর্শন মেলে না। সে সব রচনায় তিনি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, কিন্তু রসবিদগ্ধ মহাকবি নহেন। অবশ্য জয়দেবের মতোই বিদ্যাপতিও আক্ষরিক অর্থে বৈষ্ণব কবি নহেন। তাঁহার উপাস্য দেবতা বোধ করি একাধিক। পদরচনার ক্ষেত্রে তিনি হরগৌরীকেও অবলম্বন করিয়াছেন। দুরিতবারিণী দুর্গার স্তবের মধ্য দিয়া দেবীর রুদ্রাণী-রূপটি তিনি সুন্দর ফুটাইয়াছেন। দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতি তাঁহার অবিচলিত ভক্তি ছিল। রাজ্যচ্যুত দুই ভায়ের উপমায় তিনি তাঁহার চম্পূকাব্যে রামলক্ষ্মণের উপমা দিয়াছেন। ভক্তি-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁহার মানসিক ব্যাপ্তি ছিল। সেদিক দিয়া তিনি পদাবলী-সাহিত্যের প্রথম এবং প্রধান কৃতী হইলেও আক্ষরিক অর্থে "বৈষ্ণব" নহেন।

কিন্তু মিথিলা অপেক্ষা বাংলা দেশ বিদ্যাপতিকে আপন করিয়া লইয়াছে। তাঁহার মৈথিল পদাবলীর মধ্য দিয়া বৃন্দাবনলীলা আস্বাদ করিয়া বাঙালী ইহাকে ব্রজধামের ভাষা ভাবিয়াছে। যশোরাজখান হইতে 'ভানুসিংহ' অবধি সেই ব্রজবুলির অমৃতসিঞ্চনে বাঙালী ধন্য। মহাপ্রভুর আস্বাদনের মধ্য দিয়াই বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙালীহৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আলোড়ন তুলিয়াছিল। নীলাচলে প্রত্যহ বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে চণ্ডীদাস ও রামানন্দ রায়ের গানও হইত। কিন্তু শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তনের উন্মাদনায় একদা 'কি কহব রে সখি' পদটি গাহিয়া মহাপ্রভু যেভাবে সারাটি রজনী বিভোর হইয়া-ছিলেন, আর কোন পদের সে সৌভাগ্য হয় নাই। এ পদটি বিদ্যাপতির রচনা। বিদ্যাপতির রসসাধনায় মহাপ্রভুর প্রাণের সম্মিলন বাংলা পদাবলীর সাহিত্যের সকল শ্রেষ্ঠ কৃতীকেই প্রভাবিত করিয়াছে। হোসেন শাহের কর্মচারী দৈবকীনন্দন সিংহ ব্রজবুলিপদ রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া 'বিদ্যাপতি' খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিলেই তাঁহার পদে বিদ্যাপতির বাগ্‌ভঙ্গির প্রভাব বুঝা যায়। বিদ্যাপতির সার্থকতম উত্তরাধিকারী গোবিন্দ দাস। গোবিন্দ দাসে বিদ্যাপতির রস-মাধুর্য আরো ঘন গভীর ও চিত্ররূপময় হইয়া দেখা দিয়াছে। পরবর্তীকালে চন্দ্রশেখর শিশেখরের

পদাবলী বিদ্যাপতির সুদূরপ্রসারী প্রভাবের নিদর্শন। সমগ্রভাবে মধ্যযুগের ব্রজবুলিতে পদরচয়িতাগণ সকলেই বিদ্যাপতির নির্দিষ্ট সরণিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বাংলার পদাবলী-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন ব্রজবুলি-সাহিত্য বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে যাত্রা শুরু করিয়াছে এবং মহাপ্রভুর জীবনস্পর্শে প্রাণায়িত হইয়া সমগ্র মধ্যযুগের কাব্যধারাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে।

ত্রিযুগীনারায়ণ

স্বামী সুত্রানন্দ

ত্রিযুগীনারায়ণ পৌঁছে আমাদের সে কি আনন্দ! অতীব দুঃখ কষ্ট সহ্য ক'রে হবিগবের স্মৃতিবিজড়িত এই তীর্থস্থানে এসে আনন্দানুভব না করা স্থূল মনেরই পরিচয়। আমরা উচ্চ স্তরে উঠলেও সূক্ষ্ম স্তরে উঠে গেছি, তা নয়। সমাজ-বদ্ধ মানুষ, নির্জনবাস করেনি যারা—তারা বুঝতে পারে না নির্জনতা কি ভয়ানক অবস্থা। আবার মানুষ সাধারণতঃ চায় একটা কিছু ধ'রে রাখতে। যারা গতানুগতিক নাগরিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশাকে ধ'রে রেখে দুর্গম হিমালয়-তীর্থে যাত্রা করেন, তারাই নিরাশার বেদনা বোধ করেন। সে পথে প্রকৃতির সৌন্দর্য চোখে পড়লেও মন গম্ভীরভাব গ্রহণ করতে পারে না, হাঁপিয়ে উঠে। ভাবটা এরূপ—আসুন, আসুন! একটু কথা বলি; প্রাণ যে যায়। ত্রিযুগীনারায়ণে এসে আমাদের আনন্দ কতকটা এ ধরণেরই ছিল।

হরিদ্বার থেকে সাধারণ পথে অর্থাৎ দেবপ্রযাগ, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, মৈখণ্ডা ও ফাটাচটি হ'য়ে আমরা ত্রিযুগীনারায়ণ যাইনি। সে তো মাত্র ৫।৬ দিনের ব্যাপার। তাছাড়া চড়াই উৎরাই কম। রাস্তা ঘাট, বাস ও চটি—সর্বত্রই যাত্রীর ভিড়। আমরা ২৫।৩০ দিন গৃহছাড়া; এ ক'দিনে হরিদ্বার থেকে টিহরী হ'য়ে যমুনোত্রী ও উত্তরকাশী হ'য়ে গঙ্গোত্রী দর্শন ক'রে এসেছি। মাত্র টিহরী ও উত্তর-কাশী ছাড়া আর কোথাও সমাজ কিংবা সভ্যতার ন্যূনতম কোন উপকরণই আমাদের নয়নগোচর হয়নি। পত্র নেই, পত্রিকা নেই, স্কুল, ডাকঘর, হাট বাজার দূরে থাকুক—একটা দোকানও নেই ভাল। এমনকি কথা বলবার জন্য একটি ভদ্র-লোকেরও (?) দেখা পাওয়া কঠিন। থাকবার মধ্যে আছে ক্বচিৎ কোথাও সরল প্রকৃতির মানুষ—কুমায়ুনীর চাযের দোকান। দোকানে বেশী মিলে তো চা, আলু ও আটা। কোথাও বা চাল, দুধ, ঘি। সংসার-বন্ধন বা মায়াজাল-মুক্ত এমন অনেকে আছেন, যাঁরা ভগবানের উপর নির্ভরশীল অথবা প্রকৃতির রূপ-রস-সন্ধানী হ'যে এ ভীষণ নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ান, তারাই কেবলমাত্র সর্বাবস্থায় আনন্দ পাবার অধিকারী। তাঁদের পক্ষে সেখানে গ্রামের হিংসা, নিন্দা ও ঈর্ষার ভয় নেই—নেই অভাব অভিযোগের তাড়া। ধোঁয়া-ধুলো-আচ্ছন্ন সহরের হৈচৈ-সহ নেই যন্ত্রদানবের বিকট চিৎকার; আছে শুধু ছায়াশীতল অরণ্য, নির্মল বায়ু ও অফুরন্ত সৌন্দর্য—অব্যক্ত প্রশান্তি! পাহাড়ী লোকজন—সেও ঐ তরুলতারই মত নগ্ন সরল। সেখানে সমতলের সভ্যতা প্রবেশ করেনি—একে অপরকে সন্দেহ করতেও শেখেনি। নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রা। সেই সংস্কারমুক্ত পথিকগণ নিজেকে তাদেরই একজন মনে ক'রে, ঐ প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। সেখানে রাজনীতি, সমাজনীতি, বন্ধুবান্ধব, শত্রুমিত্রের কোন ভাবনা নেই—আছে সত্য, শিব ও সুন্দর।

বিগত ২৫।৩০ দিনের কথা তো গেল। এর

মধ্যে আবার শেষ তিন চারদিনের অবস্থা ভীতিপ্রদ। বস্তি বা লোকালয় একেবারেই নেই—কেবলমাত্র শ্বাপদসঙ্কুল ঘনবৃক্ষ-সন্নিবিষ্ট জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়। মধ্যে মধ্যে প্রবাহিতা মন্দগতি স্রোতস্বতী। আবার যেখানে জঙ্গল নেই, সেই উঁচু সানুদেশ কঠিন প্রস্তরবৎ মসৃণ হিমানীতে আবৃত। বহু বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ঐ বরফ ঢাকা পাহাড় পওয়ালীর তুঙ্গশীর্ষে উঠেছি। এখন অবতরণের পালা। ভোরবেলা পওয়ালীর সূর্যোদয় দর্শন করে আমরা স্তব্ধ। এর তুলনা মিলে না, এ এমনই সাধনায় ভাবাপ্লুত। মন আপনি সৃষ্টি-কর্তার চরণে লুটিয়ে পড়ে। এত উঁচুতে (,১০০০) নির্মল নীলাকাশের এককোণে মাধুর্যময় বালসূর্যের আবির্ভাব; দূরে অদূরে স্বচ্ছ তুষারকিরীট হিমাদ্রি-শিখর; বহুদূরে একখণ্ড হালকা মেঘ এখনও নিদ্রিত। পওয়ালীর উপর থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নে স্ফটিক শুভ্র পাহাড়ের আড়ালে সোনার থালার ন্যায় দিনের প্রথম আলো নিয়ে উদীয়মান ভানুদেব—কি অপূর্ব দৃশ্যপট। পাহাড়ে পাহাড়েই বা কি রূপ-সম্ভার ফুটে উঠেছে! পুরীর সূর্যোদয়, চট্টগ্রামের সূর্যাস্ত আর দার্জিলিংএর টাইগার হিল্? —হিমালয় ও তিব্বতের অনেক জায়গা ঘুরেছি—১৮৭০০০ ফুট উঁচু পাহাড় ডিঙ্গিয়েছি—এ হেন মনোহারী রূপ চোখে পড়েনি কোথাও!

পাহাড় চড়াই করা কঠিন সত্যি—বুক ধড়ফড় করে, শ্বাস কষ্ট হয়। কিন্তু উৎরাইও সহজ নয়—পা ভেঙ্গে পড়ে, বসে যেতে হয়। চড়াই থেকে উৎরাই অত্যধিক দুঃসহ, যদি সে ঢালু পথে থাকে পিচ্ছিল বরফ! আমাদের সামনে এখন পথ তার সেই ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করে এসে হাজির। অধিকন্তু পাহাড়টি ছিল আগাগোড়াই পাষাণময়। কখনও পথ এমন নিম্নাভিমুখী, মনে হয় যেন সিঁড়ি দিয়ে নামছি। আর চওড়া? এদিক ওদিক নড়লেই পাহাড় এসে গায়ে ঠেকে। আবার হয়তো কিছুটা সমান জায়গা আছে, কিন্তু বরফাবৃত বলে সে রাস্তা খুঁজে পাওয়া দায়। সামান্য পদস্খলন হ'লেই হল—কঠোর সমাজ-ব্যবস্থায় দণ্ডিতের ন্যায় শত শত ফুট নীচে নেবে যেতে হবে, আমৃত্যু একঘ'রে হ'য়ে থাকতে হবে। কেউ হাত ধ'রে একটু সাহায্য করতেও আসবে না। কে কাকে সাহায্য করবে? যে যার নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত। লোকে বলে 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয।' সত্যি তাই। এ দুর্গম পথের অর্ধেকটা আসতে না আসতেই আবার টিপ টিপ করে নেবে এলো বৃষ্টি। নামল তো সন্ধ্যা পর্যন্ত আর ছাড়বার নামটি নেই। এপথে যাত্রিগণ দলবদ্ধ হ'যে চলেন। সেদিন আমাদের দলে দু'তিন দিনের লোক মিলে প্রায় ৬০।৭০ জন ছিলেন। তার মধ্যে হযতো ৫।৭ জন ছাড়া, বাকী সকলেই অল্পবিস্তর আহত হয়েছিলেন। তিন জনের অবস্থা হয়েছিল গুরুতর। অতি সন্তর্পণে অল্প নয় মাইল রাস্তা অতিক্রম করে মঙ্গু চটিতে উপস্থিত হ'য়েই দেখছি মৌন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। এইটুকু আসতে সমস্ত দিনটা লেগে গেল। পৌঁছেই জনমানবহীন চটিতে শোরগোল আরম্ভ হ'য়ে গেল—কে এসেছে, কে আসেনি, কার জিনিসই বা কোথায়, কে কিরূপ আহত এবং কে-ই বা কোথায় রাত্রিবাসের জায়গা দখল করেছে ইত্যাদি। গোপালদা তার ছোটখাট চলন্ত ডিস্‌পেন্সারিটি খুলে বসলেন। ইতিমধ্যে খবর এলো—সবচেয়ে বড় শেঠজীর যে দলটি ছিল, তার একজন নিখোঁজ হয়েছে। টাকা পয়সা ও আলো দিয়ে নেপালী ও গাড়োয়ালী কুলীদের পাঠানো হ'ল—সবই বৃথা। আর অন্য চিন্তা করবার মত অতিরিক্ত ধৈর্য আমাদের ছিল না। রাত্রে আর উনুন ধরেনি। শুক্‌নো যা কিছু খাবার খেয়েই সকলে নিদ্রাদেবীর পদতলে মাথা নত করলেন।

সকালবেলা উঠে দেখছি চটিতে একজন

আমেরিকানও রয়েছেন - সঙ্গে দুটি কুলী। কোথা থেকে এলেন? গত দু'চারদিন তো তাঁর দেখা পাইনি? রতনবাবু এগিয়ে গেলেন; রোগ জিজ্ঞেস ক'রে গোপালদার নিকট থেকে দু'একটা কি ঔষধের পিলও তাকে দিয়ে আসলেন। তিনি এসেছেন এক্সপিডিশনে নয়—আমাদের সঙ্গেও নয়; এসেছেন তীর্থদর্শনেই, তবে আমাদের ঠিক উল্টো-দিক থেকে। বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ দর্শন ক'রে এসেছেন—যাবেন গঙ্গোত্রী, পরে যমুনোত্রী। এমন দুঃসাহস কেউ করে কিনা জানিনা। নব উৎসাহে, নূতন উদ্যমে, সুস্থ মনে ও সবল দেহে প্রথমে অপেক্ষাকৃত সুগম ও সহজ পথ অতিক্রম ক'রে, দীর্ঘদিন পরে ক্লান্ত শরীরে ও অশান্ত মনে দুর্গম ও চড়াই পথে আরোহণ নিশ্চয়ই সুবিধাজনক নয়! তবে আমেরিকানদের কথা আলাদা। তাঁদের মনোবল ও ধনবল আমাদের বাঙালী তথা ভারতবাসীদের মত নয়। ঐ যাত্রীটি দার্শনিক; হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফেরবার আগে হিমালয়ে এসেছেন হিন্দুতীর্থদর্শনে—বিশেষতঃ উত্তরকাশীর ধ্যানমগ্ন সাধু-সন্দর্শনে।

ভোর হ'তে না হ'তেই সকলে যে যার তল্পী-তল্পা গুটিয়ে প্রস্তুত; আমরাই কি বসে থাকতে পারি? পথিক আমরা—পথই আমাদের ঘর। এবার কিন্তু রাস্তা ভাল। বরফবিহীন অরণ্যে-ঢাকা পাহাড়ের ছায়াশীতল রাস্তা—ক্রমনিম্ন ঢালু হ'য়ে চলেছে। এপাশে ওপাশে লাল সাদা গোলাপের গন্ধে বন আমোদিত। কত কত অজানা গাছ—পাইন বা চীড়, শ্বেতবল্কলধারী ভূর্জ ও আখরোটের বনানী। বেশী নয়—মাত্র পাঁচ মাইল গিয়েই দেখতে পেলাম ত্রিযুগী-নারায়ণ। দেখেই বুঝতে পারলাম শান্ত সমাহিত হিমালয়ের নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মূর্তিমান্ ব্যাঘাতস্বরূপ এখানে গড়ে উঠেছে একটি ছোট্ট শহর। ডাকঘর, ডাকবাংলো, কেতাবখানা ও পুলিশ থেকে আরম্ভ করে, ঝাড়ুদার মেথর পর্যন্ত প্রত্যেকেরই কড়া শাসন এখানে বর্তমান। শিক্ষিত লোকের তো অভাব নেই-ই অর্থাৎ সমতলের লোক যা চায়, উপরের হিমালয়ে এখানেও তাই আছে। রায়না-গাঁ শহরটিকে চার-দিকে ঘিরে রেখেছে। গাঁয়ের আসে পাশে গম, ভুট্টা, আলু ও শাকসবজির প্রচুর চাষ। এখন বোঝা খুবই সহজ—ত্রিযুগী নারায়ণ দেখে আমাদের মত সাধারণ মানুষের মন কেন এত আনন্দিত হয়েছিল। কতকাল নির্বাসনের পর যেন নিজের দেশ দেখতে পেলাম।

ত্রিযুগী-নারায়ণ হিমালয়ের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এ পাহাড়ের শীর্ষ ১১০০০ ফুট উঁচু। হরিদ্বার থেকে সোজা রুদ্রপ্রয়াগের পথ দিয়ে হিমালয়ের ১৪০ মাইল অভ্যন্তরে, তার মধ্যে ১০০ মাইল পর্যন্ত বাস সার্ভিস আছে। আবার হরিদ্বার থেকে যমুনোত্রী, উত্তরকাশী ও গঙ্গোত্রী হ'য়ে ৺কেদারনাথের পথে যাঁরা এখানে আসেন, তাঁদের পক্ষে দূরত্ব প্রায় তিনশ' সত্তর মাইল; এর মধ্যে বাস যাতায়াত করে মাত্র ৯০ মাইল।

নাটমন্দির ও চত্বর-সহ মন্দিরটি বেশ মনোরম। ক্ষীণ দীপালোকে দেখলাম অধিষ্ঠিত দেবতা চতুর্ভুজ নারায়ণ—দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। সামনে অবস্থিত দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে দ্বারী জয় ও বিজয়। তা-ছাড়া কালভৈরব, কুবের প্রভৃতি দেবগণও ভেতরে রয়েছেন। মন্দিরে একটা ধ্যান-মগ্ন প্রশান্তির ভাব বিরাজিত। নাটমন্দিরে একটি বিরাট যজ্ঞকুণ্ড। সত্যযুগে হরগৌরীর বিবাহে প্রজ্বলিত এই হোম আজ পর্যন্ত অনির্বাণ আছে। বিবাহের সাক্ষী স্বয়ং নারায়ণ তিনযুগ ধরে এখানে বর্তমান। যজ্ঞকাষ্ঠ, যব, ঘৃত, তিল প্রভৃতি দিয়ে যাত্রিগণ কুণ্ডে আহুতি দেন। যখন যাত্রীদের যাতায়াত বন্ধ হ'য়ে যায়—শীতকালে বড় বড় গাছের গোড়া অগ্নি-সংলগ্ন ক'রে দেওয়া হয়। তাতে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। নাটমন্দিরের বাঁদিকে

পর পর চারটি কুণ্ড আছে। নাম যথাক্রমে—ব্রহ্মকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড ও সরস্বতীকুণ্ড। একটিতে স্নান, পাশেরটি স্পর্শ, পরেরটিতে আচমন ও শেষটিতে তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করা হয়। ব্রহ্মকুণ্ডে ছোট ছোট সাপ আছে। উঠানের সামনের দিকে আরো একটি ছোট মন্দির আছে।

৺কেদারনাথ-মাহাত্ম্যে আছে: যজ্ঞ নামক পর্বতের উপর নারায়ণ-তীর্থ নামে ইহা প্রসিদ্ধ। এখানে লক্ষ্মীনারায়ণের দর্শন পাওয়া যায়। হর-পার্বতীর মনোহর বিবাহ-স্থলও ইহাই। একটি হবনকুণ্ড চিরকাল প্রজ্বলিত আছে। এই কুণ্ডে নারায়ণ-মন্ত্রে হোম করলে জন্মমৃত্যু রহিত হ'য়ে স্বর্গ-বাস হয়। এখানে এক ব্রহ্মকুণ্ড আছে। উহার জল হরিদ্রাবর্ণ। তাতে ছোট ছোট সাপ থাকে; দেখলে ভয় হয়, কিন্তু তারা কখনও দংশন করে না। ইহার দক্ষিণভাগে বিষ্ণুকুণ্ড। এই দুই কুণ্ডে স্নান ও পরিক্রমা করলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়।

বিকেলবেলা দেখছি আরো শতাধিক যাত্রী রুদ্রপ্রয়াগের পথে নীচে থেকে এসে হাজির—যাবে ৺কেদারনাথ। বাঙালী মারোয়াড়ী মিলে ২৮ জনের একটি দল এসেছে কলকাতা থেকে। পরদিন সকালে ৺কেদারনাথজীর উদ্দেশ্যে রওনা হবার পূর্বেই খবর পাওয়া গেল—দুদিন পূর্বে পওয়ালীর পথে নিখোঁজ লোকটিকে পাওয়া গিয়েছে। রাত্রের অন্ধকারে পথ হারা হ'য়ে সে অন্য পাহাড়ে চলে গিয়েছিল। যাক, চরম ভাগ্যবিপর্যয়েও প্রাণটা নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে।

আলোক-শরৎ

'শুভ গুপ্ত'

বিষণ্ণ বর্ষার শেষে ভাদ্র এলো নেমে,
মেঘে মেঘে বজ্র হেনে, বেদনার গানে,
অভিযান শেষ হলো। আলোকের প্রেমে
শষ্প-শীর্ষ সমুন্নত আকাশের পানে।

নীল শান্তি নেমে এলো সূর্য দিয়ে মাখা।
মাঠ থেকে মাঠ-ভরা থই থই জলে,
সৌরপ্রেম অগণিত হীরা হয়ে জ্বলে।
তবে আজ স্তব্ধ হোক্ সময়ের চাকা।

ময়ূরের কণ্ঠ হলো দিনের আকাশ,
রাত্রির তারায় তারি ছড়ানো কলাপ,
শুভ্র মেঘে নম্র কাশে শরৎ সহাস
দিনের সোনার তারে আলোর আলাপ।

তবু মেঘ, আশ্বিনের হে শুভ্র প্রকাশ,
তোমার চলার পথে উধাও হৃদয়;
চম্পা-নীল রৌদ্রে কাঁপে প্রাণের উল্লাস,
"তাহ'লে আবার যাত্রা,"—কানে কানে কয়।

কেমন করিয়া ডাকিব ?

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

কেমন করিয়া ভগবানকে ডাকিতে হয়—তাহা মানুষ সভ্যতার জন্মের আগেই জানিয়াছিল। সে যখন লিখিতে পড়িতে শিখে নাই তখনও সে আকাশের দিকে চাহিয়া অদৃশ্য কোন শক্তির উদ্দেশ্যে নিজের বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। হয়তো সেই প্রার্থনা একান্তই ইহ-জগতের প্রার্থনা—হয়তো অন্ন-পানের প্রার্থনা, বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝা-বন্যার সঙ্কট হইতে উদ্ধারের প্রার্থনা, ব্যাধি-নিরাময়ের বা পুত্রলাভের অথবা সুবৃষ্টির জন্য মিনতি এবং হয়তো যে দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া সেই প্রার্থনা—সে পরবর্তীকালের 'সভ্য' মানুষের দৃষ্টিতে একান্তই কোন আদিম দেবতা,—তথাপি 'কেমন করিয়া ডাকিব?' প্রশ্নের মীমাংসা ঐ প্রার্থনার মধ্যেই যেন আমরা দেখিতে পাই। যদি প্রকৃত অভাব-বোধ থাকে এবং অভাব মিটাইতে পারেন এমন কোন অতি-লৌকিক ব্যক্তি-সত্তায় বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে নিজের প্রাণের ভাষায় ঐ অভাব তাঁহার নিকট জানানোর নামই তাঁহাকে ডাকা। ডাকা শিখিতে হয় না, কিন্তু ডাকার আগেকার ধাপ দুটি—অভাব বোধ করা বা ব্যাকুলতা এবং বিশ্বাস—ইহারা ঠিক আপনা হইতে আসে না, কিছু তালিম প্রয়োজন হয়।

প্রগতির পথ ধরিয়া সেই আদিম যুগ হইতে মানুষ আজ বহু দূর চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা প্রভৃতি জৈবিক প্রবৃত্তির ন্যায় অদৃশ্য কোন শক্তিকে ডাকিবার প্রবৃত্তিটিও মানুষ ছাড়িতে পারে নাই। পারা কঠিন, কেননা বোধ করি উহা তাহার স্বভাবের সঙ্গে মিশাইয়া সৃষ্টিকর্তা তাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। মানুষ জানা-অজানার এক বিচিত্র মিশ্রণ, দেখা-অদেখার টানা-পোড়েনের এক অত্যাশ্চর্য সংগ্রথন। অজানাকে বাদ দিবার তাহার উপায় নাই, অদেখাকে স্মরণ না করিয়া তাহার শান্তি নাই। 'প্রগতি' তাহার কতকগুলি অভাব দূর করিয়াছে সত্য, কিন্তু অভাবের কি শেষ আছে? বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে মানুষ আজ পদে পদে অসহায় নয়; আদিম কালে যে সকল বিপদে তাহাকে আকাশের দিকে তাকাইতে হইত, আজ মানুষ সেই সকল সঙ্কটত্রাণের উপায় নিজেই আবিষ্কার করিয়াছে, অলৌকিকের আহ্বান নিষ্প্রয়োজন। তথাপি এমন অনেক সঙ্কট আজিও তাহার নিকট উপস্থিত হয়, যাহাতে সে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে পুনরায় বিশ্বাসের দরজায় হাজির হইতে হয়। "যদি কেহ থাকো বাঁচাও"—এই আর্তি বুকের ভিতর হইতে আপনাআপনি গুমরাইয়া উঠে।

আদিমকালে অলৌকিক শক্তির নিকট মানুষের চাহিবার জিনিসের সংখ্যা ছিল কম, কারণ তাহার জীবনের পরিধি বেশী দূর বিস্তৃত ছিল না। কিন্তু 'প্রগতি' মানুষের জীবনকে নানাদিকে প্রসারিত করিয়াছে। মানুষের সুখের ধারণা, নিরাপত্তার ধারণা, ক্ষমতার ধারণা বহুগুণে শাখা-প্রশাখান্বিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাবও বাড়িয়াছে। সব অভাবগুলি দৃশ্য উপায়ে মিটেনা, অতএব কতকগুলির জন্য নিজের পৌরুষের অহঙ্কারকে সাময়িকভাবে ধামাচাপা দিয়া অদৃশ্য শক্তির নিকট মাথা কুটিতে হয়। স্বয়ং জাঁহাপনা আকবর বাদশাহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, আমাকে আরও ধন দাও, দৌলত দাও। ফকীর সাহেব আসিয়া তাঁহার চোখ খুলিয়া দিলেন (—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত উপদেশমূলক গল্প)। আমাদের অনেকের মধ্যেই ভিখারী বাদশাহ বাস করিতেছেন। সভ্যতার জটিল জীবনধারা লাল নীল বেগুনী সবুজ নানা

রঙের হিমালয়প্রমাণ অভাব সৃষ্টি করিয়াছে এবং যেগুলি নিজের হাত পা ছুঁড়িয়া মিটাইতে পারিনা সেগুলির জন্ম আমাদিগকে কালীঘাটে তারকেশ্বরে মদনমোহনতলায় ছুটিতে হয়। ভগবানকে না ডাকিয়া কি উপায় আছে ? আর সেই ডাকা কেহ আমাদিগকে শিখাইয়াও দেয় না—পাড়ার শিশু-বিদ্যাপীঠের শ্যামল-বাবুল-রুবী-দীপাদেরও নয়। তাহারাও পরীক্ষার দিনটিতে সকাল সকাল ভাত খাইয়া ঠাকুরবাড়ীতে হানা দেয়, দেবমন্দিরে ক্ষুদ্র মিনতি জানাইয়া যায়,—ঠাকুর, যেন পাস করি !

মানুষ 'প্রগতি' লাভ করিয়াও অলৌকিককে ডাকা যে ছাড়িতে পারে নাই—ইহাতে মানুষের লজ্জা পাইবার কিছু নাই। আর ঐ ডাকা তো নিষ্ফলও নয়। অনেকের অনেক অসম্ভব প্রার্থনাও 'সিন্নি', 'হত্যা', 'বলি' বা 'পূজা'র জোরে পূরণ হইতে দেখা যায়। অলৌকিক যে মানুষের মাথার ভ্রম নয়—তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এই সকল ঘটনা হইতে মানুষ লিপিবদ্ধ করিতে পারে : সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ—জমিদার তারাপ্রসন্ন মজুমদার (মকদ্দমা-জয়), দুঃখিনী বিধবা গৌরের মা (গৌরের মরণাপন্ন ব্যাধি-আরোগ্য), বাবু সুমেরচাঁদ চনচনিয়া (ব্যবসায়ে মোটা কিস্তি লাভ), ছা-পোষা কেরানী ব্রজেন্দ্র মিত্র (কন্যার বিবাহ)। শুধু আমাদের দেশে বা হিন্দুধর্মে নয়, নানা দেশের নানা ধর্মাবলম্বী বহু মানুষকে এই ধরনের প্রার্থনার সফলতার সাক্ষ্য দিতে ডাকিতে পারা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে (৪র্থ অধ্যায়) এই প্রকার প্রার্থনাকে আর্তভক্তি বলিয়াছেন। ইহা মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্কাম ভালবাসা অবশ্যই সূচনা করেনা, কিন্তু তবুও ইহা ভালবাসা বা ভক্তি বলিয়া মর্যাদা পাইয়াছে। কিন্তু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উন্নতির সহিত তাহার অলৌকিকের ধারণার এবং অলৌকিকের সহিত সংযোগের অর্থাৎ 'ডাকা'রও উন্নতি হইয়াছে। আর্তভক্তি বা বিপদে পড়িয়া ডাকা হইতে উন্নততর প্রার্থনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যে অলৌকিক শুধু ভূতপ্রেত, পূর্বপুরুষ বা নানা প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ামক খণ্ড খণ্ড দেবতায় সীমাবদ্ধ ছিল তাহা ধাপে ধাপে উঠিয়া সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্তা, এক প্রেমময় পরমপিতা শ্রীভগবানে আসিয়া স্থিতিলাভ করিয়াছে। সুসভ্য মানুষের উপযুক্ত ভগবান ইনি, সন্দেহ নাই। ইঁহার গুণ, কার্য প্রভৃতি লইয়া কত দর্শন, কত তত্ত্ববিদ্যা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভগবান থাকুন বা না থাকুন, মানুষ কিন্তু সভ্যতার ধাপে পৌঁছিয়াও ভগবানের জন্য কম সময় ও শক্তি ব্যয় করে নাই।

আর্তভক্তির অপেক্ষা শুদ্ধতর ভক্তি—গীতার ভাষায় 'অর্থার্থী' ভক্তি। ইহা 'অর্থ' বা ভোগ-সামগ্রীর জন্য প্রার্থনা। বিপদে পড়ি নাই কিন্তু সম্পদ্ চাই। ভগবান যদি আপনার জন, তবে তাঁহার নিকট ঐহিক জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য হাজির হইতে আপত্তি কি ? না,— আপত্তি নাই। ধর্মাচার্যগণ তাই আর্তভক্তির ন্যায় ইহাকেও মর্যাদা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে দ্বিতীয় স্তরের ভক্তি বলিয়াছেন। যীশুখ্রীষ্ট নিজে তাঁহার শিষ্যগণকে যে প্রার্থনা শিখাইয়াছিলেন তাহাতে 'অর্থার্থী' ভক্তি খানিকটা ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন,—"হে পরম পিতা, দৈনন্দিন রুটি যেন তোমার দয়ায় মিলে।"

ইহার পরবর্তী স্তরের ভক্ত গীতার সংজ্ঞায় 'জিজ্ঞাসু' ভক্ত। ইনি কোন বিপদে পড়িয়া বা সাংসারিক বিষয়ের কামনায় ভগবানকে ডাকিতেছেন না, ডাকিতেছেন জীবনের প্রকৃত রহস্য কি, লক্ষ্য কি, যথার্থ শান্তির উপায় কি, ভগবানের তত্ত্ব কি, মানুষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ কি—এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য। ডাকিবার প্রেরণা অভাববোধ—এখানেও ঠিকই আছে, তবে কিছু রূপান্তরিত। এখানে ভক্ত সংসারের কোন অভাব বোধ করিতেছেন না। অভাব—প্রাণের একটা

অব্যক্ত শূন্যতা। ইহারই নাম আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা। ভগবান ব্যতীত এই অভাব অপর কিছুতেই মিটিবার নয়। তাই প্রার্থনা, "আবিরাবির্ম এধি"—হে জ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি হৃদয় আলোকিত করিয়া আবির্ভূত হও।" "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥" (ঈশোপনিষৎ)—হে সর্বপোষক, জ্যোতির্ময় সত্যের দ্বার উন্মোচন কর, সত্যকে যে মিথ্যা চাকচিক্য ঢাকিয়া রাখিয়াছে তাহা অপসৃত হউক, সত্যের দর্শনকামী আমার বাসনা পূর্ণ কর।

ভগবানকে সাংসারিক প্রয়োজনে ডাকিতে আরম্ভ করিয়া পরে আধ্যাত্মিক শান্তির জন্য ভগবদ্ভজনা অর্থাৎ 'আর্ত' বা 'অর্থার্থী' ভক্তের 'জিজ্ঞাসু' ভক্তে রূপান্তর ধর্মজগতে একটি চিত্ত-চমৎকারী ঘটনা। ধ্রুবের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমের অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিবার বাসনা তাঁহাকে শ্রীহরিকে ডাকিতে প্রবোচিত করিয়াছিল। হরি দেখা দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি চাও? ধ্রুব কাঁদিয়া আকুল। কি আর চাহিব? চাহিয়াছিলাম তো কাচ, পাইয়া গেলাম হীরক। অনিত্য স্থান আকাঙ্ক্ষা করিয়া দর্শন মিলিল তোমার—অবিলুপ্ত-জ্যোতি সারাৎসার পরাৎপর পরমাত্মার। আর কিছু চাই না। এই চাই যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি।

এই যুগেও ভাবী বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথের জীবনের একটি ঘটনা 'অর্থার্থী' ভক্তি এবং 'জিজ্ঞাসু' ভক্তিতে পার্থক্য কি—সেই বিষয়ে অতি সুন্দর আলোক সম্পাত করে।

সাংসারিক অভাব-অনটনে নরেন্দ্র দারুণ বিপর্যস্ত—বহু চেষ্টাতেও কিছু সুরাহা হইতেছে না। একদিন তিনি অগত্যা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—মা কালীকে বলিয়া অভাব অনটনের কোন প্রতিকার করিয়া দিতে পারেন কিনা। ঠাকুর বলেন, যা না, তুই-ই মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রার্থনা জানা। নরেন্দ্র তিন তিন বার ঐ প্রার্থনা জানাইবেন বলিয়া মন্দিরে গিয়া বসিলেন। তিনবারই ভিতর হইতে প্রার্থনা উঠিল,—মা, বিবেক বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান ভক্তি দাও। ঠাকুর শুনিয়া খুব আনন্দিত। নরেন্দ্রের ন্যায় অধিকারীর কি অর্থার্থী ভক্তি সাজে?

গীতার বিভাগে 'অর্থার্থী' ভক্তের পরে 'জ্ঞানী' ভক্ত। ইনি ভগবানকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'-জ্ঞান তাঁহার চিত্তকে এক অবিচলিত সমতা, শান্তি ও সামঞ্জস্যে সুস্থির রাখিয়াছে। চাহিবার আর কিছু নাই। ভগবদিচ্ছায় সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, গাছের পাতাটিও ঈশ্বরের ইঙ্গিত ছাড়া নড়ে না—এই অনুভূতি স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার 'বিপন্ন' বোধ নাই। অতএব আর্তভক্তির প্রশ্ন উঠে না। অর্থার্থী ভক্তিরও নয়, কেননা পরমসম্পদ্ ভগবানকে সর্বদা নিজের কাছে পাইতেছেন, পার্থিব বা পারলৌকিক অন্য কোন 'অর্থ' তাঁহার দৃষ্টিতে ফিকা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি এই চতুর্থ ধাপ বা শেষ ধাপের ভক্ত ভগবানকে অনবরত ডাকিয়া চলেন। তাঁহার ডাকের পিছনেও কি অভাববোধ আছে? হাঁ, আছে। ভগবানের অনন্ত প্রেমের সম্মুখে আসিয়া 'জ্ঞানী' ভক্ত দিশাহারা। ভগবানকে ভালবাসিয়া যেন ফুরাইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যদেব জীবনের শেষ পর্যন্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া গেলেন। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি পরিপূর্ণ; কিন্তু সেই কৃষ্ণপ্রেমেরই তিনি শাশ্বত ভিখারী। অনন্ত ব্রহ্মসাগরের এক গণ্ডূষ জলপান করিয়া শিব চিরকালের জন্য আউল হইয়া বেড়াইতেছেন। ভগবানকে যিনি সাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাঁহার অপর সব তৃষ্ণা মিটিয়াছে, কিন্তু ডাকার তৃষ্ণা মিটে নাই; মিটিতেও পারে না। ভগবানকে ডাকিবার অন্তহীন তৃষ্ণার জন্যই যে ভগবানকে ডাকা।

ভগবানকে কেহ নানা বাক্যের মধ্য দিয়া ডাকেন, আবার কেহ বা সংক্ষিপ্ত দু' চারটি কথা বলিয়া কিংবা কখনও কোন শব্দ উচ্চারণ না করিযাই ডাকেন—নীবব প্রার্থনা। ভাবটি এই,—ভগবান অন্তর্যামী, আমার মনের কি কথা, প্রাণের কি অভাব—তাহা তো তাঁহার অবিদিত নাই। আমি কেবল তাঁহার নিকট আসিব, তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিব। আমাব বেদনা, আর্তি, শূন্যতা তিনি আপনা হইতেই দুর কবিবেন। তাঁহার নিকট অধিক বাক্যপ্রযোগ তো শোভা পায না। নীবব প্রার্থনার ভাবটি সত্যই বড় সুন্দর! কোন কোন ভক্তের ডাকা শুধু ইষ্টের নাম জপ করা। নাম উচ্চাবণেব সহিত তাঁহার সমগ্র প্রাণের প্রার্থনা মিশিয়া থাকে। যখন বলি 'রাম' তখন তো শুধু এইটুকুই বলিনা, কথায প্রকাশ না করিলেও প্রাণে প্রাণে বলি,—হে বাম, আমি তোমার শরণাগত, তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি ইহকাল, তুমি পরকাল, আমি সাধনহীন ভজনহীন জ্ঞানহীন ভক্তিহীন। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। দর্শন দিয়া জীবন ধন্য কর।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিযা মানুষ কত ভাবেই না ভগবানকে ডাকিযা আসিযাছে। অনেক ক্ষেত্রে সেই ডাকিবাব ভাষা পরবর্তীকালের সাধক-সাধিকাদের জন্য লিপিবদ্ধ হইযা রহিযাছে। ভগবৎ-প্রেমিক ভক্তেরা যে কথা বলিযা ভগবানকে ডাকেন, সেই কথাগুলির ভিতর কত শক্তি, কত প্রেরণা, কত মাধুর্য নিহিত। স্থূল মানুষ যখন স্থূল মানুষকে ভালবাসে তখন কযটি কথা দিয়াই বা সে তাহার ভালবাসাকে প্রকাশ করিতে পারে? ভালবাসার বস্তু এখানে সীমাবদ্ধ, ভালবাসাও তাই সীমাবদ্ধ। তবুও সেই ভালবাসাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়া বহু কবিতা, বহু নাটক, বহু উপন্যাস রচিত হইযাছে, হইতেছে এবং হইবে। আর ভগবানের ভালবাসা? সেই অনন্ত মহাসাগরের উপলব্ধি এবং প্রকাশের কি শেষ আছে? তাই যুগে যুগে দেশে দেশে ভগবদ্ভক্তগণের প্রার্থনাগুলি চিরদিন নূতন সঞ্জীব, প্রাণপ্রদ। ঐগুলি হইতে আমরাও ভগবানকে কি করিয়া ডাকিতে হয় শিখি। তাঁদের কথা, তাঁদের ভাব নিজেদের উপর আরোপ করিয়া আমরা নিজেরা ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারি। আলো হইতেই আলো জ্বলে। ভগবৎ-প্রেমিকের (সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ) সঙ্গ আমাদিগের হৃদযে ভগবৎ-প্রেম উদ্বুদ্ধ করে।

গাযত্রীমন্ত্রের সেই শাশ্বত প্রার্থনাটি! সর্ব-চবাচরের যিনি চৈতন্যালোক—তাঁহাকে হৃদযে আহ্বান! তিনি যদি বুদ্ধিকে প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে আমবা সত্যকে উপলব্ধি করিতে পাবি, সত্যকে বুকে রাখিযা সংসার যাপন করিতে পাবি—উপনিষদের 'অসতো মা সদ্‌গময়' প্রার্থনাটিতে যে ব্যাকুলতা, নির্ভরতা, সত্যলাভেব আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সকল কালে সকল মানুষকে অনুপ্রাণিত কবে। "মিথ্যার কুহক ভাঙিয়া আমায় সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর, অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে আমায আত্মজ্ঞানের দীপ্তিতে লইযা চল, মৃত্যু হইতে আমায অমরত্বে স্থাপন কর, আমাব হৃদয়ে আবির্ভূত হও। তোমার করুণামাখা মুখের দৃষ্টিতে আমাকে পরিতৃপ্ত কব।"—এই প্রার্থনা কি এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয?

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকের সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি। হে জগদীশ্বর, ধন চাই না, লোকসঙ্গ চাই না, সুন্দরী বনিতার বা কাব্যচর্চার কামনাও আমার নাই। চাই জন্মে জন্মে তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি। সার্থক ভক্তি লাভ করিতে গেলে মনের ভাব কি হওয়া দরকার, এই কথাগুলি হইতে আমরা তাহা শিখিতে পারি। ভক্তদের চরিত্রালোচনা যেমন ভক্তির সহায়ক তেমনি তাঁহাদের ডাকিবার ভাষা আযত্ত করাও ভক্তির একটি অন্যতম সাধনা।

ভগবানকে ডাকিবার ইচ্ছা যত আন্তরিক হইবে তাঁহাকে ডাকাও তত ফলপ্রসূ হইবে। যাহার পিপাসা পাইয়াছে জল তাহারই নিকট সুস্বাদু এবং তৃপ্তিদায়ক বোধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণোদয়। বালক যখন সাথীদের বলে, 'ভগবানের দিব্য' তখন ভগবান শব্দটির তাৎপর্য আর কতটুকু? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, আমরা যখন ভগবানের নাম করি, ভগবানকে ডাকি, তখন ভগবান যেন শুধু ঐরূপ একটা কথার কথা, ক্রীড়াঙ্গনের শব্দমাত্রে পর্যবসিত না থাকেন। জীবন্ত বিশ্বাস আসিয়া যেন সেই শব্দকে প্রাণবান্ করে।

'কেমন করিয়া ডাকিব?'—ইহা বুদ্ধিবৃত্তির সাজানো কৌতূহল নয়, ইহার মীমাংসাও বুদ্ধিবৃত্তির শিখানো বুলির দ্বারা হইবার নয়। প্রশ্নটি মানুষের জীবন-মরণের সহিত সম্পৃক্ত একটি স্বতঃস্ফূর্ত জিজ্ঞাসা। ব্যাকুল প্রাণের উদ্বেল অনুরাগ এবং অকম্পিত বিশ্বাস ইহার সমাধান আনিয়াছে অসংখ্য বিচিত্র ভগবন্মুখী আচরণ ও আবেগের মধ্য দিয়া। সেইগুলিই লক্ষ্য করিবার, অনুধ্যান করিবার, অনুভব করিবার। মানুষ পৃথিবীতে আসিয়াছে পূর্ণতাকে অন্তরে ধারণ করিয়া। উহা যে ভিতরেই আছে তাহা তাহার মনে নাই। জন্মিয়াই তাই তাহার ক্রন্দন শুরু। কোথায় গেল? কোথায় গেল? বুকের ধনকে যতদিন না সে ফিরিয়া পাইতেছে ততদিন তো তাহার রোদন থামিবে না। নানা ভাবে তাহাকে চাহিয়া বেড়াইতে হইবে। ইহাই তাহার ডাকার ইতিহাস এবং উপন্যাস। ইহার কোন পরিচ্ছেদই ব্যর্থ নয়, তুচ্ছ নয়। ঠেকিয়া, শিখিয়া, পড়িয়া, উঠিয়া মানুষ ডাকিয়া চলে, ডাকিয়া ডাকার সার্থকতাকে লাভ করে। অবশেষে পূর্ণতাকে ফিরিয়া পায়। হাহাকার মিটে, কিন্তু ডাকা থামে না। সে ডাকা ক্রন্দন নয়, সঙ্গীত!

বেদান্ত কি?*

স্বামী অভেদানন্দ

'বেদান্ত' কথাটির অর্থ 'বেদের অন্ত বা জ্ঞানের শেষ'। এই পরিভাষা দ্বারা আমরা যেন এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত না হই যে জ্ঞানের কোন সীমা আছে বা শেষ আছে। 'জ্ঞানের শেষ' বলিতে বুঝায় জাগতিক ও ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির সীমা, বিজ্ঞান প্রভৃতি যেখানে পৌছিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কখন পৌছিতে পারিবে না। কোথায় এই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা? ইহা কি জড় পদার্থের জ্ঞানে পর্যবসিত? না; জড়পদার্থ দৃশ্যমান জগৎ বলিয়া যাহা পরিচিত তাহারই জড় অণুর সংযোগমাত্র—ইহা বিশ্বজগতের মাত্র অর্ধেক। অন্য অর্ধেক জড় নয়—জড়ের অনুভবিতা—চেতন বোধশক্তি, যাহার সহায়ে আমরা বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইতেছি। যখন আমরা বাহিরের অনুভূত জ্ঞানের (knowledge of objective world) সহিত অনুভবিতার জ্ঞান (knowledge of subjective world) সম্মিলিত করি তখন এক মহত্তর জ্ঞানের সন্ধান আমরা পাই যাহা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ নয়, এই জ্ঞানকে দিব্যজ্ঞান বা অনন্ত জ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই জ্ঞানই সমগ্র বিশ্বের আদি ও অন্ত।

এই জ্ঞান কোথায়?—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে? আমাদের শরীরের (ভাণ্ডের) বাহিরে? না। ইহা সর্বত্র, বাহিরে এবং ভিতরেও। আমাদের আত্মায় জ্ঞানই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের আত্মা এই প্রতীয়মান অস্তিত্ব-সমূহের লয়স্থান বা অধিষ্ঠানস্বরূপ অনন্তজ্ঞানেরই প্রকাশ-মাত্র। জ্ঞানের সমুদ্র একই, যদিও ইহা বিভিন্ন অবস্থায় অনুভূত, এবং বিভিন্ন নামে অভিহিত।

* সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সোসাইটির সৌজন্যে প্রাপ্ত। [ইংরেজী হইতে অনূদিত]

আমরা ইহার সমগ্র রূপটি দেখিতে বা বুঝিতে নাও পারি। কিন্তু জীবনের কোন কোন মুহূর্তে আমরা ইহার আংশিক রূপ ক্ষণিকের জন্ম দেখিতে পাই। যদি জানিতে চাই—'কে আমি? আমার স্বরূপ কি?'—তবে বুঝিতে পারি অন্তরের মধ্যে একটি অগ্নিকণা জলিতেছে—যাহাতে দিব্যভাব অন্তর্নিহিত—যাহা অনন্ত জ্ঞানের সূর্য হইতেই প্রসূত ও প্রসারিত।

বেদান্তের তিনটি প্রণালীবদ্ধ মতবাদ আছে—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত। যতদিন পর্যন্ত আমরা শরীরকেই মনে করি আমাদের স্বরূপ, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্বন্ধে আমরা সচেতন, ততদিন বিশ্বের একজন স্রষ্টা ও শাসকের কথা—আমাদের মনে আসে। সে অবস্থায় আমরা চিন্তা করি, ঈশ্বর বিশ্বের বাহিরে (extra-cosmic) মেঘের ওপারে, স্বর্গে বসিয়া আছেন; তাঁহার কাছে আমরা পৌঁছিতে পারি না, এত দূরে যে আমাদের ধরাছোঁয়ার বা অনুভূতির বাহিরে, এত মহিমান্বিত যে আমরা তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। বিশ্বের অধিষ্ঠানস্বরূপ সেই অনন্ত জ্ঞান উপলব্ধি করিবার ইহা প্রথম সোপান মনে করা যাইতে পারে।

তারপর ক্রমশঃ যতই আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতি ও তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ বুঝিতে পারি, ততই আমরা অনুভব করি—তিনি আমাদের খুব দূরে নহেন; তিনি বিশ্বব্যাপী, তিনি আমাদের অন্তর্যামী। আত্মা যেমন শরীরের উপর প্রভুত্ব করে, তেমনই তিনিও দৃশ্যমান জগতের বাহির হইতে নয়—মধ্যে থাকিয়াই তাহার প্রতিটি পরমাণু নিয়মিত করেন। আমাদের আত্মাও সেই বিরাটের অংশ, কিন্তু পূর্ণের সমান কখনই নয়। আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের ইহা দ্বিতীয় স্তর।

তারপর যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও চিন্তার পারে গিয়া পৌঁছিযাছে তাহারই আত্মা পরমাত্মাকে নিকটতরভাবে উপলব্ধি করে। যখন আমরা আপেক্ষিক (দ্বৈত-দ্বন্দ্ব) ভাবের ঊর্ধ্বে উঠি তখন বুঝিতে পারি, একটি কিছু আছে—যাহা নানা নামে উপাসিত ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণার ভিত্তিস্বরূপ; তখনই আমরা নিরপেক্ষ সত্তার রাজ্যে প্রবেশ করি। তখন আর বাহিরের জ্ঞান থাকে না, অবর্ণনীয় সমাধির আনন্দ অনুভূত হয়; সর্বপ্রকার ভেদ-দর্শন তিরোহিত হয়।

বেদান্তের ধর্মই পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োগসিদ্ধ (practical). ইহা আমাদের শিখায় না যে কতকগুলি তত্ত্ব, যুক্তিহীন মতবাদ এবং উপদেশে বিশ্বাস করাই ধর্মের উদ্দেশ্য। পরন্তু ইহা শিখায়—ঈশ্বরীয় হওয়া, পরিপূর্ণতা লাভ করা, প্রতিদিনের কাজে কর্মে দিব্যভাব বিকশিত করাই যথার্থ ধর্ম।

বেদান্ত-ধর্মের মূল নীতি কি?—আমরা অমর আত্মা-রূপেই জন্মিয়াছি, পাপের ফলে বা অন্যায় আচরণের জন্য নয়—অমৃত-আনন্দের সন্তান আমরা! সত্যই যদি তাই হয়—তবে আমরা কি তাহা অনুভব করি? করি, বা নাই করি—তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ইহা আমাদের জন্মগত অধিকার, আজ না হয় কাল—আমরা নিশ্চয় ইহা অনুভব করিব, এ বিষয়ে সচেতন হইব। আমাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরের মতো অনন্ত অমৃত এবং দিব্য,—পবিত্র। ব্যক্তিগত আত্মা (জীব) এবং বিশ্বগত পরমাত্মায় (ঈশ্বরে) [পরমার্থতঃ, স্বরূপতঃ] কোন ভেদ নাই।

আত্মা অনন্ত, জন্মহীন, মৃত্যুহীন—অপরিবর্তনীয়। শরীরের বিনাশে শরীরী আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মা কখনও মরিতে পারে না; এই সত্যটুকু মনে রাখিতে পারিলে মৃত্যুকে আর কেন ভয়? ভয়শূন্যতাই আমাদের আদর্শ, এবং ইহাই প্রত্যেকের আদর্শ হওয়া প্রয়োজন।

'মরম না জানে, ধরম বাখানে'

[সমালোচনা]

শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার, এম্‌-এ

'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকার ১৩৬৩ সালের শারদীয়া সংখ্যায় কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেব লিখিত 'রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। ইহা ওদুদ সাহেব কর্তৃক বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত বক্তৃতামালার অংশ। আলোচ্য প্রবন্ধের স্থানে স্থানে ওদুদ সাহেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামীজীর প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহাদের সাধনার মর্মকথা বুঝিবার চেষ্টাও তিনি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, প্রবন্ধটিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি কিন্তু লেখকের যথাযোগ্য শ্রদ্ধার অভাব সুপরিস্ফুট।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞান সাধনায় যে কালজয়ী ও সীমাতিশায়ী পরিপূর্ণতা আছে—তাহা ওদুদ সাহেবের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। তিনি ভক্ত-হৃদয়রূপ অমৃতলোকের বাহিরেই রহিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র যুক্তিতর্ক ও বিশ্লেষণের পথে সেই অমৃতলোকে প্রবেশ করা যায় না। মরমী সাধক 'প্রাণের ভাষায় প্রাণের কথা কয়, ও প্রাণে-প্রাণে প্রেরণা জোগায়।' তাহার অন্তরে অন্তর মিশাইয়া যে তাহার প্রাণের পরিচয় নিতে পারে, আনন্দলোকে শুধু তাহারই নিমন্ত্রণ।

ওদুদ সাহেব 'মরমী সাধনার অবাঞ্ছিত পরিণতি,' 'প্রগল্‌ভ ভক্তির অবাঞ্ছিত পরিণাম,' 'ভগবৎ-চেতনা ও ভগবৎ-নির্ভরতার উৎকট স্বয়ং-সম্পূর্তি,' প্রভৃতি অনেক কথা বলিয়াছেন। ভক্তিমার্গে সিদ্ধিলাভের অর্থই স্বয়ং-সম্পূর্ণ ভগবৎ-চেতনা, আরাধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও একান্ত নির্ভরতা—'যদেব ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে'। ভক্তের কাছে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। মহা ভাবলোকে ভক্ত ও আরাধ্য নিভৃতে বিরাজ করিয়া নিত্য নব সঙ্গ-সুখের আস্বাদন গ্রহণ করেন।

হিসাব পরিমাণ করিয়া বা 'ফরমুলা'-অনুসারে সাধনা করিয়া ঈশ্বর লাভ হয় না, ব্যাকুলতা হইলেই ঈশ্বরলাভ হয়। ব্যাকুল মনে পরিণামচিন্তা সম্ভব নয়। ভক্তিমার্গে সতর্কতাবিহীন ব্যাকুলতার জন্য 'অবাঞ্ছিত পরিণাম' কখনও ঘটে না। ভক্ত যাঁহার জন্য ব্যাকুল, সেই সর্বশক্তিময়ের অতন্দ্র দৃষ্টি তাহার উপর সদা নিবদ্ধ থাকিয়া তাহাকে কল্যাণের পথে চালিত করে। কেহ ইহা বিশ্বাস করুক, আর নাই করুক, ভক্তের তাহাতে কিছুই যায় আসে না। ভক্ত মহাভাবে বিভোর হইয়া থাকে। ভগবৎ-চেতনা তাহার মধ্যে 'উৎকট'-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া কেহ চীৎকার করিলেও তাহার কিছুই যায় আসে না।

ওদুদ সাহেবের মতে 'যে ভগবৎ-চেতনা বা নির্ভরতা অভ্রান্তভাবে লোকশ্রেয়ের প্রেরণা দেয় না, তাহা বন্ধ্যা'। যথার্থ ভগবৎ-চেতনা লোকশ্রেয়ের প্রেরণাদায়ক না হইয়াই পারে না। জীবপ্রেম ভগবৎপ্রেমেরই অপরিহার্য অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই ধরিয়াছেন, বৈষ্ণবের ভগবৎপ্রেম শুধু বৈকুণ্ঠের তরে নয়:

'প্রিয়জনে যাহা দিতে পারি দিই তাই দেবতারে,
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই প্রিয়জনে,
আর পাব কোথা? দেবতারে প্রিয় করি,
প্রিয়েরে দেবতা।'

সেই প্রিয়তমের প্রতিরূপ হিসাবে বিশ্বের সকলেই ভক্তের প্রিয়জন। লোকশ্রেয়ের মাপ-কাঠিতে পরমহংসদেবের সাধনাকে অসার্থক প্রতিপন্ন

করার জন্য ওদুদ সাহেবের প্রয়াস টুপি দিয়া আকাশ ঢাকিবার চেষ্টার মতোই হাস্যকর। তাঁর এই প্রবন্ধেই তিনি পরমহংসদেবের বিখ্যাত বাণী 'যত্র জীব তত্র শিব' উল্লেখ করিয়াছেন। 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' করিবার যে উপদেশ পরমহংদেব দিয়াছেন ওদুদ সাহেব নিশ্চয়ই তাহা জানেন। তাঁর প্রবন্ধের আর এক জায়গায় তিনি তিনি লিখিয়াছেন, 'পরমহংসদেবের সাধনায় সেবার প্রেরণা অবশ্য ছিল, না থাকলে স্বামী বিবেকানন্দকে ব্যক্তিগত মুক্তি উপেক্ষা ক'রে লোকহিত সাধনায় তিনি উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন না।' তবে ওদুদ সাহেব বলেন, 'বিবেকানন্দের প্রতিভাব সঙ্গে যুক্ত না হ'লে তাঁর মানব সেবার আকাঙ্ক্ষা সার্থক হ'তে পারত না, এই মনে হয়।' অতি সত্য কথা। কিন্তু এজন্য যে তিনি মনে করেন, পরমহংসদেবের ব্যক্তিগত ভগবৎ-চেতনায় লোকশ্রেয়ের ইচ্ছার অল্পতা ছিল—তবে বলিতে হয়, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যে একই সত্তার দ্বিবিধ প্রকাশ—ওদুদ সাহেব তাহা ধরিতে পারেন নাই। ভাবসমাহিত প্রশান্তবিগ্রহ রামকৃষ্ণ ও তেজোদীপ্ত অমিতবিক্রম বিবেকানন্দ—এই দুইয়ে মিলিয়া এক। শুধু তাই নয় অসংখ্য সন্ন্যাসী ও ভক্তদলের মধ্যে রামকৃষ্ণ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। এই ভাবে রামকৃষ্ণ সকল জীবশ্রেয়ের মূলাধার, লোকশ্রেয় তো আরও সীমাবদ্ধ। ভারতের সর্বত্র এবং পৃথিবীর নানাস্থানে যাঁহার নামে আর্তত্রাণ, শিক্ষাদান এবং জনসেবার নানা কাজ চলিতেছে, সহস্রাধিক সন্ন্যাসী যাঁহার অনুগামী হইয়া সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার ভগবৎ-চেতনা 'বন্ধ্যা'! এইরূপ উক্তি ওদুদ সাহেবের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট আশা করা যাইত না।

ওদুদ সাহেব আবার সন্ন্যাসের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন! তাঁহার মতে, 'সন্ন্যাস ইত্যাদি জীবন-বিমুখ-প্রবণতা……।' ওদুদ সাহেব সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টির দাবি করেন, কিন্তু এখানে 'নিয়াতা ফিল ইস্‌লাম'—ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নাই—এই সংস্কারটি তাঁহার দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসী সংসার- বা জীবনবিমুখ নহেন, তাঁর সংসার বিরাট এবং সাধনা মহাজীবনের। কবির কথায়:

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর?

দৃষ্টির স্বচ্ছতা থাকিলে তিনি এই ভাবেই সন্ন্যাসকে দেখিতেন। হিন্দু বৌদ্ধ ও খৃষ্টান সন্ন্যাসি-সঙ্ঘগুলির অক্লান্ত সেবায় মানবজাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া আসিতেছে। যে কোন অপক্ষপাতী সমালোচকই এই কথা স্বীকার করিবেন Sleeping lıviathan-রূপ ঘুমন্ত ভারতীয় জাতির চেতনা-সঞ্চারে শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম সন্তানবর্গের অবদান তুলনাহীন।

ওদুদ সাহেবের মতে, "পরমহংসদেবের 'যত মত তত পথ' চিন্তাধারার উপর অতীত প্রভুত্ব করছে, তাই ওটি তত্ত্বের ব্যাপার বেশী, সত্যের ব্যাপার কম।" ইহা ওদুদ সাহেবের অপূর্ব গবেষণা। 'যত মত তত পথ'—সর্বাশ্রয়ী সত্য। উপনিষদে আছে, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। ধর্মের ব্যাপারে ভারত কোনও মতকে কোনও দিন অস্বীকার করে নাই। কি করিয়া অস্বীকার করিবে? যিনি অবাঙ্মনসোগোচর, 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে আদিযুগ হইতে। সাকারের ধ্যানে, নিরাকারের ধ্যানে, গানে, নৃত্যে, আচারে, বিচারে, প্রেত-পূজায়, প্রতীক পূজায়, কত সাধক কত ভাবে তাঁহার পরশ আপন প্রাণের ভিতর পাইতে চাহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কাহার সাধনপথ ঠিক, কাহার বা ভুল—তাহার বিচারের শক্তি ক্ষুদ্রবুদ্ধি স্বল্পজীবী মানুষের নাই। নুনের পুতুল কি মহাসমুদ্রের

গভীরতার পরিমাপ করিতে পারে? রামকৃষ্ণ অসীম, কিন্তু তিনি যাহাদের শিক্ষার জন্য অবতীর্ণ, সেই সাধারণ মানুষ সীমাবদ্ধ, তাই তিনি বলিয়াছেন যে ইহাদের কাহারও আন্তরিক সাধনা বিফল হইতে পারে না। সরল ব্যাকুল ভাবে সাধন করিলে সকল পথেই সকল মতেই অনন্ত ভাবস্বরূপ ঈশ্বর লাভ হয়। ইহাই "যত মত তত পথ"। ৺মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় তাঁর 'বাংলার নবযুগ' বইটিতে "সেমিটিক নেতিবাদের" কথা বলিয়াছেন। অধ্যাপক গোপাল হালদার তাঁহার "সংস্কৃতির রূপান্তর" বইটিতে "সেমিটিক নেতিবাদ"কে মানসিক ঔদ্ধত্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ওদুদ সাহেব তাঁহার প্রবন্ধে 'এটা ভুল, ওটা ভুল' বলিয়া চলিয়াছেন—এই নেতিবাদের প্রভাবে।

স্বচ্ছ অন্তর-বিশিষ্ট মানুষ বুঝিতে পারে যে অসীম বিশ্বব্যাপারের প্রায় সবটুকু তার জ্ঞানের অগম্য। সুতরাং তার উপলব্ধির অতীত কোনও বিষয়কে সে ভুল বলিবার সাহস পায় না, এবং বলে না। কিন্তু নেতিবাদমূলক চিন্তারাজ্যে কতকগুলি মায়া-বিগ্রহ (বেকনের 'idol')-এর সৃষ্টি হয়। এই সব ভাবপুত্তলিকার দাস হইয়া নেতিবাদীরা সর্বাশ্রয়ী সনাতন সত্যকে হারাইয়া ফেলে। এই কারণেই ওদুদ সাহেব বলিয়াছেন, "সর্বধর্মই সত্য, এটি একটি শিথিল চিন্তা মাত্র। তার চাইতে সব ধর্মের ভিতরই যথেষ্ট মিথ্যা বা অসার্থক ভাবনা রয়েছে, মানুষকে সে সব কাটিয়ে উঠতে হবে, এই চিন্তার মর্যাদা বেশী।" একথা জানিয়া মিস্ মেয়ো ও বিভারলি নিকলসেরা উৎসাহিত হইবেন যে রুচিবান্ শিল্পীর চেয়ে নর্দমা-পরিদর্শকের মর্যাদা বেশী। নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয় না।

অবতারবাদের বিরুদ্ধে ওদুদ সাহেবের আপত্তি। তাঁর মত "এ সম্পর্কে সব চাইতে শোচনীয় ব্যাপার হলো, স্বামী বিবেকানন্দ যে তাঁকে পূজা নিবেদন করলেন অবতারবরিষ্ঠ ব'লে।" বিবেকানন্দ অবতার-বরিষ্ঠকেই "অবতারবরিষ্ঠায়" বলিয়া পূজা করিয়াছেন। অতিমানবীয় মনীষাসম্পন্ন স্বামীজীর মনে সন্দেহের লেশমাত্র থাকিলেও তিনি তাহা করিতেন না। পরমহংসদেবের সহিত স্বামীজীর প্রথম পরিচয়ই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষের মনের গঠন এইরূপ যে সে কোনও না কোনও ভাবে অবতারের উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞানদাতা, পরিত্রাতা, বার্তাবহ অবতার কেবল হিন্দুরই অতি প্রিয় নয়; তথাগত বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, হজরত মহম্মদ প্রভৃতি ধর্মগুরুগণেরও কোটি কোটি উপাসক আছেন, ইহাতে দোষ দেখি না। নাস্তিকেরাও দেখিতেছি রাজনৈতিক নেতাকে অবতারের আসনে বসাইয়া উপাসনা করেন। কেহ কেহ চিত্রতারকা, খেলোয়াড় বা দৌড়ের ঘোড়ারও উপাসনা করেন। নেতিবাদী নিজেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নিজেরই উপাসনা করেন। সুতরাং মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ অবতারের উপাসনাকে সেকেলে বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া নিরর্থক। উপাসনা যখন করিতেই হইবে তখন শ্রেষ্ঠ অবতারের উপাসনা করাই শ্রেয়।

ওদুদ সাহেব বলেন, 'রামকৃষ্ণদেবের যে অলৌকিক দর্শন হলো, সেটি হয়ত মরমী সাধনার এক সাধারণ দুর্বলতা।' যিনি অলৌকিক দর্শন বিশ্বাস করেন না তাঁহার সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই। আমরা অলৌকিক দর্শনে বিশ্বাসী; হজরত মহম্মদের অহিলাভ ও 'সাব-ই-মিরাজ'এর রাত্রিতে সপ্তস্বর্গ ভ্রমণ সম্পর্কে ওদুদ সাহেবের সুস্পষ্ট মত জানিলে বাধিত হইব।

রোঁমা রোঁলা পরিপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া মণিপূর্ণ খনি অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহার পরশ-পাথর মিলিয়াছে। ওদুদ সাহেবের পথে চলিলে তিনি এই পাওয়ার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতেন। ধর্মকে নিজ বুদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ করার পরিণাম বেদনাদায়ক।

সমালোচনা

দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা—শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্থাপত্য-বিশারদ-প্রণীত, প্রকাশক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা—২৩৮+২৸৹ (ভূমিকা-সূচী প্রভৃতি); মূল্য ২০৲ টাকা।

স্থাপত্য-বিশারদ শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় নূতন করিয়া নিষ্প্রয়োজন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া ভারত-প্রতিভা কিভাবে স্বমহিমার বিকাশ-সাধন করিতে পারে বর্তমান গ্রন্থখানি তাহারই একটি স্থায়ী নিদর্শন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীচট্টোপাধ্যায় ১৯৫৪ খৃঃ ধারাবাহিক ভাবে যে বক্তৃতাবলী দেন—তাহারই সারাংশ অবলম্বনে ইহা সংকলিত, ইহার পিছনে রহিয়াছে লেখকের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা, বহু অধ্যয়ন, পর্যটন ও প্রাচীন পুঁথির গবেষণা; সর্বোপরি রহিয়াছে তাঁহার স্বকীয় প্রতিভাদীপ্ত চিন্তা।

প্রস্তাবনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত মহাশয় লিখিয়াছেন: 'দেবায়তনের ইতিহাসের যোগ একটি দেশের বা জাতির ধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে নয়, ইহার যোগ সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে।' বহু পরিশ্রমে রচিত গ্রন্থখানিকে কেহ যেন মন্দির-নির্মাণের প্রণালী বা পদ্ধতি বলিয়া মনে না করেন। লেখক অনুভব করিয়াছেন: 'ভারতবর্ষের একটি সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ নির্ভুল নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রকাশের আশু প্রয়োজন।' ইতিহাস প্রায়ই অসত্য এবং অর্ধসত্য উপাদানের মিশ্রণে বিকৃত হয়। মহাকালের বিরাট বক্ষে মানব-মন তাহার যে স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে—লেখক তাহাই অধ্যয়ন করিয়াছেন—সযত্নে, নীরবে—একাকী।

জীবন-সায়াহ্নে স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দেশবাসীকে তথা বিশ্ববাসীকে তিনি উপহার দিয়াছেন। বাইশটি অধ্যায়ে সুলিখিত গ্রন্থে আদিপ্রস্তরযুগ হইতে শুরু করিয়া দ্রাবিড় ও আর্য, হিন্দু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত—প্রতিটি কৃষ্টির তরঙ্গ আলোচিত হইয়াছে; ভারতের বাহিরে ভারত-সংস্কৃতির প্রসার এবং বহিরাগত সংস্কৃতির সহিত ভারত-কৃষ্টির সংঘাত এবং সমন্বয়-প্রচেষ্টাও প্রদর্শিত হইয়াছে। 'বস্তু-তান্ত্রিকতার কবলে বর্তমান ভারত'ও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মূলগত ঐক্য লক্ষ্য করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করিয়া লেখক গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

পরিশেষে চিত্রবিবরণীতে প্রায় ১৭১টি চিত্রের অন্তর্নিহিত ভাব তিনি বিবৃত করিয়াছেন। চিত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশই মন্দির ও দেবতা বা তীর্থ সংক্রান্ত, কতকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি ও নক্সা পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অধুনা-নির্মিত নয়াদিল্লীর বিড়লার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির রহিয়াছে, অথচ বেলুড়মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির না থাকার কারণ বোঝা গেল না। শ্রীরামকৃষ্ণের যে ছবিখানি আছে তাহা নিতান্তই কাল্পনিক। —নি.

নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—৮৭; মূল্য আড়াই টাকা।

'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'—সুমুদ্রিত পুস্তকখানিতে প্রখ্যাত সন্ন্যাসী স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর 'গুরু' 'ইষ্ট' ও 'সাধন' বিষয়ক সংস্কৃতে রচিত শ্লোকগুলি ও তাহাদের পদ্যানুবাদ অধ্যাত্ম পথের পথিকের নিকট অপূর্ব দিগ্দর্শন-রূপে গ্রহণীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সাধনার মর্মকথা অনবদ্য ভাষায় মনোরম ছন্দে ও ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিয়া সাধক-কবি ৪৭টি কবিতা সাধারণের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। —জী.

স্মৃতিপূজা গ্রন্থমালা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—প্রণেতা শ্রীহরিদাস রামানন্দ। প্রকাশক শ্রীসূর্যমণি—ললিতা সাহিত্য ভবন। আশীষ কুটীর, শিলং। পৃঃ ১২৮+৯। মূল্য ৪৲ টাকা।

গ্রন্থকারের পূর্বনাম শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, ভারতীয় শিক্ষা-সেবক, অবসরপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর। তাঁহার জীবনে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শ-লাভ এক পরম সৌভাগ্য, তাই গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, আধ্যাত্মিক দান প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে, দুইটি অধ্যায় লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতি-তর্পণ। দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনা কিভাবে কয়েকজন সাধক ও মহাপুরুষের মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, তত্ত্বভূষণ সীতানাথ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির সহিত গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত স্মৃতি ও মতানুযায়ী অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। "রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় মহাবিশ্বজীবনের যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, পরমহংসদেবের সাধনায় তাহাই যেন মূর্তিমান হইয়াছে।"—দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লেখকের এই উক্তিতে ইতিহাসের পারম্পর্য অবহেলা করা হইয়াছে।

—মৈথিল্যানন্দ

Song Sublime or 'Geeta'—(In Rhyme) by Sr Profulla Kumar Lahiri, 57, Monohar Pukur Road, Calcutta-29 Pages 148. Price Rs. 1/-

সম্পূর্ণ গীতার আঠারোটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি শ্লোক পৃথক্ ভাবে ছন্দে ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। Edwin Arnold এর 'Song Celestial' এবং স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রিষ্টোফার ঈশারউডের 'Song of God'এর পর ইংরেজীতে গীতার কাব্যানুবাদে ভাষা ভঙ্গি ও ছন্দের নূতনত্ব আনা উচিত। লেখক সে দিক দিয়া না গিয়া মূলের নিকটতা রক্ষা করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, সেজন্য ভাষা ও ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; তবে ভাবের দিক দিয়া তাহা পূর্ণ হইয়াছে। বিদেশী পাঠকের নিকট ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাব পরিবেশনের প্রথম পুস্তকরূপে ইহা অনায়াসেই দেওয়া চলিবে। কাব্যের আবরণে দর্শনের তত্ত্ব ঢাকা পড়ে; আমাদের মনে হয় গীতার গদ্যানুবাদ বিষয়-প্রবেশে অধিকতর সহায়তা করিত।

মীরাবাঈ—শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য প্রণীত, প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিশার্স কলিকাতা-১২ পৃষ্ঠা ২৬২+(২২); মূল্য সাড়ে চারি টাকা।

নানা কারণে মীরাবাঈ-এর জীবনী লেখা সহজ নহে। প্রথমতঃ কোন সাধক বা সাধিকার জীবনী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয় না, দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী কালে ভাবের আতিশয্যে অনেকে বহু ঘটনা অতি-রঞ্জিত করিয়া এমনভাবে লোকের চোখে ধরিয়া দেন যে তাহা হইতে আসল জীবন খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

টড্ সাহেবের 'রাজস্থানে' আমরা মীরাবাঈ-এর জীবনীর ধারাবাহিক আলোচনা প্রথম দেখিতে পাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন—ঐ সকল লিপিবদ্ধ ঘটনাবলীর অনেকাংশই সত্য নয়।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া মীরার জীবনের ঘটনাগুলির যথাযথ সত্যতা নির্ণয় করিয়াছেন, ইহা প্রশংসনীয়; তবে হয়তো এই কারণেই পুস্তকখানি সাহিত্যের দিক দিয়া শুষ্ক হইয়াছে। মীরা-ভজনাবলীর অনুবাদগুলিতে মূলের আবেদন ঝঙ্কৃত হয় নাই। সঙ্গীত-মুখরিত প্রেম-নির্ঝরিণী মীরার জীবনের ভাব-ব্যঞ্জনা ইহাতে ফুটে নাই।

রামকৃষ্ণ-জননী শ্রীশ্রীসারদামণি—অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রণীত, প্রকাশক শ্রীলালবিহারী পাল, ২৮ বি, এন. ম্যাক মিল ষ্ট্রীট, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৪৮, মূল্য ১৲।

বইখানির ঐ প্রকার নামকরণের সার্থকতা লেখক ভূমিকায় যাহা বুঝাইযাছেন, তাহা আমাদের বোধগম্য হইল না। সে যাহাই হউক শ্রীসারদাদেবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনলীলা, বিশেষভাবে মাতৃভাবের দিকটি, কাব্যধর্মী গদ্যে লেখক ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। পুরাপুরি কাব্যাকারে লিখিলেই পুস্তকটির মর্যাদা বাড়িত। ঘটনা ও ভাষার ভুল অনেক স্থলে চোখে পড়িল। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি অবশ্য দূরীকরণীয়। ভাবের আতিশয্যে লেখক ঘটনার যাথার্থ্য বা পারম্পর্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন নাই—মনে হয।

অঘটন আজো ঘটে—দিলীপকুমার রায়। পৃষ্ঠা ২৯৬+৯। মূল্য চার টাকা আট আনা। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ; ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাংলাদেশের এই শ্যামল মাটিতে রাধাকৃষ্ণের যুগল-উপাসনা বহুদিন সাধক-সাধিকাগণের হৃদয়ে শ্রীভগবানের মাধুর্যময আনন্দস্বরূপের উপলব্ধি সঞ্চারিত করিয়াছে। এই ভক্তিরসাশ্রিত গ্রন্থটির আগুন্ত সেই অনুভূতির কাব্যমণ্ডিত প্রকাশ। পর পর কয়েকটি কাহিনীর মধ্য দিয়া লেখক এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ভগবানের চিরন্তন লীলারস পরিবেশন করিয়াছেন। অলৌকিক কাহিনীর প্রতি বিজ্ঞ সমাজের একান্ত উপেক্ষা এবং অজ্ঞ সাধারণের অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণতা—এই দুইই অযৌক্তিক। আমাদের সীমাবদ্ধ যুক্তি ও বুদ্ধি বিরাট বিশ্বরহস্যের সমস্তখানিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, একথা অহঙ্কারের পরিচয় দেয় মাত্র। অপর পক্ষে এই অলৌকিকতার ছদ্মবেশে অনেক নকল অবতার দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে—দেখিয়া সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার কথা ভাবিয়া দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি একথা সত্য যে সাধারণ যুক্তি ও বুদ্ধির অগম্য অনেক ঘটনাই এ জগতে ঘটে। বৈজ্ঞানিক তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করেন এবং ভক্ত ঐ ঘটনার মধ্য দিয়া সর্বসাধারণের কারণস্বরূপ শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমার কথা স্মরণ করিয়া ধন্য হন।

'অঘটন আজো ঘটে' সেইরূপ কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার সমষ্টি—যৌক্তিক যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা এই সব ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এ বইটির উদ্দিষ্ট পাঠক—"··যাঁরা সত্যকে খানিকটা কষতে পারেন, তাঁদের সহজবোধের—ইনটুইশনের নিকষে। ··এ বইটি লেখা শুধু তাঁদের জন্যে যাঁরা জানতে চান ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় কি না, ভক্ত কাতর হয়ে ডাকলে তিনি রক্ষা করেন কি না—এক কথায়, ভাগবত করুণা ভাববিলাসী কল্পনামাত্র, না পরীক্ষাসহ, অনুভবগম্য সত্য।" ভক্ত ভাবুকেরা বইটিকে যোগ্য সমাদর জানাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ভগবৎ-নির্ভরতার ও ভক্তরক্ষায় সদাজাগ্রত শ্রীভগবানের মহিমা কয়েকটি কাহিনীর মধ্য দিয়া লেখক অমৃতময়ী ভাষায় পরিবেশন করিয়াছেন। নবযুগের "ভক্তমাল"-রূপে এই গ্রন্থটি অজস্র হৃদয়ে শান্তির অমৃত পরিবেশন করিবে—ইহাই আমাদের ধারণা।

বইটির ছাপা ও প্রচ্ছদপট উচ্চাঙ্গের। সে তুলনায় প্রকাশক যদি বাঁধাইয়ের দিকে আর একটু নজর দিতেন তাহা হইলে পাঠকেরা অধিকতর তৃপ্তি লাভ করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

দিল্লী ঃ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণীতে ইহার ধর্ম-সংস্কৃতি-সেবামূলক কার্যাবলীর ব্যাপক চিত্র সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। রবিবারের গীতা ক্লাসে প্রায় সহস্র সুধী ও বিদ্যার্থীর সমাগম হয়। আশ্রমে এবং আশ্রমের বাহিরে অনুষ্ঠিত শাস্ত্রালোচনার সভাগুলি খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কেন্দ্রপরিচালক স্বামী রঙ্গনাথানন্দ পাটনা, নাগপুর, লখ্‌নৌ, কানপুর, দেরাদুন সাহারানপুর প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় দর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু কর্তৃক গ্রন্থাগার ও সভাগৃহের উদ্বোধন এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়, যক্ষ্মা-ক্লিনিক এবং 'সারদা-মহিলা-সমিতি'র কার্যও প্রশংসনীয়।

বেলঘরিয়া (২৪ পরগনা): শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমের ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে মনুষ্যত্ব-বিকাশের সর্ববিধ সুযোগ লাভ করিতে পারে তাহার জন্যই এই প্রতিষ্ঠান। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদিগের সমস্ত খরচ আশ্রম হইতেই দেওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট ৮২ জন বিদ্যার্থীর মধ্যে ৪৭ জন 'ফ্রি' এবং ১৫ জন আংশিক 'ফ্রি' ছিল। ১৯৫৬ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক: এম্‌-এস্‌.সি পরীক্ষায় ২টি ছাত্রের মধ্যে একটি ফার্ষ্ট ক্লাস ও একটি সেকেণ্ড ক্লাস পায়; বি-এ এবং বি-এস্‌.সিতে ৭টির মধ্যে ৬টি দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ করে; আই-এ ও আই-এস্‌.সিতে ২১ জনের সকলেই উত্তীর্ণ হয় (১৭টি প্রথম বিভাগে), ৪ জন সরকারী বৃত্তি লাভ করে।

এখানে উপাসনা-মন্দিরে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা, নিয়মিত ধর্ম ও সমাজনীতি বিষয়ক আলোচনা, সুপরিচালিত ব্যায়ামাগারে স্বাস্থ্যচর্চা, প্রশস্ত মাঠে খেলাধূলা, বৃহৎ ঝিলে সন্তরণ বিদ্যার্থিগণের নৈতিক মানসিক ও শারীরিক উন্নতির বিশেষ সহায়ক।

বারাণসী ঃ সেবাশ্রম (শ্রীরামকৃষ্ণ রোড, বারাণসী-১)—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এই পুরাতন সেবা-প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘ ৫৬ বৎসর ধরিয়া জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শিবজ্ঞানে আর্তসেবা করিয়া আসিতেছে। ১৯৫৬ সালের সুমুদ্রিত কার্যবিবরণী আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। এখানকার সুপরিচালিত বিভাগগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণী: অন্তর্বিভাগীয় সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসিত—২৯৯৬, বৃদ্ধ কর্মশক্তিহীন নরনারীর আশ্রয়াগারে ২৮ জন ছিলেন, বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে মোট চিকিৎসিত—৭৩,৩৭৫, অস্ত্রচিকিৎসা-প্রাপ্ত—৪৭,০৫৫। গড়ে দৈনিক রোগিসংখ্যা—৮৬০, প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে প্রায় ১০,০০০ নমুনা পরীক্ষিত হয়, এক্স-রে বিভাগে পরীক্ষিতের সংখ্যা প্রায় ১০০০। দরিদ্র, পঙ্গু ও স্কুলের ছাত্রদিগকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়, এবং সাময়িক রিলিফ কার্যের ভারও গ্রহণ করা হইয়াছিল।

উৎসব

জলপাইগুড়ি ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৩শে চৈত্র শনিবার, (৬ই এপ্রিল) সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে জনসভা হয়। সভায় আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বোধসানন্দ বার্ষিক কার্য-বিবরণী পাঠ করেন, স্বামী অচিন্ত্যানন্দের বক্তৃতার পর রাত্রে কীর্তন হয়। পরদিন সাধারণ উৎসবে সারাদিনে বহু ভক্ত নরনারী সমাগত হন ও ২০০০ জন বসিয়া প্রসাদ পান।

আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার

সেণ্ট লুই : বেদান্ত সোসাইটি, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের **কার্যবিবরণী :** কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) রবিবারের ধর্মালোচনা : ধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে সারা বৎসরে প্রায় ৪৭টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। নানা ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হইতে এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তুলনামূলক ধর্ম (Comparative Religion) অধ্যয়ন করিবার জন্য ছাত্রগণ আসিতেন।

(২) প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ধ্যানভ্যাস শিখাইতেন এবং 'কঠোপনিষদ্' ও 'নারদীয়ভক্তিসূত্রে'র অধ্যাপনা করিয়াছেন।

(৩) এই বৎসরের বিশেষ ঘটনা : ভারত হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী ও প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী নির্বাণানন্দজীর আমেরিকা আগমন। তাঁহারা ২২শে মার্চ সেণ্ট লুই আশ্রমে আসেন। সোসাইটিতে স্বামী মাধবানন্দজী সাধারণ সভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশ্বশান্তি' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

(৪) ২৩শে ফেব্রুআরি স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ কলাম্বিয়া স্টিফেন কলেজের উদ্যোগে একটি টেলিভিশন আলোচনায় যোগ দেন। প্রায় নয় শত শ্রোতার সম্মুখে তিনি ভারতীয় দর্শনের দিক হইতে অধ্যাপক স্মিথের পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর দেন,—আমরা যে জগতে বাস করি তাহার স্বরূপ কি? মানুষ কি? মানুষের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য কি? কি করিয়া মানুষ সেই উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারে? সমাজ কিভাবে গঠিত হইবে?

(৫) সেণ্ট লুই-এর থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও খৃষ্টান ধর্মমন্দিরে আহূত হইয়া 'স্বামী' ভারতের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দেন।

(৬) শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে বিশেষ পূজা ভজন হয়। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শংকরাচার্যের জন্মদিনেও বিশেষ আলোচনা, এবং দুর্গোৎসব—গুড ফ্রাইডে ও খৃষ্টমাসের সময় আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(৭) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামীজী এই বৎসর ২৮ জনকে সাধনার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(৮) সোসাইটির বন্ধু ও সদস্যেরা গ্রন্থাগারের পুস্তকের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

শিক্ষা-শিবির

বেলুড় : জনশিক্ষা মন্দির : যুব-শিক্ষা শিবির

অন্যান্য বৎসরের মত এবারও গ্রীষ্মাবকাশকালে সারা জুন মাস ধরিয়া বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন জন-শিক্ষামন্দিরের তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত কর্মী বা আদর্শ সমাজ-সেবক গঠনের উদ্দেশ্যে যুব-শিক্ষা-শিবির পরিচালিত হইয়াছিল। পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগনা হইতে শিবিরে যোগদান করে। প্রায় সকলেই স্কুল বা কলেজের ছাত্র; এক জন শিক্ষক ছিলেন।

নিয়মিত কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ভোরে প্রার্থনা, সকালে কুচকাওয়াজ, প্রাথমিক চিকিৎসা-শিক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, ম্যালেরিয়া দূরীকরণ-অভিযান ও খেলাধুলা। শিবিরে বাসকালে কাঠের খেলনা তৈয়ারি, বই বাঁধাই প্রভৃতি হাতের কাজ ও গ্রন্থাগার পরিচালনা শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল।

শিক্ষার্থীদের জন্য সকালে ও সন্ধ্যায় প্রায় প্রতিদিনই সমাজজীবন-গঠনের উপযোগী বিষয় আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে স্বপনবুড়োর 'শিশুসংগঠন,' মৌমাছির

'নেতৃত্ব', বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীসুবোধ মুখার্জির 'গ্রন্থাগার পরিচালনা', পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়ের 'শিবির-জীবনের উদ্দেশ্য', শ্রীদেবনাথ দাসের 'নেতাজী', শ্রীননী দত্তের 'বয়স্কশিক্ষা', রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা শিক্ষণকেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীঅবীর মুখার্জির 'চলচ্চিত্রের মর্যাদা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসিগণও বিভিন্ন দিন বেদ, গীতা, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, বিবেকানন্দ ও বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে বলেন।

সর্বসাধারণের জন্য: একদিন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীর কথকতা' হয়, কয়েক দিন চলচ্চিত্রে 'পথের পাঁচালী' প্রভৃতি দেখানো হয়; একদিন জনশিক্ষা-মন্দিরের যুবপ্রতিষ্ঠান 'মহেশ' নাটক অভিনয় করিয়া সকলকে আনন্দিত করে।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে পুলিনবিহারী মিত্র

গত ১৮ই শ্রাবণ ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয় তাঁহার ঈশ্বর চক্রবর্তী লেনের বাসভবনে ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দকেও তিনি দর্শন করিয়াছিলেন, এবং বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পুলিনবাবু সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে তিনি প্রায়ই সঙ্গীত শুনাইতেন, মহারাজও তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। স্বামী বিবেকানন্দ রচিত 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি'—বিখ্যাত সঙ্গীতটি রেকর্ডে গাহিয়া পুলিনবাবু যশস্বী হইয়াছিলেন। সঙ্গীত-নায়ক পরলোকগত অঘোর চক্রবর্তীর নিকট তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। পূর্বে প্রায় প্রতিবৎসর বেলুড়মঠে দুর্গাপূজার সময় তিনি আগমনী সঙ্গীত গাহিয়া ভক্তগণকে মুগ্ধ করিতেন। মঠে সাধুদের তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন; তিনিও সকলকে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা চির শান্তিলাভ করুক,—ইহাই প্রার্থনা।

নানাস্থানে উৎসব

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে পূজা পাঠ কীর্তন ভজন প্রসাদ-বিতরণ আলোচনা-সভা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

চাকদহ (নদীয়া), চৌধুরীহাট (কুচবিহার), আদ্রা (পুরুলিয়া), কাটোয়া (বর্ধমান), ইছাপুর নবাবগঞ্জ (২৪ পরগনা), জনাই (হুগলী), তারাগুলিয়া (২৪ পরগনা)।

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ এই উৎসবগুলিতে যোগদান করিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী' আলোচনা করেন। চৌধুরীহাটে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন কুচবিহারের মহারাজ ভূপবাহাদুর; আদ্রায় অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার এবং ইছাপুর নবাবগঞ্জে অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত অন্যতম বক্তা ছিলেন।

অণ্ডাল (বর্ধমান): চারদিনব্যাপী উৎসবে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ এবং স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করেন।

ডিগবয় (আসাম) : স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কর্তৃক চারদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী সৌম্যানন্দ মহারাজ বাংলায়, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ হিন্দীতে এবং শ্রীমহাদেব শর্মা আসামীতে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন।

তেজপুর (আসাম) ঃ গত ১৪ই ১৫ই ও ১৬ই জুন শিলং মিশন কেন্দ্রের স্বামী চণ্ডিকানন্দ ও স্বামী গহনানন্দের উপস্থিতিতে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিদিনই পূর্বাহ্নে পূজা পাঠ ভজন সঙ্গীত, মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণ ও সায়াহ্নে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অসমীয়া হাইস্কুলে (তেজপুর একাডেমী), বাঙালী বালকদের ও বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয়ে—তিন দিন তিন জায়গায় সভা হওয়াতে সকলেই আনন্দ উপভোগ করেন।

সংস্কৃতি-সংবাদ

বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার ঃ গত জুলাই মাসে সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে আহূত পণ্ডিত এবং সংস্কৃতানুরাগী সুধীবৃন্দের এক মহতী সভায় পরিষদধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলেন, গত কয়েক বৎসরে বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের অবিভক্ত বাংলার ২৫০টি চতুষ্পাঠীর স্থলে বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে প্রায় ১৪০০ চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতেছে। পরিষদের অধীনে ৫৬টি পরীক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে ৩০টি কেন্দ্র বাংলার বাহিরে পরিচালিত হইতেছে। ছাত্রসংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়াছে। তিনি বলেন, বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মুসলমান ছাত্রগণ ক্রমশঃ সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে।

জাতীয় গ্রন্থাগারে তিব্বতী পুঁথি ঃ মাননীয় দলাই লামা সম্প্রতি কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে বুদ্ধ-মুখ-নিঃসৃত বাণী-সংকলন 'কাঞ্জোর' নামক একটি দুষ্প্রাপ্য তিব্বতীয় ধর্মগ্রন্থ উপহার পাঠাইয়াছেন। গত শীতকালে যখন তিনি গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন তখন গ্রন্থাগারিক মহাশয় তাঁহাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করায় তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, ঐ পুস্তকের একটি নকল পাঠাইয়া দিবেন। এই মূল্যবান গ্রন্থটি পাওয়াতে গ্রন্থাগারের গৌরব বাড়িয়াছে। এতদ্দ্বারা তিব্বতের ধর্ম ও কৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হইল।

বিশ্ব-দার্শনিক সম্মেলন ঃ প্যারিসের আন্তর্জাতিক দার্শনিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পোলিশ আকাডেমির ভবনে ওয়ার্‌স'তে কুড়িটি দেশের প্রায় পঞ্চাশ জন দার্শনিক সমবেত হন। ১৭ই জুলাই হইতে ২০শে জুলাই পর্যন্ত চারদিনে 'চিন্তা ও কর্মের পরস্পর সম্বন্ধ'—এই প্রধান বিষয় লইয়া নয়টি গবেষণা-পত্র পঠিত হয়, ঘরোয়াভাবেও আলোচনা হয়। এশিয়া হইতে ভারত, চীন ও জাপানের প্রতিনিধিগণ ইহাতে যোগ দিতে গিয়াছিলেন। ১৮ই জুলাই ভারতকে একটি পুরা দিন প্রদত্ত হয়। মহীশূরের শ্রীনিকাম ও দিল্লীর শ্রীহুমায়ুন কবীর ভারতীয় ভাবধারা ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে বসিবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

বিশ্ব-ধর্ম-সভা ঃ গত ২৩শে জুন, নিউ দিল্লী রাষ্ট্রপতি-ভবনে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়া স্থির করিয়াছেন—আগামী নভেম্বরে দিল্লীতে বিশ্বশান্তি ও মানুষের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মগুলির একটি সম্মেলন-সভা অনুষ্ঠিত হইবে। জৈন 'মুনি' সুশীল কুমারজীর দায়িত্বাধীনে সর্বভারতীয় ধর্ম-সম্মেলনের এক সভায় কাকা কালেলকারের সভাপতিত্বে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। রাজস্থানের (অর্থমন্ত্রী) শ্রীহরিবল্লভ উপাধ্যায় মহাশয় উক্ত সংঘের অধ্যক্ষ।

বিজ্ঞান

সমুদ্র হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি: কিছুদিন যাবৎ বৈজ্ঞানিক-মহলে গবেষণা চলিতেছিল সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরে যে তাপ-তারতম্য (Oceanic thermal gradients) রহিয়াছে, তাহাকে কাজে লাগাইয়া শিল্পের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা যায় কিনা। উপবিভাগে চঞ্চল উষ্ণস্রোত এবং তলদেশে শান্ত শীতল জলের স্তর, সমুদ্রের এই ধর্ম লইয়া ফ্রান্সে প্রাথমিক পরীক্ষার সাফল্যের পর আফ্রিকার আইভরি কোষ্টে—যেখানে এই তাপ-তারতম্য খুব বেশী সেখানে বিদ্যুৎ-শক্তির দুইটি উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে! বিদ্যুৎ-শক্তির আরও একটি অফুরন্ত উৎস - নূতন আবিষ্কৃত না হইলেও—নূতনভাবে কাজে লাগানো হইল।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা

সম্মিলিত জাতিসংঘের পরিসংখ্যান মতে: পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা ২৭০,০০,০০,০০০; এবং প্রতি ঘণ্টায় ৫০০০, প্রতিদিন ১২০,০০০ এবং প্রতিবৎসর ৪,৩৮,০০,০০০ করিয়া বাড়িতেছে! হাজার করা জন্মের হার ৩৪ এবং হাজার করা মৃত্যুর হার ১৮। ল্যাটিন আমেরিকার বৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা বেশী—প্রতিবৎসর শতকরা ২.৬। সর্বাপেক্ষা ঘনবসতির দেশ এশিয়া; পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী লোক এশিয়াবাসী! সকল দেশেই এমনকি অনুন্নত দেশগুলিতেও মৃত্যুর হার পূর্বাপেক্ষা কমিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ স্বাস্থ্যনীতির মান উন্নয়ন। মৃত্যুর হার কমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—প্রত্যাশিত আয়ু বাড়িয়াছে। উত্তর আমেরিকা ও ইওরোপে—গড়ে আয়ু ৭১ বৎসর, ভারতে ৩৪ বৎসর।

বয়স অনুযায়ী সংখ্যাবিভাগ: ১৫ বৎসরের নীচে শতকরা ৩৪; ১৫ হইতে ৫৯ বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা শতকরা ৫৮; ৬০ এর উপরে শতকরা ৮।

পণ্য-উৎপাদন কার্যে নারীর যোগদান: হাইতি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়ায় ৫৪%, ল্যাটিন আমেরিকায় ১০%, পাকিস্তান ৪%।

ধর্ম ও ভাষা অনুযায়ী বিভাগ: (১) ভারতে—হিন্দু ৮৫%, মুসলমান ১০%, বাকী ৫% শিখ খৃষ্টান জৈন প্রভৃতি।

(২) পাকিস্থানে—মুসলমান ৮৫%, হিন্দু ১৩%, অন্যান্য ২%।

(৩) সিংহলে—হিন্দু ২০% অন্যান্য ভারতীয় ধর্ম ১০%, সিংহল, ব্রহ্ম ও তাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধ ধর্মই প্রবল। খৃষ্টান ধর্ম পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র—ছড়াইয়া আছে। ভারতে প্রায় ৮০০ প্রকার ভাষা কথিত হয়।

বহিরাগত জাতিদের সংখ্যানুপাত: ফিজিতে ভারতীয়দের সংখ্যা ফিজিয়ান অপেক্ষা অধিক। ট্রিনিদাদের ৩৫% এবং বৃটিশ গায়েনার ৪০% ভারতীয়। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের জন্মহার অপর অধিবাসী-অপেক্ষা বেশী, এবং ভারতীয়রাই সংখ্যাধিক।

দক্ষিণ আফ্রিকায় দেশীয় বা বান্টু জাতি ৬৭%, শ্বেতজাতি ২১%, মিশ্র ৯% এবং এশীয় (ভারতীয়) ৩%।

বহু দেশেই, সংখ্যা-গণনায় অনেক ভুল-ত্রুটি আছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সংখ্যাগণনা, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব নাই বলিলেই চলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যাগণনার ভুল মাত্র ১.৪%, তাহারও কারণ লোকেদের চলাফেরা ও স্থানপরিবর্তন। —United Nations' Demographic Year Book.

বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধনের গ্রাহক-সংখ্যা পরিবর্তন

উদ্বোধন-পত্রিকার বর্তমান গ্রাহকবর্গকে জানান যাইতেছে যে—শ্রাবণ ১৩৬৪, হইতে তাঁহাদের গ্রাহক সংখ্যা (Subscribers' Number) পরিবর্তন করা হইল। পত্রিকার উপরে যে ঠিকানা থাকে তাহার পূর্বভাগেই এই গ্রাহকসংখ্যা থাকিবে। যদি কেহ ঠিকানা পরিবর্তন, বা পত্রিকা-অপ্রাপ্তি প্রভৃতির জন্য পত্র দেন, তাহা হইলে এই গ্রাহকসংখ্যাসহ নিজ নাম ঠিকানার উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না। ইতি—

—কার্যাধ্যক্ষ



শ্রীশ্রীদুর্গা

[illegible]

উদ্বোধন

দেবীর আত্মপ্রকাশ

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥

[ঋগ্বেদ : ১০।১০।১২৫।৪]

ভারতের তপোবনে মহর্ষি অম্ভৃণের দুহিতা বাক্ আত্মোপলব্ধির পরম মুহূর্তে পরিপূর্ণ হৃদয়ে যাহা বলিয়া উঠিয়াছিলেন—তাহাতে জগতের ও জীবনের মহারহস্য উদ্‌ঘাটিত। জগৎ-রঙ্গমঞ্চের পিছনে থাকিয়া যিনি এই বিশ্বনাট্য পরিচালনা করিতেছেন, সহসা যবনিকা উত্তোলন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া 'দেবীসূক্তে' সেই দেবীই যেন স্বয়ং বলিতেছেন :

আমারই শক্তিতে সকল প্রাণী অন্ন আহার করিয়া শরীর পোষণ করে, আমারই শক্তিতে সকলে শ্বাস-প্রশ্বাস নির্বাহ করিয়া প্রাণ ধারণ করে, আমারই শক্তিতে চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় রূপরসাদি পঞ্চবিষয় ভোগ করে—চক্ষু দেখিতে পায়, কর্ণ কথিত বাক্য শ্রবণ করে।

যাহারা আমাকে এইরূপে অন্তর্যামিনীরূপে জানে না, তাহারা আত্মবিমুখ হইয়া জন্ম-মরণের পথে বারংবার দেহধারণ করিয়া দুঃখ পায়, ক্লেশ পায়; আমাকে অবজ্ঞা করিয়া হীন হয়, ক্ষীণ হয়। হে শ্রুতি-স্মৃতিপরায়ণ বিশ্বাসী মানব! শ্রদ্ধালভ্য আত্মতত্ত্বের কথা তোমাকেই বলিতেছি—শ্রবণ কর, ধারণা কর!

আমি সকলের আদি মধ্য অন্ত জুড়িয়া—ভক্ষ্য-ভোগ্যরূপে বাহিরে, প্রাণ ও চৈতন্যরূপে ভিতরে; আমাকে অস্বীকার করিও না, আমাকে আত্মা বলিয়া উপলব্ধি কর; আমাকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আশ্রয় বলিয়া জানো। বিশ্বাস কর—মৃত্যুময় জীবনের পারে অমৃতত্বে তোমাদের চির অধিকার! তোমরা যে অমৃতের সন্তান, আমার সন্তান,—আমিই যে অমৃত-স্বরূপিণী!

কথাপ্রসঙ্গে

মাতৃ-উপাসনা

সৃষ্টির রহস্য মানুষ জানিতে না-ও পারে, আত্যন্তিক প্রলয়ও তাহার জ্ঞানের অগোচর; কিন্তু পালনী শক্তির মধুর স্পর্শ কি জীবনের প্রথম অনুভূতির সহিত তাহার সত্তার পরতে পরতে চেতনা সঞ্চারিত করে নাই? বহির্জগতের কঠিন মৃত্তিকাস্পর্শজনিত প্রথম ক্রন্দনকে হাসিতে রূপান্তরিত করিতেই কি সেই আনন্দশক্তির সকল চেষ্টা নিয়োজিত হয় নাই?

স্বীয় হৃদয়ের স্পন্দন দিয়া যিনি সন্তানহৃদয়ে স্পন্দন সূচনা করিয়াছেন, স্বীয় বক্ষের সুধা দিয়া যিনি সন্তানের ক্ষুধা মিটাইয়াছেন, স্বীয় চক্ষের স্নিগ্ধ দীপ্তি দিয়া যিনি সন্তানের চোখে দৃষ্টি করিয়াছেন, মহাশক্তির সেই পরম বিকাশ—সত্তা, চেতনা ও আনন্দের সেই মধুর প্রকাশ—মাতৃমূর্তিই সন্তানের অনুভূতিতে প্রথম প্রতিভাত; বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া শিশু দেখিয়াছে—তাহার নিকটতম, অন্তরতম এই মূর্তিটিকে! বুদ্ধি দিয়া বোঝে নাই, মন দিয়া ভাবে নাই; কিন্তু প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে—এই আমার প্রিয়—পরম কাম্য! তাহাকে দেখিলে সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে না দেখিলে সে কাঁদিয়াছে—অস্ফুট স্বরে ডাকিয়াছে—সে ডাকাতে প্রস্ফুটিত ভাষা নাই; কিন্তু সন্তান ও জননীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পক্ষে তাহাই কি যথেষ্ট হয় নাই?

তারপর যেদিন আধ-আধ স্বরে সন্তান-কণ্ঠে 'মা, মা' শব্দ দুটি ধ্বনিত হইল—সেদিন জননীর এতদিনের নীরব সাধনা সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল! জননীর সম্পূর্ণ রূপ, স্বরূপ—সন্তান কখনও জানিতে পারে না। মাতৃশক্তির পালনী মূর্তিই সন্তানের প্রয়োজন, এই মূর্তিই তাহার উপাস্য এবং মাতৃনাম-মহামন্ত্রেই তাহার জন্মগত অধিকার! এই শক্তির মধুর মহিমাই তাহার জীবন মরণ জুড়িয়া এক মহা-সঙ্গীতের মতো বাজিয়া চলিয়াছে!

অন্ধকারে ভয় পাইয়া শিশু সর্বাগ্রে মা-কেই মনে মনে ডাকিয়াছে, বিপদে সঙ্কটে মানুষ 'প্রাণ-পরিত্রাহি' ডাকিয়া ওঠে, 'মাগো, রক্ষা করো'; দূর দেশান্তরে রোগযন্ত্রণায় মাতৃস্পর্শ কামনা করিয়াই অচৈতন্য অবস্থায়ও সন্তান মাকেই খুঁজিয়া থাকে! মুমূর্ষু বৃদ্ধও অস্ফুট স্বরে বলে, 'মাগো! কোলে তুলে নাও!' কে এই জননী? যাহার জন্য সন্তান সর্বদা সর্বাবস্থায় স্বভাবতই ব্যাকুল—যাহার সহিত তাহার নিত্যসম্বন্ধ?—দেশ কালের ঊর্ধ্বে,—যুক্তি-তর্কের সীমার বাহিরে?

এই মাতৃতত্ত্ব বিশ্লেষণের বস্তু নয়, একান্তই অনুভূতির বিষয়, এবং মাতৃস্নেহ—মহামায়ারই অপার করুণায় প্রত্যেক প্রাণীর অনুভূতির মধ্যে; তিনিই যেন অনুভূতিরূপে সন্তানের হৃদয়ে, অন্তর্যামিনীরূপে সন্তানের অন্তরে!

* * *

সৃষ্টির সেই প্রথম উষায় যখন সৃষ্টিকর্তা সদ্য জাগিয়া উঠিয়া দেখেন মধু-কৈটভ-রূপ সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বাবর্তে মহান্ধকারে তিনি বিপন্ন, জগৎ-পাতা পুরুষোত্তমও নিদ্রাচ্ছন্ন,—তখনই তিনি নারায়ণেরও নিদ্রাকারিণী 'হরি-নেত্র-কৃতালয়া' সেই মহামায়ার বন্দনা শুরু করিলেন, 'মা, তুমি আর তমোময়ীরূপে

আমাদের অন্তর আচ্ছন্ন রাখিও না, বিষ্ণুকে উদ্বুদ্ধ কর জগৎপালনকার্যে।' ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্টা মহাকালী মহামায়া সরিয়া দাঁড়াইলে জাগরিত বিষ্ণু মধুকৈটভকে সংহার করিয়া সৃষ্টির পর পালনে তৎপর হইলেন।

আবার 'দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধম্ পূর্ণমব্দশতং পুরা'! শতায়ু মানবের সারাটি জীবনই তো দেবাসুরের যুদ্ধ, এবং সত্ত্বগুণাশ্রিত দৈবীসম্পদ জ্ঞানভক্তিকে বিদূরিত করিয়া রজস্তমোময় আসুরিক ভাব কামক্রোধই তো আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে; শান্তি ও আনন্দের স্বর্গরাজ্য হইতে দেবস্বভাব মানব নির্বাসিত।

কি উপায়ে আবার তাহা ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে?—এই চিন্তায় নিমগ্ন সাধক দেবতাগণ! তাঁহাদের ভিতর যে শক্তি বিভক্তভাবে ছিল—একাগ্রতায় তাহাই একীভূত, সম্মিলিত হইয়া এক অপূর্ব নারী-মূর্তিরূপে আবির্ভূত হইল—পালনপরা বরাভয়করা মাতৃমূর্তি! কিন্তু পালনকার্যে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত দ্বৈত-দ্বন্দ্ব শুভাশুভের অশুভকে পরিহার করিতেই হইবে, অশুভ দুর্বৃত্তশক্তিকে দৈবী শুভশক্তি দ্বারা নিগৃহীত করিয়া মহালক্ষ্মী মহাদেবী সন্তানদের শুভ বাসনা পূর্ণ করিলেন, তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত বন্দনা শ্রবণান্তর স্বর্গীয় সহস্রোপচারের পূজা গ্রহণ করিয়া 'বিপৎকালে ডাকিলেই আসিব' সন্তানদিগকে এই মধুর আশ্বাস দিয়া জননী অন্তর্হিতা হইলেন!

আবার দম্ভ-দর্প-রূপী দুই মহাশত্রু শুম্ভ-নিশুম্ভের বিক্রমে স্বর্গশান্তিচ্যুত হইলে উপাসনা-পরায়ণ নির্যাতিত দেবগণ দেবীকে আহ্বান করিলেন, যে দেবী সকলের মধ্যে সর্বরূপে বিরাজমানা—বিপন্ন দেবতাগণ জননীর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া তাঁহাকে প্রাণপণ ডাকিতে লাগিলেন। লীলাময়ী দেবী দেখা দিয়া, অনন্ত অপূর্ব চিত্তচমৎকারিণী মায়া বিস্তার করিয়া সন্তানদের সুখের বাধা দূর করিলেন। অসংখ্য অশুভ বাসনা ধ্বংস করিয়া মহাসরস্বতী অহংকারের যুগ্মমূর্তি দম্ভ-দর্প-রূপী শেষ দুই মহা শত্রু বিনষ্ট করিয়া শান্তির স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক করেন! যাহা বাহিরে, তাহাই অন্তরে। যাহা অন্তরে, তাহাই বাহিরে!

*　　　*　　　*

শিশুর মতো সরল বিশ্বাসে ডাকিতে পারিলে মা না আসিয়া থাকিতে পারেন না, কারণ সন্তানের উপর জননীর নিজেরই যে এক স্বাভাবিক টান রহিয়াছে! তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ভাবের সাধনা করিয়া মাতৃভাবেই স্থিতি করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন: ঈশ্বরকে অনেকভাবে তো ডেকেছ, একবার 'মা' বলে ডেকে দেখ না! মা নাম বড় মধুর, মা বড় আপনার, জোর চলে।—মা জানেন সন্তানের ভাব ও অভাব। অভাব বুঝিয়া তিনি সুরথকে রাজ্য দেন, ভাব বুঝিয়া সমাধিবৈশ্যকে জ্ঞান দেন, আর মেধামুনিকে মাতৃমহিমা-কীর্তনে মুখর করেন!

মাতৃতত্ত্ব আত্মতত্ত্বেরই নামান্তর—অন্তর্নিহিত রূপ! মাতৃ-উপাসনাই আত্মানুসন্ধান: 'কোথা হইতে আমার উদয়, কোথায় স্থিতি, কোথায় বিলয়?' আত্মানুসন্ধান মানুষকে লইয়া যায় আত্মায়, ব্রহ্মে, সচ্চিদানন্দে। মাতৃ-উপাসনায় সাধক বোঝেন: মা-ই আমার আত্মা, শক্তি ব্রহ্ম অভেদ;—যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই সর্বভূতে সর্বব্যাপিনী সত্তা ও চেতনা,—তিনিই সুখে দুঃখে আনন্দদায়িনী, তিনিই আনন্দময়ী—আনন্দ-স্বরূপিণী।

মহালয়া-তত্ত্ব

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

'মহালয়া' কথাটীর প্রকৃত অর্থ কি, এ যেমন ভাবতে ইচ্ছা করে, তেমনি মহালয়ার সঙ্গে দুর্গা-পূজার সম্বন্ধ কি, সে রহস্যও উল্লেখ করতে স্বতই বাসনা জাগে। মহালয়া থেকেই আমাদের দেশে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি; কোনও কোনও অঞ্চলে মহা-লয়ার পূর্ববর্তী কৃষ্ণা নবমীতিথি থেকেই কল্পারম্ভ। তা হ'লে মহালয়া কি, অপর-পক্ষ বা পিতৃপক্ষের সঙ্গে দুর্গাপূজার পক্ষ বা দেবীপক্ষের সম্পর্ক কি—এই তত্ত্বের অনুধাবন করবার চেষ্টা করবো।

মহালয়া স্ত্রীলিঙ্গবোধক শব্দ—অমাবস্যা—শব্দের বিশেষণ। কিন্তু এই পিতৃপক্ষীয় অমাবস্যাটীই 'মহালয়া' কেন? বিগ্রহবাক্য করতে গেলে (১) "মহান্ লয়ো যত্র" অথবা (২) 'মহান্ আলয়ো নিবাসো যত্র যা বা সা মহালয়া'। তা হ'লে এ অমাবস্যাতে কার মহান্ লয়, অথবা কারই বা মহান্ নিবাস? উত্তর কি? পুনরায় যদি বলি—(৩) 'মহস্য উৎসবস্য আলয়ঃ' অর্থাৎ উৎসবের বসতিস্থল বা পরিপূর্ণ উৎসব-দিবস—তা হ'লেও কি অর্থ দাঁড়ায়? শাস্ত্র-প্রমাণ কি? মহালয় ও মহালয়া দুটি শব্দেরই প্রয়োগ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কাজেই এই শেষোক্ত বিগ্রহবাক্যও সম্ভবপর; অথবা যদি বলি 'মহাংশ্চাসৌ আলয়শ্চ ইতি'—পুংলিঙ্গান্ত মহালয়।

(১) মহান্ লয়ো যত্র

কস্য? চন্দ্রস্যেতি—চন্দ্রের মহান্ লয় হয় এই অমাবস্যায়—এই অর্থে 'মহালয়া' যোগরূঢ়-শব্দ, বলেছেন বঙ্গদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ স্মার্ত কালবিবেকের টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার। চন্দ্রের ক্ষয় তো প্রতি কৃষ্ণপক্ষেই হয়; তবে প্রৌষ্ঠপদী বা ভাদ্রী পূর্ণিমার পরবর্তী অমাবস্যাটীতে চন্দ্রের আত্যন্তিক বা বিশেষ ক্ষয়ের প্রশ্ন কোথায়? তাই তর্কালঙ্কার এই শব্দকে "যোগরূঢ়" বলেছেন। যোগরূঢ় শব্দ ব্যুৎপত্তি-বিষয়ে আমাদের মৌন মূক করে দেয় ঠিকই, কৌতূহল চরিতার্থ করে না—চিত্তেও তেমন শান্তি প্রদান করে না।

কিন্তু আমরা যদি যে অমাবস্যায় সারা বৎসরের শ্রাদ্ধদানের সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ লয় ঘটে—সেই অর্থে ধরি, তা হ'লে তো "চন্দ্রের লয়" অর্থ আনতে হয় না, অথচ শাস্ত্রবাক্যও এই অর্থে সুসিদ্ধ হয়ে পড়ে।

(২) মহান্ আলয়ো যত্র

যজুঃশ্রুতি বলছেন—"দ্বে সৃতী অশৃণবং দেবানামুত পিতৃণাম্।' একটী দক্ষিণায়ন, অন্যটী উত্তরায়ণ। অর্থাৎ দেবগণ ও পিতৃগণের অধিকার অনুসারে দুটি সরণি রয়েছে। একটী উত্তরায়ণ, অন্যটী দক্ষিণায়ন। মাঘাদি ষন্মাস উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণাদি ষন্মাস দক্ষিণায়ন। দক্ষিণায়নই পিতৃগণের অধিকৃত কাল। দক্ষিণায়নের ছয় মাস সময়ের মধ্যে, পুনরায় কেশব যখন সুপ্ত থাকেন, সে সময়ই প্রশস্ত। তন্মধ্যে পুনরায় প্রৌষ্ঠপদীর অর্থাৎ ভাদ্র পৌর্ণমাসীর পর-পক্ষ প্রশস্ত। আবার তার মধ্যে প্রতিপদ্ থেকে পঞ্চমী, ষষ্ঠী থেকে দশমী এবং একাদশী থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত অর্থাৎ মহালয়া পর্যন্ত উত্তরোত্তর প্রশস্ত, প্রশস্ততর ও প্রশস্ততম কাল। ত্রয়োদশী যদি মঘা-নক্ষত্রযুক্ত হয়, তা হলেই সব চেয়ে প্রশস্ত। যদি মধু এবং পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ প্রদান করা হয়, তা হ'লে সে শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়। যে যেমন অবস্থাতেই থাকুক—এ সময়ে সকলের পক্ষে শ্রাদ্ধ একান্ত বিহিত।

উত্তরাদয়নাচ্ছ্রাদ্ধে শ্রেষ্ঠং স্যাদ্দক্ষিণায়নম্।
চাতুর্মাস্যন্ত তত্রাপি প্রসুপ্তে কেশবে হিতম্॥

প্রোষ্ঠপত্যাঃ পরঃ পক্ষস্তত্রাপি চ বিশেষতঃ।
পঞ্চমূর্ধ্বঞ্চ তত্রাপি দশমূর্ধ্বমতোঽপ্যতি ॥
মঘাযুক্তা চ তত্রাপি শস্তা রাজংস্ত্রয়োদশী।
তত্রাক্ষয়ং ভবেচ্ছ্রাদ্ধং মধুনা পায়সেন চ ॥
সর্বস্বেনাপি কর্তব্যং শ্রাদ্ধমত্র নরাধিপ।
পরান্নভোজী শ্বপচঃ শ্রাদ্ধমত্র তু কারয়েৎ ॥

বৃহদ্রাজ-মার্তণ্ড-ধৃত 'মৎস্যপুরাণে'ও লিখিত আছে :

কন্যাং গতে সবিতরি দিনানি দশ পঞ্চ চ।
পার্বণেন বিধানেন শ্রাদ্ধং তত্র বিধীয়তে ॥

অর্থাৎ সূর্য যখন কন্যারাশিতে উপস্থিত হন, তখন পার্বণ-বিধানে শ্রাদ্ধ বিহিত। কার্ষ্ণাজিনি ও ভবিষ্যোত্তরও বলছেন :

নভস্যস্যাপরে পক্ষে শ্রাদ্ধং কুর্যাদ্ দিনে দিনে।
নৈব নন্দাদি বর্জ্যং স্যান্নৈব বর্জ্যা চতুর্দশী ॥

অর্থাৎ গৌণ ভাদ্র মাসের অপর বা কৃষ্ণ পক্ষে প্রতিদিন শ্রাদ্ধ বিহিত ; তখন নন্দাও (প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশী) বর্জনীয় নয়, চতুর্দশীও বর্জনীয় নয়। অতএব মহালয়া-সম্পর্কীয় এই পক্ষ অত্যন্ত প্রশস্ত বলে এই সময়ে বহুবিধ শ্রাদ্ধ বিহিত। এ সমস্ত নিত্য।

সমস্ত স্মৃতিকারই বলছেন—"আষাঢ্যা পঞ্চমে পক্ষে কন্যাসংস্থে দিবাকরে", দিবাকর কন্যাগত হলে অর্থাৎ আশ্বিনে—এটী আষাঢ় থেকে পঞ্চম পক্ষ—সেই শ্রেষ্ঠ পক্ষে, সমুদয় তিথির মধ্যে পুনরায় পিতৃকর্ম-শ্রাদ্ধাদিতে অমাবস্যাই প্রশস্ততম বলে অপরপক্ষের এই অমাবস্যাটীই সারা বৎসরের মধ্যে পিতৃশ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠ দিন।

এই অপরপক্ষ বা পিতৃপক্ষে পিতৃগণ আপন পুরী থেকে মনুষ্যলোকে এসে পুত্র পৌত্রাদি-প্রদত্ত ভোজ্যাদি গ্রহণের নিমিত্ত সমবেত হন। তাঁরা এই তিথিতেই প্রেতপুরী থেকে এসে সমবেত হন—আলীন হন বলে—এই তিথির নাম মহালয়।

(৩) মহস্য আলয়ঃ

মহ শব্দের অর্থ উৎসব। এই অপরপক্ষের অমাবস্যায় প্রেতপুরী খালি ক'রে সকলে এসে মর্ত্যভূমিতে সমবেত হন—যমরাজের অনুশাসনে—এবং তাঁরা বৃশ্চিকরাশিতে সূর্য উপনীত হওয়ায় সময় পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। বৃশ্চিকে সূর্যদেবের উপস্থিতির সময়ের মধ্যে যদি পিতৃগণ শ্রাদ্ধ না পান, তা হ'লে তাঁরা নিদারুণ ক্ষোভে, অভিমানে, অনুতাপে দারুণ শাপ দেন বর্তমান বংশধরগণকে এবং পুনরায় প্রেতপুরীতে বিষম হতাশায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। অমাবস্যাতিথিই তাঁদের শ্রাদ্ধ গ্রহণের শ্রেষ্ঠ দিন—সেজন্য তাঁদের উৎসবের দিন বলে চিহ্নিত করার জন্যই এই তিথিটিকে "মহালয়া" নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণ এই প্রসঙ্গে বলেছেন :

যাবচ্চ কন্যাতুলয়োঃ ক্রমাদাস্তে দিবাকরঃ।
তাবচ্ছ্রাদ্ধস্য কালঃ স্যাৎ শূন্যং প্রেতপুরং তদা ॥

যখন সূর্যদেব কন্যা ও তুলার সংক্রমণে ব্যাপৃত, তখন শ্রাদ্ধের কাল বিহিত, তখন প্রেতপুরী শূন্য থাকে।

ভবিষ্যপুরাণে এই উক্তির পূর্ণ সমর্থন দৃষ্ট হয় :

কন্যাং গতে সবিতরি পিতৃরাজানুশাসনম্।
তাবৎ প্রেতপুরী শূন্যা যাবদ্বৃশ্চিকদর্শনম্ ॥
ততো বৃশ্চিকে আয়াতে নিরাশাঃ পিতরো নৃপ।
পুনঃ স্বভবনং যান্তি শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্ ॥ * * *
সূর্যে কন্যাস্থিতে শ্রাদ্ধং যো ন দদ্যাদ্ গৃহাশ্রমী।
রতস্তস্য ধনং পুত্রাঃ পিতৃনিঃশ্বাসপীড়নাৎ ॥[1]

এই মহালয়ার দিনটীই পিতৃপুরুষের কেন শ্রেষ্ঠ আনন্দের দিন—এইটী প্রমাণ করতে গেলে শ্রাদ্ধ-দানের বিধিক্রমটী পর্যালোচনা করতে হয়। প্রথমতঃ মৃততিথিবিহিত সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পুত্রাদির অবশ্য কর্তব্য। তা ছাড়া প্রতিমাসে বিহিত কৃষ্ণপক্ষীয় পার্বণশ্রাদ্ধ ও নিত্য।[2] তন্মধ্যে পুনরায় অপরাহ্ণ শ্রেয়ান্—"মাসি মাসি অপরপক্ষস্য অপরাহ্ণঃ

১ শ্রাদ্ধ-বিবেক, ১১৪ পৃঃ।

২ পয়োমূলফলৈঃ শাকৈঃ কৃষ্ণপক্ষে চ সর্বদা। পরাধীনঃ প্রবাসী চ নির্ধনো বাঽপি মানবঃ ॥ মনসা ভাবশুদ্ধেন শ্রাদ্ধে দত্তাস্তিলোদকম্ ॥

শ্রেয়ান্"। নিগম বলছেন—"অপরপক্ষে যদহঃ সংপন্নতে, অমাবস্যায়াস্তু বিশেষেণ"। সাগ্নিক যিনি, তিনি কেবল অমাবস্যাতেই শ্রাদ্ধ করবেন—"ন দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধমাহিতাগ্নের্দ্বিজন্মনঃ"। কিন্তু কেউ যদি প্রতি মাসের কৃষ্ণপক্ষে পার্বণশ্রাদ্ধ করতে না পারেন, তা হ'লে—

"অনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং ত্রিরব্দস্যেহ নির্বপেৎ।
কন্যাকুম্ভ বৃষস্থেঽর্কে কৃষ্ণপক্ষে চ সর্বদা॥"

সারা বৎসরের মধ্যে তিন দিন শ্রাদ্ধ করলে সূর্য যখন কন্যারাশিতে অর্থাৎ সৌরাশ্বিন, সৌর-ফাল্গুন এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষে, বিশেষতঃ অমাবস্যায়।

তাতেও যদি অসমর্থ হন, তাহলে "হংসে বর্ষাসু কন্যাস্থে শাকেনাপি গৃহে বসন্। পঞ্চম্যা উত্তরে দদ্যাদুভয়োর্বংশয়োরৃণম্॥" এই উক্তি অনুসারে সূর্য কন্যারাশিতে উপগত হলে অমাবস্যায় শাক দিয়ে হলেও গৃহস্থ একবার অন্ততঃ শ্রাদ্ধ করবেন। এটাই তো 'মহালয়া' অমাবস্যা। এই অমাবস্যা মহালয়া—"মহস্য পিতণামুৎসবস্য আলয়ঃ নিকেতন-স্বরূপঃ দিবসোঽয়হমি" তি মহালযঃ, বা নিকেতনরূপা তিথিঃ মহালয়া॥

এখানে আর একটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই পিতৃগণের মহানন্দ দিবসে ষোড়শ-পিণ্ড-দান একান্ত কর্তব্য। "ষোড়শ" এখানে "পঞ্চাম্রবৎ" পারিভাষিক শব্দ—কারণ, ক্রিয়ার সময়ে উনিশটী পিণ্ডই দান করতে হয়। এই মন্ত্রগুলি এত উদাত্ত, এত সৌন্দর্য-মাধুর্য-বিমণ্ডিত, সর্বতোভাবে এত অপূর্ব যে সেগুলির বিশ্লেষণের জন্য স্বতন্ত্র স্থান প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু লিপিবদ্ধ করছি যে নীচ ও উচ্চ, পাপী ও নিষ্পাপ, বিভিন্ন যোনিজ—কারো জন্য শ্রাদ্ধ-দাতার আজকের এই মঙ্গলতম দিনে কোনও ভেদবুদ্ধি নেই—সকলকেই শ্রাদ্ধদাতা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করছেন। আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্যন্ত দেবর্ষি-পিতৃ-মানব সকলের জন্যই আজ পিণ্ডদান :

"আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্॥"

এখন প্রশ্ন এই—যদি কোনও কারণে মহালয়াতেও পিতৃশ্রাদ্ধ কেহ দুর্ভাগ্যবশতঃ করতে না পারেন, তা হ'লে পিতৃগণের তুষ্টিবিধানের কি কোনও উপায় নেই? নিবন্ধকারগণ এই বিষয়ে এই গৌণ কল্পের বিধান দিয়ে ভবিষ্যপুরাণ বলছেন :

"যেযং দীপান্বিতা রাজন্ খ্যাতা পঞ্চদশী ভুবি।
তস্যাং দদ্যান্ন চেদ্দত্তং পিতৃণাং বৈ মহালয়ে॥"

কিন্তু এই গৌণ কল্পে ষোড়শ-পিণ্ডদান হবে না।

১৩৬৪ সালের শারদীয় উৎসবের প্রাক্কালে জগজ্জননীকে কোটী কোটী প্রণতি নিবেদন করি। অপর বা পিতৃপক্ষ ও দেবীপক্ষ দুটী অঙ্গাঙ্গিভাবে সংবদ্ধ। অপবপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষের মহালযা তিথি মহাজননীর আগমনের শঙ্খনিনাদ ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত করে। পিতৃগণের মহানন্দ ও জননীর আগমনের পদধ্বনি—উভয়ে মিলে মহালয়া জগজ্জনের এত আদরের ও আনন্দের দিন।

এই আনন্দের দিনে মহাপুণ্য দিবসে জগজ্জননীকে স্তুতি নিবেদন করি—

সর্বরূপস্বরূপা ত্বং সর্বরসস্বরূপিণী।
সর্ববর্ণসমাহার-সর্বলীলাবিধায়িনী॥
অমৃতমসি মাতস্ত্বং সর্বানন্দবিধায়িনী।
সর্বালোকবিধাত্রী চ সর্বশান্তিপ্রদায়িনী॥

ওঁ শান্তিঃ॥

শারদ বোধন

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বাদলের অভিসার সাঙ্গ করি স্বচ্ছ নীলাকাশ
এ সুন্দরী ধরণীর পানে চেয়ে পরম আগ্রহে,
শুনায় মহতী বার্তা জাগাইয়া আনন্দ উল্লাস
দিগ্‌বধূ-মনে, কেদার-বাহিনীধারা বুঝি বহে
আগমনী গীতি ল'য়ে মর্মে মর্মে। নব আলিম্পন
সুন্দরেব দেখেছে কি অন্তরের নগ্ন শিশু মম?
মাতৃ-মমতার সুধাক্ষরা শক্তি-পীঠে মগ্ন মন,
শীর্ষে শোভে অসংখ্য তারকাশ্রেণী রত্নদ্বীপ সম
আশ্বিন-উৎসব-রসে প্রকৃতির পাত্র পূর্ণ করিয়া আবার—
কে তুমি জাগাতে এলে ভূমাব ব্যঞ্জনা ল'য়ে বিশ্বমূলাধাব?
চিরকামনার মায়ামৃগমদ-গন্ধের পরশে
জীবন-আশ্রমে মোব চিত্তশিখা উঠেছে উজ্জ্বলি'।
মানস-যাত্রীর দল লোকে লোকে চলেছে হরষে
কোন্ তীর্থ-পথে যাবে সঙ্গে দিতে প্রাণের অঞ্জলি?
প্রশান্তির আবেষ্টনে নিঃসঙ্গতা চায় দিতে এনে
অমৃতের পারাবারে অন্তহীন রহস্যের তরী।
আজিকার ভূ-বলয় মোর চোখে রূপ-রেখা টেনে
অরূপের গাহে গান ধ্যানে পরা-প্রকৃতিরে স্মরি।
প্রেমার পবশ দিতে মায়াচ্ছন্ন সংসারের আলোছায়া হ'তে,
কে তুমি বোধন-শঙ্খ বাজায়ে এসেছ মোর সাধনার স্রোতে?
স্বপ্নে কত অভ্রপুষ্প ফুটেছিল, ঝরে গেছে তারা,
বর্ষা-রাতে সপ্তস্বরা সঙ্গীতের সুরে সুরে শত,
বিরহবিচ্ছেদবাণী শুনেছিনু, মৌন অশ্রুধারা
বয়ে গেছে আঁখি হ'তে, দিন গেছে নিমেষ-নিহত।
দুঃখতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাণসিন্ধু মাঝে
বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত—যে জীবন অরণ্য-শোভায়
যাপিতেছি আমি. সেথা মোর মাতৃবন্দনার বাজে
শঙ্খ আজি, ব্যথা-বেদনার কথা শোনাবো তোমায়।
সংসারের সান্ত স্তরে কতবার এলো মোর অনন্তের ডাক?
কি বার্তা এনেছ দূত! কহ মোরে, ওই সব কথা আজ থাক্।

দ্বিভুজার রূপ ধরি মহাসাধকের লীলাময়ী
যে জননী এসেছেন আদ্যাশক্তি কৈবল্যদায়িনী ;
ভবতারিণীর দেহে, করুণায় যার মৃত্যুঞ্জয়ী
হ'ল নর, সুরধুনী কহে যার কথা ও কাহিনী
সেই মোর দশভুজা, অন্তরের নগ্ন শিশু ডাকে
তাবে সদা, বুঝি তার সীমাহীন মহাসিন্ধু বুকে
অন্তহীন বিন্দু মিশে যায়, আমি ডাকি সেই মাকে
নিখিলের সব ধাবা তারি মাঝে মিশে আছে সুখে।
সারদা-প্রতিমা গড়ি শারদ উৎসবে মোরা জাগাবো বোধন,
কে তুমি এসেছ হেথা, মাতৃশক্তি-বন্দনার করো আয়োজন।

কে বড়?

শ্রীদিলীপকুমার রায়

গণেশ-সাথে কার্তিকের বাধে
কলহ কত—প্রতিযোগিতা নানা।
রূপ জিতিলে গুণ বিষাদে কাঁদে,
গুণ জিতিলে রূপ শোনে না মানা।
তর্ক বাড়ে, ভবানী কহে তবে :
"ভুবন আগে আসিবে ঘুরি' যেই
গলার মালা আমার তারি হবে,
রটিবে ভবে জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে সে-ই।"
কার্তিক তো হেসেই কুটি কুটি :
"মূষিকে চ'ড়ে ভায়া জিতিতে পারে ?"
ময়ূরে উড়ে চলে সে নভে ছুটি'।
গণেশ শুধু উমার চারিধারে
পরিক্রমি' ডাকে : "ভুবন-মাতা !"
শক্তিধর ক্লান্ত ফিরে সাঝে।
পরিয়া মালা গণেশ হাসে, "দাদা !
মাযেরি মাঝে কোটি ভুবন রাজে !"

মন ও জীবন

শ্রীপ্রণব ঘোষ

আশ্চর্য এ মন,
পৃথিবী হাতের মুঠোয় পেয়েছে যখন,
অনায়াসে চায় সে আকাশ।
আবার সে—স্বর্গ থেকে হারায় আশ্বাস,
ধরাতল ফিরে পেতে চায়।
এই চায় ইন্দ্রধনু, এই প্রজাপতি,
সহজের পন্থা ছেড়ে বিসর্পিল গতি
সেই তার প্রাণের উল্লাস।

তবুও আকাশ থেকে রৌদ্র ঝরে পৃথিবীর বুকে,
এ প্রশান্ত শরতের সুনির্মল সুখে,
শুভ্র আলো হ'য়ে ওঠে সকল মনন।
তখনই নিশ্চিত মানি : প্রেমই জীবন।

'ডুব দে রে মন—'*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

অশ্বিনী দত্ত একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর তাঁকে 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন' গানটি গেয়ে শোনাচ্ছেন। অশ্বিনীবাবু দেখলেন, ঠাকুর গাইতে গাইতে কোথায় ডুবে গেলেন,—একেবারে সমাধিস্থ। এই ডোবাটাই আসল জিনিস। ডুবতে হয় কোথায়? ভিতরে। উপর উপর ভাসলে কিছুই হয় না। ধর্মলাভ করতে হ'লে ডুব দিতে হবে,—ঠাকুরের এটি একটি বিশেষ শিক্ষা।

ডুব দে রে মন কালী ব'লে

হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥ (রামপ্রসাদ)

এই ডুব দেওয়াই জীবনের লক্ষ্য। ঠাকুরের জীবনে এটি আমরা বিশেষ ক'রে দেখতে পাই। 'এগিয়ে পড়, ঝাঁপ দাও, ডুব দাও'—এইগুলিই পাঁচ খণ্ড কথামৃতের সার কথা। ঠাকুর এই ক'টি কথা প্রায়ই ব্যবহার করতেন।

ডুব দিলে কি পাওয়া যায়? "রত্নাকর নয় শূন্য কখন দু' চার ডুবে ধন না পেলে।" ডুব দিলে কত মণি পাওয়া যায়। ঠাকুর ডুব দিয়ে অমূল্য রত্নরাশি তুলে এনে ছড়িয়ে দিতেন, লোকে আনন্দে প্রাণভরে কুড়িয়ে নিত।

সবাই টাকা আর নাম-যশের পিছনে ছুটছে; কিন্তু আনন্দ পাচ্ছে কি? মোটেই নয়। ধর্ম হবে কখন? যখন আমরা বিষয় থেকে পিছিয়ে এসে আবার ভিতরে ডুবতে আরম্ভ ক'রব।

বঙ্কিমবাবুকে ঠাকুর বললেন, "উপরে ভাসলে হবে না।" উত্তরে তিনি বলেন, "ডুবি কি ক'রে, পিছনে শোলা বাঁধা রয়েছে যে।"

ঠাকুর কেশব সেনকে পোষা বেজির উপমা দিয়েছিলেন। পোষা বেজির লেজে দড়ি দিয়ে বাঁধা ইঁট। এক এক বার সে দেওয়াল বেয়ে কলুঙ্গায় উঠে বসে, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, ইঁটের টানে ধুপ্ ক'রে নেমে পড়ে। কেশবাদি ভক্তকে ঠাকুর বললেন,—"তোমরাও একটু ধ্যান ট্যান করতে পার, কিন্তু দারাসুত-ইঁট টেনে নাবিয়ে ফেলে।"

সাধুসঙ্গ করলে বিবেকের উদয় হয়। বিবেকের সঙ্গে সঙ্গে আসে বৈরাগ্য। বিবেক আমাদের হাত ধ'রে নিয়ে চলে। সাধুসঙ্গে মন-ঘড়ি মেলানো যায়। ঠাকুরের সান্নিধ্যে যাঁরা আসতেন তাঁদের বিবেক জাগত, তাঁর কাছে 'ঘড়ি মিলিয়ে' নিতেন তাঁরা। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত শুনে তাঁদের হুঁশ হ'ত, চৈতন্য জাগত। তাঁরা দেখতে পেতেন, মন বিষয়ের দিকে কতটা ছুটেছে, ঈশ্বর থেকে কতটা পিছিয়ে পড়েছে।

সংসারে দুটি জিনিস আমরা সর্বদা খুঁজছি: আনন্দ ও শান্তি। কিন্তু বিষয়ের আনন্দ ও নিরানন্দ সংযোগ-বিয়োগের ব্যাপার। ছেলে ছিল না, তখন নিরানন্দ; ছেলে হ'ল, তাতে আনন্দ; আবার সেই ছেলে চলে গেল, তখন দুঃখ অশান্তি নিরানন্দ। এরই ভিতর দিয়ে কত জন্ম চলে যায় মানুষের। তবু চৈতন্য আসে না, হুঁশ হয় না। সাধুসঙ্গ এই হুঁশ এনে দেয়। ঠাকুর গাইতেন:

আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে॥

* মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৩০-৫-৫৭ তারিখে প্রদত্ত পূজ্যপাদ মহারাজের বক্তৃতা। শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য সংকলিত। 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে' গানটির পর ধর্মপ্রসঙ্গ আরম্ভ হয়।

পরম ধন ঐ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥

ধর্ম জিনিসটা ভিতরের, বাইরের নয়। অনাবিল আনন্দ ও শান্তি লাভ করতে হ'লে ভিতরে যেতেই হবে, আপনাতে আপনি থাকতে হবে। ভিতরে তো বটেই। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন: The kingdom of heaven is within.—স্বর্গরাজ্য অন্তরে। এই জিনিসটি 'পাখীর মাস্তুল আশ্রয় করা'-র ছোট্ট গল্পের মধ্য দিয়ে ঠাকুর কেমন সুন্দর বুঝিয়েছেন। 'মাস্তুল আশ্রয় করা' অর্থাৎ চারদিক ঘুরে এসে ভিতরে গিয়ে ভগবানকে আশ্রয় ক'রে পড়ে থাকা, এইটিই ধর্মের শেষ কথা। যতক্ষণ না ডানা ব্যথা করে—ততক্ষণ মন-পাখী বসতে চায় না। ডানা-ব্যথার পর একটা অবস্থা, তখন শরণাগতি। ভিতরে সন্ধান ক'রে ভগবানকে পেলে তাঁকে সর্বভূতে দেখা যায়। তখন তাঁর সত্তা সকল বস্তুতে অনুভূত হয়। ভিতরে আসতে হ'লে ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখী করতে হয়। সংসারের দীর্ঘ পথের শেষ নেই।

আর পারি না, এটি যখন ঠিক ঠিক বোধ হয় তখনই বিবেক আসে, হুঁশ হয়। তখন থেকেই ভিতরের দিকে আসা। দুটি পথ—প্রেয় ও শ্রেয়, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। এসব অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে আসে। ঠাকুর বলতেন,—"শুনে শেখা, দেখে শেখা, ঠেকে শেখা।"

রামপ্রসাদ গৃহী ছিলেন। কিন্তু বিষয়ের মধ্যে থেকেও তিনি এত বড় ভক্ত ছিলেন যে, জগদম্বা নিজে কন্যারূপে এসে তাঁর বেড়া বেঁধেছিলেন। রামপ্রসাদের গানে আছে,—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুমূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তার বেটারে, তত্ত্বকথা তায় শুধাবি॥

দুটি পথ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিকে ছেড়ে নিবৃত্তির সঙ্গে ঘর করতে হবে। কামনা-বাসনা সঙ্গে নিয়ে কালী-কল্পতরুমূলে যাওয়া যায় না, সে যে ত্যাগের পথ। রামপ্রসাদ সংসারের মধ্যে থেকেও ত্যাগের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি নিবৃত্তিকে সঙ্গে নিলেন কেন? ভগবানের দর্শন লাভ করতে হ'লে ভিতরে যেতে হবে। মহাপুরুষদের প্রদর্শিত পথই পথ।

কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার-লোভে সদাই ফেরে।
তুমি বিবেক-হলদি গায় মেখে লও
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥

এখানেও রামপ্রসাদ পুনরায় বলছেন, বিবেকের আশ্রয় নিতে। মহাপুরুষেরা তো সবই ব'লে দিয়েছেন। শোনে কে? ঠাকুর পানাপুকুরের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। হাতে ক'রে পানা সরালে দেখা যায়, পানাপুকুরের ভিতরে জল চিক্ চিক্ করছে। একটু পরেই আবার পানা নাচতে নাচতে এসে জল ঢেকে ফেলে। রামপ্রসাদ তাই ব্যাকুল হ'য়ে বলছেন,—"মাগো! চোখের ঠুলি খুলে দাও।"

ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।
খুলে দে মা চোখের ঠুলি হেরি গো তোর অভয়পদ॥

* * *

বৈরাগ্য মানে—মনে অনাসক্তির ভাব আনা, ভোগে বিতৃষ্ণ হওয়া। ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হ'লে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে। বৈরাগ্য কি থেকে আসে? বিষাদ থেকে। বিষাদ কেন? শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মতি হ'ল না ব'লে। বিবেক ও বৈরাগ্য নিয়ে আমাদের সাধনের পথে এগিয়ে পড়তে হবে, ভিতরে আসতে হবে।

লালাবাবুর জমিদারীর বার্ষিক আয় সাত লক্ষ টাকা ছিল শুনেছি। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে 'বেলা যায়' এই কথাটি কানে যেতেই লালাবাবুর মনে প'ড়ল,—"আমার জীবনসূর্যও তো অস্তগামী: আমাকেও তো এবার যেতে হবে।" এই সামান্য

ব্যাপারেই তাঁর বিবেক জাগল, বৈরাগ্য এল। নিজের বিষয়সম্পত্তিদ্বারা ভগবানের সেবার ব্যবস্থা ক'রে তিনি বৃন্দাবনে চলে গেলেন এবং ভগবৎ-আরাধনায় মগ্ন হ'লেন।

স্ত্রী পুত্র সংসার, এই নিয়েই লোকে মত্ত। ভগবানকে বাদ দিয়ে এই সমস্ত নিয়ে তারা ভুলে রয়েছে; এককে বাদ দিয়ে শূন্যের পর শূন্য বসিয়ে চলেছে। উপনিষদে আছে, ইন্দ্রিয়গুলিকে বিধাতা এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে তারা ক্রমাগত বাইরের দিকেই ছুটছে—'কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্'। অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছা—কিনা ভগবান লাভের, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অভিলাষ। ভগবানকে চাই, এই অভিলাষ থাকা চাই। আর কি চাই? বিবেকের আশ্রয় নিয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করা। ইন্দ্রিয়সংযম আসল কথা,—মনের মোড় ফেরানো; আসক্তি অনুরাগ ভিতরে দেওয়া। বিষয়-বাসনা মনটাকে চারদিকে টেনে রেখেছে। সাধন চাই। 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'। শুধু সাধনেও হয় না; তার সঙ্গে চাই কৃপা। মীরা বলেছেন,—"সাধন কর না চাহিয়ে মনুয়া, (মনুয়া=মন) প্রেম লগানা চাহি।" সাধন আবার শুকনো হ'লে হবে না,. তার সঙ্গে ভালবাসা মাখিয়ে দিতে হবে, প্রেম লাগাতে হবে। প্রেম ভালবাসা—স্ত্রীপুত্রাদিতে বিষয়ে দিয়ে তো মানুষ দেউলে হ'য়ে বসে আছে। ঠাকুর হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙতে বলেছেন। তেল কিনা ভক্তি। 'কাঁঠাল ভাঙা' মানে সংসার করা। বুদ্ধিমান্ যারা তারা মনে 'ভক্তিতেল' মেখে নিয়ে সংসার করে। তা হ'লে আর সংসারে আসক্ত হ'যে পড়ার আশঙ্কা থাকে না।

ঠাকুর বলতেন,—"মান-হুঁশ।" যার চৈতন্য জেগেছে, হুঁশ হয়েছে, সেই মানুষ। ঠাকুর বলতেন, খোঁটা ধরতে। খোঁটা কিনা ভগবান। মন্দিরের ভিতরে গিয়ে ভগবান যেন দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন! রাজসিক বুদ্ধি আমাদের বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কোথায়? জগতের সমস্ত টাকাকড়ি পেলে আরও পেতে ইচ্ছে হবে। এই জিনিসটি বুঝলে তখন মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়াতে হবে আবার, বলতে হবে,—"দরজা খুলে দাও।" গীতায় শ্রীভগবান বলছেন,—"কাম-ক্রোধগুলো সংযত কর। দেখ, আমি তো রয়েছি, আমাকে ধর।"

শ্রীদুর্গাস্তোত্র

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

নমি শৈলবাসিনি শুভ্রহাসিনি হিমগিরিসুতে অম্বিকে!
নমি সিন্ধুধারিণি জগত্তারিণি মহাদেবি সতি চণ্ডিকে!
নমি মঙ্গলে শ্যামে গৌরি শারদে পার্বতি শিবে শর্বাণি!
নমি ভুবনেশি মায়ে ভবে ও শক্তি শর্বে অভয়ে রুদ্রাণি!
নমি মুণ্ডমালিনি শঙ্করি দশমূর্তিধারিণি দণ্ডিনি!
নমি করুণারূপিণি তামসনাশিনি তুঙ্গে মেনকানন্দিনি!
নমি সিদ্ধসেনানি সিদ্ধিদায়িনি চন্দ্রসূর্যবর্ধিনি!
নমি অট্টহাসিনি খড়্গধারিণি মহিষাসুরমর্দিনি!
নমি সর্বাভরণভূষিতে জননি পয়োধরে সুধাবর্ষিণি!
নমি বিশ্বব্যাপিনি বিঘ্ননাশিনি কুমারি সর্বদর্শিনি!

জননী প্রকৃতিদেবী

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

কিছুকাল পূর্বে বর্তমান সময়ের পৃথিবীর সুবিখ্যাত তেইশ জন চিন্তাশীল পুরুষ ও মহিলা বিলাতের জর্জ এলেন এবং আনুউইন্‌ কোম্পানি-প্রকাশিত "I believe" নামক পুস্তকে তাঁহাদের দার্শনিক এবং বিশ্বাসমূলক মতবাদগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুস্তকে সুলেখক এমিল লাডউইগ (Emil Ludwig) লিখিয়াছেন, "আমি একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতিদেবীকেই পূজা করি, যাঁহাকে বিশ্ববিশ্রুত জার্মান কবি গোটে (Goethe) 'প্রকৃতিদেবী' (Gott-Natur) বলিতেন। তিনি তাঁহার যৌবনকালে এই ভাবটিকে একটি প্রশস্তি-কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেটি আমি আমার শয্যাপার্শ্বের দেওয়ালে বিশ বৎসর ঝুলাইয়া রাখিয়াছি।"

"What I worship is the creative power and that alone. Goethe called it Gott-Natur, seeking a way out by this compound expression In the prime of his life, Goethe voiced this concept in an ode For twenty years it has hung on the wall beside my bed"—Page 203, "I believe."

লাডউইগ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার কোন দার্শনিক মতবাদ নাই। ধর্মযাজকগণের ন্যায় বিশিষ্ট কোন ধর্মমতও তিনি পোষণ করেন না। তিনি যখন ভগবানের কার্যাবলীর অনুধ্যান করেন, তখন যে ভাবগুলি তাঁহার হৃদয়কে দৃঢ়ভাবে অভিভূত করে সেইগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি তাঁহার ভাব-গুরু গোটের মতো মৃত্যুর পারে অনন্তত্ব লইয়া মাথা ঘামান না। সংসারে যাঁহারা নিতান্ত ভাবুক বা ভাবপ্রবণ তাঁহারা ঐ সকল লইয়া থাকুন। কিন্তু এ পৃথিবীতে যাঁহাদের কিছু করণীয় আছে, যাঁহারা দৈনন্দিন জীবনে সংগ্রাম ও কর্ম করিতে ব্যস্ত, তাঁহাদের 'পরে কি হইবে' অর্থাৎ 'মরিয়া অমর হইব কিনা' এসব চিন্তা করিবার দরকার নাই। বর্তমান জগৎ এবং বর্তমান জীবনই তাঁহাদের চিন্তার ও কর্মের একমাত্র ক্ষেত্র। গোটে যখন অশীতি বর্ষ অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধ তখনও তিনি ঐহিক জীবনের কর্ম এবং ধর্ম একীভূত করিয়া বলিতেন, "মৃত্যুর পরে আমি বর্তমান থাকিব—এ ধারণা আমার কৃত কর্মের উপর বিশ্বাস হইতে জাত। যদি আমি মৃত্যু পর্যন্ত অবিরত কর্ম করিতে থাকি, তাহা হইলে প্রকৃতি আমাকে আর এক রকম জীবন দিতে বাধ্য, কারণ বর্তমান জীবন আমার আত্মাকে ধরিয়া রাখিতে অক্ষম।"

লাডউইগ তাঁহার গুরুর এই উৎসাহপূর্ণ বাণীর প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন:

Belief and accomplishment were so allied in him that at eighty years of age he spoke the daring words, 'The conviction of my continuation after death springs from my belief in action For if I continue to work ceaselessly until my death, then nature is obliged to give me another form of existence when the present one can no longer house my spirit'

গোটে তাঁহার এই মতটি দৃঢ় করিয়া আরও বলিতেন যে, প্রকৃতির পারে আমাদের কোন কিছুর সন্ধান করিবার দরকার নাই, কারণ প্রকৃতির কার্য ও ঘটনাবলী হইতেই আমাদের যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয়—'Let us seek nothing behind the phenomena ; they themselves are the lesson.'

লেখক লাডউইগ তাঁহার প্রবন্ধে গ্যেটের যে 'প্রকৃতি-বন্দনা' বিশ বৎসর তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা এইভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন: "প্রকৃতি!—যিনি সর্বদা আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন এবং যিনি সর্বদা আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা তাঁহার সীমা লঙ্ঘন করিতে অক্ষম। তাঁহার মধ্যে আমরা খুব বেশী গভীরে ডুবও দিতে পারি না। প্রকৃতি তাঁহার চক্রনৃত্যে আমাদিগকে কবলিত করিয়া লইয়া চলিযাছেন, যে পর্যন্ত না আমরা ক্লান্ত হইয়া তাঁহার বাহুপাশ হইতে পড়িয়া যাই।····· যদিও আমরা অনবরত তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করি, তবু তাঁহার উপর আমাদের কোন শক্তি কাজ করে না। তাঁহার অগণিত সন্তানের মধ্যে প্রকটিতা—এই জননী! তিনি মায়াতেই পরিতুষ্টা; যে নিজের বা অপরের সেই মায়াকে ধ্বংস করিতে চায় তাহাকে কঠোর অত্যাচারীর মত তিনি শাস্তি দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সহিত তাঁহার অনুসরণ করে তাহাকে তিনি তাঁহার বক্ষের অতি নিকটে ধরিয়া রাখেন। তাঁহার সন্তান অসংখ্য। তিনি কাহারও প্রতি কৃপণতা করেন না। তাঁহার প্রিয় সন্তানদের উপর তিনি অজস্র কৃপা বর্ষণ করেন এবং তাহাদের জন্য অনেক কিছু বিসর্জন করেন; মহৎদিগকে তিনি রক্ষা করেন। তাঁহার নাটক সর্বদাই নূতন, কারণ তিনি ক্রমাগত নূতন নূতন দর্শক জোগাইতেছেন। জীবন তাঁহার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য আবিষ্কার এবং মৃত্যু তাঁর চূড়ান্ত কীর্তি, যাহা দ্বারা তিনি প্রচুর জীবন সৃষ্টি করেন। তিনি মানুষকে অন্ধকারে আবৃত রাখিয়া অনন্তকাল তাহাকে আলোকের দিকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। তিনি মানুষকে মন্থর ও অলস করিয়া পৃথিবীর উপর নির্ভরশীল করিয়াছেন, আবার সর্বদা তাহাকে উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য উদ্দীপিত করিতেছেন।····· তিনি উদার, তাঁহাকে বন্দনা করি, তাঁহার সকল কর্মই প্রশংসনীয়। তিনি সর্বজ্ঞ এবং শান্ত।······তিনি আমাকে এতদূর আনিয়াছেন; তিনিই আমাকে ইহার বাহিরে লইয়া যাইবেন। আমি বিনা শর্তে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করি। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি আমাকে লইয়া তাহাই করুন। তিনি তাঁহার সৃষ্ট সন্তানকে বিদ্বেষপূর্বক কষ্ট দিবেন না। একমাত্র তিনিই—সকল দোষের আধার এবং সকল গুণেরও আশ্রয়।"

জীবন-সায়াহ্নে বহু মনীষী এবং মহান্ ব্যক্তি প্রকৃতির মধ্যে যে দেবীত্ব ও মাতৃত্ব লুক্কায়িত, তাহা উপলব্ধি করিয়া জীবন মৃত্যুর রহস্য ভেদ করিতে প্রয়াস পান। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার দেহাবসানের পূর্বে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে এই মর্মে এক পত্র লেখেন: 'মা তাঁহার নিজের কার্য করিতেছেন। আমি এখন আর বেশী চিন্তা করি না। আমার মত পোকা হাজারে হাজারে প্রতিক্ষণে মরিতেছে। কিন্তু তাঁহার কার্য ঠিকমত চলিয়া যাইতেছে। মায়ের জয় হউক। মায়ের ইচ্ছাস্রোতে একাকী গা ভাসাইয়া আমি সারা জীবন চলিতেছি। যখনই আমি সেই ইচ্ছাস্রোত ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছি তখনই আমি আঘাত পাইয়াছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।' আবার লিখিয়াছেন, 'আমি মুক্ত। আমি মায়ের ছেলে। তিনিই কাজ করেন, আবার তিনিই খেলেন। আমি কেন নিজের মতলব করিতে যাই? কি মতলবই বা করিব? তাঁহার ইচ্ছায় সব আসিয়াছে এবং চলিয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার হাতের পুতুলমাত্র। তিনিই রজ্জুদ্বারা সকলকে পুতুলের মতো নাচাইতেছেন!'

গায়ত্রী

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

যাঁহারা সন্ধ্যাহ্নিক করেন তাঁহাদিগকে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে হয়। অর্থ না জানিয়া শুধু এই মন্ত্র জপ করিলে জপের সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় না। শাস্ত্রে গায়ত্রী মন্ত্রের একাধিক ব্যাখ্যা আছে। এই সকল অর্থের মধ্যে যেটি যাহার মনঃপূত হয় তিনি সেইটিই গ্রহণ করিতে পারেন।

ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ১০ম ঋক্ গায়ত্রী মন্ত্র। যে মন্ত্র জপ করিতে হয় সেখানে তাহার প্রথম অংশ "ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ" (প্রণব ও মহাব্যাহৃতি)-র উল্লেখ নাই। "তৎ সবিতু র্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"—ইহাই উপরি-উক্ত ঋক্। প্রণব ও মহাব্যাহৃতি পরে ঋক্ মন্ত্রের পূর্বে যুক্ত হইয়াছে। প্রণব ও ব্যাহৃতি-যুক্ত মন্ত্রের পরেও একবার প্রণব উচ্চারণ করিতে হয়।

প্রাণায়াম-কালে সপ্রণব সব্যাহৃতি গায়ত্রী-মন্ত্রের পরে "গায়ত্রী-শিরঃ" নামক অংশও পাঠ করিতে হয়। *সে অংশ এই : ওঁ আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূ র্ভুবঃ স্বরোম্।* প্রাণায়াম কালে মহাব্যাহৃতির সহিত আরও চারিটি ব্যাহৃতির নাম উচ্চারণ করিতে হয়। ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যম্—ইহারা সপ্তব্যাহৃতি; ইহাদের মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ মহাব্যাহৃতি।

যিনি যে মন্ত্রের দ্রষ্টা—তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি। মন্ত্রে যাঁহার কথা উক্ত হয়, তিনি সেই মন্ত্রের দেবতা। গায়ত্রী মন্ত্রে ওঁকারের ঋষি ব্রহ্মা, সপ্তব্যাহৃতির ঋষি প্রজাপতি এবং গায়ত্রীর (এই অংশকে শংকরাচার্য *শুদ্ধাগায়ত্রী বলিয়াছেন*) ঋষি বিশ্বামিত্র। গায়ত্রীর দেবতা সবিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই সবিতা কে?

ঋগ্‌বেদে কোনও কোনও স্থলে সূর্য ও সবিতা একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কোনও স্থলে ঐ দুই শব্দ দ্বারা বিভিন্ন দেবতা সূচিত হইয়াছেন। সায়নাচার্যের মতে উদয়ের পূর্বে সূর্যের যে মূর্তি, তাহাই সবিতা। সূর্য ও সবিতা যে একই দেবতার দুই মূর্তি, তাহা বলা যায়। এই সূর্যই কি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা উপাস্য দেবতা?

সায়নাচার্য গায়ত্রী মন্ত্রের চারি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক প্রকার ব্যাখ্যায় সবিতা-শব্দ তিনি সূর্য অর্থে, অন্যতর ব্যাখ্যায় "জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর" অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। মহীধর সবিতা-শব্দ "আদিত্যান্তর পুরুষ" অথবা ব্রহ্ম অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই—"দেবস্য সবিতুঃ (ভর্গস্বরূপান্তর্যামি-ব্রহ্মণঃ) বরেণ্যম্ (বরণীয়ম্, উপাসনীয়ম্) ভর্গঃ ধীমহি (সোঽহমস্মি ইত্যনেন চিন্তয়ামঃ)—তিনিই আমি—এই ভাবে চিন্তা করি।

আহ্নিকতত্ত্বে সমগ্র গায়ত্রী মন্ত্র এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :

"দেবস্য সবিতুর্বর্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুম্।
ব্রহ্মবাদিন এবাহু বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি ॥
চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তিং পুনঃ পুনঃ ॥
বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্।
বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসার-ভীরুভিঃ ॥
আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ।
জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ ॥
ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্যমণ্ডলে।
মন্ত্রার্থমপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেব হি ॥

সূর্যদেবের অভ্যন্তরে যে বর্চকে ব্রহ্মবাদিগণ বিভু ভর্গ ও বরেণ্য বলেন, আমরা তাহার ধ্যান করি। যে ভর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন,

আমরা সেই ভর্গকে চিন্তা করি। যিনি বুদ্ধির প্রেরক তিনি চিদাত্মা, বিরাট পুরুষ। তিনি জন্ম-সংসারভীত জনগণ কর্তৃক বরণীয। যিনি আদিত্যের অন্তর্গত ভর্গাখ্য পুরুষ তিনি জন্ম-মৃত্যু ও ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশের জন্ত বরণীয়। যে পুরুষ ধ্যানে সূর্যমণ্ডলে দৃষ্ট হয় তিনিই বরণীয়। ইহাই মন্ত্রের অর্থ। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা উপাস্য সূর্য নহেন, সূর্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত চিদাত্মা বিরাট পুরুষ।

বহুদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন-পত্রিকায় এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন :

নিরপেক্ষ হইয়া বলিতে গেলে সূর্য্যই—আদিতে গায়ত্রীর উপাস্য দেবতা ছিলেন, পরে সবিতা-শব্দ 'পরমেশ্বর' অর্থে গৃহীত হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় সবিতা-শব্দ সূর্য অর্থে গ্রহণ করিয়াও ব্রহ্মপক্ষে সমগ্র মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা এইরূপ :

"ওঁ ভূর্ভুর্বঃস্বঃ"—এখানে ওঁ-শব্দের অর্থ জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে জগৎ হইতে পৃথক্ নহেন, এই কথা বুঝাইবার জন্ত বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ভূঃ (পৃথিবী) ভুবঃ (অন্তরীক্ষ) ও স্বঃ (স্বর্গ)—এই তিন লোকে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইহার অর্থ—দেবস্য (দীপ্তিমান্) সবিতুঃ (সূর্যের) বরেণ্যং (প্রার্থনীয়) ভর্গ (জ্যোতিঃ-স্বরূপ) ধীমহি (আমরা চিন্তা করি)। তিনি যে কেবল সূর্যের অন্তর্যামী, তাহা নহে। যঃ (যিনি) নঃ ধিয়ো (আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে —আমাদের অন্তর্যামী হইয়া) প্রচোদয়াৎ (বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন)।

শংকর ব্রহ্ম-অর্থেই সবিতা-শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। ৺সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিয়াছেন, "প্রথমে ছিল ইহা (গায়ত্রী) সূর্যের ধ্যান। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাকে ব্রহ্ম-ধ্যানে পরিণত করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুও এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা স্বীকার না করিবার পক্ষে কারণ আছে।

গায়ত্রী মন্ত্রে সবিতা-শব্দের অর্থ সূর্য, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাহা হইলেও এই মন্ত্রের উপাস্য সূর্য নহেন। যিনি সূর্যেরও বরেণ্য তিনিই এই মন্ত্রের উপাস্য। উপরি-উক্ত সকল ব্যাখ্যাতেই 'সবিতুঃ' ও 'দেবস্য' এই দুই শব্দে সম্বন্ধে ষষ্ঠী ধরিয়া "সবিতুঃ ভর্গো দেবস্য" এর অর্থ করা হইয়াছে দেব সবিতার ভর্গ বা তেজ। কিন্তু "সবিতুঃ" শব্দের এখানে যে কর্তায় ষষ্ঠী তাহার প্রমাণ 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদে পাওয়া যায়। শ্লোকটি এই :

যদা তমঃ তৎ ন দিবা ন রাত্রিঃ
ন সন্ ন চাসন্ শিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪।১৮

এই শ্লোকে যে কেবল "সবিতুর্বরেণ্যং" শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নহে। ইহার অর্থের সহিত গায়ত্রী অর্থেরও প্রচুর সাদৃশ্য আছে। ইহার অর্থ এই :

যখন তমঃ (মনুসংহিতার প্রথম শ্লোকে যে তমঃ বর্ণিত হইয়াছে তাহা) ছিল, তখন দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল না। তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, ছিলেন কেবল শিব। তিনিই অক্ষর, তিনিই সবিতার বরেণ্য ; তাঁহা হইতে পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হয়। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলেই "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এবং "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী" যে একই অর্থবোধক তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অমর-কোষ অনুসারে প্রজ্ঞা, ধী ও বুদ্ধি সমার্থক। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে প্রেরণ করেন" কিন্তু ইহার অর্থ—যে অনন্ত ধী-সমুদ্র হইতে প্রতিজীবে

প্রতিক্ষণে ধী আগমন করিতেছে—ইহা বলিতে বাধা কি? পৃথিবীর উপরিভাগস্থ যাবতীয় কূপ যেমন পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ অসীম জলভাণ্ডারের সহিত সংযুক্ত এবং সেই জলভাণ্ডার যেমন প্রতি কূপে অনুক্ষণ জল প্রেরণ (সরবরাহ) করিতেছে, তেমনি অনন্ত ধী-ভাণ্ডাররূপী ব্রহ্ম অনুক্ষণ প্রতি-জীবে তাঁহার ধী সরবরাহ করিতেছেন; ইহাই "ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ" শব্দদ্বয়ের অর্থ। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ আছে বা নাই, সে প্রশ্ন না তুলিয়াও বলা যায় আমরা জ্ঞানময় পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত। আমাদের ধী তাঁহারই ধী।

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, "মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ"—তাঁহা হইতে স্মৃতি, জ্ঞান ও তাহাদের অপায় হয়। উপনিষদের "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী"-র অর্থও ইহাই। প্রসৃতা কোথায়? না জীবে। গায়ত্রীর সহিত এই শ্লোকের এতাদৃশ সাদৃশ্য দেখিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে যে, উপনিষদের শ্লোকটিতে ঋষি গায়ত্রী-তত্ত্বই নিহিত করিয়াছেন। এই শ্লোকে "সবিতুর্বরেণ্যং"-এর অর্থ সবিতার বরেণ্য, সবিতা যাঁহার ভজনা করেন। এখানে ষষ্ঠী কর্তায়। গায়ত্রীতেও কর্তায় ষষ্ঠী ধরিলে অর্থ হইবে। সবিতা যে ভর্গের (জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের) উপাসনা করেন, আমরা তাঁহার ধ্যান করি। সেই ভর্গ সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী যেমন, তেমনি আমাদের মধ্যেও অবস্থিত—অথবা আদিত্য ও আমরা সকলেই তাঁহার মধ্যে অবস্থিত। এই ভাবে ব্যাখ্যা করিলে সবিতা-শব্দ গায়ত্রীতে প্রথমে "সূর্য" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল, পরে জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত "ব্রহ্ম" অর্থে গৃহীত হইয়াছিল—ইহা কল্পনা করিবার প্রয়োজন হয় না।

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং" ইহার তৎ-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দেশঃ ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" (১৭।২৩), ওঁ, তৎ ও সৎ—ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দেশ বা নাম। বেদে ও উপনিষদে বহুস্থলে তৎ-শব্দ ব্রহ্ম-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "তৎ ত্বমসি" এই বাক্যের তৎ-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। গায়ত্রীর তৎ-শব্দও ব্রহ্ম-অর্থে গ্রহণ করা যায়। "দেবস্য সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গঃ তৎ ধীমহি" এই ভাবে অন্বয় করিলে অর্থ হয় "দীপ্তিমান্ সবিতৃদেবের ভজনীয় ভর্গস্বরূপ তৎ বা ব্রহ্মকে আমরা ধ্যান করি"।

'ছান্দোগ্য' উপনিষদে গায়ত্রীকে ব্রহ্ম অর্থে গ্রহণ করিয়া বলা হইয়াছে—যাহা কিছু আছে সকলই গায়ত্রী। গায়ত্রীই এই পৃথিবী। গায়ত্রীর চারিটি চরণ। সমুদয় ভূত ইহার একপাদ, অবশিষ্ট তিন পাদ স্বর্গে অমৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত। এখানে উপনিষদের ঋষি ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত হইতে দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়াছেন এবং গায়ত্রীকেই পুরুষ বলিয়াছেন॥ এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় উপনিষদের যুগেও ব্রহ্মই গায়ত্রীর লক্ষ্য ছিলেন।

গায়ত্রীর যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাই প্রাচীনতম। তিনি অদ্বৈত মতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

ভূঃ ইতি সন্মাত্রং উচ্যতে। ভুবঃ ইতি সর্বং ভাবয়তি প্রকাশয়তি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদ্রূপম্ উচ্যতে। স্বব্রিয়তে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বঃ ইতি সুষ্ঠু সর্বৈঃ ব্রিয়মাণং সুখস্বরূপম্ উচ্যতে।—ভূঃ-শব্দের অর্থ সৎ। ভুবঃ-শব্দের অর্থ চিৎ এবং স্বঃ-শব্দের অর্থ আনন্দ। সকল প্রকাশ করে বলিয়া ভুবঃ অর্থে চিৎ। সকলেই ভাল বলিয়া বরণ করে বলিয়া স্বঃ অর্থে আনন্দ। সুতরাং ভূর্ভুবঃ স্বঃ অর্থে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

তারপরে শঙ্কর বলিয়াছেন, "শুদ্ধগায়ত্রী প্রত্যক্ ব্রহ্মৈকবোধিকা" অর্থাৎ প্রত্যক্ আত্মা (জীবাত্মা) ও ব্রহ্ম যে এক—তাহাই শুদ্ধগায়ত্রী দ্বারা বোঝা যায়। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি নঃ (অস্মাকং) ধিয়ঃ (বুদ্ধীঃ) যঃ প্রচোদয়াৎ (প্রেরয়েৎ) ইতি সর্ববুদ্ধি-সংজ্ঞান্তঃকরণ-প্রকাশকঃ সর্বসাক্ষী প্রত্যগ্

আত্মা ইতি উচ্যতে—অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধি-নামক অন্তঃকরণের প্রকাশক সর্বসাক্ষী প্রত্যক্ আত্মা অর্থাৎ প্রতি শরীরে অবস্থিত আত্মা—ইহাই কথিত হইয়াছে।

তস্য প্রচোদযাৎ-শব্দনির্দিষ্টস্য আত্মনঃ স্বরূপ-ভূতং পরব্রহ্ম তৎসবিতুরিত্যাদি-পদৈঃ নির্দিশ্যন্তে—অর্থাৎ প্রচোদযাৎ-শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট সেই প্রত্যক্ আত্মার স্বরূপভূত যে পরব্রহ্ম তিনি "তৎ সবিতুঃ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট হইযাছেন। তত্র "ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দেশো ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" (গীতা) ইতি তৎ-শব্দেন প্রত্যগ্ভূতং স্বতঃসিদ্ধং পরং ব্রহ্মোচ্যতে।—অর্থাৎ গীতোক্ত বচন অনুসারে তৎ শব্দ দ্বারা প্রতিশরীরস্থ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মকে বুঝাইতেছে।

"সবিতুঃ" ইতি সৃষ্টিস্থিতিলয়লক্ষণস্য সর্ব-প্রপঞ্চস্য সমস্তদ্বৈতবিভ্রমস্য অধিষ্ঠানম্ লক্ষ্যতে। "সবিতুঃ"-পদ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয যাঁহার লক্ষণ সেই সর্বপ্রপঞ্চের ও সমস্ত দ্বৈতভ্রমের অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম তিনিই লক্ষিত হইতেছেন। ইহা হইতে বুঝা যায যে শংকর সবিতা-শব্দ ব্রহ্ম অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

"বরেণ্যমিতি সর্ববরণীয়ম্, নিরতিশযানন্দরূপম্" —'বরেণ্য' পদ সকলের বরণীয, অসীম আনন্দ বাচক।

"ভর্গ ইতি অবিদ্যাদোষ-ভর্জনাত্মক-জ্ঞানৈক-বিষযত্বম্"—'ভর্গ' শব্দ দ্বারা অবিদ্যানাশক আত্ম-জ্ঞানের বিষযত্ব লক্ষিত হইতেছে।

"দেবস্য ইতি সর্বদ্যোতনাত্মক-অখণ্ড-চিদেক রসম্"—"দেবস্য" শব্দের অর্থ সর্বপ্রকাশক অখণ্ড একরস 'ব্রহ্মের'।

"সবিতুঃ দেবস্য ইত্যত্র ষষ্ঠ্যর্থো 'রাহোঃ শিরো'বৎ ঔপচারিকঃ"।—শির ভিন্ন রাহুর অন্য অঙ্গ নাই। তবু "রাহুর শির" বলা হয়। রাহুর শিরই রাহু। তেমনি "সবিতুর্দেবস্য" এখানে যে ষষ্ঠী বিভক্তি তাহা ঔপচারিক। সবিতা ও ভর্গ একই।

"বুদ্ধ্যাদি-সর্ব-দৃশ্য-সাক্ষিলক্ষণং যৎ মে স্বরূপং তৎ সর্বাধিষ্ঠানভূতং পরমানন্দং নিরস্ত-সমস্তানর্থরূপং স্বপ্রকাশং চিদাত্মকং ব্রহ্ম ইত্যেবং ধীমহি ধ্যায়েম"—ইহাই শঙ্করের মতে গায়ত্রীর অর্থ: আমার যে স্বরূপ বুদ্ধি-আদি সমস্ত দৃশ্য বস্তুর সাক্ষী, তাহা সর্বাধিষ্ঠানভূত পরমানন্দ নিরস্তসমস্তানর্থ স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম—ইহাই ধ্যান করি।

শঙ্কর গায়ত্রী-শিরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন:

"আপো জ্যোতিঃ রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওম্"। আপঃ=আপ্নোতি (ব্যাপ্নোতি) অর্থাৎ সর্ব-ব্যাপী। জ্যোতিঃ=প্রকাশস্বরূপ। রসঃ=সর্বোৎ-কৃষ্ট। অমৃতং=সংসার-নির্মুক্ত। ভূর্ভুবঃ স্বঃ=সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। সর্বব্যাপী জ্ঞানস্বরূপ সর্বোৎকৃষ্ট নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ ওঁ॥ তিনিই আমি।

শঙ্করের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হউক বা না হউক, বেদের যে অদ্বৈতবাদ পুরুষসূক্তে এবং উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত তাহাই যে গায়ত্রীতেও প্রতিফলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রণব-মহাব্যাহৃতি ও গায়ত্রীশিরঃ-সমন্বিত গাযত্রীর মুখ্যার্থ এই:

(যিনি) ওঁ (তিনিই) ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-রূপে প্রকাশিত। (বেদে যাঁহাকে "তৎ" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই) দীপ্তিমান্ সবিতারও সম্ভজনীয় ভর্গস্বরূপ (জ্যোতি বা জ্ঞান-স্বরূপ)। তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি। আমরা তাঁহার ধী-সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। যাঁহার অনন্ত ধী আমাদের সসীম ধী-রূপে প্রকাশিত। তিনি আপঃ (সর্বব্যাপী) তিনি জ্যোতিঃ (জ্ঞান), তিনি রস (রসো বৈ সঃ—উপনিষৎ) তিনি অমৃত, তিনি ব্রহ্ম, তিনি ভূঃ ভুবঃ স্বঃ রূপে প্রকাশিত ওম্।

তুমি আছ, এই শুধু সত্য চিরন্তন

শ্রীদিব্যপ্রভা ভরালী

তুমি আছ, আছ তুমি এই শুধু বাণী—
অনাদি কালের বুকে উঠে প্রতিধ্বনি।
যুগে যুগে পলে পলে দিবস রজনী
তুমি আছ, আছ—এই অনন্ত রাগিণী
ধ্বনিতেছে অবিরাম বিশ্বের বীণায়—
কত তানে, কত ছন্দে, কত মূর্ছনায়।

যেথা নাহি অন্ধকার নাহি রাত্রিদিন
সেথা তুমি আছ শুধু আদি অন্তহীন—
বিরাট চৈতন্যসিন্ধু অকূল অপার,
উদ্বেলিত উর্মি তব অনন্ত ইচ্ছার!
তুমি আছ, ব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মহিমা
বিশ্বের শাশ্বত সুর, অক্ষর গরিমা!

তুমি আছ অপূর্ব এ সৃষ্টি-প্রেরণায়—
অনন্ত জীবন-স্রোতে অনন্ত ধারায়।
আপনার মায়াজালে জড়ায়ে আপনা
এ মায়া-সংসার তুমি করেছ রচনা।
জগত-ভাসক দীপ্ত অখণ্ড অরূপ!
রূপে রূপে বিভাসিত তোমারি স্বরূপ।

তুমি আছ হে অসীম! সসীমের মাঝে,
তোমারি বিচিত্র সাজে এ ভুবন সাজে
কত বর্ণে, কত গন্ধে, কত ব্যঞ্জনায়।
তুমি আছ প্রকৃতির সৌন্দর্য-সুধায়,
তুমি আছ গগনের ঘন নীলিমায়,
মধু-চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ শুভ্র শুচিতায়।

আলো-ছায়া-বিজড়িত বিজন কাননে,
স্বপন রহস্য-ভরা নীরব লগনে,
বনানীর শ্যামাঞ্চলে পুষ্পের সৌরভে,
তটিনীর কলস্বনে গিরির গৌরবে,
রাজিছ সুন্দর তুমি আপন লীলায়
স্থূল, সূক্ষ্ম, কত তব অরূপ শোভায়!

তুমি আছ সুগভীরে মর্ত্য হৃদয়ের
নিষ্কল নির্মল শুভ্র জ্যোতি জ্যোতিষ্কের।
যেথায় আনন্দালোক সুধার বিকাশ
সেথা হে আনন্দ-রূপ! তোমারি প্রকাশ।
তুমি আছ প্রজ্ঞাঘন অমৃত আভায়,
ধীর জন দেখে তোমা হৃদয়-গুহায়।

তুমি আছ নিত্যানন্দ শিশুর হাসিতে,
জাগিছ আপন সুরে কবির বাঁশীতে।
তুমি আছ মধুময় মহোৎসব ক্ষণে,
তুমি আছ মুমূর্ষুর অন্তিম লগনে।
তুমি আছ বহু দূরে যুক্তি-বিতর্কের,
সন্নিকটে আছ তুমি ভক্ত-হৃদয়ের।

তুমি আছ সর্বব্যাপী, সবার অন্তরে—
বিরাজিছ হে বিরাট, বিশ্বের বাহিরে!
অখিল আধার তুমি শক্তি জগন্ময়ী—
সর্বভূতান্তরস্থিত শিব কালজয়ী!
'একমেবাদ্বিতীয়ম্' জগত-কারণ
তুমি আছ, এই শুধু সত্য চিরন্তন।

ভারতীয় দর্শনের উদার ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোন কোন ধর্ম ও দর্শনের মতে মানুষ ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু ইতর প্রাণী হইতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ও উপাদান কি? অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষও জীবন-যুদ্ধে লিপ্ত এবং জীবন-ধারণের জন্য নানা কাজে ব্যস্ত। অন্যান্য জীবজন্তুর মত মানুষও ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল এবং রৌদ্রবৃষ্টিতে আশ্রয়স্থল অনুসন্ধান করে এবং তাহা পাইলে সুখী হয়। তাহাদের মত মানুষও আহার করে, নিদ্রা যায় এবং সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে। ইতর প্রাণীরা প্রাণধারণের উপযোগী দ্রব্য পাইলে এবং তাহাদের নৈসর্গিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিতে পারিলে সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। তাহার মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা বলিয়া একটা প্রবল পিপাসা আছে। এ পিপাসা যেমন মানুষের চিরসাথী, তেমনি ভৌতিক দ্রব্যে বা ভোগবিলাসে ইহা চির অতৃপ্ত। জলে এ পিপাসা মিটে না, পরমান্নেও এ ক্ষুধা দূর হয় না। মানুষ তাহার জ্ঞান-পিপাসার শান্তি করিবার জন্য সব বিষয়েই জ্ঞানলাভ করিতে চায়। ইতর প্রাণীরা জীবন-সংগ্রামে তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তিবলেই অন্ধভাবে কাজ করে। কিন্তু মানুষ জীবন-সংগ্রামের তাৎপর্য কি, তাহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উপায় কি এবং জীবনে চরম উন্নতি লাভের পথ কি—এসব বিষয় তাহার উচ্চতর চিন্তাশক্তির সাহায্যে জানিবার চেষ্টা করে। মানুষের জ্ঞানলাভের এই প্রয়াস তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিগত এবং বিচারবুদ্ধি হইতে উদ্ভূত। দর্শন-শাস্ত্র মানুষের জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার একটি চিরন্তনী প্রচেষ্টা। উহা মানুষের অনাবশ্যক কল্পনা-বিলাস-মাত্র নহে, তাহার অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য বস্তু। আলডুস হাক্‌স্‌লে নামক এক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ মনীষী তাঁহার এক গ্রন্থে (Ends and Means) এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে 'মানুষ তাহার জীবনে একটা দার্শনিক মতবাদ অনুসরণ করিয়া চলে, জীবজগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। একথা শুধু চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেই সত্য নহে। ইহা একান্ত চিন্তাবিমুখ ব্যক্তির পক্ষেও প্রযোজ্য। ভাল হোক্, মন্দ হোক্—কোন একটা দার্শনিক মতবাদ অবলম্বন করিয়া মানুষকে জীবনে চলিতে হয়। কোনও দার্শনিক মত না মানিয়া জীবনে চলা যায় না।'

আমরা যে শাস্ত্রকে 'দর্শন' বলি, পাশ্চাত্ত্য দেশে তাহাকে 'ফিলসফি' বলে। 'ফিলসফি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য ব্যাপক অর্থ হইতেছে 'জ্ঞানানুরাগ'। মানুষের জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানুষের স্বরূপ কি? তাহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি? যে জগতে মানুষ বাস করে তাহার প্রকৃতি কি? জীবজগৎ জড় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, না ঈশ্বর বা পরমাত্মার জ্ঞান- ও ইচ্ছা-প্রসূত? জন্ম ও মৃত্যু কি? জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরপারে মানবাত্মার কোন অস্তিত্ব থাকে কি না? জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষ যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার আলোকে জীবনে কোন্ পথে চলা উচিত এবং কোন্ আদর্শ অনুসরণ করা কর্তব্য? মানব-সভ্যতার আদিম কাল হইতেই এই প্রকার প্রশ্ন মানুষের মনে কতই উঠিতেছে। ফিলসফিতে এরূপ প্রশ্নগুলির বিচার-সঙ্গত সমাধান করিবার চেষ্টা করা হয়। ভারতীয় দার্শনিকগণ এসব প্রশ্নের বিচার- ও যুক্তিসঙ্গত সমাধান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ফিলসফিতে

যে তত্ত্বের বিচার করা হয় তাঁহারা তাহার সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষানুভূতি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য ভারতীয় সাহিত্যে ফিলসফিকে 'দর্শন' বা দর্শনশাস্ত্র বলে। ভারতীয় দর্শনের সর্ব শাখাতেই এক বা অন্য ভাবে তত্ত্বদর্শনের সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনে তত্ত্বদ্রষ্টাকে মুক্ত পুরুষ এবং তত্ত্বাদ্রষ্টাকে বদ্ধ জীব বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রাচীন সংহিতাকার মনু বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি সম্যক্‌দর্শন বা সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী তাঁহার কর্মবন্ধন হয় না, যিনি সম্যক্ দর্শন-বিহীন তিনি সংসারে আবদ্ধ হন'। (মনুসংহিতা, ৬।৭৪)

বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য দর্শন বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে—যথা (১) তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান, (২) প্রমাবিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞান-সাধন, জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার-লব্ধ জ্ঞান, (৩) তর্কশাস্ত্র অর্থাৎ অনুমানের প্রামাণ্য ও সে সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ের বিচার, (৪) নীতিবিজ্ঞান অর্থাৎ মানুষের নীতি, নৈতিক বিচারের মান, পুরুষার্থ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান, (৫) সৌন্দর্যবিজ্ঞান অর্থাৎ সুন্দর ও অসুন্দরের বিচার ও তাহার মান-সম্বন্ধে জ্ঞান। আধুনিক কালে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মধ্যে আরও কয়েকটি বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটির নাম এক্‌সিওলজি (Axiology) বা ইষ্টবিজ্ঞান। ইহাতে মানুষ যে সমস্ত বস্তুকে তাহার ইষ্ট বা বাঞ্ছিত দ্রব্য হিসাবে মূল্যবান্ বলিয়া গণ্য করে (যথা সত্য, শিব, সুন্দর, ধর্ম, অর্থ, কাম ইত্যাদি) তাহার বিচার করা হয়। সেইরূপ সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানকেও দর্শনের শাখা বলিয়া বিবেচনা করা হয়। অবশ্য বর্তমানে মনোবিজ্ঞানকে দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পদার্থ-বিদ্যা বা রসায়ন-শাস্ত্রের মত দর্শন-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসাবেই আলোচনা করিবার চেষ্টা হইতেছে।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মূল সমস্যাগুলি একরূপ এবং অনেক স্থলে তাহাদের সমাধানও অনুরূপ। কিন্তু উভয়ের বিচার-পদ্ধতি ও চিন্তা-ধারার প্রগতির মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ভারতীয় দর্শন বিষয় হিসাবে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত নহে। দার্শনিক মত বা দর্শন-প্রণেতার নাম অনুসারে ভারতীয় দর্শন বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, যথা: বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যেক শাখাতেই তত্ত্ববিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচ্য বিষয়গুলি একত্র আলোচনা করা হইয়াছে। সাধারণতঃ ভারতীয় দর্শনে যে কোন দার্শনিক সমস্যার আলোচনা, সম্ভাব্য সকল দিক্ হইতেই করা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই তত্ত্ববিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, প্রমা-বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সমস্যাগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করা হয় নাই। এ জন্য ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেক শাখাতেই তত্ত্ববিজ্ঞান, প্রমাবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতির একত্র সমাবেশ দেখা যায়। এরূপ দার্শনিক তত্ত্বগুলির একত্র আলোচনার পদ্ধতিকে কোন কোন ভারতীয় চিন্তানায়ক ভারতীয় দর্শনের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী বলিয়াছেন।

ভারতীয় দর্শন বলিতে কেবলমাত্র হিন্দুদর্শন বুঝায় না। উহা হিন্দু বা অহিন্দু, আস্তিক বা নাস্তিক, সকল ভারতীয় চিন্তানায়কের দার্শনিক চিন্তাধারার সমষ্টি। কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতীয় দর্শন বলিতে মাত্র হিন্দুদর্শন বুঝায়। কিন্তু 'হিন্দু' শব্দের অর্থ যদি 'হিন্দুধর্মাবলম্বী' হয়, তবে এ ধারণা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলিতে হইবে। অবশ্য 'হিন্দু' শব্দটি ভৌগোলিক অর্থে 'ভারতীয়' বুঝাইলে ভারতীয় দর্শনকে হিন্দুদর্শন বলা যায়। শ্রীমন্ মাধবাচার্য তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সর্বদর্শন-সংগ্রহে" বৈদিক বা আস্তিক দর্শন-শাখাগুলির সঙ্গে নাস্তিক চার্বাক দর্শন এবং অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈন

দর্শনকে যথাযোগ্য স্থান দিয়াছেন এবং সমভাবে তাহাদের আলোচনা করিয়াছেন।

ইহা হইতে ভারতীয় দর্শনের উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং অবাধ ও অদম্য সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শন বহু শাখা ও প্রশাখায় বিভক্ত এবং কোন কোন স্থলে তাহাদের মত অত্যন্ত বিভিন্ন। কিন্তু কোন এক শাখাতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অন্য শাখাগুলির মতবাদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহাদের আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে। এই প্রকারে দার্শনিক আলোচনার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রচলন হইয়াছে। কোন দার্শনিক তাঁহার নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠাব পূর্বে বিপক্ষের মতবাদের অবতারণা করিতেন; ইহাকে 'পূর্বপক্ষ' বলা হয়। তাহার পর তাঁহাকে বিপক্ষের মতবাদ নিরসন করিতে হইত; ইহাকে 'খণ্ডন' বলা হয়। সর্বশেষে দার্শনিক তাঁহার নিজ মতের ব্যাখ্যা ও প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা উহার প্রতিষ্ঠা করিতেন; এ জন্য ইহাকে 'উত্তরপক্ষ' বা 'সিদ্ধান্ত' বলা হয়।

ভারতীয় দর্শন-শাখাগুলির এরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় তাহারা পরস্পরের মত যত্নসহকারে আলোচনা করিয়াছেন। ফলে প্রত্যেক শাখাই পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে এবং উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে বেদান্তের কোন প্রধান গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে তাহাতে চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ ও মীমাংসা দর্শনের মতগুলি সযত্নে ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করা হইয়াছে। সেইরূপ বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনের কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থে অন্যান্য দর্শনের মতগুলি আলোচনা করা হইয়াছে। এই ভাবে এক একটি দর্শনশাখা এক একটি দর্শনকোষে পরিণত হইয়াছে। এমনকি সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অনেক সমস্যার আলোচনা ভারতীয় দর্শন-শাখাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। মনে হয় এই জন্যই কেবলমাত্র ভারতীয় দর্শনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং ভারতীয় দর্শনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে নিরত এদেশীয় পণ্ডিত-গণ পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অতি দুরূহ ও দুর্বোধ্য সমস্যা-গুলিরও এমন সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হন যে তাহাতে আমরা হর্ষ ও বিস্ময় বোধ করি।

অতীতকালে ভারতীয় দর্শনের মহত্ত্ব ও সমৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ—এই উদার ভাব ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী। ইহা হইতে আমাদের এবং ভবিষ্যদ্-বংশীয়দের একটি বিশেষ শিক্ষালাভ করা উচিত। ভারতীয় দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত এবং ভবিষ্যতে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করিতে হইলে আগামীকালের ভারতীয় দার্শনিকদের—দেশ-বিদেশ হইতে যে সব নূতন চিন্তাধারা এদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে সেগুলির সম্যক্ আলোচনা এবং তাহাদের সহিত আমাদের নিজস্ব চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করা একান্ত কর্তব্য। তাহা করিতে পারিলে আপাতবিরুদ্ধ ধর্মমতগুলির সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হইবে এবং ধর্মদ্বন্দ্বের অবসান হইতে পারে।

বিশ্বজনীন পর-মতসহিষ্ণুতার মহা-ভাবটির জন্য পৃথিবী আজও প্রতীক্ষারত। সভ্যতার পক্ষে ইহা এক পরম লাভ। এইভাব ভিতরে প্রবেশ না করিলে কোনও সভ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বিখ্যাত মার্কিন লেখক মামফোর্ড (Lewis Mumford) একটা বড় দামী কথা বলেছেন : 'পশ্চিমের সভ্যতা গত চার শতাব্দী ধ'রে যে ভাবে গড়ে উঠেছে তার সম্পর্কে চরম সমালোচনা হ'ল, এই সভ্যতা তৈরী করেছে একটা মেশিনের জগৎ যার মধ্যে না আছে সৃজনীশক্তি, না আছে হৃদয়। এ জগৎ প্রাণের বিরোধী এবং আধুনিক মানুষের অনিবার্য নির্বুদ্ধিতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে সমস্ত জীবনের উপরে নিয়ে আসবে প্রলয়ের অভিশাপ।'

চোখ যার খোলা আছে সে দেখতে পাবে মামফোর্ডের কথার মধ্যে একটুও অত্যুক্তি নেই। কোন্ অন্ধ আবেগে আমাদের এই পৃথিবী মাতালের মতো টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে নিশ্চিত মৃত্যুর অন্ধকারে! বিজ্ঞানের সাধনা ক'রে যাঁরা স্বর্গ থেকে জ্ঞানের আগুন চুরি ক'রে এনেছেন তাঁদের দানে মানুষের সভ্যতা ঐশ্বর্যশালিনী হয়েছে নিশ্চয়ই। আমরা মানবতাকে সেই শক্তি দিয়েছি যে শক্তি ছিল দেবতাদের একচেটিয়া সম্পদ। কিন্তু হায়, আমরা যদি এই সঙ্গে দেবতাদের চরিত্র-সম্পদের অধিকারী হ'তে পারতাম! পরমাণুবোমা আবিষ্কৃত হ'ল এমনই একটা অশুভ লগ্নে যখন নীতিবোধের দিক দিয়ে আমরা প্রায় খ্যাকশিয়ালের পর্যায়ে নেমে গেছি। পরের মুর্গী মারতে তার বিবেকে যেমন একটুও বাধে না, অন্তরীক্ষ থেকে আগ্নেয় মারণাস্ত্র ফেলে নগরীর ঘুমন্ত শিশু এবং নারী হত্যা করতেও আমাদের বিবেকে তেমনি আজ একটুও বাধে না। আমাদের এই moral nihilism, নীতিবোধের এই একান্ত দৈন্য আজ আমাদিগকে নামিয়ে এনেছে চেঙ্গিস খাঁর পর্যায়ে, হয়তো আরও একধাপ নীচে।

এই প্রলয়ের তীরে আমাদের গড়িমসি করবার সময় কোথায়? 'We must think swiftly, plan swiftly, act swiftly'. দিগন্তপ্রসারী এই অন্ধকারের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত নিশ্চয়ই প্রদীপ্ত মশালের কাজ করবে। মামফোর্ড বলেছেন, ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তির পথ আছে : Power must become the willing servant of love. শক্তিকে আজ স্বেচ্ছায় হ'তে হবে প্রেমের দাসী! নতুন কোন নৈতিক আদর্শের দ্বারা হালে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। পলিটিক্সের রাস্তায় প্রলয়কে এড়াতে পারব—এ সম্ভাবনাও কম। পথ দেখাবে ধর্ম, যার মূল কথা হ'ল বাইবেলের ভাষায় : Love thy God with all thy heart and all thy soul and all thy might. And love thy neighbour as thyself. হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, কনফিউসাসের ধর্ম—পৃথিবীর সকল ধর্ম চেয়েছে মানুষের ধ্বংসের প্রবৃত্তিকে শান্ত করতে; অবাধ জিঘাংসাকে কোন ধর্মই প্রশ্রয় দেয়নি; প্রত্যেকে চেয়েছে মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার দীপশিখাকে অনির্বাণ রাখতে। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান'—এই মানদ হবার আচরণকেই কি মহাপ্রভু বৈষ্ণবের লক্ষণ বলে প্রচার করলেন না? আজ আমাদের দরকার প্রেমধর্মের পুরাতন আদর্শকে পৃথিবীর এই নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করবার স্বচ্ছ বুদ্ধি এবং হৃদয়ের ঔদার্য।

বুদ্ধির দুর্বিনীত অহঙ্কারে আজ আমরা সর্বনাশের অতলে ডুবতে বসেছি। 'Mankind is afloat on a frail life-raft'. তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রের বুকে আমরা ভেসে চলেছি ক্ষণভঙ্গুর ভেলায়; জীবনের প্রতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি শ্রদ্ধা। 'Religion understands the mons-

ters of the deep and the storms that come up in the night'. সমুদ্রের গভীরে যে সকল জলচর হিংস্রপ্রাণীর বাসা তাদের সন্ধান রাখে ধর্ম। রাতের দিগন্তে ধেয়ে আসে যে ঝঞ্ঝা তারও সংবাদ রাখে ধর্ম।

পুরাতনের শাসনকে পর্যুদস্ত করতে গিয়ে আমরা আধুনিকতাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মূল্য দিতে চলেছি। মাত্রাজ্ঞান হারানো নিশ্চয়ই কোন কাজের কথা নয়। মানুষ প্রগতির পথে এতখানি এগিয়ে এসেছে সংযমের সাধনা ক'রে—একথা ভুলে গেলে চলবে কেন? পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, যৌনজীবনে শৃঙ্খলার মূল্যকে যারা স্বীকার করেনি তারা প্রগতির পথে বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারেনি। অগ্রসর হয়েছে তারাই যারা প্রবৃত্তির জীবনকে নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধেছে।

এই সংযমের প্রয়োজনকে আমরা যেন আজ অস্বীকার করতে বসেছি! আধুনিক মানুষ বিধি-নিষেধকে একদম স্বীকার করে না—এমন কথা বলা ভুল। স্বীকার করে—কিন্তু ছোট ছোট ব্যাপারে। যথা: গাড়ীর মধ্যে থুথু ফেলতে নেই, টিকিট কাটতে গিয়ে 'কিউ' দিতে হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে। কিন্তু সাধারণভাবে দেখতে গেলে, ভোগবাদই আজ আমাদের জীবনের মর্মমূলে শিকড় গেড়ে বসেছে। সিগার, শ্যাম্পেন, মোটর—এরই তৃষ্ণায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আজ আলজিরিয়ার মোহ ছাড়তে পারছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূলেও এই একই ভোগবাদ। সিগারের কামনা, শ্যাম্পেনের কামনা, মোটরের কামনা, ঐশ্বর্যের দুর্নিবার কামনা।

যাদের মধ্যে ভোগের তৃষ্ণা এত বলবতী তারা পরমাণুশক্তির ব্যবহারে সংযত হবে—এমন আশা করা দুরাশা। মামফোর্ড ঠিকই বলেছেন: Morally, such people are unfit for control of atomic power as a chronic alcoholic would be for the inheritance of a vast stock of whisky. পাঁড় মাতালের হেপাজতে যদি একগাদা মদের বোতল রাখা যায় —সে বোতলগুলোকে খালি ক'রে ফেলবেই। ভোগবাদীদের হাতে আণবিক শক্তির অপব্যবহারও অনিবার্য। কোন সংযমেরই যারা ধার ধারে না তারা পরমাণুশক্তিকে সংযমের মধ্যে বেঁধে রাখবে—কেমন ক'রে আমরা এমন আশা করতে পারি?

তাই উচ্ছৃঙ্খল ভোগবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবার প্রয়োজন আজ বিপুল। আর এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ও বাণীর মধ্যে তো কাম-কাঞ্চনের বিরুদ্ধেই অভিযানের শঙ্খনির্ঘোষ! বিষয়-বুদ্ধিকে কোথাও তিনি প্রশ্রয় দেন নি; লক্ষ্মী-মারোয়াড়ীর দশ হাজার টাকা অবহেলায় ফিরিয়ে দিলেন; টাকাকে মৃত্তিকাজ্ঞানে গঙ্গার জলে ফেললেন। সোনার জন্যেই না ধনতন্ত্রে যুগযুগান্তের অত্যাচার! সোনার জন্যেই না আজও পৃথিবী সাম্রাজ্যবাদে অভিশপ্ত! লেনিন বলেছিলেন, বিপ্লবোত্তর যুগে সোনা ব্যবহৃত হবে শুধু শৌচাগার নির্মাণের কাজে। ঠাকুর তাকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেছিলেন।

যুগাবতার ঠাকুর একদিকে অনাসক্তির, আর একদিকে দেখালেন প্রেমের পথ। শক্তি যদি প্রেমের কিঙ্করী না হয়, পরমাণুশক্তির ব্যবহার পৃথিবীকে রসাতলে ডুবিয়ে দেবে। কি বললেন তিনি? 'সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে, যতদূর পারো, আর ভালবাসবে।'

ঠাকুরের জীবনের মন্দিরে এই ভালোবাসার দীপশিখাই জ্বলছে। তাঁর প্রত্যেকটি বাণী প্রেমে দেদীপ্যমান। এ যুগের অন্যতম চিন্তাবীর সোরো-কিনও একই সুরে কথা বলছেন: মানুষের বাঁচবার আজ শেষ আশ্রয় 'all-giving and all-forgiving reverence for life'. মানুষের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাই আজ পৃথিবীকে সমস্ত সমস্যার পারে নবজীবনের উপকূলে পৌঁছে দিতে পারে। ঠাকুরের সেই কথা 'আর ভালোবাসবে।' "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" আর কোন পথ আছে কি?

শঙ্কর-দর্শনে "মিথ্যা"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

শঙ্কর-মতে জগৎ "মিথ্যা" বা জগতের কেবল-মাত্র "ব্যবহারিক সত্তাই" আছে, "পারমার্থিক সত্তা" নয়—এ বিষয়ে কিছু আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। (শ্রাবণ, ১৩৬৪)

"মিথ্যা" সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন অদ্বৈতবাদী নানা-ভাবে যে সকল সংজ্ঞা দান করেছেন, তা স্বতন্ত্রভাবে উদ্ধৃত করবার স্থান এ নয়। সেজন্য রামানুজ তাঁর সুবিখ্যাত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য "শ্রীভাষ্যে" অদ্বৈত-মত-খণ্ডনার্থে মহাপূর্বপক্ষে অদ্বৈত-মত-সার সংগ্রহ ক'রে "মিথ্যাত্বের" যে সুন্দর সংজ্ঞাটি দিয়েছেন সেইটিই এস্থলে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

"মিথ্যাত্বং নাম প্রতীয়মানত্ব-পূর্বক-যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞান-নিবর্ত্যত্বম্। যথা, রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানক-সর্পাদেঃ। দোষবশাদ্ হি তত্র তৎকল্পনম্।" (১।১।১)

অর্থাৎ, যা সাক্ষাৎভাবে প্রথমে প্রতীতিগম্য, প্রত্যক্ষীকৃত বা দৃষ্ট হয়, কিন্তু পরে যথার্থ বস্তুর জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিবারিত হয়ে যায়—তা-ই হল "মিথ্যা"। যথা, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম-কালে দৃষ্ট সর্প। এস্থলে উপরের সংজ্ঞাটির প্রত্যেক শব্দেরই একটি বিশেষ অর্থ আছে। ("শ্রুতপ্রকাশিকা" টীকা)

প্রথমতঃ—বাহ্য বস্তুর সাহায্যেও নিবৃত্তি হ'তে পারে, যেমন, দণ্ডাদির সাহায্যে ঘটাদি চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিলে ঘটাদির নিবৃত্তি বা ধ্বংস হয়। কিন্তু, "মিথ্যা" বস্তুর নিবৃত্তি হয় এই সাধারণ প্রণালীতে নয়, আন্তর প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানদ্বারাই কেবল—মিথ্যা সর্পজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় একমাত্র সত্য-রজ্জুজ্ঞান দ্বারাই। সেজন্যই এস্থলে "জ্ঞান" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ—ঈশ্বর অনন্ত শক্তিবলে কেবল সংকল্প দ্বারাই যে কোনও বস্তুর নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন। কিন্তু জীবের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়—তাব মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হতে পারে সংকল্প বা ইচ্ছা দ্বারা নয়—সত্য, জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ দ্বারা। সেজন্য, যদি ভ্রান্ত ব্যক্তি এরূপ দৃঢ় সংকল্পও করেন যে, তিনি সর্প প্রত্যক্ষ আর করবেন না, তাতে ফল কিছুই হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর রজ্জু-প্রত্যক্ষের উদয় হয়। সুতরাং "জ্ঞানের" অর্থ এস্থলে "জ্ঞানমাত্র"। কেবলমাত্র জ্ঞান এবং জ্ঞান-দ্বারাই অর্থাৎ সত্যজ্ঞান বা সত্য প্রত্যক্ষ দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়।

তৃতীয়তঃ—এই জ্ঞান হবে, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, সত্য জ্ঞান—সেই বিষয়েরই, অর্থাৎ যে অধিষ্ঠান অবলম্বনে ভ্রমের উৎপত্তি হয়েছে, তারই সত্যজ্ঞান, অন্য কোনও বিষয়ের নয়। সেজন্যই এস্থলে বলা হয়েছে "যথাবস্থিত"। অর্থাৎ মিথ্যা সর্প সম্বন্ধে জ্ঞান দূর হবে সত্য-রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞানের দ্বারাই, রজতপ্রমুখ অন্যান্য সত্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের দ্বারা নয়।

চতুর্থতঃ—"যথাবস্থিত" পদটি যে "জ্ঞান" পদের বিশেষণ নয়, সে কথা স্পষ্ট করবার জন্য বলা হয়েছে: "বস্তু"। অর্থাৎ, জ্ঞানই কেবল যথার্থ হ'লে চলবে না—যেহেতু ভ্রান্তিজ্ঞানও ভ্রমকালে সাময়িকভাবে যথার্থ ব'লেই প্রতীত হয়—জ্ঞান হওয়া চাই যথার্থ বস্তুরই জ্ঞান। সেজন্য অযথার্থ বস্তুর সাময়িকভাবে যথার্থরূপে প্রতিভাত জ্ঞানের দ্বারা নয়, যথার্থ বস্তুর শাশ্বতভাবে যথার্থ জ্ঞানই হ'ল "মিথ্যা"র নির্বতক।

পঞ্চমতঃ—যথার্থ বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের উদয়ে জ্ঞানের প্রাগভাবও নিবৃত্ত হয়, মিথ্যাজ্ঞানও নিবৃত্ত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে, জ্ঞানের প্রাগভাব নয়, মিথ্যা জ্ঞানই নিবৃত্ত হয়। সেজন্যই বলা হয়েছে—"প্রতীয়মানত্বপূর্বক"। অর্থাৎ "মিথ্যা" হ'ল নঞর্থক

যথার্থ জ্ঞানাভাবমাত্রই নয়, সেই সঙ্গে সদর্থক অযথার্থ-জ্ঞান। এস্থলে জ্ঞানের অভাব-মাত্রই নেই, উপরন্তু একটি বিশেষ জ্ঞানই রয়েছে, যদিও সেই জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান-মাত্র।

ষষ্ঠতঃ—"জ্ঞান-নিবৃত্ত্যত্বম্" না ব'লে এস্থলে "জ্ঞান-নিবর্ত্যত্বম্" বলা হয়েছে এইজন্ত যে, যথার্থ-বস্তুর জ্ঞানের মিথ্যাজ্ঞানকে নিবারণ করবার যোগ্যতা আছে, অর্থাৎ যদিও বর্তমানে মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়ে যায়নি, তথাপি ভবিষ্যতে তা হবার সম্ভাবনা আছে। এরূপে বর্তমানে সত্যরূপে দৃষ্ট, অথচ ভবিষ্যতে অসত্যরূপে দ্রষ্টব্য বস্তুই হ'ল "মিথ্যা"।

"মিথ্যাত্বের" আর একটি সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা হ'ল—"মিথ্যাত্বঞ্চ স্বাশ্রয়ত্বে নাভিমত-যাবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্।" (বেদান্তপরিভাষা, দ্বিতীয় অধ্যায়)—অর্থাৎ, যে অধিষ্ঠান বা বস্তুটির আশ্রয়ে ভ্রমের উৎপত্তি হয়েছে, সেই অধিষ্ঠানে এই ভ্রমদৃষ্ট বস্তুর অত্যন্তাভাব বা ত্রৈকালিক নিষেধ। "প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্ মিথ্যাত্বম্।" (পঞ্চপাদিকা)—অর্থাৎ, রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানের আশ্রয়ে রজ্জু-সর্প-ভ্রমের উদয় হয়, অথবা রজ্জুতে সর্পের আরোপ করা হয়। কিন্তু রজ্জুতে সর্পের অস্তিত্ব কস্মিন্‌কালেও নেই, সেজন্যই সর্পটি মিথ্যা।

"মিথ্যা" বস্তুর লক্ষণ কি? এর উত্তর হ'ল এই যে, মিথ্যার লক্ষণ নির্দেশ করা অসম্ভব। কারণ, বস্তু-লক্ষণের প্রথম ও প্রধান কথাই হ'ল—সেই বস্তুটি সৎ অথবা অসৎ। কিন্তু মিথ্যা সৎও নয়, অসৎও নয়, সদসৎও নয়, সদসদ্-বিলক্ষণও নয়। প্রথমতঃ—মিথ্যা বস্তু সৎ নয়, যেহেতু সৎ বস্তু কদাপি বাধিত বা অসত্য ব'লে প্রমাণিত হয় না, যেমন—ব্রহ্ম। কিন্তু মিথ্যা বস্তু প্রথমে সত্যরূপে প্রতিভাত হলেও, পরে সত্য বস্তুর জ্ঞানোদয়ে বাধিত বা অসত্য ব'লে প্রমাণিত হ'য়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ—মিথ্যা বস্তু অসৎও নয়—যেহেতু অসৎ বস্তু কদাপি প্রত্যক্ষগোচরই হয় না; যেমন—আকাশ-কুসুম। কিন্তু মিথ্যা বস্তু প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ—মিথ্যা বস্তু সদসৎও নয়—যেহেতু একই বস্তু দুই বিরুদ্ধধর্মভাগী হ'তে পারে না। চতুর্থতঃ—মিথ্যা বস্তু সদসদ্-বিলক্ষণও হ'তে পারে না—যেহেতু সংসারের সকল দ্রব্যই হয় সৎ, না হয় অসৎ; সেজন্য সৎও নয়, অসৎও নয়—এরূপ সত্তা কল্পনা-মাত্রও করা যায় না। সেজন্যই মায়াকে, এবং তজ্জনিত মিথ্যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শঙ্কর বলেছেন: "অনির্বচনীয়"—

"তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্বচনীয়ে নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ব্রূমঃ"। (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য—১।১।৫)

অর্থাৎ, 'নামরূপ' বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বও নয়, অতত্ত্বও নয়, সেজন্য অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় সংসারবীজই সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্ত থাকে, সৃষ্টিকালে ব্যক্ত হয়।

এই সত্তা-ত্রৈবিধ্য-বাদ যথাযথ উপলব্ধি করতে পারলে শঙ্কর বেদান্তের সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হবে। সাধারণ ধারণা এই যে, শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বা মায়ামাত্র বলেছেন ব'লে তিনি জগতের অস্তিত্বই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এই ধারণা যে সত্য নয়, তা উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই প্রমাণিত হবে। উপরে যে চারটি শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা—সৎ বা পারমার্থিক সত্তা, ব্যবহারিক সত্তা, প্রাতিভাসিক সত্তা ও অসৎ—তাদের মধ্যে, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তা, প্রকৃতকল্পে 'মিথ্যা' হলেও, 'সত্তা'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যাবে যে, পরিশেষে বাধিত হ'য়ে অসত্য প্রতিপাদিত হলেও, প্রারম্ভে তাদের এক প্রকারের অস্তিত্ব আছে।

বিশেষ ক'রে জগৎ মিথ্যা হলেও শূন্য নয়, আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বা তুচ্ছ নয়, স্বপ্ন নয়, সাধারণ রজ্জু-সর্প-তুল্য ভ্রমও নয়। এরূপে

ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের পরিভাষায়—জগতের 'Phenomenal, empirical reality' আছে, 'Noumenal, absolute reality' নেই।

অর্থাৎ, সাধারণ জীবনের দিক থেকে, প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারের দিক থেকে—দৈনন্দিন জ্ঞান অজ্ঞান, সুখ দুঃখ, আশা আশঙ্কা, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, প্রভৃতির দিক থেকে পারিবারিক ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থার দিক থেকে—এমনকি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও—এই পরিদৃশ্যমান জড় জগৎ—এই শ্যামলা শোভনা সুষমাময়ী ধরণী—যা যুগে যুগে কত কবি, কত জ্ঞানি-বিজ্ঞানী, কত সমাজ-সেবক ও রাষ্ট্রনায়ককে উদ্বুদ্ধ করেছে সাহিত্য-চর্চায়, জ্ঞানানুশীলনে মানব-সেবায়—তা নিশ্চয়ই সত্তাশীল, নিশ্চয়ই অর্থশূন্য নয়। উচ্চতম সত্তা ব্রহ্মতুল্য না হলেও, সংসার ক্ষণবিলয়ী স্বাপ্ন পদার্থ ও অল্পস্থায়ী ভ্রমকালীন দৃষ্ট পদার্থের অপেক্ষা বহু উচ্চতর, প্রকৃষ্টতরও স্থিরতর সত্তা। সেজন্য, তার মূল্য এবং প্রযোজনও সমধিক। কারণ, পরিশেষে পরিত্যাজ্য হলেও প্রারম্ভে এই সংসারের মাধ্যমেই মুক্তিলাভ সম্ভব। এ সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা পরে করা হবে।

মানব-মন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

মানব-মনের বিস্ময়-কর গতি,
কি যে উপাদানে গড়েছেন প্রজাপতি!
মানুষী তনুই ভুবনের বিস্ময়,
মানব-মনের সব রহস্যময়।
গড়িতে ও মন লাগিয়াছে কত দিন?
কত বিদ্যুৎ, কত গুলা ইঞ্জিন?
কত শত ভিসুভিয়সের উত্তাপ?
কত শত হিম-গিরির হিমের চাপ?

২

কয়টা সাহারা চেরাপুঞ্জী বা ক'টা—
লেগেছে কয়টা ইন্দ্রধনুর ছটা?
কত তেজ কত রস আর কত ভাব,
লেগেছে ঘটাতে ইহার আবির্ভাব।
ও মন গড়িতে জোগায়েছে উপাদান
কতই কপিল, কত দধীচির দান?
ও মন যেমন উচ্চ তেমনি নীচু
বাধা ও বিঘ্ন মানে না—মানে না কিছু।

৩

জগৎকে করে আলোড়ন বিলোড়ন,
আনে বিপ্লব ধ্বংস বিড়ম্বন।
আবার কখনো ভাবের বন্যা আনি
ধরণীতে করে অমৃতের আমদানি।
অবিনশ্বর তার সৃষ্টি ও বড়,
বিশাল সৃষ্টি—সৃষ্টি সূক্ষ্মতর।
শ্রীভগবানের মহিমা-উদ্ভাসিত
সেই গ'ড়ে দেয় অপূর্ব ধরণী তো।

৪

মানবের মন গড়েছে—শকুন্তলা
কত সুর, কত শিল্প, চিত্রকলা!
কতই পুরাণ দর্শন রীতিনীতি,
মহাকাব্য ও অমর স্তোত্র-গীতি
স্বর্গে মর্ত্যে সে করিতে পারে যোগ
চিন্তার শর পঁহুছায় ধ্রুবলোক।
বিচিত্রতার সেই তো প্লাবন আনে,
এক ক'রে দেয় ভুবনে ও ভগবানে।

বিজ্ঞান ও ধর্ম

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

আধুনিক পণ্ডিত সমাজের কোন কোন লোকের ধারণা আছে যে ধর্মের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই; বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ এত গভীর যে উভয়ের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করা প্রায় অসম্ভব। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁহার একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, আমাদের সম্মুখে একটি স্বর্ণযুগের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ তাহার বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাহায্যে এই স্বর্ণযুগের অধিবাসী হইতে পারে কিন্তু তাহার যাত্রাপথের সামনে এক বিরাট দানব বসিয়া আছে, সেই দানবটি হইতেছে ধর্ম। ইহাকে হত্যা করিতে না পারিলে মানুষের উন্নতির কোন আশা নাই।

রাসেল চিন্তাশীল লেখক, পণ্ডিত সমাজে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। রাসেল বলেন, একথা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে মানুষ সুখ চায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে সর্ববিধ সুখের পথে লইয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের বহুবিধ উন্নতির ফলে বহিঃপ্রকৃতি মানুষের করায়ত্ত হইয়াছে, কাজেই এখন আর তাহার পক্ষে ধর্মের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, রাসেলের মতে, ধর্মের উৎস হইতেছে ভয়। বহু যুগ আগে, যখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কোন সূচনাই দেখা যায় নাই, তখন মানুষ নানা দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করিত। বহিঃপ্রকৃতিকে ভয় করিয়া চলিত এবং অন্ধ বিশ্বাসের বশে প্রকৃতির ভিতর নানারূপ কাল্পনিক দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিত। সেই দেবদেবীর সত্যিকারের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিত না। কালক্রমে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ এই অন্ধ বিশ্বাস দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে; কাজেই এখনও ধর্মকে জীবনে স্থান দিলে মানুষ স্বভাবতই প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়িবে। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে—বিজ্ঞান যুক্তিবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর ধর্ম কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির রুদ্ররূপকে শান্ত করা এবং কল্পিত পারলৌকিক আত্মাকে প্রসন্ন রাখা—ইহাই প্রধানতঃ ধর্মের কাজ। রাসেলের মূল যুক্তি এইরূপ।

আমাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে রাসেলের অভিমত যুক্তিনিষ্ঠ কিনা এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে প্রকৃতই কোন বিরোধ আছে কিনা। প্রথমে বিচার করিয়া দেখা দরকার বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রকৃত লক্ষণ কি?

বিজ্ঞানের কাজ হইল বিশেষকে সামান্যের মধ্যে বিধৃত করিয়া দেখা; বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য 'বহু'কে 'এক'-এর সাহায্যে বিশ্লেষণ করা। মনোবিজ্ঞান বিভিন্ন মানুষের মনের সাধারণ ভাব বা প্রত্যয়গুলি বিশ্লেষণ করিয়া থাকে, তেমনি পদার্থবিজ্ঞান বিভিন্ন প্রকারের জড় পদার্থের ভিতর সাধারণ ধর্মগুলি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে।

একথা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে বিজ্ঞানের কাজ সীমাবদ্ধ। পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ; একটি অপরের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞান মনোরাজ্যের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না; তেমনি মনোবিজ্ঞান জড় পদার্থের লক্ষণ লইয়া আলোচনা করে না। বিজ্ঞানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা কতকগুলি মৌলিক সূত্র—বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করিয়া নেয়। পদার্থবিজ্ঞান জড়জগতের অস্তিত্ব, দেশ-কালের অস্তিত্ব, কার্যকারণ-সম্পর্ক প্রভৃতি স্বীকার করিয়া নেয়। তেমনি মনোবিজ্ঞান—মন

আদৌ আছে কিনা, এ প্রশ্ন করে না; মনের কামনা, বাসনা ও অনুভূতিকে সত্য বলিয়া মানিয়া নেয়।

বিজ্ঞান আমাদের কাছে যে জ্ঞান পরিবেশন করে তাহা সুসংবদ্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ, সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কোন দিনই চরম সত্য নহে। বিজ্ঞান একটির পর একটি কল্পনার (hypothesis) সাহায্যে সত্যানুসন্ধানের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ কেন? পাশ্চাত্ত্য দেশে কি ভাবে এই বিরোধের সূত্রপাত হইল তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ কখনও প্রবল আকার ধারণ করে নাই। বৌদ্ধযুগে ধর্মযাজকগণ বৈজ্ঞানিকদিগকে বিশেষতঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীকে নানাপ্রকার উৎসাহ দিয়াছেন। নাগার্জুন যেমন একদিকে ধর্ম ও দর্শনের মৌলিক আলোচনায় পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তেমনি সাধারণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনে তিনি অপরিসীম দান করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন যুগে ধর্মযাজকেরা বৈজ্ঞানিকের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন। ইটালিদেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্রুনোকে (খৃঃ অঃ ১৫৫০) জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল, যেহেতু তৎকালীন ধর্মযাজকদের মতানুসারে তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন নাই। ব্রুনো ছিলেন নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। মৃত্যুর সময় তিনি বলিয়াছিলেন: "আমাকে যাহারা হত্যা করিল তাহারা আমার চাইতেও ভয়ার্ত। আমি সত্যের জন্য চিরকাল সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি। সেই সংগ্রামের জয়-পরাজয় ভাগ্যের হাতে। আমি অন্যায় ও অসত্যের পায়ে মাথা নত করি নাই—ভাবীকালের মানুষ এই কথা নিশ্চয় মনে রাখিবে।" ব্রুনোর জীবন আলোচনা করিলে জানা যায় যে তিনি সত্যনিষ্ঠা ও চিন্তার স্বাধীনতার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে যীশুখৃষ্টের সত্যনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ সত্যনিষ্ঠার অপরাধে ব্রুনোকে হত্যা করিল। নির্ভীকভাবে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের জন্য গ্যালিলিওকেও নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে।

অতীতে ধর্মের নামে যেমন বিজ্ঞানের উপর অত্যাচার হইয়াছে, তেমনি বর্তমানকালে বিজ্ঞানের নামে ধর্মের উপর অত্যাচার চলিতেছে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার গর্বে গর্বিত হইয়া আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মানুষ হিন্দুধর্মকে কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনীর সমষ্টি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকেরা বলেন: ধর্ম একটি কুসংস্কার বা বুজরুকি মাত্র; যে ঈশ্বর ও পরলোকের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ আমাদের জানা নাই—তাহাই ধর্মের বিষয়-বস্তু। আধুনিক সন্দেহবাদীর মতে ধর্ম কাল্পনিক বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত আর বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাই উভয়ের মধ্যে বিরোধের সূচনা করে।

এই অভিযোগের বিশ্লেষণ করিতে হইলে ধর্মের লক্ষণ কি—তাহাই প্রথমে আলোচনা করিতে হইবে। 'ধর্ম' কথাটি 'ধৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; যাহা মানুষকে ধারণ করিয়া আছে তাহাই ধর্ম। 'Religion' কথাটির মূল অর্থ—যাহা মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের ঐক্য সাধন করিতে পারে। কালক্রমে religion কথাটির অর্থ হয় ঈশ্বরানুভূতি, ঈশ্বরপ্রীতি এবং ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য পূজা-প্রার্থনাদি আচার অনুষ্ঠান করা। আমরা ধর্ম বলিতে বুঝি এমন একটি সত্য, যাহা মানুষের একমাত্র আশ্রয়-স্থল—যাহা বাদ দিলে মানুষ মানুষ থাকে না। সহজ কথায় বলা যাইতে পারে যে, জলের ধর্ম যেমন তরলতা, আগুনের ধর্ম যেমন দাহিকা-শক্তি,

তেমনি মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বের লক্ষণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ কোথায় তাহাই আলোচনা করিতে হয়। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—এই চারিটি গুণ মানুষ ও পশু—উভয়ের মধ্যেই বর্তমান। তাহা হইলে, ইহার কোনটাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। গুরু শিষ্যকে আশীর্বাদ করিয়া যখন বলেন, "তুমি মানুষ হও" তখন তিনি বলিতে চান যে তোমার মধ্যে যে সুপ্ত মনুষ্যত্ব আছে তাহাকে উদ্বুদ্ধ কর, তুমি জীবনের জয়গান গাও, তুমি এগিয়ে চল, পিছিয়ে থেকোনা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রোহিতাশ্বের উপাখ্যানের মধ্যে সুন্দর কথাটি আছে—চরৈবেতি, চরৈবেতি—তুমি এগিয়ে চল, চল—এগিয়ে চল। এগিয়ে চলার মধ্যেই মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার আবরণ উন্মোচনের মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব। এক কথায়, 'ধর্ম' বলিতে বুঝিতে পারি মানুষের আত্মোপলব্ধি। এই বিষয়ে পৃথক্ প্রমাণ দেওয়া সম্ভবপর নয়; মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন সেই পথ অনুসরণ করিলেই ধর্মের তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্; মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।' উপনিষদের ঋষিরা বলিয়াছেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি'। আমি ও ব্রহ্ম অভিন্ন—ইহা অনুভূতির আলোকে প্রতিভাত সত্য, ইহা প্রমাণলভ্য নয়। যেখানে সংশয় ও সন্দেহ আছে সেখানেই প্রমাণের প্রয়োজন। আত্মা সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় থাকিতে পারে না; কাজেই প্রমাণের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। আমি ও ব্রহ্ম দুইটি পৃথক্ বস্তু নয়, কাজেই অপর কোন সত্তা বা পুরুষের সাহায্যে এই ঐক্য সাধিত হইতেছে, ইহাও সত্য নয়। ব্রহ্মানুভূতির অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই অবস্থায় প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয়—এই তিনটি ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়। শাস্ত্রে ব্রহ্মকে 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' বলা হইয়াছে। কিন্তু এ আলো কিসের আলো? উপনিষদ্ বলিয়াছেন,

> ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
> তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

—সেখানে সূর্যের ভাতি নাই, চন্দ্রতারকার ভাতি নাই, বিদ্যুৎও সেখানে প্রভাষিত নহে, অগ্নি সেখানে কোথায়? তিনি প্রকাশমান বলিয়াই তদনুযায়ী নিখিল জগৎ প্রকাশমান, তাঁহার দীপ্তিতে এই সমুদয় প্রকাশ পায়। কেনোপনিষদ্ বলিয়াছেন, 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ্ গচ্ছতি, নো মনঃ। ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ'॥—যেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্য যাইতে পারে না, মন যাইতে পারে না, বুদ্ধি যাইতে পারে না; তাঁহাকে আমরা জানি না, কিরূপে তাঁহার উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে? উপনিষদ্ আরও বলিয়াছেন, 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?' যিনি সর্বজ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় সেই বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?

অনেক সময় দেখা যায়, আপাতবিরোধী বাক্যের সাহায্যেও পরম পুরুষকে বর্ণনা করা হইয়াছে:

'তদেজতি, তন্নৈজতি'—তিনি এগিয়ে চলেন অথচ এগিয়ে চলেন না; 'তদ্দূরে তদন্তিকে'—তিনি দূরে আছেন, অথচ নিকটেও আছেন ইত্যাদি। আপাতবিরোধী বাক্য ব্যবহারের বিশেষ তাৎপর্য আছে। সাধকেরা বলিতে চান যে ঈশ্বর যুক্তিতর্কের বাইরে; ঈশ্বর অনুভূতি-সাপেক্ষ, উপলব্ধি-সাপেক্ষ; উপলব্ধির আলোকে যখন নিজের স্বরূপকে মানুষ অবলোকন করে তখন সে বুঝিতে পারে যে সে ক্ষুদ্র, খর্ব, দেহেন্দ্রিয়ধারী নশ্বর জীব মাত্র নয়; সে অমৃতের পুত্র, সে বিরাট ভাগবত জীবনের মধ্যে বিধৃত; সে সচ্চিদানন্দের মূর্ত বিগ্রহ। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে মানুষ স্বভাবতই ভয়মুক্ত

হয়, মৃত্যুভয়ে সে আর ভীত হয় না। সেইজন্ত শাস্ত্রকারেরা "অভীঃ" মন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

উপনিষদের দৃষ্টি অনুসরণ করিলে 'ভয় হইতে ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে'—রাসেলের এই অভিযোগ আর যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন ঋষিরা ধ্যানদৃষ্টিতে সত্যের যে রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই ধর্মের মূল সুর খুঁজিয়া পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ এইজন্তই বার বার বলিয়াছেন: 'Religion is realisation ..it is being and becoming'। মতামতের মধ্যে যুক্তিতর্কের মধ্যে ধর্মের সত্য নিহিত নাই; ধর্ম আসলে আত্মার স্বরূপ-উপলব্ধি। এই উপলব্ধির ফলে মানুষ মহত্তর, বৃহত্তর জীবনের অধিকারী হয়। যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে প্রাচীনকালে কোন কোন সম্প্রদায় ভয় হইতে ধর্মভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি এই উক্তি সার্বিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সমাজের অন্তান্ত জিনিসের মত ধর্মবোধের এবং ধর্মানুষ্ঠানেরও বিবর্তন ঘটিয়া থাকে। কাজেই একথা বলিলে ভুল হইবে না যে, যে ক্ষেত্রে ভয় হইতে ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, সেখানে প্রেমে তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে: "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"। যিনি রুদ্র তিনিই আবার প্রসন্ন। যস্ত ছায়াঽমৃতং যস্ত মৃত্যুঃ—মৃত্যু ও অমৃত একই সত্তার দুই দিক্। ইংরেজীতে একটি কথা আছে 'There is more in the fruit than there was in the roots'। ফলের ঐশ্বর্য মূলের অপেক্ষা অনেক বেশী।

ধর্মকে যাঁহারা কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বিজ্ঞানের মধ্যেও কল্পনার স্থান রহিয়াছে। বিজ্ঞান স্থূল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে চরম বলিয়া স্বীকার করে নাই; ব্যবহারিক জগতের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মতম যে সত্তা আছে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্ত বিজ্ঞানের সাধনা। পরমাণুকে বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক যে ইলেকট্রন্ ও প্রোটনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে তাহাদের অস্তিত্বের ধারণা করা হয় মাত্র।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মিলনের সেতু কোথায় এখন তাহাই আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ—ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে 'শব্দমূল' বলা হইয়াছে। সেইজন্ত শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে ধর্মের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হন, একথা সত্য। কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধানের মূলে একটি বিশ্বাস কাজ করিতেছে—সেই বিশ্বাস হইতেছে এই যে, প্রকৃতির যাবতীয় জিনিস কার্যকারণ-সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃতির সমস্ত রহস্ত উদ্‌ঘাটন করা যাইবে। এই বিশ্বাস ছাড়া বৈজ্ঞানিক কোন মতেই অগ্রসর হইতে পারেন না।

Max Planck বৈজ্ঞানিকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি কথার উপর বারবার জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অপরিহার্য ধর্ম হইল ঐকান্তিক নিষ্ঠা (penetrating sincerity)। এই নিষ্ঠা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে যেমন অপরিহার্য তেমনি ধর্মশীল লোকের পক্ষেও অপরিহার্য। আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা না থাকিলে যেমন বৈজ্ঞানিক তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না, তেমনি আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা ব্যতীত ঈশ্বরলাভও হয় না।

বৈজ্ঞানিক বিশেষকে সামান্তের (Universal) মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। যেমন, পদার্থবিজ্ঞান সকল পদার্থের অন্তর্গত মূল সত্যটির অনুসন্ধান করে, প্রাণিবিজ্ঞান সকল প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি মৌলিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করে। ধর্মের কাজও বহুকে একের মধ্যে বিধৃত করিয়া দেখা। গীতায়

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "সূত্রে মণিগণা ইব"। মণির মালা গাঁথিবার জন্ম সূতার প্রয়োজন; সূতা ছিঁড়িয়া গেলে সমস্ত মণি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে: একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। 'এক' বহুর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং 'বহু' একের মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে—এই সত্য উপলব্ধি করাই ধর্ম ও দর্শনের প্রধান লক্ষ্য।

এ-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বিজ্ঞান কখনও চরম সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। ইহা কেবল মানুষকে সত্যের বিভিন্ন সোপানের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেয়। ধর্ম মানুষকে শিখায় কেমন করিয়া চরম সত্তাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিতে হয়। বিজ্ঞান সেই চরম সত্তার বিভিন্ন প্রকাশকে নিজ নিজ প্রথানুযায়ী বিশ্লেষণ করিয়া থাকে। এই কথা স্মরণ রাখিলে বুঝিতে পারিব যে, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে প্রকৃত বিরোধ নাই। জড়, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সচ্চিদানন্দের বিভিন্ন স্তর মাত্র। প্রকৃতির সুগভীর অন্তস্তলে যে প্রাণপুরুষ অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে অস্বীকার করিলে এই স্তরগুলি অর্থহীন হইয়া পড়িবে।

ধর্ম মানবপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করে, বিজ্ঞান সেই অন্তর্নিহিত সত্যের বহিঃপ্রকাশকে ব্যাখ্যা করে। ধর্মশীল ব্যক্তি ও বৈজ্ঞানিক উভয়েই সত্যের পূজারী। ধর্মশীল ব্যক্তি সত্যকে সামগ্রিকভাবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখেন; আর বৈজ্ঞানিক চরম সত্যের খণ্ডরূপকে বিশ্লেষণ করিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে কতকগুলি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন। এ যুগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে জেমস্ জীন্স্ বলিয়াছেন যে, জড়জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি এবং মনে হয় ইহার পিছনে এক Mathematical Mind—গণিতজ্ঞ মন আছে, যাঁহার নির্দেশে জগতের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা হইতেছে। এডিংটনও বহিঃপ্রকৃতির মূলে এক Universal Logos বা বিশ্বজনীন চিৎশক্তি মানিয়াছেন। গত যুগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ফ্যারাডে বলিয়াছেন, ইহা আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বোধ হয় যে স্রষ্টা ঈশ্বরের পুঁথি না পড়িয়া মানুষ মানুষেরই লেখা পুঁথি পড়িয়া থাকে। পাস্তুর বলিয়াছেন: যে ঈশ্বরকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে—শিল্পকলার আদর্শ, বিজ্ঞানের আদর্শ, ধর্মজীবনের আদর্শ—তাহার জীবন ধন্য; সে খণ্ডসত্যকে অনন্তের আলোকে প্রতিফলিত দেখিতে পায়।

ধর্ম যে-ঈশ্বরের সন্ধান দেয় সেই ঈশ্বর সত্য শিব সুন্দর। বিজ্ঞান এই অখণ্ড তত্ত্বকে খণ্ড করিয়া কেবল সত্যের সাধনা করিয়া থাকে। আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে যে বিভ্রাট ও বিপর্যয় দেখা দিয়াছে তাহা দূর করিতে হইলে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে এক অবিচ্ছেদ্য মঙ্গলসূত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে। যে বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষকে অসুন্দর ও অমঙ্গলের পথে লইয়া যায় তাহা বর্জন করিতে হইবে। সত্য যে শিব ও সুন্দরের একটি বিশেষ প্রকাশ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলনের পথ প্রশস্ত হইবে। আজ ফ্র্যান্সিস্ বেকন্-এর কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়: 'A little science makes man an atheist, whereas a great deal of science turns man's thoughts about to religion'.—বিজ্ঞানের সামান্য পরিচিতি মানুষকে নাস্তিক করিয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞানের সুগভীর অনুশীলন তাহাকে স্বভাবতই ধর্মের পথে লইয়া যায়।

বাংলাদেশে দুর্গোৎসব

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

বাংলাদেশে দুর্গোৎসব জাতীয় উৎসব। ওড়িষ্যায় রথযাত্রা, উত্তরপশ্চিমে ও বিহারে দেওয়ালী, বোম্বে ও দাক্ষিণাত্যে গণপতি-উৎসব জাতীয় উৎসব। অবশ্য অন্য প্রদেশেও এই সব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু জাতীয় উৎসব বলিতে আবাল-বৃদ্ধ নরনারীর মধ্যে যে আনন্দের উন্মাদনা দেখা যায়, অন্যত্র ঠিক সেই ভাবের উচ্ছ্বাস দেখা যায় না।

হিন্দুজাতির মধ্যে সকল পর্বেই আনন্দানুষ্ঠান ও পূজার্চনা আছে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ পর্বে বিভিন্ন প্রদেশে অনন্দোৎসবের যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা প্রদেশগত ও জাতীয়। বর্তমানকালে ভারতের সর্বত্র এই সব পর্বে কতকটা সীমাবদ্ধ আনন্দোৎসব, পূজার্চনার উদ্যম ও উৎসাহ দেখা যায়, কিন্তু সকলের প্রাণে সব পর্বে সাড়া দেয় না। বাংলাদেশে দুর্গোৎসবে প্রতি পল্লীতে প্রতি গ্রামে প্রতি গৃহে জাতিধর্মনির্বিশেষে যে উদ্বেল আনন্দের তরঙ্গে নর-নারীর হৃদয় প্লাবিত হয়—অন্য প্রদেশে বাঙালী ব্যতীত অন্য কাহারও অন্তরে সেই উদ্দাম ভক্তির উচ্ছ্বাস ক্বচিৎ দেখা যায়।

বাংলার আগমনী গান দুর্গোৎসবের মাসাধিক পূর্বে বাংলার প্রতি গ্রামে ভিখারী বৈরাগীদল পথে পথে গাহিয়া বেড়াইত। বাংলার নরনারী উৎকর্ণ হইয়া ভক্তি রসাপ্লুত চিত্তে তাহা শুনিত। আমরা বাল্যকালে প্রত্যুষে শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজার বহুদিন পূর্বে গাহিতে শুনিয়াছি :

"গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে—'মা কৈ, মা কৈ' ব'লে
ডাকিছে মা তোর ঐ শশধর-বদনী।
মা তোর এই কন্যে ত্রিভুবন-ধন্যে
কভু এ সামান্যে নয় গো রাণী।
আমরা ভাবতেম ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে
তিনি নাকি ভবের ভয়-হারিণী॥
মা তোমার এই তারা চন্দ্রচূড়-দারা
চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী।
এমন রূপ দেখি নাই কারো, মনের অন্ধকার হরে
মা, তোর হর-মনোমোহিনী।"

এই গান শুনিয়া অনেক বয়স্ক নরনারীর চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিত। আমরা বালকের দল মনে করিতাম, মা দুর্গা আসিতেছেন, নূতন পোশাক পরিয়া দল বাঁধিয়া কত আনন্দ করিব। আজ বাঙালীর সেই আগমনী গান নেই—আগমনী গান আর শুনিতে পাওয়া যায় না। কত পরিবর্তন!

বোধনের দিন পল্লীর রমণীরা সমবেত কণ্ঠে গাহিত, ভিখারীরা বা গায়কের দল গাহিত :

এলো গিরিনন্দিনী,
ল'য়ে সুমঙ্গল ধ্বনি ঐ শোন রাণী।
চল, বরণ করিয়ে উমা আনি যেযে
কি কর পাষাণী রমণী!
অমনি উঠিয়ে পুলকিত হ'য়ে ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুণ্ডল, অঞ্চল লোটায় ধরণী॥
আঙিনার বাহিরে হেরিয়ে গৌরীরে,
দ্রুত কোলে নিল রাণী
অমিয়-বরষী, উমা-মুখ-শশী, চুম্বয়ে যেন চকোরিণী॥
গৌরী কোলে করি মেনকা সুন্দরী
ভবনে লইল ভবানী।
কমলাকান্তের পুলকে অন্তর, হেরি ও বিধুমুখখানি॥

সাধক কমলাকান্তের এই বোধন-সংগীত আর শোনা যায় না। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহে দুর্গা-মণ্ডপ থাকিত। দরিদ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের কুটীরে পূজামণ্ডপ ছিল—দুর্গোৎসবে লক্ষ্মীপূজায় শ্রীশ্রীশ্যামাপূজায় দোলপর্বে তাহা প্রতিমার আবির্ভাবে সমুজ্জ্বল ছিল—ঢাক ঢোল

ঘণ্টা কাঁসির রবে শানাই-এর সুরে সমগ্র পল্লীটি মুখরিত হইত। বালক বৃদ্ধ ধনী দরিদ্র সকলের মুখেই আনন্দের দীপ্তি। গীতবাদ্যে, নাম-গুণগানে, ভজন-সঙ্গীতে অনাবিল ভক্তির প্রবাহ বহিত। আর সেদিন নাই।

বোধনের দিন 'মা এসেছেন'—এইভাবে বিভোর হইয়া লোকে দাশরথির গান গাহিত; ভাবোন্মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণও গাহিয়াছেন সেই গান—

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী—
চাঁদের মেলা যেন চাঁদ সারি সারি॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী
আসবে কত দণ্ডী জটাজুটধারী॥
মেয়ে কোলে, মেয়ে দুটি রূপসী
লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী,
সুরেশ কুমার গণেশ আমার
তাদের না দেখিলে ঝরে নয়ন-বারি॥

আজ বোধনে সে গান আর শুনিতে পাওয়া যায় না—পূজামণ্ডপে। ঘরে ঘরে যে পূজা ছিল—তাহার সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। এখন পল্লীতে সার্বজনীন পূজা—গ্রামোফোন রেকর্ডে "লারে লাপ্পা" প্রভৃতি গান লাউড-স্পীকার মুখরিত করে। আবার চিন্ময়ী মাতৃপ্রতিমার আবরণ উন্মোচন হয় মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতৃবর্গের দ্বারা—মাতৃপূজার এই অদ্ভুত বোধন। হায় মা।

মা তো মৃন্ময়ী নন—চিন্ময়ী; জড় মাটির মূর্তি নয় যে, আমরা রাম শ্যাম সামান্য পর্দার আবরণ উন্মোচন করিয়া লোক-সমক্ষে মাকে প্রকাশ করিতে পারি! এতো একটা সাধারণ অনুষ্ঠান নয়। এর উন্মোচন হয় জগজ্জননীর কৃপায়; কোন সাধারণ মানুষের বক্তৃতায় মহামায়ার আবরণ উন্মোচিত হয় না! শ্রীশ্রীঠাকুর ভাববিভোর হইয়া গাহিতেন—

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে।
ব্রহ্মাবিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জানতে পারে॥

তাই জগন্মাতার কাছে আকুলভাবে চাহিতে হয়: মা—তোমার কুণ্ডলিত শক্তিকে জাগাও! জীবের ভাব আরোপ করিয়া ঠাকুর প্রেমবিগলিত হৃদয়ে মায়ের আবাহন করিতেন—

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী, তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিণী,
তুমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপিণী।
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী॥
ত্রিকোণে জ্বলে কৃশানু, তাপিত হইল তনু,
মূলাধার ত্যজ শিবে স্বয়ম্ভু-শিব-বেষ্টনী॥
গচ্ছ সুষুম্নার পথ, অধিষ্ঠানে হও উদিত,
মণিপুর-অনাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞা-সঞ্চারিণী।
শিরসি সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে,
ক্রীড়া কর কুতূহলে সচ্চিদানন্দ-দায়িনী॥

জগজ্জননী মাকে সরল ভক্তি-বিশ্বাসে বাংলার নরনারী আপনার "মা" করিয়াছিল—এই দুর্গোৎসবে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে। অতি দীন দরিদ্র মূর্খও মনে করে—আমার মা জগজ্জননী আসিতেছেন, স্নেহ-করুণার অমৃত-পীযূষধারা পান করাইতে। মাতৃভক্ত বাঙালী প্রতিমায় চিন্ময়ী মাকে সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দময়ী মায়ের স্নেহসুধা আস্বাদন করিত। পিতৃগৃহে কন্যা আসিলে জননীর যেমন আনন্দ হয়—বিশ্বজননীর প্রতিমায় বাংলার অন্তঃপুরচারিণীরা মা দুর্গাকে সেই ভাবে বরণ করিত। এইভাব অন্য প্রদেশে দুর্লভ—বিশেষতঃ দুর্গোৎসবে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে দুর্গোৎসবের সময় শ্রীশ্রীমা যখন হলুদ-গুদাম বাড়ীতে ছিলেন তখন আমি প্রায়ই শনি-রবিবার তথায় বাস করিতাম। 'কথামৃত'কার 'শ্রীম' সেই সময়ে আসিয়া থাকিতেন—শনিবার সন্ধ্যায় আসিয়া রবিবার সন্ধ্যায় চলিয়া যাইতেন। তিনি ও আমি প্রায়ই হলঘরে দ্বিতলে একসঙ্গে পাশাপাশি শয়ন করিতাম—তখন আমার

ছাত্রজীবন—এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। পূজার কয়দিন 'শ্রীম' মায়ের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। মহানবমীর সন্ধ্যায় আমরা দুইজনে বাগবাজারে প্রতিমা দর্শন করিতে একত্র বাহির হইলাম। বাগবাজারে গোঁসাই বাড়ীতে প্রতিমায় দুর্গাপূজা হইত—প্রথমে আমরা সেখানে গেলাম। 'শ্রীম' তন্ময় হইয়া প্রতিমা দর্শন করিয়া গুন্‌গুন্ স্বরে গাহিলেন।

বলরে শ্রীদুর্গা নাম—(ওরে আমার মন রে)
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে পথে চলে যায়।
শূল হস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়॥
তুমি দিবা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি সে যামিনী।
কখনও পুরুষ হও মা, কখন কামিনী॥ ইত্যাদি

অদূরে দাঁড়াইয়া গুন্‌গুন্ করিয়া 'শ্রীম' এই গান গাইতেছেন—আবার আমার দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, বাড়ীর মেয়েরা এসে মাকে কেমন অপলকদৃষ্টিতে দেখছেন, যেন মা—কত আপনার।" দুর্গোৎসবে আমরা বাঙালীরা মা'কে অতি আপনার করে ফেলেছি। প্রতিমা—মাটীর মূর্তি দেখি না—দেখি আমাদের "মা", এমন আপনার-করা ভাব আর কোথাও দেখতে পাই না।

'শ্রীম'র সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে তাহা বলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। দুর্গোৎসবের কয়েক দিন সাধু ও ভক্তরা শ্রীশ্রীমার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। মহাষ্টমীর দিন আমরা কয়েকজন মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি—প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় 'শ্রীম' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন গোলাপ-মা ত্রিতল হইতে ডাকিলেন, "এস ভক্তরা, মাকে দর্শন করবে এস।" আমরা একে একে পুষ্পাদি লইয়া তেতলায় মাকে দর্শন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিলাম; কিন্তু 'শ্রীম' দোতলায় বসিয়া রহিলেন—পুষ্পাঞ্জলি দিতে ও দর্শন করিতে গেলেন না; আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাষ্টার মশায়, আপনি দর্শন করিতে গেলেন না।" তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমার দর্শন হয়েছে"। আমি অবাকবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম "বাঃ! আপনি তো এই এলেন—কখন দর্শন করতে গেলেন?" তিনি মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন, "সিদ্ধেশ্বরীতলায়।" আমি উত্তর করিলাম, "মা তো কোথাও যান নি; আমি তো গত কাল থেকে এখানে আছি।" তিনি শুধু বলিলেন "আমার সেখানে দর্শন হয়েছে।" তাই বলিয়া শুধু গুন্‌গুন্ স্বরে গাহিতে লাগিলেন:

মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে।
ইহকালে পরকালে মা তারে আনন্দে রাখে॥
সদানন্দময়ী তারা, সদানন্দের মনোহরা
এই মিনতি করি মাগো, ওই রাঙা পায়ে মতি থাকে॥

'শ্রীম'র এই দর্শনের ঘটনাটি ছাত্রজীবনে মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল—বাস্তবিকই চিন্ময়ী রূপকে আমরা জড়রূপে ভাবিয়া থাকি। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার শ্রীকেশবচন্দ্রকে শ্রীদুর্গা-প্রতিমার কথায় বলিয়াছিলেন "কেশব, তোমরা প্রচার কর—ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, কিন্তু দুর্গা-প্রতিমা দেখে তোমাদের বাঁশ খড় মনে হয় কেন? সেখানে কেন চিন্ময়ী মাকে দেখ না?" বাস্তবিকই আমরা আধুনিকেরা দুর্গা-মূর্তির ধ্যান-অনুযায়ী মূর্তি গড়ি না—শিল্পকলার রুচি লইয়া আমরা দেবীকে মানবী আকারে পরিণত করিয়া মূর্তি গড়ি—কখনও কখনও কোন মূর্তি দেখিয়া মনে হয়—এ তো মায়ের দেবীমূর্তি নয়। পূজক যে ধ্যানমূর্তি সহায়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে—সেই ধ্যানের সঙ্গে প্রতিমার মিল নাই। শিল্প হিসাবে, আধুনিক কলা হিসাবে গঠিত মূর্তির নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য থাকিতে পারে—সেটা শিল্পীর কল্পনার সৃষ্টি—ঋষির ধ্যানমূর্তি নয়; পূজকের ধ্যানমূর্তি নয়। কিন্তু কালের ঘূর্ণিপাকে সেই ধ্যানী পূজকেরও অভাব; দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে

বক্তব্য, এই পূজাপার্বণে দেববিগ্রহে মূর্তি প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধমহাজন বা শাস্ত্রোক্ত ধ্যানানুযায়ী মূর্তি না হইলে পূজার কি অঙ্গহানি হয় না? ক্রমশঃ আমরা শিল্পের দোহাই দিয়া সাধনার ধ্যান-মূর্তি হইতে বিচ্যুত হইতেছি এবং পূজামণ্ডপে অধ্যাত্ম সাধনার পরিবর্তে বাহ্যকৌতুকের আড়ম্বরে মাতিয়া উঠিতেছি।

ভারতে মায়ের এই মাতৃমূর্তি স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা জোগাইয়াছে। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি জননী জন্মভূমির এই মাতৃমূর্তি শ্রীদুর্গা প্রতিমার ধ্যানে পর্যবসিত করিয়াছেন।

'ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্॥'

'কমলাকান্তের দপ্তরে' কমলাকান্তের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের অন্তরের কথাই বলিয়াছেন।

"এই কি মা? হাঁ—এই মা। চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি, এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা, এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্ন-মণ্ডিত দশভুজ দশদিকে প্রসারিত। তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত—পদাশ্রিত-বীরজন-কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব। দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ-প্রহারিণী শত্রুমর্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়—কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ। আমি সেই কালস্রোতে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।" আজ স্বাধীন ভারতে সার্বজনীন দুর্গামণ্ডপে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মায়ের পূজা বাংলার বালক যুবকদের দ্বারা কি রূপায়িত—প্রচারিত হইতে পারে না? কিন্তু এই সকল প্রেরণার মূল উৎস—ধর্ম। দেশাত্মবোধ, দেশপ্রেম, মানব-সেবা, আত্মোন্নতি, ঐক্য-বুদ্ধি ও উদারতা এই ধর্মের অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—"ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানব জাতির চরম সভ্যতা—ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছু উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছে—সমস্ত স্বীকার করিয়াছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানব-সভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হইবে।"

বাংলায় দুর্গোৎসব—বাঙালীর ধর্মের প্রেরণা—জাতীয়তায় প্রেরণা, আত্মজ্ঞানের চরম সাধনা! বাঙালীর রক্তমাংসে ইহার ভাব জড়াইয়া আছে। শবর প্রভৃতি বন্য জাতির উৎসব—ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার ভাবধারা ও উপাসনা—বাংলার সকল শ্রেণীর মানুষের সম্বন্ধ এই মহোৎসবে মহামায়ার পূজার অঙ্গীভূত—কেহ বাদ পড়ে নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে—প্রথম দুর্গোৎসব—প্রতিমায় পূজা করিয়া বাঙালীকে আধ্যাত্মিক জাতীয় উৎসবে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই প্রশান্ত ভাবতন্ময়তা—সেই আনন্দ-মূর্তি দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। ১৩৭১ সালের 'উদ্বোধন' শারদীয়া সংখ্যায় উহা প্রকাশিত।

আজ দুর্গোৎসবে আমাদের প্রধান সাধনা সকলকে পরমাত্মীয় ভ্রাতৃজ্ঞানে অকপটে ভালবাসা। আমরা সকলেই শ্রীশ্রীমহামায়ার সন্তান—শুধু—ইহা মুখের একটা কথার কথা নয়—দৃষ্টান্তদ্বারা—সেবায় ব্যবহারে বাস্তবে তাহা দেখাইতে হইবে। যুগ-পরিবর্তনে ভাবের পরিবর্তন আসিবেই—অতীত কখনও ফিরিয়া আসে না, কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যাহাতে গৌরবমণ্ডিত হয়, তাহা করিতে হইবে—ঐ শোন, স্বামিজীর মেঘগম্ভীর স্বরে উদাত্ত আহ্বান—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"!

'মহাবিদ্যা মহামায়া'

[চণ্ডীর কথকতা-অবলম্বনে]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ চরাচর কারণ-সলিলে নিমগ্ন হ'লে ভগবান বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। সেই সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমল হ'তে মধু ও কৈটভ নামে অতি ভীষণাকার ও ভয়ানক দুর্ধর্ষ দুটি দৈত্য উৎপন্ন হয়। অখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা চারিদিক জলময় দেখে সৃষ্টির বীজসম্ভার নিয়ে বিষ্ণুর নাভি-কমলে অবস্থান করছিলেন।

মধু ও কৈটভ ব্রহ্মাকে দর্শনমাত্রই দারুণ ক্রোধ-ভরে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। প্রজাপতি এই মহা বিপদে ভাবতে লাগলেন: জগৎপাতা জনার্দন যোগ-নিদ্রায় অভিভূত। সুতরাং এই বিষম সঙ্কটে কে তাঁকে পরিত্রাণ করবেন? তিনি নিহত হ'লে প্রলয়শেষে সৃষ্টির নবকল্পারম্ভই বা কে করবে? তা ছাড়া, মহামায়ার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের লীলাও যে ব্যাহত হয়ে যাবে;—তাই প্রজাপতি ভয়ানক শঙ্কিত ও বিচলিত হলেন।

বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মহামায়া যোগনিদ্রা নারায়ণের নয়ন-কমল আশ্রয় ক'রে রয়েছেন। সেই অতুলা তামসী শক্তির অমোঘ প্রভাবেই বিষ্ণুর এই যোগনিদ্রা। সুতরাং ব্রহ্মা তখন বিষ্ণুর জাগরণের জন্য ভগবতী যোগনিদ্রার আরাধনা আরম্ভ করলেন। প্রজাপতি ভক্তিবিনম্র-ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে সুললিত ছন্দোবদ্ধ বাক্যে দেবীর স্তুতি বন্দনা করতে লাগলেন:

'মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥'

হে দেবি, তুমি মহাবিদ্যা—মহাবাক্যলক্ষণা ব্রহ্ম-বিদ্যারূপা, আবার তুমিই মহামায়া—সংসৃতি-কারিণী মহা অবিদ্যাস্বরূপা। তুমি মহামেধা—মহতী স্মৃতিরূপা, আবার তুমিই মহা অস্মৃতি—মহতী ভ্রান্তি বিস্মৃতিস্বরূপা। তুমি মহামোহা—ব্যাপক অজ্ঞানরূপা। তুমি মহাদেবী—মহতী দেবশক্তি, আবার তুমিই মহা অসুরী—মহতী অসুরশক্তি।

ব্রহ্মার এই স্তবে অনন্ত মহিমময়ী মহামায়ার একই সঙ্গে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব পরিকীর্তিত হয়েছে। বস্তুতঃ তিনি একাধারে পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবরাশির এক অনবদ্য সমন্বয়-মূর্তি। রুদ্র-মধুরে, কোমল-কঠোরে সত্যই তিনি অনুপমা, অপরূপা।

নিঃস্ব সর্বহারা সুরথরাজা ও সমাধিবৈশ্য সংসারের দোষ দর্শন করেও তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন কেন—সংসার-স্থিতিকারী এই মায়া-মোহের কারণ অবগত হবার জন্য মহামুনি মেধসের শরণাপন্ন। সুরথ অগ্রণী হ'য়ে অতিশয় বিনীত ভাবে মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করলেন: জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা মূঢ়ের মত মায়া-মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছি। স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ ও রাজ্যাদি বিষয়ের দোষ দেখেও কেন এখনও আমাদের চিত্ত মমতাকৃষ্ট ও স্নেহাসক্ত?

মেধসমুনি তদুত্তরে তাঁদের বললেন: শাস্ত্র-জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মানুষ মহামায়ার প্রভাবে মোহ-গর্তে ও মায়ার আবর্তে পতিত হ'য়ে অহরহঃ হাবুডুবু খাচ্ছে। মহামায়া—তাঁর আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবেই জগতের সকল জীবকে মায়ায় আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন, এমনকি বিবেকিগণেরও চিত্তকে তিনি বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে মোহাবৃত করেন। এই মহামায়াই—তমঃপ্রধানা শক্তিই জগৎ-পাতা বিষ্ণুর যোগনিদ্রা; তাই তিনি তাঁকেও প্রলয়কালে মোহে আচ্ছন্ন করে রাখেন।

বন্ধন ও মুক্তি—উভয়েরই কর্ত্রী তিনি। তিনি

ইচ্ছাময়ী, লীলাময়ী। তিনিই অবিদ্যা-শক্তিরূপে বন্ধনকারিণী মহামায়া, আবার তিনিই বিদ্যা-শক্তি-রূপে মোক্ষদা বা মুক্তিদাত্রী, মহাবিদ্যা। তাঁর নিত্যলীলায় তিনি এই জগৎসংসার রচনা করেছেন এবং জগৎকে বিমুগ্ধ করে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের খেলা করছেন।

'সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥'

তিনিই সংসারমুক্তির হেতু—পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী, আবার তিনিই ঘোর সংসারবন্ধনের কারণ—মহা অবিদ্যা-রূপিণী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—'সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে,—অবিদ্যা, যা থেকে কামিনী-কাঞ্চন—মুগ্ধ করে। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম—ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়।'

আদ্যাশক্তি মহামায়াই সমস্ত জগতের মূলাধার। তিনি সনাতনী নিত্যা জগন্মূর্তি। এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ তিনিই ধারণ করেছেন। তিনি সর্বগতা এবং সর্বতোব্যাপ্তা হ'য়ে বিরাজ করছেন। তাঁর অস্তিত্ব বাদ দিয়ে চরাচর জগতের কোনও বস্তুরই পৃথক্ সত্তা নেই। বস্তুতঃ তিনি সর্বত্র এবং সর্বক্ষণ ওতপ্রোতভাবে বিরাজিতা। কিন্তু তথাপি তিনি দেবগণের কার্যসিদ্ধি ও বিশ্বজগতের পরি-পালনের নিমিত্ত মহাসঙ্কটময়কালে সমুৎপন্না হ'য়ে থাকেন।

মহামায়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এঁদেরও নিয়ন্ত্রী বা ঈশ্বরী। তিনিই এই নিখিল বিশ্বচরাচর সৃজন, পালন ও সংহার করেন।

'ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা ॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥'

একাধারে তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী। আমরা মায়েদের সন্তান প্রসব ও পালন-কার্য দেখে জগজ্জননীর সৃজন- ও পালন-লীলার কিঞ্চিৎ ধারণা করতে পারি। কিন্তু তাঁর সংহার-লীলার কথা ভাবতে গেলে স্বভাবতই আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। মাতা হ'য়ে তাঁর নিজের সৃষ্ট ও পালিত সন্তানকে তিনি কিরূপে সংহার বা বিনাশ করেন তা কল্পনাও করা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে জগন্মাতার সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের লীলা দিব্য নেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন—এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী-মূর্তি গঙ্গাগর্ভ হ'তে উত্থিতা হ'য়ে ধীরে ধীরে পঞ্চবটীতে আগমন করলেন। ক্রমে দেখলেন ঐ রমণী পূর্ণগর্ভা। পরে দেখলেন ঐ রমণী তাঁর সম্মুখেই এক অতি সুন্দর কুমার প্রসব ক'রে গভীর স্নেহে ঐ শিশুকে স্তন্যদান করছেন। পরক্ষণেই তিনি দেখলেন ঐ নারী কঠোর করালবদনা হ'য়ে ঐ শিশুকে গ্রাস ক'রে পুনরায় গঙ্গাগর্ভে প্রবিষ্টা হ'লেন।

মহামায়ার এই নিত্যলীলা গভীরভাবে অনুধ্যান করলে বোধ হয় যে, সৃজন পালন বা সংহরণ কোনটিতেই তিনি আসক্তা নন। তিনি মহামায়া, মহামোহা; কিন্তু তিনি নিজে কখনও মায়ামোহে বিমুগ্ধা নন। যেরূপ সর্প নিজ মুখের বিষ দ্বারা অন্যের জীবন বিনাশ করে, কিন্তু সে নিজের বিষে কখনও মরে না। মহামায়া অবলীলাক্রমে নিরন্তর তাঁর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার লীলা করছেন।

অসুররাজ শুম্ভ যখন মহামায়া চণ্ডিকাকে বলল—'তুমি বলেছিলে, যে তোমায় সংগ্রামে পরাজিত করবে, যে তোমার দর্প চূর্ণ করবে, যে তোমার তুল্য বলশালী, তুমি তাকেই তোমার পতিরূপে বরণ করবে। কিন্তু হে চণ্ডিকে, তুমি ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা প্রমুখ দেবশক্তি মাতৃকাগণের সাহায্যে সংগ্রাম করছ; তুমি তাদেরই সাহায্যে চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ প্রভৃতি প্রবল পরাক্রমশালী মহাসুরকে অগণিত সৈন্যসহ নিধন করেছ। হে দুর্গে, এতে তোমার

নিজের কৃতিত্ব কতখানি। তুমি অন্যের বল আশ্রয় ক'রে যুদ্ধ করছ।' সুতরাং তোমার গর্ব করা শোভা পায় না।

মহামায়া তখন শুম্ভকে বললেন—'রে দুষ্ট, রে মূঢ়, একমাত্র আমিই এ জগতে বিরাজিতা। আমা-ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেউ আমায় সাহায্য করার নেই। ব্রাহ্মী প্রমুখ এই অষ্টমাতৃকা আমারই বিভূতি, আমারই প্রকাশ, আমারই অভিন্নাশক্তি। এই দেখ্, তাঁরা এখনি সব আমাতে বিলীনা হ'য়ে যাচ্ছেন।' অতঃপর মহামায়া চণ্ডিকা ঐ মাতৃকাগণকে অবলীলাক্রমে নিজ মধ্যে সংহরণ বা বিলীন ক'রে নিলেন। তিনি তখন একাকিনীই রইলেন। যে সকল বিভূতি বা শক্তিকে তিনি বাহিরে বিস্তার ক'রে লীলা করছিলেন, তখন তিনি সে সকলকে অক্লেশে আত্মদেহে সংহরণ ক'রে নিলেন, গুটিয়ে নিলেন। সুতরাং এই 'সংহার' তাঁর অতি স্বাভাবিক লীলা।

শরণাগত ভক্তসন্তানগণের প্রতি প্রসন্না হ'য়ে তিনি বরদায়িনী হন, সর্বার্থসাধিকা হন; তখন তাঁরই বরে তাঁদের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং তাঁরা মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করেন। তাই দেবীর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য তাঁর অভয় চরণকমলে দেবগণের বারংবার কত কাতর প্রার্থনা, কত ব্যাকুল বিনতি—'হে দুঃখভয়হারিণী দেবি, তুমি প্রসন্না হও, হে অখিলবিশ্বজননি, তুমি প্রসন্না হও। হে দেবি, তুমি নিখিল বিশ্বচরাচরের অধীশ্বরী, তুমি বিশ্ব পরিপালন কর। হে বিশ্বার্তিহারিণী দেবি, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্না হও। হে ত্রিভুবনবাসিগণের চির-আরাধ্যা দেবি, তোমার চরণে প্রণত জনগণের প্রতি তুমি বরদা হও। হে জননি ভগবতি, তুমি প্রসন্না হও। হে ভক্ত-বৎসলে, তুমি প্রসন্না হও। হে দেবি, তুমি কৃপা কর।'

অসুরাধিপতি মহিষাসুরকে নিধন ক'রে মহামায়া দেবগণকে পরিত্রাণ করলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভরে দেবীর স্তব-বন্দনা করেন। সুরগণ দেবীর অপার-মহিমা-কীর্তন-প্রসঙ্গে স্তুতি করেন:

'কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥'

হে দেবি, তোমার পরাক্রমের তুলনা আর কার সঙ্গে হ'তে পারে! তোমার রূপ শত্রুগণের নিকট অতিশয় ভীতিকারী অথচ অমরগণের নিকট সুমনোহর। এমন আর কোথায় আছে? হে বরদে, চিত্তে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং সমরে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা, ত্রিভুবনে একমাত্র তোমাতেই দৃষ্ট হয়।

মহামায়া দুর্বৃত্তগণের শাস্তিবিধানে যেরূপ সক্রিয়া, আশ্রিতগণের কল্যাণসাধনে সেইরূপই যত্নশীলা। তাঁতে সৃষ্টি-স্থিতিকারিণী সৌম্যরূপ এবং সংহারকারিণী রুদ্ররূপ একই সঙ্গে বিরাজিত। এই জন্য তিনি সৌম্য হ'তেও সৌম্যতরা, আবার ভীষণ হ'তেও ভীষণতরা। তিনি যেমন শুভঙ্করী, তেমনই ভয়ঙ্করী। একদিকে তিনি বরাভয়করা, অন্যদিকে তিনি অসি-মুণ্ডধরা।

মহাবিদ্যা-রূপে তিনি অতি সৌম্যা সুমনোহরা, মহা-অবিদ্যা-রূপে তিনিই অতি রৌদ্রা সুভীষণা। বিদ্যাশক্তিতে পুণ্যবান্‌দিগের গৃহে তিনি লক্ষ্মী-স্বরূপা, অবিদ্যা শক্তিতে তিনিই পাপাত্মাগণের গৃহে অলক্ষ্মীরূপা। পরিতুষ্টা হ'লে তিনি সকলপ্রকার দৈহিক ও মানসিক রোগ দূর করেন। কিন্তু রুষ্টা হ'লে তিনি সকল অভীষ্ট বিনষ্ট করেন। বস্তুতঃ মানবগণকে সকল ঐহিক বিদ্যায়, প্রবৃত্তিপর ধর্মশাস্ত্র-সমূহে এবং নিবৃত্তিপর বেদান্তবাক্যসমূহে তিনিই প্রবর্তিত করেন। আবার গভীর অন্ধকাররূপ অজ্ঞান-আবর্তে ও মমতাপূর্ণ সংসার-গর্তে তিনিই পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করান। ভোগ এবং অপবর্গ, সংসার এবং মুক্তি—দুই-ই তাঁর ইচ্ছাধীন।

জননী বিরাটরূপিণী

স্বামী জীবানন্দ

সমষ্টির অস্তিত্ব ব্যষ্টির উপরেই নির্ভর করে। ব্যষ্টি নিয়েই সমষ্টি। একটি একটি মানুষ নিয়ে মানব-সমাজ। উচ্চ-নীচ, ধনী দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, সুন্দর-কুৎসিত, বালক-বৃদ্ধ সবই রয়েছে মানব-সমাজে। আকৃতি-প্রকৃতি বল-বুদ্ধি সাহস-বীর্য সবেতেই দেখা যায় কত পার্থক্য। নানা প্রকার বৃক্ষ নিয়ে বনানী। অগণিত ছোট বড় তরঙ্গের সমষ্টিই তো সমুদ্র। প্রকৃতির সর্বত্রই বৈচিত্র্য—রূপে নামে। বিচিত্রতার মূলে নাম ও রূপ। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও মহা ঐক্য আছে। সে ঐক্য স্বরূপের একত্ব। নাম ও রূপ বাদ দিয়ে যদি চিন্তা করা যায়, যা থাকে তাই আমাদের স্বরূপ—সৎ-চিৎ-আনন্দ। সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন:

ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না, সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না, আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে বা শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, যখন তিনি এই সব কার্য করেন তখন তাঁকে শক্তি বলি।

একই মহাশক্তি সর্বত্র স্থূল ও সূক্ষ্ম ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত হ'য়ে রয়েছেন। আমাদের শরীরে যেমন অসংখ্য জীবকোষ রয়েছে—সেইরূপ সমুদয় জীব ও জড় জগৎ বিরাজিত রয়েছে সেই বিরাটের শরীরে। যেখানে যত শক্তির প্রকাশ, যত শক্তির খেলা তিনি তার অধিষ্ঠাত্রী, সমষ্টিরূপিণী। প্রাণরূপে, বুদ্ধিরূপে, দয়া-প্রেমরূপে নানা ভাবে তিনি বিরাজিতা। দেশ-কাল-নিমিত্তরূপা মহাশক্তিই বিরাটরূপিণী জগজ্জননী।

সকলের মধ্যে আছেন জগন্মাতা, তা হ'লে সকলের সেবাই জগজ্জননীর সেবা। তাই সর্বভূতের—সর্বপ্রাণীর সেবাই বিরাটরূপিণী জননীর উপাসনা।

প্রকৃতিতে বিবিধ উপচারে নানা সৌন্দর্য-সম্ভারে—রূপে রসে রঙে, ছন্দে গানে—অপরূপভাবে তাঁর পূজা চলেছে। চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র, আকাশ বাতাস, নদ-নদী বৃক্ষলতা—সকলেই এই বিরাটরূপিণী মহামায়ার উপাসক। আলোয় জলে ফুলে ফলে এই উপাসনা।

সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ এই পূজা করবে কি ভাবে? প্রধানতঃ তার পূজা হবে মানুষেরই সেবার মধ্য দিয়ে। আমাদের চারদিকে রয়েছে দারিদ্র্যপীড়িত অজ্ঞ, দুঃস্থ, রোগগ্রস্ত, গৃহহীন নিরন্ন মানুষ—তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাদের সেবাকে মহামায়ারই পূজারূপে ভাবনা করতে হবে।

বিরাটরূপিণী জননীর পূজা ভাবের পূজা। এই পূজা বাহিরের পঞ্চ বা ষোড়শোপচারে নয়—আন্তর উপচারে এই উপাসনা। সবই উৎসর্গীকৃত হবে অন্তরে, অন্তরেরই গুণসম্ভারে। ভাবরূপ পুষ্পের অঞ্জলি; এই পুষ্পগুলি: অমায়, অনহংকার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য, অলোভ; আরও পাঁচটি মহা-পুষ্প—অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞান। আসল

পুষ্প চিত্ত—সেটি মায়ের চরণে উৎসর্গ করতে হবে; সন্তান যে জন্ম হ'তেই 'মায়ের জন্ম বলিপ্রদত্ত'!

যখন আমরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে জনসেবার মাধ্যমে জননীর উপাসনায় ব্রতী হব তখন যেন অনাসক্ত হ'য়ে কর্তব্য সম্পাদন করতে পারি; আসক্তিই আনে বন্ধন; তাই অহংকার, রাগ, দ্বেষ, মাৎসর্য ও লোভশূন্য হ'য়ে আমরা করব সকলের সেবা—বিরাটরূপিণীর উপাসনা। হয়তো সফলতা দেখা যাবে না অনেক সময়, তবু চিত্তে ক্ষোভ যেন না আসে। পীড়নে অনিচ্ছা, সংযম, করুণা ও ক্ষমা—আমাদের পাথেয়। প্রকৃত সেবার ভাব নিয়ে যিনি কর্ম করবেন তিনিই বলতে পারবেন: 'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্'—তিনি লাভে অলাভে, জয়ে পরাজয়ে সমভাব—তাঁর সকল কর্মই উপাসনা। জনসাধারণের দারিদ্র্য-নিবারণ, অজ্ঞতা-দূরীকরণ, রোগপরিচর্যা প্রভৃতির মাধ্যমে জগজ্জননীর ঠিক ঠিক উপাসনা অত্যন্ত কঠিন।

মহামায়ার বিরাট রূপকেই হৃদয়ে সতত ধ্যান করেন মাতৃসাধক। বিশ্বজগৎ জুড়ে তাঁর পূজার উপচার: আকাশ তাঁর বস্ত্র, প্রাণবায়ু ধূপ, বিশ্বের সমস্ত তেজ তাঁর আরতির প্রদীপ, যাবতীয় শব্দ তাঁর স্তুতিগান,—তিনি মৃন্ময়ী অধিষ্ঠানে কি ভাবে আবির্ভূতা হ'তে পারেন—সত্যই অচিন্তনীয়। মহামায়ার সঙ্গে সকলের এবং সবকিছুরই নিত্য সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধবলেই জগৎ 'অস্তি'রূপে প্রতীত হয়, তাই যাঁর বাহিরে কিছুই নেই এবং যিনি ছাড়া আর কিছু নেই, তাঁর যে কোন আধারেই পূজা হ'তে পারে। আধারে উপাসনার নাম প্রতীকোপাসনা! প্রতীক অর্থে অবয়ব—যিনি সর্বব্যাপক তাঁর একটি অংশকে অবলম্বন ক'রে সাধক অচিন্ত্য অব্যক্ত ভাবের সন্ধান পান। তাই মৃন্ময়ী, পাষাণময়ী, দারুময়ী মূর্তিতেও চিন্ময়ীভাবে পূজিতা হ'য়ে জগজ্জননী সন্তানের উপর কৃপা বর্ষণ করেন। যুগে যুগে মাতৃসাধকগণ 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্'কে মনোজগতে যে যে রূপে ধরতে পেরেছেন সেই সব রূপই পরবর্তী সাধকদের আরাধ্য দেবতা। মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী, দশ মহাবিদ্যা, নবদুর্গা প্রভৃতি আদ্যাশক্তি মহামায়ারই বিশেষ বিশেষ রূপ। আবার মহামায়া যখন মানবীরূপে লীলায় অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর চরণাশ্রয়ে অগণিত নরনারী দুঃখের পারে চলে যায়।

শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে মা ছাড়া আর কি আছে? সকল আশায়, সকল চেষ্টায়, সকল কর্মে—সাফল্যে ও ব্যর্থতায় মায়েরই খেলা! মাকে চিন্তা করতে পারলে ভাবনার কিছুই থাকে না। মা-ই সন্তানের একমাত্র ভরসা। মায়া থেকে মুক্তিলাভ মানুষের পরম পুরুষার্থ—মাকে আশ্রয় করতে পারলেই তা সম্ভব হয়। কেনোপনিষদে আছে, দেবতারা একে একে যখন পরব্রহ্মের সম্মুখীন হ'য়ে, তাঁকে চিনতে অসমর্থ হ'য়ে ফিরে এলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন ব্রহ্মময়ী মহামায়া—বহুশোভমানা হৈমবতী উমারূপে; ইনিই তাঁকে চিনিয়ে দিলেন যে, বিচিত্র রহস্যময় 'যক্ষ'—যিনি তাঁদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করেছেন তিনিই ব্রহ্ম। মাতৃরূপে তিনি যখন মায়ার আবরণ উন্মোচন করেন তখনই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। চিন্ময়ীশক্তি সকল প্রাণীর মধ্যে থেকে তাদের যেমন চালাচ্ছেন তারা সেই রকম চলছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না কার হাতের ক্রীড়নক তারা—অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে! ফুটন্ত জলে আলু-পটলের মত লাফাচ্ছে—অহংকারে বিমূঢ়চিত্ত হ'য়ে নিজেদের কর্তা ও ভোক্তা ব'লে মনে করছে। আলু-পটলের লাফানোর কারণ যেমন অগ্নির শক্তি, সেইরূপ সকল ক্রিয়াশীলতার অন্তরালে অচিন্ত্য মহাশক্তি। গুণাতীতা মহামায়া যখন গুণময়ী হ'য়ে ব্যষ্টিরূপে সাধকের নিকট আবির্ভূত হন, তখন সাধক নিজের অন্তরে বাহিরে সর্বত্র তাঁর বিরাট ভাবটি উপলব্ধি ক'রে পরম জ্ঞান ও পরম আনন্দ লাভ করেন। 'তস্মাৎ পরৈব জননী সমুপাসনীয়া'।

শ্রীশ্রীসারদামণিদেবীর স্বরূপরহস্য

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন :

'দাস তোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে'

পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দ লিখিয়াছেন : 'শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে ? ঐশ্বর্যের লেশ নাই। একি মহাশক্তি। জয় মা। জয় মা !! জয় শক্তিময়ী মা !!!'

পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ প্রণাম-মন্ত্রে বলিতেছেন :

'যথাগ্নের্দাহিকা-শক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্॥'

—যেরূপ অগ্নির দাহিকা-শক্তি সেইরূপ রামকৃষ্ণে স্থিতা সর্ববিদ্যাস্বরূপা যে সারদা তাঁহাকে প্রণাম করি।

পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দ স্তব করিয়াছেন :

'প্রকৃতিং পরমাম্ অভয়াং বরদাম্'

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন :

"ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।"

"ও জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী, ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।"

এই সকল উক্তির মধ্য দিয়া অজ্ঞানান্ধ জীব আমরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর স্বরূপ সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত পাই। শ্রীশ্রীমাও বিভিন্ন সময়ে ভক্তদের নিকট নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা ভাবে বলিয়াছেন। শিবুদাকে বলিয়াছিলেন, 'লোকে বলে কালী'। স্বামী তন্ময়ানন্দকে বলিয়াছিলেন, "আমি আর কে? আমিও ভগবতী"।

* * *

শ্রীশ্রীমার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রধান ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক ষোড়শীরূপে পূজিতা হওয়া। বহু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সাধক-জীবনের উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন এই পূজার দ্বারা। সাধনার ফল, জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীর পাদপদ্মে চিরকালের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন "মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল।"

পূর্বোল্লিখিত উদ্ধৃতি-সকলের মধ্য দিয়া আমরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী যে জগন্মাতার মানববিগ্রহ—তাহা ধারণা করিতে পারি। তাঁহার জীবনে যে সকল লোকোত্তর সদ্‌গুণাবলীর প্রকাশ দেখি তাহা হইতে ইহা বেশ বুঝা যায় যে তাঁহার 'জন্মকর্ম' দিব্যভাবানুষঙ্গী। 'ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ'—তাঁহার জীবনের প্রভাতরলদ্যুতি এই মর-জগতের ধূলি-মলিনতা-সমুদ্ভূত নয়। শ্রীশ্রীমার জীবনের এই রহস্য বুঝিতে হইলে তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

তন্ত্র বলেন, এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের মূলে আছেন মহাশক্তি মহামায়া।

চণ্ডীতেও ব্রহ্মা স্তুতি করিতেছেন :

দেবি, তুমিই এই সমস্ত ধারণ করিয়া আছ, তুমিই এই জগৎ সৃষ্টি কর, তুমিই ইহা পালন কর এবং সর্বদা প্রলয়কালে তুমিই ইহা সংহার কর।

দেবী ভাগবতেও কথিত হইয়াছে :

শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেঽখিলম্।
ইচ্ছয়া সংহরত্যেষা জগদেতচ্চরাচরম্॥

—শক্তিই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তিনি অখিলকে পালন করেন এবং ইনিই ইচ্ছাদ্বারা এই চরাচর জগৎ সংহরণ করেন।

এই যে শক্তির ধারণা—এটি তন্ত্রের ধারণা। তন্ত্র বলেন, এই জগৎ এক মহাশক্তির প্রকাশ।

কিন্তু এই শক্তি কে? এই প্রশ্নই সুরথ রাজা মেধা ঋষিকে করিয়াছিলেন :

'ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ॥'

—ভগবন্, যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? মুনিবর, তিনি কিরূপে উৎপন্না হন এবং তাঁহার কার্যই বা কি?

ইহার উত্তরে মেধা মুনি বলিতেছেন: 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।'—সেই মহামায়া নিত্যা এবং বিশ্বরূপা, তাঁহার দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত।

এই দৃষ্টিই তন্ত্রের বিশেষ দৃষ্টি। বেদান্তের মায়ার ন্যায় এই মহামায়া জ্ঞানবাধিতা নন—তিনি নিত্যা; শিবতত্ত্ব আর শক্তিতত্ত্ব নিত্যযুক্ত; শক্তি শিবের সহিত সম্মত-সমবায়িনী।

তন্ত্রের মতে শক্তির কৃপা-ব্যতিরেকে মুক্তি সম্ভব নয়। চণ্ডীতেও এই কথাই বলা হইয়াছে। 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'—তিনি প্রসন্না ও বরদা হইয়া মানবের মুক্তির কারণ হন। ভাস্কর রায় বলিয়াছেন "ন চ—মোচনস্য শিবকার্যত্বাৎ কথং তত্র দেব্যাঃ কর্তৃত্বম্?—ইতি বাচ্যম্, মোচকত্ব-শক্তিমন্তরেণ শিবস্য তদ্‌যোগেন মোচকর্তৃতায়া অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং শক্তাবেব স্বীকর্তুং যুক্তত্বাৎ"—মুক্তি শিবের কার্য বলিয়া সেই বিষয়ে দেবীর কর্তৃত্ব কেন হইবে, ইহা বলা ঠিক নয়; মোচকত্বরূপ শক্তি না থাকিলে শিবের উহা থাকিতে পারে না বলিয়া অন্বয়-ব্যতিরেক ন্যায়ানুসারে শক্তির মোচনকর্তৃত্ব স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। সেইজন্যই চণ্ডীতে বলা হইয়াছে 'সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী'—তিনিই মুক্তির কারণস্বরূপা সনাতনী পরমা বিদ্যা।

এই যে সনাতনী বিদ্যা তিনি নিত্যা হইলেও তাঁহার বহুপ্রকারের সমুৎপত্তির কথা শ্রবণ করা যায়। তাই চণ্ডীতে বলা হইয়াছে:

দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

যখন তিনি দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য আবির্ভূতা হন, নিত্যা হইলেও তখন তিনি পৃথিবীতে উৎপন্না হইলেন—এইরূপে অভিহিতা হন।

অবতারগণের সহিত তাঁহাদের লীলাসঙ্গিনী শক্তির আবির্ভাব যুগে যুগে ঘটিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতার, শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধিকার, শ্রীবুদ্ধের সহিত যশোধরার, শ্রীচৈতন্যের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার আবির্ভাব সেই মহাশক্তিরই অবতরণ। লীলা-সঙ্গিনীদের আবির্ভাব-ব্যতিরেকে অবতারদিগের লীলা সার্থকতা ও পরিপুষ্টি লাভ করিত না।

এই দৃষ্টি শাস্ত্রবহির্ভূত নয়। লিঙ্গপুরাণে পাই:

শঙ্করঃ পুরুষাঃ সর্বে স্ত্রিয়ঃ সর্বা মহেশ্বরী।
পুংলিঙ্গশব্দবাচ্যা যে তে চ রুদ্রা প্রকীর্তিতাঃ॥
স্ত্রীলিঙ্গশব্দবাচ্যা যাঃ সর্বা গৌর্যা বিভূতয়ঃ।
এবং স্ত্রীপুরুষাঃ প্রোক্তাস্তয়োরেব বিভূতয়ঃ॥

—সকল পুরুষই শঙ্কর এবং সকল স্ত্রীই মহেশ্বরী। পুংলিঙ্গ শব্দবাচ্য যাঁহারা, তাঁহারা রুদ্র। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দবাচ্য সব কিছুই গৌরীর বিভূতি। এইরূপে স্ত্রীপুরুষ সকলেই মহেশ্বর মহেশ্বরীরই বিভূতি।

এইরূপে জগতের সব কিছু শঙ্কর-শঙ্করীর প্রকাশ হইলেও এই প্রকাশের তারতম্য আছে। এই তারতম্যকে অবলম্বন করিয়াই অবতার এবং সাধারণ জীবের প্রভেদ।

কিন্তু এই তারতম্য যে কেবলমাত্র আধিভৌতিক ক্ষেত্রে আছে তাহা নয়—অধ্যাত্মভূমিকাতেও এই প্রকাশ-তারতম্যের কথা শাস্ত্রে দেখা যায়। কালী, তারা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ভেদে শক্তির বহু রূপ শাস্ত্রে উক্ত আছে। ইঁহারা সকলেই পরাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি। কিন্তু শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শী-বিদ্যা শক্তিদেবতার মধ্যে মুখ্যা বা প্রকৃতিস্বরূপা।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে 'ত্রিশতী' নামক স্তবে বলা হইয়াছে: 'মোক্ষৈকহেতুবিদ্যা তু শ্রীবিদ্যা নাত্র সংশয়ঃ', মোক্ষের একমাত্র কারণ শ্রীবিদ্যা,—ইহাতে কোন সংশয় নাই। বামকেশ্বরতন্ত্রেও কথিত হইয়াছে:

ত্রিপুরা পরমা শক্তিরাদ্যা জ্ঞানাদিতঃ প্রিয়ে।
স্থূলসূক্ষ্মবিভেদেন ত্রৈলোক্যোৎপত্তি-মাতৃকা॥

হে প্রিয়ে, ত্রিপুরা অর্থাৎ শ্রীবিদ্যা পরমাশক্তি। ইনি জ্ঞানের অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের আদি বলিয়া আদ্যা। ইনি স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের উৎপত্তির জনয়িত্রী।

পরশুরামকল্পসূত্রে বলা হইয়াছে, "ইয়মেব মহতী বিদ্যা সিংহাসনেশ্বরী সম্রাজ্ঞী"—ইনি শ্রেষ্ঠা বিদ্যা, পরশিব তাঁহার অধিষ্ঠান-ভূমি, ইনি সম্রাজ্ঞী অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ন্ত্রী। তাঁহার প্রধান সচিব শ্যামা অর্থাৎ কালী। কালী-সাধনা সমাপন করিয়া শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শীর উপাসনার বিধান কল্পসূত্রে দেওয়া হইয়াছে। কারণ—'প্রধানদ্বারা রাজপ্রসাদনং হি ন্যায্যম্'—প্রধান রাজপুরুষকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার দ্বারা রাজার প্রসন্নতা সম্পাদন করাই ন্যায়সঙ্গত।

কল্পসূত্রের এই দৃষ্টিতে যদি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্র-সাধনা আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণও কালী-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ষোড়শী-পূজা করিয়া তাঁহার সাধকজীবনের উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার দেহ-মনের উপাশ্রয়ে এই পূজা করা হইয়াছিল তিনি হইতেছেন শ্রীশ্রীসারদাদেবী। সুতরাং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মধ্যে যে শক্তির নিবাস তিনি যে শ্রীবিদ্যা—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অবতার-বরিষ্ঠের লীলাসঙ্গিনীর দেহ ও মনকে আশ্রয় করিয়া যে শক্তির অবতরণ ঘটিয়াছিল তিনি 'মহতী বিদ্যা, সিংহাসনেশ্বরী, সম্রাজ্ঞী'। জগতের ধূলিমলিনতার মধ্যে শক্তির এত বিরাট অবতরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর ঘটে নাই।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে যে তাহা হইলে শ্রীশ্রীমাকে কখনও কালী, কখনও বগলা, কখনও সরস্বতী কেন বলা হইতেছে! ইহা কি সকল মাতৃশক্তিই পরমার্থতঃ এক বলিয়া? না, তাহা নয়। আদ্যা-শক্তি ত্রিপুরা জ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়াময়ী। তাঁহার ত্রিকূট-মন্ত্রেও তিনটি তত্ত্ব আছে—বাগ্‌ভবকূট, শক্তিকূট ও কামরাজকূট। এই বাগ্‌ভবকূটই সরস্বতী, কামরাজকূট কালী এবং শক্তিকূট বগলা। ত্রিকূট-মন্ত্রের অধীশ্বরী দেবী ষোড়শীর—এই সকল দেবতাই অংশ বা বিভূতি। সুতরাং শ্রীসারদাদেবী এই ষোড়শীর মানববিগ্রহ বলিয়া তাঁহাকে কালী, সরস্বতী, বগলা, পরমাপ্রকৃতি প্রভৃতি সকল নামেই অভিহিত করা যায়।

আচার্যপ্রবর শঙ্কর অদ্বৈতমতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠসমূহে শ্রীচক্র স্থাপন এবং শ্রীবিদ্যার উপাসনা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। বিশ্ব-জননীর কৃপা-ব্যতিরেকে জ্ঞান বা মুক্তি সম্ভব নয় বলিয়াই বোধহয় তিনি ইহা করিয়াছিলেন। কাঞ্চীপুরের কামাক্ষীদেবীর মন্দিরেও শ্রীচক্রস্থাপন—শঙ্করাচার্য করিয়াছিলেন। এই দেবী পুরী-সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা। শ্রীরামকৃষ্ণও পুরী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। কাজেই তাঁহার ষোড়শীপূজা এই দিক হইতেও সমীচীন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের ও পুরী-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সৌভাগ্যবশতঃ দেবী ষোড়শী এই সময়ে মানব-দেহাবলম্বনে প্রত্যক্ষভাবে পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহুদিন স্বহস্তে এই সঙ্ঘকে পরিচালিত করিয়াছিলেন ভারতের ও জগতের কল্যাণে।

এই আলোচনা হইতে আমাদের এই ধারণা দৃঢ় হইবে, শ্রীসারদামণিদেবী নামে যে মানবকন্যা এই জগতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক ষোড়শীরূপে পূজিতা হইয়াছিলেন, তিনি স্বরূপেও এই ষোড়শীদেবীই ছিলেন। অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে এই স্বরূপতত্ত্ব সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ফলহারিণী কালীপূজার দিন প্রতিমায় কালীপূজা না করিয়া অষ্টাদশবর্ষীয়া মানবীর দেহাবলম্বনে ষোড়শীপূজা করিয়াছিলেন।

যে বিরাট শক্তির অবতরণ শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে অবলম্বন করিয়া ঘটিয়াছে সেই শক্তির সম্বন্ধে আনন্দ-লহরীর একটি শ্লোকের অবতারণা করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি :

তনীয়াংসং পাংশুং তব চরণপঙ্কেরুহভবম্
বিরিঞ্চিঃ সঞ্চিন্বন্ বিরচয়তি লোকানবিকলম্।
বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহস্রেণ শিরসাং
হরঃ সংক্ষুদ্যৈনং ভজতি ভসিতোদ্ধূলনবিধিম্॥

জননি, ব্রহ্মা তোমার চরণপদ্মের অল্পমাত্র ধূলি লইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সেই জগৎকে সহস্র শিরের দ্বারা বিষ্ণু অনন্তরূপে কোনপ্রকারে বহন করিতেছেন, আর প্রলয়-সময়ে এই জগৎকে চূর্ণ করিয়া শিব ভস্মধারণবিধিতে বিভূতি লেপন করিতেছেন।

রাণী রাসমণি

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

গরীব ঘরের গোপন মণি, কাঁটার কেয়া, মরুর ফুল,
গুণে স্বয়ং সরস্বতী, রূপে লক্ষ্মী সমতুল।
নতুন যুগের সত্যবতী, ব'লেই তোমায় আজ গণি,
বাঙালী আর বাংলা দেশের গরব তুমি রাসমণি।
আনুগত্যের দাসখতেতে নাম-লোভীরা এক কালে,
হ'ত যেমন 'রাজা, রাণী, রাজাধিরাজ' ফাঁকতালে,
তেমন রাণী হওনি তুমি, মান নহে সে—অসম্মান,
কর্ম তোমায় রাণী নামের সার্থকতা করল দান।

"অর্থ সকল অনর্থ মূল"—এই বাণী যে সত্য নয়,
প্রমাণিত করল তাহা তোমার দান ও কীর্তিচয়।
'ব্যবহারের দোষে গুণে ভালমন্দ'; তাই তোমার
'অর্থ' পরমার্থ-লাভের সহায় হ'ল বারংবার।
নিঃস্ব ও দীন কৃষাণ-মেয়ে, বিশ্বভরা তোমার দান
কালের দাবি ব্যর্থ ক'রে সগৌরবে বর্তমান
ঐ রয়েছে গঙ্গাতীরে মহাকালীর শ্রীমন্দির
পুণ্যকামীর বন্ধুসম বিন্ধ্যসম উচ্চশির।

উদয়-গিরির আড়াল হ'তে সূর্যসম শুভঙ্কর
উঠ্‌ল জেগে সেথান থেকে জ্ঞান-ভকতির যে ভাস্কর,
দীপ্তি তাহার উজল ক'রে তুল্‌ল সারা বিশ্ব-ধাম,
পুণ্য রামকৃষ্ণ-লীলার গোড়ায় লেখা তোমার নাম।
নরদেবের চরণধূলি পড়ল তোমার আঙিনায়,
সংশয়ীদের ভুল ভাঙিল পরিজ্ঞানের পূর্ণিমায়।
ভেদবাদীরা দেখ্‌ল চেয়ে 'গড়-ভগবান্' ভিন্ন নয়,
সকল পথের, সকল মতের ঘটল শুভ সমন্বয়।

"জীবের মাঝে শিব বিরাজে" এ বিশ্বাসে তোমার মন
পূর্ণ ছিল কানায় কানায়,—মগ্ন ছিল অনুক্ষণ।
কাশী যেতে পথ দিয়ে তাই শুনলে যখন অকস্মাৎ
বাংলাদেশে অন্নহীনের দীন-দুখীদের আর্তনাদ,
বিশ্বনাথের পূজার কড়ি নিঃস্ব-হিতে করলে দান,
বিপন্নেরা শান্তি পেল নিরন্নেরা অন্নপান।
কাশী যেতে আর হ'ল না,—কাশীশ্বরীর কি নির্দেশ!
সেই তো এল তোমার কাছে, তীর্থ হ'ল বাংলাদেশ!

দশের হিতে ন্যায়ের পথে করলে কত রণোদ্যম,
দেখ্‌ল সেদিন জগদ্বাসী বঙ্গনারীর কি বিক্রম!
ভয় কারে কয় জানতে না তো, জয়ে বাধা হয়নি তাই,
জানতে শুধু "সত্যই শিব,"—সত্য যা তার ধ্বংস নাই।
হোক না স্বয়ং লাটবাহাদুর থাক না যতই শক্তি তাঁর
অধিকারে বাদ সাধিতে পারতো না যে কেউ তোমার।
শক্ত তোমার যুক্তি-বিচার পারতো না কেউ খণ্ডাতে,
ন্যায়ের দাবি আদায় ক'রে নিতে কড়ায় গণ্ডাতে।

অত্যাচার জানতে না তাই সইতে নাগো অত্যাচার,
অধীনতার সেই যুগেও স্বাধীন ছিলে সত্যিকার।
রাণী নামের দায়িত্ব কি, ভোলনি তা' ক্ষণ-তরে,
পরোপকার পরপ্রীতি ঢেউ খেলিত অন্তরে।
মরেও তুমি তাই মরোনি, রাণীর মতই গৌরবে
সকল ধরা আকুল ক'রে জয়-মহিমার সৌরভে
বেঁচে আছ আজও ভবে,—কীর্তিমতীর মৃত্যু নাই;
লক্ষ কোটি মানব-মনের মাঝখানে তাই তোমার ঠাঁই।



রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

স্বামী তেজসানন্দ

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এই সেই প্রাচীন ভূমি, অন্যান্য দেশে যাইবার পূর্বেই ব্রহ্মবিদ্যা যে-দেশকে নিজ প্রিয় বাসভূমিরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন; এই সেই ভারতবর্ষ, যাহার আধ্যাত্মিক প্রবাহ জড়রাজ্যে সাগরসদৃশ প্রবহমান স্রোতস্বতীসমূহের তুল্য, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া তুষারশিখররাজিদ্বারা যেন স্বর্গরাজ্যের রহস্য-নিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। এই সেই ভারত, যে ভারত-ভূমির মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ ঋষি-মুনিগণের চরণরজে পবিত্র হইয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল, এখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং জগৎপ্রপঞ্চে ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব! ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শ সকল এখানেই চরম পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতেই আবার তদ্রূপ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে।"

ভারতের এই সমুন্নত সাংস্কৃতিক জীবন একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। অশ্রুত ও অদৃশ্য নৈশ-শিশির-সম্পাতে রাশি রাশি গোলাপ-কলি যেমন অলক্ষিতে প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি যুগে যুগে মহামানবগণের অক্লান্ত নীরব সাধনা ভারতের এই আধ্যাত্মিক, তথা সাংস্কৃতিক জীবনকে বিকশিত ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগের আর্য-ঋষিকণ্ঠে বহুত্বের মধ্যে যে একত্বের বাণী একদিন ধ্বনিত হইয়াছিল, জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ যে নৈতিক ধর্মকে জীবনের মুক্তিমন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, রামায়ণ-মহাভারতীয় যুগের শৌর্য-বীর্য-গাথা ও গীতার সমন্বয়বাদ যে সনাতন ধর্মকে ভারতের প্রাণকেন্দ্র বলিয়া প্রচার করিয়াছে, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগের মর্মস্পর্শী-কাহিনীর মাধ্যমে বেদান্তের যে জটিলতত্ত্ব সহজ সরলভাবে নানারূপে, নানাছন্দে পরিবেশিত হইয়া সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল,—তাহাই ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনকে অতুলসম্পদে ভূষিত করিয়া আজও শত বিপ্লব ও বিপর্যয়ের মধ্যে বিশ্বের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্ভব, আদর্শ ও অবদান পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়,—এই ভারত-সংস্কৃতিই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মূল উৎস ও প্রকৃত প্রাণ। ভারতীয় সংস্কৃতির এক সঙ্কট-মুহূর্তে যুগ-যুগ-সঞ্চিত এই অমূল্য আধ্যাত্মিক ভাবসমূহই—ঊনবিংশ-শতাব্দীর শেষে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘাকারে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল।

নিয়ত-পরিবর্তনশীল ভাগ্যচক্রের বিবর্তনে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের রাষ্ট্র-গগনে এক বিপদ-মেঘ সহসা আবির্ভূত হয়। প্রতীচ্য সভ্যতার অগ্রদূত ইংরেজ বণিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতে প্রবেশলাভপূর্বক অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হিন্দু ও মুসলমান রাজন্যবর্গকে ছলে বলে কৌশলে পরাজিত করিয়া একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিল। রাজনীতিক্ষেত্রে বিদেশী শক্তির নিকট এই পরাভব ভারতের কৃষ্টি-জগতেও এক যুগান্তর-কারী বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। বুদ্ধিমান ইংরেজ বুঝিয়াছিল ভারতের ন্যায় এক সুপ্রাচীন বিরাট জাতিকে কেবল বাহুবলে চিরদিন বশীভূত করিয়া রাখা সম্ভব নহে; স্বামী প্রভুত্ব স্থাপনের

জন্য প্রয়োজন হইবে তাহার অন্তর্জগতে কৃষ্টিগত আমূল পরিবর্তন-সাধন। তাই প্রতীচ্যের প্রকৃত বিজয়-অভিযান আরম্ভ হইল এক অভিনব পন্থায়। একদিকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রবর্তিত হইল প্রতীচ্য শিক্ষা, অপরদিকে শুরু হইল খ্রীষ্টান ধর্ম-যাজকগণকর্তৃক সমাজ-সেবকবেশে খ্রীষ্ট-ধর্মের অবাধ প্রচার। যুক্তিবাদী পাশ্চাত্ত্যের আপাতরমণীয় বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও শিক্ষায় বিভ্রান্ত হইয়া অনেকেই আচার-ব্যবহার, খাওয়া দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি ও চাল-চলনে প্রতীচ্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং ইহাও ভাবিতে শিখিলেন—এতদিন তাহারা যে ভারতীয় ধর্ম ও শাস্ত্র রত্ন-পেটিকার মত সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা পরস্পরবিরোধী মতবাদে পূর্ণ, অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বাগাড়ম্বর মাত্র। যদি তাহাই না হইবে তবে এত বড় একটা দেশ ক্ষুদ্র একটি বিদেশী শক্তির নিকট এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিবে কেন? এই বিভ্রান্তিকর প্রবল চিন্তাপ্রবাহ সমাজ-সৌধের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়া ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির অস্তিত্বকেও বিপন্ন করিয়া তুলিল। কিন্তু প্রতীচ্য জড়-সভ্যতা যতই প্রভাবশালী হউক না কেন, ভারতবাসীর আন্তর জগৎ জয় করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। প্রবল আততায়ীর কবলে পতিত হইয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে দুর্বল ব্যক্তিও যেমন আত্মরক্ষার্থে গর্জিয়া উঠে, ভারত-প্রতিভা তেমনি মর্ম-স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পরাক্রান্ত বিদেশী সভ্যতাস্বীকৃতির ভাবী বিষময় পরিণাম চিন্তা করিয়া জীবন-মরণের এই মৌন সন্ধিক্ষণে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বিদেশীয় রাজশক্তির নির্যাতন ও নিষ্পেষণ, শোষণ ও তোষণনীতি এবং ভারতীয় সমাজ-দেহে প্রতীচ্যকৃষ্টির অলক্ষ্য অনুপ্রবেশ মোহ-গ্রস্ত মৃতপ্রায় জাতির আত্মরক্ষণ-শক্তিকে সহসা প্রবুদ্ধ করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল, যাহার ফলস্বরূপ দেখিতে পাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ও শেষভাগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তিনটি প্রবল ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্ভব। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ভারতীয় নেতা ও সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা মহানগরীতে 'ব্রাহ্ম-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে বোম্বাই শহরে 'আর্য-সমাজ' এবং উক্ত বৎসরই ম্যাডাম এইচ. পি. ব্লাভাটসকে ও কর্ণেল অল্‌কটের প্রচেষ্টায়—প্রথমে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে এবং পরে ভারতবর্ষের মাদ্রাজ নগরীতে 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এই আন্দোলন-ত্রয়ের প্রত্যেকটি হিন্দুধর্মের মৌলিক ভাবধারার বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব পদ্ধতি অনুসারে উহাকে রূপায়িত করিয়া বিদেশীয় প্রভাব হইতে ভারতবাসীকে মুক্ত করিতে চেষ্টিত হইল। ইহার ফলও কতকটা ফলিল। যাহারা পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই ধর্মান্দোলনপ্রসূত নবীন মতবাদসমূহের মধ্যে স্ব স্ব আত্মিক ক্ষুধা মিটাইবার সামগ্রীর সন্ধান পাইয়া প্রতীচ্য হইতে প্রাচ্যের প্রতি পুনঃ মুখ ফিরাইলেন। অবাধ পাশ্চাত্ত্য ভাবের স্রোতে এইরূপে একটা প্রবল বাধার সৃষ্টি হইল।

কিন্তু সমাজ-সংস্কারমূলক এই ধর্মীয় আন্দোলন-সকল একদেশী ও একাঙ্গী হওয়ায় ইহাদের কোনটিই জনসাধারণের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল না; কারণ হিন্দুধর্মমত-সমূহের মধ্যে যে মূলগত ঐক্য বিদ্যমান এবং অধিকারি-ভেদে যে বিবিধ ধর্মেরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নবধর্ম-প্রবর্তকগণ হিন্দুধর্মের সারভূত বহুলাংশকে নিষ্প্রয়োজন ও অন্ধকুসংস্কারবোধে পরিহার করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে সনাতনপন্থী হিন্দুমাত্রেই নবীন মতবাদ

ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি কোনপ্রকারেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। এই কারণে, যে মহদুদ্দেশ্য লইয়া এই সকল ধর্মীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সাফল্যলাভ করিতে না পারায় ইহারা স্ব স্ব ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গেল।

সঙ্ঘ-স্রষ্টা

ইহা অনস্বীকার্য যে, হিন্দুধর্মের সর্বজনীনতা ও ঔদার্যসত্ত্বেও যুগ-যুগ-সঞ্চিত বিবিধ অপ্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধ ইহার অঙ্গীভূত হইয়া সনাতন ধর্মের কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। তথাপি বৈদেশিক চিন্তাধারার আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে হইলে যে এই সকল অনাবশ্যক নিয়ম ও অনুষ্ঠানাদির বহুলাংশে সময়োপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্জন প্রয়োজন, তৎপ্রতি সনাতনপন্থী গোঁড়া হিন্দুসমাজ দৃক্‌পাত না করিয়া গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়া ধীর মন্থর গতিতেই পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। হিন্দুসমাজের এই অপরিবর্তনশীল মনোবৃত্তিই তাহাদের ধর্ম ও কৃষ্টির প্রগতিমূলক সংস্কারের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। সময়ের আহ্বানে সাড়া দিতে না পারিলে ধূমায়মান আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ-বহ্নি যে একদিন সহসা প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র সমাজ-সৌধকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারে, তদ্বিষয়ে গোঁড়া সমাজ-নায়কগণ তখনও সচেতন হইয়া উঠিতে পারেন নাই। একদিকে রাজশক্তির সহায়তায় ধর্ম- ও কৃষ্টি-জগতে প্রতীচ্যের প্রবল আক্রমণের ফলে ভারতীয় হিন্দুসমাজের নিপীড়িত অনুন্নত ও অস্পৃশ্য জাতির ব্যাপক ধর্মান্তর-গ্রহণ, অপরদিকে একদেশী ধর্মীয় আন্দোলনসমূহের নগ্ন ব্যর্থতা। এই সঙ্কট-মুহূর্তে ভারত-রঙ্গমঞ্চে এমন একটি আন্দোলনের প্রয়োজন হইল—যাহা সনাতন-পন্থীর রক্ষণশীলতা ও সংস্কারবাদীর প্রগতিশীলতার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে। কারণ হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে না পারিলে এবং যুগপ্রয়োজনে যেখানে যতখানি পরিবর্তন ও পরিবর্জন প্রয়োজন তাহা না করিলে পূর্ববর্তী একাঙ্গী আন্দোলনত্রয়ের ন্যায়ই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

এই সন্ধিক্ষণে যুগপ্রয়োজন-সিদ্ধিকল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের আবির্ভাব ভারত-তথা মানবেতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি হুগলী জিলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর নামক এক অখ্যাত পল্লীতে এক দরিদ্র নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁহার জন্ম; কলিকাতার উপকণ্ঠে পবিত্র ভাগীরথী-তীরে দক্ষিণেশ্বর-তপোবনে তাঁহার সুদীর্ঘ কঠোর সাধনা ও সিদ্ধি—আজ কাহারও অবিদিত নাই। এমন ধর্ম নাই যাহা তিনি সাধন করেন নাই, এবং এমন সত্য নাই যাহা তিনি উপলব্ধি করেন নাই। তিনি তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির সাহায্যে আত্মবিস্মৃত ভারত-বাসীকে দেখাইলেন যে, ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টি একটা অলীক বা পরস্পরবিরোধী, কুসংস্কারপূর্ণ কল্পনা নহে। অনন্ত শক্তি ও সম্ভাবনা উহাতে নিহিত রহিয়াছে—যাহা ভারতের পুনরুত্থান ও মুক্তির কারণ হইবে, এবং বিশ্ববাসীকে প্রকৃত শান্তির সন্ধান দিবে। তাঁহার জীবনে সমগ্র মানব-জাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবেদনকল্পে গাহিয়াছেন :

> "বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
> ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা ;
> তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
> নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে !
> দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি—
> সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।"

যুগযুগান্ত ধরিয়া বিভিন্ন দেশের সাধকবৃন্দ যে সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন,

শ্রীরামকৃষ্ণে তাহা মিলিত হইয়া তাঁহার জীবনকে এক মহান পুণ্যতীর্থে পরিণত করিয়াছে, যাহার স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন করিযা শ্রান্ত ক্লান্ত মানব-মন শাশ্বত আনন্দ ও শান্তির অধিকারী হইবে। তিনি এমন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে আরূঢ় হইয়াছিলেন, যেখান হইতে তিনি সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রদর্শন করিতে পারিতেন। তিনি সর্বধর্মের সমন্বয় সাধন করিয়া বলিলেন—যে-পথ দিযাই তত্ত্বের সন্ধানে অগ্রসর হউক না কেন, পরিণামে সাধক চরম লক্ষ্যেই পৌঁছিবে। *তিনি বলিলেন, "দেশ-কাল-পাত্র* ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি ক'রে একটা মত আশ্রয় কল্লে, তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়।" "সকলেই তাঁকে ডাকছে। দ্বেষাদ্বেষির দরকার নাই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস সে সাকারই চিন্তা করুক, যার নিরাকারে বিশ্বাস সে নিরাকারই চিন্তা করুক। আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের ভুল,—এই মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatism) ভাল নয়।" "হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন।"

হিন্দুধর্মের মর্মবাণী—সমন্বয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই কথাই বলিয়াছেন :

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ (৪।১১)

—যে যে-ভাবেই আমাকে ভজনা করুক, আমি সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দিয়া থাকি; বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইলেও অন্তিমে সকলে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'শিব-মহিম্নঃ স্তোত্রে'ও এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই, "রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব" ॥৭॥—নদীসমূহ ঋজু-কুটিল নানা গতি অবলম্বন করিয়া যেমন অবশেষে মহাসমুদ্রে মিলিত হয়, মনুষ্যসকল রুচির বৈচিত্র্যহেতু নানা মত নানা পথ অবলম্বন করিলেও অবশেষে অনন্ত-সাগর-সদৃশ পরমাত্মারূপী শ্রীভগবানকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে এই মহাসত্যই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই ধর্মসমন্বয় বিভিন্ন ধর্মের শুষ্ক সারসংগ্রহ বা একটা সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাস নহে। *তিনি কঠোর সাধনার মাধ্যমে সকল ধর্মের* সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তাই তিনি আদর্শ-বাদী হইয়াও বাস্তববাদী এবং তজ্জন্যই তাঁহার বাণী সনাতনপন্থী ও প্রগতিবাদী সকলেরই মর্ম স্পর্শ করিয়া তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সচেতন করিযা তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি সমস্যাসমাকুল ভারতের দুর্দিনে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত,—সকল দার্শনিক মতের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিযা বিভ্রান্ত ভারতবাসীকে আত্মস্থ ও কেন্দ্রস্থ করিযা তুলিলেন। তাঁহার আহ্বানে বৈষ্ণব, শাক্ত, তান্ত্রিক, বৈদান্তিক, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রীষ্টান, পারসিক ও মুসলমান—সকলে এক নবীন আলোকের সন্ধান পাইয়া স্ব স্ব ধর্মে আরও অধিক আস্থাবান্ অথচ অপর ধর্মের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিল। দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে লক্ষ্য করিযা ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলিযাছেন: Sri Ramakrishna was the consummation of two thousand years of the spiritual life of three hundred million people; a great symphony composed of thousand voices and thousand faiths of mankind.—ত্রিশকোটি মানবের দ্বিসহস্রব্যাপী গভীর আধ্যাত্মিক সাধনার চরম পরিণতিস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন সহস্র

সুরের একটি সমন্বিত ঐকতান, যেখানে মানব জাতির সহস্র ধর্ম ও মতবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। ব তঃ গভীর আধ্যাত্মিকতা ও উদার সর্বজনীনতার একত্র সমাবেশ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে যেরূপ সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর অন্য কোথাও তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। তাই তাঁহার সাধনা ভারতের তথা জগতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন: The story of Ramakrishna Paramahansa's life is a story of religion in practice. His life enables us to see God face to face. · ··"শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত ধর্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধির একটি প্রকৃষ্ট ইতিহাস। তাঁহার জীবন আমাদিগকে ভগবানের সাক্ষাৎকার করিতে সহায়তা করে। তিনি দিব্য ভাবের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহার বাণী শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উক্তি নহে—উহা স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রসূত জীবনবেদ। এই অবিশ্বাসের যুগে, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন্ত বিশ্বাসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যাহা সহস্র সহস্র নরনারীকে আজ পরম শান্তি ও সান্ত্বনা দিতেছে—অন্যথা তাহারা কখনও আধ্যাত্মিক আলোকের সন্ধান পাইত না।"

সঙ্ঘের সূচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সর্বধর্মের মিলন-ও সমন্বয়-ভূমি। তাঁহার অক্লান্ত সুদীর্ঘ সাধনায় ভারতের যে সুপ্ত আধ্যাত্ম-চেতনা প্রবুদ্ধ হইয়াছিল তাহাই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘাকারে অচিরে রূপায়িত হইয়া উঠিল। এই সঙ্ঘগঠনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের মিলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত দত্ত-পরিবারে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি অলোকসামান্য মেধা ও মনীষা লইয়া নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরীর সযত্ন তত্ত্বাবধানে নরেন্দ্রনাথ ক্রমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন, কিন্তু ইওরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া তিনি কতকটা সংশয়বাদী (sceptic) হইয়া উঠিলেন! বিধাতার এক নিগূঢ় প্রেরণায় ঊনবিংশ শতাব্দীর এক শুভক্ষণে ভারতের এই দুইটি উজ্জ্বল প্রতিভা দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপীঠে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। একদিকে প্রাচ্য কৃষ্টির মূর্তবিগ্রহ—নিরক্ষর, নিরভিমান সিদ্ধসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ; অপরদিকে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাদৃপ্ত প্রতীচ্যের প্রতীকসদৃশ সংশয়বাদী নরেন্দ্রনাথ,—যেন কর্মচঞ্চল বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য আজ শান্ত সমাহিত অধ্যাত্মজ্ঞানগম্ভীর প্রাচ্যের সম্মুখে যুগসমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান। আগ্রহ-ব্যাকুলিত চিত্তে নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" ধীর অকম্প্রকণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "হাঁ, তাঁকে দেখেছি, যেমন তোমাকে দেখছি,—তার চেয়েও স্পষ্টতর ভাবে। তাঁকে উপলব্ধি করা যায়, দেখা যায় এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি। কে তাঁকে জানতে চায়?" স্মরণাতীত কাল হইতে মানব মনে এই একই প্রশ্ন কতবার জাগিয়াছে; আবার কতবার তাহার সমাধানও হইয়াছে। ভারতের ঋষিকণ্ঠে সুদূর অতীতেও এই একই সিদ্ধান্ত ধ্বনিত হইয়াছিল—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বা-ঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽনায়॥" শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৩।৮॥ অধ্যাত্মিকতার জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যস্পর্শে ও শিক্ষায় নরেন্দ্রনাথ ক্রমে আস্তিক ও শান্ত হইয়া উঠিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুইটি চিন্তাধারা শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের যুগ্মজীবনে মিলিত হইয়া যে মহাশক্তি-সঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছিল, বলা বাহুল্য, তাহা মানবের অপার শান্তি ও কল্যাণের স্থায়ী উৎস হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মহাপ্রস্থানের কিছুকাল পূর্ব হইতেই দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুর উদ্যান বাটীতে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন নির্মলচরিত্র ভক্তিমান তেজস্বী যুবককে ভারতের সর্বোচ্চ সনাতন আদর্শ ত্যাগব্রতে দীক্ষিত করিয়া নানাভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন ভোগবাদমুখর যুগে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে এমন একটি সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের প্রয়োজন যাহা "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায চ"—এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। কাশীপুর উদ্যানে অন্তিম শয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে সমীপে ডাকাইয়া অন্যান্য যুবক শিষ্যগণ সম্বন্ধে বলিলেন, "আমি ইহাদের ভার তোমার উপর অর্পণ করিতেছি।" এই বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। তাহাদের আত্যভিমান দূরীকরণার্থে তাহাদিগকে একদিন জাতিনির্বিশেষে সকলের দ্বারে-দ্বারে 'মাধুকরী' ভিক্ষা করিতে পাঠাইলেন এবং অপর একদিন এই সকল চিহ্নিত অন্তরঙ্গ শিষ্যগণকে ত্যাগের জ্বলন্ত প্রতীক গৈরিক বসন দিলেন। প্রকারান্তরে সকলকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ংই নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কাশীপুর উদ্যানে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সূত্রপাত করিলেন।

বেদান্তের বিজয়-অভিযান

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-সংবরণ করিলে সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ সম্যক্‌ভাবে গড়িয়া তুলিবার গুরু দায়িত্ব নরেন্দ্রনাথের উপর অর্পিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের অত্যল্পকাল মধ্যে বরাহনগরে এক জীর্ণ ভাড়াটিয়া গৃহে উক্ত বৎসরই অনাড়ম্বর ভাবে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম মঠ স্থাপিত হইল এবং নরেন্দ্রনাথ তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য, উৎসাহ, বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রবল আকর্ষণী শক্তিদ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের কৌমারবৈরাগ্যবান শিষ্যবৃন্দের প্রায় সকলকেই এই নবপ্রতিষ্ঠিত মঠে সঙ্ঘজীবন যাপনোদ্দেশ্যে একত্র করিলেন। অতঃপর বরাহনগর-মঠেই কোন এক সময় ত্যাগী যুবকগণ আনুষ্ঠানিক ভাবে আচার্য-শঙ্কর-প্রবর্তিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়োচিত নাম ও গৈরিকবস্ত্র ধারণ করিলেন এবং তীব্র বৈরাগ্য, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, পূজা, ধ্যান, জপ ও স্বাধ্যায়াদির সহায়ে সকলে স্ব স্ব আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে যত্নপর হইলেন।

এতৎকালীন দুই একটি ঘটনা সঙ্ঘের তথা ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তরকারী পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল—(১) সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) উত্তরাখণ্ডের পবিত্র প্রাচীন তীর্থ হৃষীকেশ হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে কঠোর তপস্যাদি করিয়া পরিব্রাজক-জীবনযাপনের অভিপ্রায়ে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত দুই বৎসরের অধিককাল একাকী ভ্রমণ করিলেন। শত গ্রন্থাগারের পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াও যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হয় না, এই পরিভ্রমণকালে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-পেরিয়া সকলের সঙ্গে সমভাবে মিলিত হইয়া তিনি ভারতের মর্মবাণী ও অখণ্ডতা, অন্তরের আকুতি ও বেদনা, অভাব-অভিযোগের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করিলেন এবং পরপদ-দলিত মৃতকল্প নিঃসহায় ভারতবাসীর মুক্তি-মন্ত্রেরও সন্ধান পাইলেন। (২) অতঃপর, পশ্চিমভারত ভ্রমণ-কালে তিনি শুনিতে পাইলেন আমেরিকার শিকাগো শহরে এক বিরাট ধর্মমহাসভার আয়োজন হইতেছে এবং বিশ্বের সকল ধর্মের প্রতিনিধি সেই সভায় স্ব স্ব ধর্মালোচনার জন্য আহূত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, হিন্দুধর্মের পক্ষে এই ধর্মসভায় প্রতিনিধিস্বরূপ কাহাকেও পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ অন্তরে অনুভব করিলেন তদীয় গুরু-দেবের মহতী ইচ্ছা পূরণের জন্যই এই রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইতেছে। মাদ্রাজের কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত

উৎসাহী যুবক স্বামীজীর উদারতা, ত্যাগ, গভীর পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া অর্থ-সংগ্রহপূর্বক হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহাকেই আমেরিকায় প্রেরণ করিতে চাহিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তিনি ১৮৯৩ সালের ৩১শে মে বোম্বাই হইতে আমেরিকা যাত্রা করিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো শহরে সেই ধর্মমহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়। সমুদয় পাশ্চাত্ত্য খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী সভ্যজাতি পূর্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে, এই মহাসভায় খ্রীষ্টধর্মেরই বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে এবং অন্যান্য ধর্মের অসারতা চিরকালের জন্য প্রমাণিত হইবে। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ! গুরুবলে বলীয়ান এবং আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদে গরীয়ান বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের উদার গম্ভীর তত্ত্ব বিশ্বসভায় দিনের পর দিন বিশ্লেষণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে তিনি বেদান্তের সার্বভৌমত্ব উদ্ঘাটন করিয়া বলিলেন, "যদি কখনও এক সর্ববাদিসম্মত ধর্মের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে তাহা কখনও দেশ-কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইবে না; যে অনন্ত ভগবানের বিষয় উপদেশ করিবে সে তদ্রূপ অনন্তই হইবে; সেই ধর্মসূর্য কৃষ্ণ-ভক্ত বা খ্রীষ্ট-ভক্ত, সাধু বা অসাধু সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে; সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান ধর্ম হইবে না; পরন্তু সকলের সমষ্টিস্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির অনন্ত পথ উন্মুক্ত থাকিবে; সেই ধর্ম এতদূর সার্বভৌম হইবে যে, তাহা অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে।····· সেই ধর্ম এইরূপ হইবে যে, উহাতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না, প্রত্যেক নরনারীকে দেবস্বভাব বলিয়া স্বীকার করিবে এবং উহার সমুদয় শক্তি সমস্ত মনুষ্যজাতিকে স্ব স্ব দেবস্বভাবোপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্য সতত নিযুক্ত থাকিবে।" স্বামীজী ২৭শে সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার শেষ অধিবেশনে বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; কিংবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্য ধর্মের সারভাগ ভিতরে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষাপূর্বক নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্ধিত হইবে। যদি এই সর্বধর্ম-মহাসম্মেলন জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তবে তাহা এই: সুন্দরভাবে ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মের সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মেই অতি মহানুভব উদারচরিত্র নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণসত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ কল্পনা করে যে, অন্যান্য ধর্মের বিনাশ হইয়া তাহার ধর্মই অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকিবে, তবে সে বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাহার জন্য আমি বড়ই দুঃখিত; আমি তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, তাহার ন্যায় লোকেরা বাধা দিলেও অনতিবিলম্বে প্রতি ধর্মের পতাকার উপর ইহাই লিখিত থাকিবে—'বিবাদ করিও না, পরস্পর সহায়তা কর; বিনাশের চেষ্টা না করিয়া পরস্পরের ভাব গ্রহণ করিয়া ধারণা কর; কলহ ছাড়িয়া মৈত্রী ও শান্তি আশ্রয় কর।"

ধর্মমহাসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে বেদান্ত-ধর্মের অত্যুদার আদর্শ পরিবেশন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ আজ শুধু বিশ্ববরেণ্য হইলেন তাহা নহে, ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টিকে তিনি গৌরবাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিলেন। কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, কপর্দকশূন্য ভিক্ষাজীবী এক হিন্দু যুবক-সন্ন্যাসী পরাধীন ভারতের উপেক্ষিত সনাতন হিন্দুধর্মকে সর্বধর্মের পুরোভাগে এইভাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে। স্বামীজী মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন

ভারতের প্রাণপুরুষ তদীয় আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ আশীর্বাদেই সুদূর পাশ্চাত্যের ধর্মমহাসভায় তাঁহাকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করিয়াছে। তিনি কৃতজ্ঞতা-ভরা অন্তরে দেশবাসীকে জানাইলেন এই অসামান্য সাফল্য ভারতকৃষ্টিরই সাফল্য এবং এই বিপুল গৌরব ও সম্মান তাঁহার স্বদেশবাসিগণেরই প্রাপ্য, তাঁহার নিজের নহে। স্বামীজীর এই প্রতীচ্য-বিজয়কে অভিনন্দিত করিয়া পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ লিখিযাছেন, "যে শক্তিমান মহাপুরুষ পৃথিবী আলোড়ন করিয়া উহার সংস্কার সাধন করিতে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক নির্ধারিত, সেই স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য-বিজয়াভিযান ভারতের কেবল নবজাগরণ নহে, পরন্তু পুনরভ্যুদয় এবং বিশ্ববিজয়েরও প্রথম প্রত্যক্ষ নিদর্শন।"

বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা

১৮৯২ সালে বরাহনগর হইতে মঠ আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়। প্রতীচ্যখণ্ডে বেদান্তধর্মের বীজ বপন করিয়া ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অচিরে নূতন মঠে গুরুভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইলেন। তিনি ঐ বৎসরই ১লা মে রামকৃষ্ণ-দেবের সন্ন্যাসী ও গৃহী-শিষ্যগণকে একত্র করিযা তাঁহাদের সমবেত সাহায্যে 'রামকৃষ্ণমিশন' নাম দিয়া একটি প্রচার-সমিতি গঠন করিলেন—যাহার প্রধান উদ্দেশ্য—(১) সকল ধর্মকে একই সনাতন ধর্মের বিকাশ মনে করিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা; (২) উন্নতচরিত্র কর্মী তৈরী করা, যাহারা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া জনসাধারণের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানকল্পে আত্মোৎসর্গ করিবে; (৩) ভারতের শিল্প, সাহিত্য, ললিতকলাদির উন্নতি ও বিস্তারসাধন করা; (৪) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বজনীন শিক্ষার আলোকে জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মের প্রকৃত আদর্শ প্রচার করা; (৫) এবং জাতিধর্মনির্বিচারে নরনারায়ণজ্ঞানে আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বহুকাল-পোষিত এই পরিকল্পনা গুরুভ্রাতৃ-গণের সহায়তায় রূপায়িত করিযা তুলিতে পারিয়া বিশেষ স্বস্তিবোধ করিলেন এবং সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দ ও স্বামীজীর ইচ্ছাকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশ মনে করিয়া উৎসাহের সহিত বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইযা পড়িলেন।

১৮৯৭ সালের ১২ই জুন প্রবল ভূমিকম্পে আলমবাজার মঠ নিরতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে বেলুড় গ্রামে (বর্তমান বেলুড়মঠের দক্ষিণদিকে) ৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ মনোরম উদ্যানবাটীতে ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মঠ পুনরায় স্থানান্তরিত হয়। এই স্থানেই সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীও কিছুকাল অবস্থান করিয়া পঞ্চতপাদি কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করেন। তাঁহার অবস্থিতি, তপস্যা, অপূর্ব অনুভূতি ও দর্শনাদি ঐ উদ্যানবাটীকে পবিত্র ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। স্থায়িভাবে নিজস্ব ভূমিতে মঠস্থাপনের উদ্দেশ্যে স্বামীজী উক্ত সালের ৫ই মার্চ ইংরেজ ভক্তমহিলা মিস হেনরিযেটা মুলার এবং মার্কিন ভক্তমহিলা মিসেস ওলি বুলের অর্থসাহায্যে (৩৯০০০৲ মুদ্রায়) যেখানে বর্তমান বেলুড় মঠ বিদ্যমান, সেই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের কিয়দংশ ক্রয় করিয়া নূতন মঠ নির্মাণ-কার্যে তৎপর হইলেন। নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হইলে ১৮৯৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর স্বামীজী ৺নীলাম্বর মুখার্জীর উদ্যান-বাটী হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি ও অস্থি প্রভৃতি স্বয়ং শিরে বহন করিয়া এই নবনির্মিত মঠে প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বামীজীর বহুকালের ইচ্ছা আজ পূর্ণ হইল। ১৮৯৯ সালের ২রা জানুয়ারি হইতে ইহাই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের স্থায়ী প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইল। ১৯০১ সালে Trust Deed (অর্পিনামা)















[illegible]

সম্পাদিত হইলে পূর্ব-প্রবর্তিত প্রচার-সমিতির সমগ্র কার্যভার বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ট্রাষ্টিগণই (Board of Trustees) সাময়িকভাবে গ্রহণ করিলেন।

ইতোমধ্যে অত্যধিক পরিশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের স্বাস্থ্য দিন দিনই ভাঙিয়া পড়িতেছিল। চিকিৎসকগণের নির্দেশে স্বামীজী স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে ১৮৯৯ খৃঃ ২০শে জুন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা করিলেন এবং তত্রত্য পূর্বারব্ধ কার্যসকল পর্যবেক্ষণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৯০০ খৃঃ ৯ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ইহার পর হইতে তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্য আরও দ্রুত অবনতির দিকে চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই শুক্রবার তিনি সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মহাসমাধিযোগে লীলা-সংবরণ করিলেন। এই আকস্মিক তিরোধানে সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দ অত্যন্ত মর্মাহত হইলেও দিশাহারা হইলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বে বিপুল উদ্যমে সঙ্ঘের কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় সঙ্ঘশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই সর্বত্র বিস্তৃতিলাভ করিল। অতঃপর প্রচার-বিভাগের কার্যকলাপ আরও শৃঙ্খলার সহিত নির্বাহের উদ্দেশ্যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় আইনের ১৮৬০।২১ ধারা অনুসারে তাঁহারা সঙ্ঘের প্রচার-বিভাগকে রামকৃষ্ণ মিশন নামে রেজেষ্ট্রি করাইলেন। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘেরই দুইটি দিক। ইহাদের উভয়ের মধ্যে আইনগত পার্থক্য থাকিলেও আদর্শ হিসাবে মূলতঃ ঐক্যই রহিয়াছে। মিশনের কার্যনিয়ন্ত্রণ সংসদ্ (Governing Body) বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণ (Board of Trustees) দ্বারাই সংগঠিত; উহার কর্মী প্রধানতঃ রামকৃষ্ণ-মঠেরই সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং বেলুড়মঠই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্মিলিত প্রধান কেন্দ্র। ১৯২২ খৃঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের পর হইতে ক্রমান্বয়ে স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ এবং স্বামী বিরজানন্দ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পদে বৃত হইয়া দেশ-বিদেশে বিভিন্ন মঠ ও মিশনের কেন্দ্রস্থাপন, বেদান্তধর্মের বহুল প্রচার ও বিবিধ জনহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া সঙ্ঘের প্রভূত বিস্তারসাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সঙ্ঘনায়ক স্বামী শংকরানন্দ পূর্ববর্তি-গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ১৯৫১ খৃঃ হইতে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের আদর্শ ও প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।*

* রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ (পোঃ বেলুড়মঠ) কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের ইংরেজী পুস্তক 'Ramakrishna Movement . Its Ideal and Activities' অবলম্বনে লিখিত।

টানো আমায় তোমার পানে

শ্রীরবি গুপ্ত

এনেছি আজ অরুণ-রাঙা তোমার দুটি চরণতলে
হৃদয়খানি, আলো তোমার চিরজ্যোতির পরশ-পলে।
লবো তোমার পাবক-বাণী
সকল তিমির বাধায় হানি',
দীপ্ত তোমার স্বপ্নখানি মূর্ত করো জীবন-দলে।

নীরব আমার বীণাখানি এবার লহ আপন হাতে,
ঝংকারো সুর মুখর যাহা তোমার মানসলিলীন প্রান্তে।
টানো আমায় তোমার পানে
পূর্ণ করো তোমার গানে,
জীবন-নদীর অবাধ ধারা যেন তোমার দিশায় চলে।

স্বাধীনতা-শতাব্দী ও বিবেকানন্দ-যুগ

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

১৮৫৭-৫৯ সালে প্রায় দুটো বছরের বিপ্লবে যেন এক যুগ-প্রলয় হ'য়ে গেল, গঙ্গা ও যমুনার অববাহিকা প্রদেশগুলিতে রক্তের স্রোত ব'য়ে গেল; শাদায় কালোয় সেখানে ভেদ নেই—রক্তের রঙ সমান লাল! কিন্তু প্রতিহিংসায় কালো হ'য়ে উঠল মিউটিনির ইতিহাস? স্বাধীনতার জন্য যারা লড়েছে তাদের—কালা বিদ্রোহীদের দেহ কামানের মুখে বেঁধে সাদা সৈনিকরা ছিন্নভিন্ন করল; একজন রুশ শিল্পী স্বচক্ষে দেখে ছবি এঁকেছিলেন।

অহিংসার ঋত্বিক্ মহাত্মা গান্ধী জন্মালেন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, এবং আগের দশকে (১৮৫৮-৫৯) জন্মেছিলেন কয়েকটি ভারত মাতার সন্তান,—যাঁদের আজ স্মরণ করা উচিত: জগদীশচন্দ্র বসু ও বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮), রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র (১৮৬১), নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩)—যাঁদের প্রতি গান্ধিজীর গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

১৮৯৩ খৃঃ গান্ধিজী যখন ভেসে চলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, সেই বছরেই বিবেকানন্দ সিংহল চীন অতিক্রম ক'রে জাপান দেখে পৌঁছলেন আমেরিকায়, এবং ৩॥ বছর পাশ্চাত্ত্য দেশে কাটিয়ে দেশে ফেরেন—জানুয়ারি ১৮৯৭, প্রায় সেই সময়েই গান্ধিজীও আফ্রিকা থেকে কলকাতা আসেন। স্বামীজী আবার জুন, ১৮৯৯ খৃঃ বেরিয়ে ১॥ বছর ধরে ইওরোপ আমেরিকা—শেষ বার পরিদর্শন ক'রে ফেরেন মার্চ, ১৯০১; সে সময় গান্ধীজী কলকাতা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের শোচনীয় অবস্থা বিষয়ে প্রস্তাব তোলেন এবং পদব্রজে বেলুড় গিয়ে স্বামীজীর সাক্ষাৎলাভের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর অসুস্থতা বা অনুপস্থিতির জন্য দেখা হয়নি। ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই স্বামীজীর দেহত্যাগ—বুওর যুদ্ধের শেষে ও রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রারম্ভে।

সেই সঙ্কটের যুগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে বসেছেন, আর "নৈবেদ্য" রচনায় মগ্ন,—"হিংসার সমাপ্তি অপঘাতে"—যেন আগুনের অক্ষরে লেখা; এটি 'Sun-set of the Century' নামে ইংরেজী গদ্যে রূপান্তরিত ক'রে কবি তাঁর 'Nationalism' (১৯১৫) গ্রন্থে ছেপে বিশ্ব-যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান; তখন গান্ধিজী দক্ষিণ-আফ্রিকা ছেড়ে স্থায়িভাবে ভারতেই তাঁর আশ্রম স্থাপন করেছেন।

সেই আর এক বিপ্লব-যুগের সূচনায় (১৯১৭-৪৭) স্বামী বিবেকানন্দকে সশরীরে আমরা না পেলেও তাঁর দিব্য বাণীর প্রভাব (১৯০২-১৯১২) দেখেছি—অগণিত দেশ-সেবক ও সেবিকাদের জীবনে; তাদের কাছে জন্মমৃত্যু যেন 'পায়ের ভৃত্য'ই ছিল। সেই চরম আত্মাহুতির আদর্শ যেন মূর্ত হয়েছিল যুবক সুভাষচন্দ্রের জীবনে, এবং তিনিই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত সগৌরবে আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন; তাঁরও প্রধান প্রেরণা বিবেকানন্দের বাণী।

সেকেলে যান্ত্রিক যুদ্ধ পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে (না পিছিয়ে?) চলেছি (Atomic) আণবিক যুদ্ধের চরম ধ্বংসের দিকে। মানব-জাতির ও মানবসভ্যতার এই বিষম সঙ্কটে ভাবলে ভাল হয় বিবেকানন্দ আমাদের কোন্ কোন্ দিকে সাবধান করে গেছেন—১৯০২ খৃঃ ৪০ বছর পূর্ণ হবার আগেই দেহত্যাগ করার সময়। সেই অতি সংক্ষিপ্ত অথচ অগাধ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রায় পাঁচ বছর বিবেকানন্দ ভারতের বাইরেই কাটিয়েছেন: আমেরিকায় ১৮৯৩-৯৬; মাঝে ইংলণ্ডে ১৮৯৫-৯৬;

আবার আমেরিকা ইওরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে ১৮৯৯-১৯০১; এই সব দেশের বহু নরনারী তাঁর কাছে এসেছে, তাঁদের গভীর সমস্যাগুলি নিয়ে প্রশ্ন করেছে—তাঁদের সমস্যার মীমাংসা কোথায় জানতে চেয়েছে। তাঁর অন্যতমা শিষ্যা নিবেদিতার রচনা থেকেই তার প্রচুর আভাষ পাই। তাঁর আরও কত আলাপ গুরুভাই ও সহকর্মীদের সঙ্গে—শিষ্য ও শিষ্যাদের উদ্ধৃতি থেকেও আমরা কিছু পেয়েছি; কিন্তু তাঁর উপযুক্ত সূচী (Index এবং Bibliography) এখনও তৈরী হয়নি; মায়াবতী সংস্করণ, পত্রাবলী ও তাঁর ডায়েরী (যদি থাকে) প্রভৃতি থেকে এখনই সে-কাজ শুরু করার সময় হয়েছে। সেটি হবে 'বিবেকানন্দ-দর্শন',—বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কাজ, সেদিন স্বামী তেজসানন্দের নিমন্ত্রণে বেলুড় বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের ভাষণ দিতে গিয়ে এই কথাই বার বার মনে হয়েছিল।

এযুগের তরুণরা স্বাধীনতা কিছু পেয়েছে; আরও দাবি করে; কিন্তু বিবেকানন্দ-দর্শনে 'স্বাধীনতার' সংজ্ঞা ও তাৎপর্য কি?—এবিষয়ে গবেষণা কেউ করেননি—এখনই শুরু করা দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় যে স্বামীজী—শুধু রাজনৈতিক নয়, সমাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন বিশ্বনৈতিক মুক্তি সাধনাকেই স্বাধীনতা বলেছেন, তাঁর কাছে এই পরম তত্ত্বটি পেয়ে শুধু এদেশের মানুষ নয়, বিশ্বমানব উপকৃত হবে—এখনই এবং সুদূর ভবিষ্যতে। তাই আমাদের স্বাধীনতা-শতাব্দীর অনুধ্যানের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে বার বার মনে পড়ছে, আজও বিবেকানন্দ-'দর্শনে'র সূত্রপাত হয়নি; শুধু তাঁর জন্মস্থানের নিকট একটি সড়কের উপর, আর দক্ষিণেশ্বর-বালি সাঁকোর গায়ে যদিও তাঁর নাম লেখা হয়েছে। আসল কাজ কিন্তু অনেক বাকী।

বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে 'মুক্তি'

জড় বা চেতন সমগ্র প্রকৃতির লক্ষ্য মুক্তি, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলে সেই লক্ষ্যে যাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। সাধুর আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি হইতে তস্করের ঈপ্সিত মুক্তি খুবই পৃথক, সাধুর বাঞ্ছিত মুক্তি তাহাকে অনন্ত আনন্দের ও অবর্ণনীয় শান্তির দিকে লইয়া যায়, আর তস্করের কামনা তাহাকে নূতন নূতন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে।

প্রত্যেক ধর্মেই দেখা যায়—এই মুক্তির সংগ্রাম। সকল নীতি ও স্বার্থত্যাগের মূলে এই মুক্তির ভাব,—ক্ষুদ্র দেহভাব হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা! যখন দেখা যায়—এক ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করিতেছে, অপরকে সাহায্য করিতেছে, তাহার অর্থ এই যে—ঐ ব্যক্তিকে 'আমি ও আমার' এই ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। স্বার্থ সংকীর্ণতার গণ্ডির বাহিরে বিস্তারের সীমা নাই।

সকল বড় বড় নীতি-পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগকে চরম আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছে। মনে কর, একজন এই চরম নিঃস্বার্থ অবস্থা লাভ করিল—তারপর তাহার কি হইবে! সে আর ক্ষুদ্র ব্যক্তি শ্রীযুক্ত অমুক থাকিবে না,—সে অসীম বিস্তার লাভ করিয়াছে। তাহার পূর্বেকার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব হারাইয়া গিয়াছে। সে অনন্ত হইয়াছে; এবং এই অনন্ত বিস্তারই সকল ধর্ম, সকল নীতি ও সকল দর্শনের লক্ষ্যস্থল!　　['কর্মযোগ' হইতে সংকলিত]

"আলো—আরও আলো—"

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

শেষ হয়ে আসে বেলা—দিনমণি অস্তাচলে নামে।
দিবসের আলো ক্রমে মিলাইয়া আসে ;
কোলাহল থামে :
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ মনে
এখন ফিরিতে চাই আপন আবাসে।
অন্ধকার নামে ধরাতলে,
মাথার উপরে মেঘ,—পথ কোথা ?
আমারে কে পথ দেবে ব'লে ?
দিকহারা, লক্ষ্যহারা, আমি চলি—তবু পথ চলি,
পদে পদে বাধা জাগে, শক্তি মোর যায় ফুরাইয়া,
দিগ্‌ভ্রষ্ট এ পথিকে কে দেখাবে পথ ?—কারে বলি,
"আলো দাও—ওগো আলো দাও"
চলিয়াছি কাহারে ডাকিয়া ?
সম্মুখে দুস্তর নদী, কুলু কুলু ঢেউ ব'য়ে যায়,
অন্ধকারে একাকার,—
তরী কোথা—নাবিক কোথায় ?
কাণ্ডারী, শুনেছি আমি মাতৃমুখে একদিন যেন :
ভালোবেসে তুমি জ্বালো আলো,
হাত ধ'রে নিয়ে যাও, বন্ধু কেহ নাহি তোমা হেন,
তাই ডাকি, "জাগো তুমি,
মুছে দাও সূচীভেদ্য কালো
আলো দাও—জ্যোতির্ময় আলো !"
আমি একা—বন্ধু নাই, দিবসের সাথী ছিল যারা
কোথায় হারায়ে গেছে তারা।
কেহ এলো নাকো পাশে,—
আমি কাঁপি ত্রাসে :
মৃত্যুদূত ওই বুঝি আসে
পায়ে পায়ে অগ্রসরি'।
আজ মনে পড়ে মোর মায়ের সে কথা—
"বিপদে পড়িলে ডেকো তাঁরে
হাত ধরিবেন তিনি—"
তাই মোর এত ব্যাকুলতা
কোথা রামকৃষ্ণদেব—আলো দাও এই অন্ধকারে।
শক্তি দাও দুর্বল অন্তরে—
পথ চিনে যেতে পারি যেন
ফেলে-আসা আপনার ঘরে।

খুঁজে পাই নাকো

শ্রীচিত্ত দেব

খুঁজে পাই নাকো :
ঠিক কোন্‌খানে থেকে তুমি মোরে ডাকো,
খুবই কাছে আছ মনে হয়।
তবুও তোমার-আমার পরিচয়
কেন যে হয় না তাই ভাবি।
মন বলে হারিয়েছি আমি সেই চাবি
তোমার ঘরের তালা যে চাবিতে খোলে।
যদি তুমি জানো চাবি কে রেখেছে তুলে
আমারে ঘোরাও কেন নানা পথে ঘাটে ?
তুমি জানো দিন মোর কি ক'রে যে কাটে—
এ-জীবন বৃথা কত দীর্ঘ মনে হয় !
না হ'লে তোমার-আমার পরিচয়
দেহ মোর হয় শুধু পাশব-মত্ততা !
এসো তুমি এসো আজ, তোমার মমতা
ছুঁয়ে থাক, ছুঁয়ে থাক আমার হৃদয়।
এ-আকাশে প্রতিদিন যে-অরুণোদয়
আড়ালে আড়ালে থেকে আঁকো
সে-তোমারে—
খুঁজে পাই না-কো !

ভারতের শিক্ষা-প্রগতিতে শিল্পের স্থান

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ (বিশ্বভারতী)

দেশের প্রচলিত বিদ্যালয়ে দেহ ও মনের সহযোগিতাব শিক্ষার অভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন:

"দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার প্রথায় আমরা সাধারণতঃ পুঁথিগত কয়েকটি বিষয় বাছাই ক'বে নিযে আর সমস্তকে অস্বীকার করি। পাশ্চাত্ত্য সমাজে বিদ্যালযের বাহিরেও নানা উপায়ে স্কুল-কলেজে শিক্ষণীয বিষযেব অভাব পূরণ ক'রে দেয। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজের বাহিরে ছাত্রদেব অন্য শিক্ষাব ক্ষেত্র নেই বললেই হয়। তাই নোট-নেওযা মুখস্থ-করা বিদ্যায় তাদের মন যে পবিমাণ বস্তু পায়, সে পরিমাণ খাদ্য পায না।

"দেহেব শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহ'লে মনের শিক্ষার প্রবাহও বেগ পায় না। অনেক ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি; তাব কারণই এই যে, শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবি কোনই আমল পায না। সেই অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে।"

দেহের চর্চা ও হাতের কাজ সম্পর্কে তাঁহার অভিমত: দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছিনে। দেহের দ্বারা আমরা যে-সব কাজ করতে পারি সেইসব কাজের চর্চা—যে চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়—সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়—সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে। আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোন না কোন হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ ক'রে দেওয়া চাই। আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্বের চর্চায় মনও সজীব হযে উঠে। যে সব ছেলেকে আমরা নির্বোধ বলে মনে করি তাদের অনেকেরই সুপ্ত চিত্ত এই দৈহিক কর্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা ক'রে আছে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ ক'রে নেয়। তাছাড়া যার দেহ শিক্ষিত হযনি সে যত বড়ো পণ্ডিতই হোক সংসারক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবন ধারণ করতে হয—সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকে বাঁচাতে হবে। এ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ কোন কোন অভিভাবকের কাছ থেকে আমরা বাধা পাব; কিন্তু সে বাধাকে স্বীকার করা আমাদের কর্তব্য হবেনা।

শিক্ষাশিল্পেব নবজীবন

আদর্শ, পূর্ণাঙ্গ ও আবশ্যিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্প-শিক্ষাদানের স্থান সকল সভ্য দেশে স্বীকৃত হইলেও এদেশে বুনিয়াদি শিক্ষানীতি প্রবর্তনের পূর্বে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান সুনির্দিষ্ট ছিল না। পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশী শাসকেরাই এ দেশবাসীর শিক্ষানীতি, পদ্ধতি ও প্রসার নিয়ন্ত্রণ করিতেন। আবশ্যিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনে তাহাদের দান সীমাবদ্ধ ও নগণ্য। বুনিয়াদি শিক্ষা দেশে প্রবর্তিত হইবার পর বিগত অল্পাধিক দেড় দশক মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান ও মান—সবেমাত্র বাস্তব ও ব্যাপক রূপ লইতেছে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশের স্থানে স্থানে 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ১৯২১ খৃঃ অসহযোগ-আন্দোলনকালে ভারতের সর্বত্র জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন স্বাধীনতাকামী স্বদেশ-হিতৈষী শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে জাতীয় বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদানের একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা দেখা গিয়াছিল এবং বহু জাতীয় বিদ্যালয়ে নানাবিধ শিল্প শিক্ষা-দানের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। তখনও শিল্পশিক্ষাকে

সাধারণ শিক্ষার অংশ হিসাবে গ্রহণ করিতে দেশ সক্ষম ছিল না। গান্ধীজীর নেতৃত্বে বুনিয়াদি শিক্ষার কার্যক্রম রচনার পর, স্বাধীন দেশে শিল্পমাধ্যমে শিক্ষার পথ অনেক সুগম ও সহজ হইয়াছে।

শিল্পদর্শন

শিল্পের যথাযথ চর্চা সাধারণ শিক্ষার কতখানি উৎকর্ষ সাধন করে তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে শিক্ষাব্রতীকে শিল্পজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিতে হয়। শিল্পজ্ঞান যেমন একটি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে অবস্থিত, শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগও তেমনি একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। এই স্বতন্ত্র বিজ্ঞান আবার শিল্পজ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে; অর্থাৎ শিল্পবিশেষের জ্ঞান ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদিগকে ইহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি—এই দুইটি বিজ্ঞান একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষানীতি-সম্মত শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চাকে আমরা 'শিক্ষাশিল্প' বলিয়া অভিহিত করি।

যে রহস্যময় প্রকৃতির কোলে মানুষের বাস, সে প্রকৃতি হইতে মানুষের জীবনকে পৃথক করিয়া রাখা বা দেখা যায় না, আর সে প্রকৃতি হইতে আমরা বাঁচিবার জন্য খাদ্যবস্তু আহরণ করি, আমাদের সৌন্দর্য-পিপাসা চরিতার্থ ও প্রয়োজন মিটাইবার এবং গৃহাবাস নির্মাণের উপাদান সংগ্রহ করি, সেই প্রকৃতি ও প্রকৃতিদত্ত বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষাশিল্পের সহযোগে চর্চা করিলে আমাদের সমগ্র জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, আমাদের জীবনের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিতে পারে; শিক্ষাশিল্পের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপকতা তখন উপলব্ধিতে আসে। শিল্পকার্যে যখন শিল্পীর চৈতন্যসত্তা ফুটিয়া উঠে তখনই শিল্প বিশেষ রূপ লাভ করে। বিদ্যার্থী কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞানময় প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, আনন্দের মধ্যে বিচরণ করিবে, ইহা শিক্ষাশিল্পের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

যাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট কাঠের কাজ শিখিয়াছে, তাহারা বনে জঙ্গলে অরণ্যে গাছের গঠন কিভাবে প্রকৃতি-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা বুঝিতে সমর্থ। ইহার চর্চা গভীর হইলে শিল্পশিক্ষার্থীর চিন্তা শুধু কাঠেই নিবদ্ধ থাকে না, তখন ইহা কোষময় বৃক্ষজীবন ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে মনকে আকর্ষণ করে, প্রকৃতির বিচিত্র লীলার প্রত্যক্ষ অনুভূতি বিদ্যার্থীর জীবনে বহন করিয়া আনে। অজ্ঞ আদিম মানব হয়তো তাহা জানিত না, সেজন্য বন জঙ্গল তাহার ভীতির উদ্রেক করিত। কাঠের কাজের উপাদান—গাছ সম্পর্কে ইহা যতখানি সত্য, অন্য সকল মৌলিক শিল্প সম্বন্ধেও ঠিক তাই। বস্ত্র আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য বস্তু। বস্ত্র ভিন্ন মানবসভ্যতা প্রায় কল্পনা করিতে পারা যায় না। বিভিন্ন ধাতুর আবিষ্কার ও ইহাদের ব্যবহার মানবসভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আসল কথা এই যে, শিল্পচর্চা প্রকৃতিজাত বস্তুর সঙ্গে মানবজীবনের প্রকৃত সম্পর্ককে বাস্তব করিয়া তোলে। তা-ছাড়া শিল্পচর্চার মাধ্যমে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির যথার্থ ব্যবহার হয় আর এরূপ দৈহিক চর্চার মূল্য ব্যক্তির জীবনে অসাধারণ; কারণ ইহার ফলে সুপ্ত সৃজনী শক্তির উন্মেষ হয়। সেইজন্যই বোধহয় আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, বিশেষ যুগের শিল্প-প্রগতি সেই যুগের সভ্যতা বিশেষের উৎকর্ষাপকর্ষের একটি মাপকাঠি বলিয়া বিবেচিত হয়। কর্মীর চৈতন্যসত্তা কর্মে প্রকাশিত হইলেই কর্মও সজীব হইয়া উঠে।

পুঁথিগত জ্ঞান ও কর্মবিজ্ঞান

যথাযথভাবে জীবনে কোন কর্মের চর্চা করিয়া জ্ঞানার্জন ও আনন্দ পাইতে হইলে সেই কর্মের চর্চা করিতেই হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজনও সেইখানে; বিদ্যালয়ে উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট এই 'অভ্যাস' আয়ত্ত করা প্রয়োজন।

কিন্তু শিল্পজ্ঞান-চর্চার অভ্যাস নিছক পুঁথিগত হইলে কর্মবিজ্ঞানটির সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতার অভাব থাকিয়া যায়। অভিজ্ঞতা-দ্বারা কাজের গুণাগুণ ও উপকারিতা অনুভূত হইলে পুঁথির জ্ঞানও আলোকপ্রাপ্ত হয়, সমৃদ্ধ হয়। আজ কর্ম-বিজ্ঞান ও পুঁথিজাত জ্ঞানকে পরস্পরের পরিপূরক করিয়া প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনক্ষেত্রে শিক্ষাকে, অন্য ভাষায় শিক্ষার্থীর জীবনকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবার তাগিদ আসিয়াছে। কর্মচেতনা ও জ্ঞানের সমন্বয়ে শিক্ষানীতি-সম্মত পথে মৌলিক শিল্পসমূহকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করিলে ব্যক্তির, দেশের ও সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জীবন সমৃদ্ধ হইবে, আর আমাদের প্রাচীন নিজস্ব ঐতিহ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি সহজ হইবে, মহত্তর অর্থনীতির ভিত্তি সমাজে সুদৃঢ় হইবে, সংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের ভবিষ্যৎ নূতন আলোকপ্রাপ্ত হইবে।

শিক্ষায় শিল্প-নির্বাচন

এক একটি শিল্পকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাজে যথার্থ প্রয়োগ করিতে যাইয়া এক একজন শিক্ষা-ব্রতীকে বহু গবেষণা ও মনন করিতে হইয়াছে। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্যদেশের শিক্ষাবিদ্ ফ্রোয়েবেল, মন্তেসরি, সালোমন প্রভৃতির শিল্পশিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা একথার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শিল্প-নির্বাচনে দেখিতে হইবে, বিদ্যার্থীর বয়স, বিদ্যা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, তাহার কল্পনার বিকাশ ও রূপ এবং সেই সঙ্গে শিল্পবস্তুর সর্বজনীন মৌলিক ও শিক্ষানৈতিক আবশ্যকতা। শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্প-নির্বাচনের ইহাই হইবে মাপকাঠি। যে শিল্পবস্তু সকলের দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য, যাহা করিতে গেলে হস্ত-নৈপুণ্যের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি সচল হয়, জ্ঞানের চর্চা হয় এবং যে শিল্পের উপাদান সহজলভ্য, সেই শিল্পকেই সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষাশিল্প বলা চলে।

হাতির দাঁতে মনোরম বস্তু তৈরী করা যায় এই শিল্পে শিক্ষণীয় উপাদান আছে, সৌন্দর্যের চর্চা ইহাতে হয়, কিন্তু দেশময় হাতির দাঁতের কাজ প্রবর্তন শিল্পশিক্ষা-দানের ক্ষেত্রকে কতখানি সীমাবদ্ধ করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সভ্যদেশসমূহের বিদ্যালয়ে কাঠের কাজ, লৌহ ও অন্যান্য ধাতুর কাজ, বয়ন, সেলাই ইত্যাদি শেখানো হইয়া থাকে। কারণ এইসকল শিল্পের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও জানা যায়—যে শিল্প-উপাদান যে দেশে যত সহজে প্রাপ্য, সেই দেশের শিল্পজীবনে সেই উপাদানই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেরুপ্রান্তবাসী ল্যাপদের শিল্পজীবনে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ল্যাপরা সাধারণতঃ বল্‌গা হরিণ পালন করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করে। ল্যাপদের শিল্পকলার প্রধান উপাদান বল্‌গা হরিণের শিং, হাড়, চামড়া ইত্যাদি। এমনকি বল্‌গার পাকস্থলীকে পর্যন্ত তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। সুইডেনের অন্তর্গত ল্যাপ বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা সুইডদেরই অনুরূপ, কিন্তু বিদ্যালয়ের হস্তশিল্পের বেলায় বলগার শিংই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আসল কথা, যে দেশে প্রকৃতিজাত যে উপাদান যত সহজে লভ্য, তাহাই সাধারণতঃ সে দেশের জনশিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতের মত সুবৃহৎ দেশের স্থানে স্থানে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমরা জানি বিদেশী বণিক শাসকদের অত্যাচার ও কূটচালে এদেশের অতি-ব্যাপক কার্পাস-শিল্প ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। তা সত্ত্বেও ভারতের পূর্বাঞ্চলে আসামের ও মণিপুরের ঘরে ঘরে "মণিপুরী তাঁত" এখনও সক্রিয়। সেখানে গৃহকন্যাকে গৃহকর্মে সুনিপুণা করিবার জন্য যে সকল কাজকর্ম শিখিতে হয়, তন্মধ্যে মণিপুরী তাঁতের ব্যবহার একটি। সাধারণতঃ এইরূপ বিশেষ শিল্প দেশের স্থানবিশেষের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসের

সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। এদেশের কার্পাস-শিল্প একটি ব্যাপক শিল্প, এই শিল্পের ধারা এদেশবাসীর মজ্জায় মজ্জায় রহিয়াছে; তা না হইলে কলের যুগে খাদি-আন্দোলন এত ব্যাপক হইতে পারিত না। এই দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বজন-শিক্ষণীয় শিল্প নির্বাচন করিতে গেলে কার্পাস-শিল্পের ন্যায় প্রযোজনীয় দ্বিতীয় শিল্প দেখা যায় না।

বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা উপস্থিত করা কালে গান্ধীজী নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে তকলি দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করার উল্লেখ করিয়াছিলেন। ডক্টর জাকীর হোসেন তখন যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহাও এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

"তকলির মাধ্যমে আমাদিগকে সকল বিষয় শিখাইতে গেলে আমরা অনভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা কাজ চালাইতে পারিব না। আমি নিজে একজন শিক্ষক, আজ যদি আমাকে তকলির মাধ্যমে সকল বিষয় শিখাইতে হয়, তবে আমাকে বিপুল বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু আমার হাতে যদি এরূপ পুস্তক থাকে, যাহাতে কাপড় বোনার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ের সমন্বয় প্রদর্শিত, তবে সেই পুস্তকের সহায়তায় আমি আমার ছাত্রদিগকে শিখাইতে পারিব। এরূপ পাঠ্যপুস্তক-রচনা সময়-ও শ্রম-সাপেক্ষ।"

কার্পাস-শিল্পকে শিক্ষার বাহন করিতে যে সকল প্রতিবন্ধ রহিয়াছে, শিক্ষাবিদ্ ডক্টর সাহেব তখনই তাহা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় গত পনের বৎসরে কার্পাস-শিল্প সম্বন্ধে অনেক বই বাহির হইয়াছে, খানকতক পুরাপুরি আমারই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাও যথেষ্ট নহে। শিক্ষার উপযোগী সাহিত্য তখনই রচিত হইতে পারে, যখন গবেষণাত্মক কাজ সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত শিক্ষাদানের পথ দেখাইতে সমর্থ হয়।

বিবিধ শিল্পের সম্বন্ধ নির্ণয় ও ইহাদের সমন্বয়

শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান ও ইহাদের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ শিল্পই—যথা: মাটি, কার্পাস, কাঠ, বাঁশ, বেত ও বিভিন্ন ধাতুর (যেমন লৌহ, তামা, পিতল, ইস্পাত প্রভৃতি) কাজ একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। শিল্পের এই পারস্পরিক সম্বন্ধটি ভাল করিয়া বুঝিয়া শিল্পসমূহের মধ্যে সমন্বয় শিক্ষা-শিল্পের ক্ষেত্রেই রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন; নতুবা শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পশিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

তুলা কোমল বস্তু, কিন্তু তুলার সূতা তুলার ন্যায় কোমল থাকে না। বয়নকে একটি পৃথক শিল্প বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ যিনি সূতা কাটিতে জানেন ও যথারীতি কাটিয়া থাকেন, তিনি আপন সূতা তাঁতির দ্বারা বয়ন করাইয়া লইতে পারেন, বয়ন তাহার না জানিলেও চলে। অর্থনৈতিক জীবনে প্রাপ্তবয়স্কদের শিল্পের এইরূপ আংশিক চর্চা বা কাজের এই শ্রেণীবিভাগ সমাজে পূর্বেও প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। মন্থর যুগেও সেইরূপ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এরূপ করিলে বস্তুর পূর্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্রই সংকুচিত হইয়া যায়।

সূতাকাটার মুখ্য উদ্দেশ্য বয়ন ও বস্ত্র। সূতাকাটা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক বয়ন না শিখিলে সূতা কাটার গুণাগুণ ও নৈপুণ্য সম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ সঞ্চালন সহজ হয় না। সূতাকাটা শিক্ষা আরম্ভ করার পূর্বে কার্পাস চয়ন, তুলাই, ধুনাই, পাঁজ-প্রস্তুত-করণ যেমন শিখিতে হয় তেমনি সূতাকাটা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহার মুখ্য ব্যবহার বুঝা ও জানা প্রয়োজন হয়। সূতার সমগুণ, নির্দিষ্ট শক্তির প্রয়োজনীয়তা, অতিরিক্ত পাকের দোষ ইত্যাদি কাপড় বোনা কালেই আত্ম-

প্রকাশ করে এবং কাটুনীর বুদ্ধিবৃত্তিকে উৎকৃষ্ট গুণ-সমন্বিত সুতাকাটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ করিয়া তোলে। এই উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে যাহারা সুতা কাটিবে তাহারা নিজের সুতায় বয়নও করিতে শিখিবে। এরূপ করিলে অজ্ঞতাবশতঃ সুতাকাটায় তুলার যে অপচয় ঘটে, সুতার গুণবৈষম্যহেতু কাপড়ের জমির যে উৎকৃষ্ট বুনন হয় না, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হইবে, এবং ইহার আর্থিক দিকও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। সেজন্য বিদ্যালয়ে সুতাকাটা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বয়নশিক্ষা ব্যবস্থাও করিতে হয়। কিন্তু বড় তাঁত পরিচালনা করা প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষেই সম্ভব। সেইজন্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষে ছোট আকারের তাঁতে অনুরূপ বস্ত্র—যথা ফিতা, গামছা, গালিচা ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থাও করা যায়। তাঁত-শিক্ষককে বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিয়া চলিতে হইবে। সুতাকাটার ও তাঁতের শিক্ষক এরূপ ক্ষেত্রে এক হইলে শিক্ষার উৎকর্ষ বাড়িতে পারে। বিভিন্ন বয়নকৌশল সেই সঙ্গে আয়ত্ত হইবে।

একথা সত্য, আমাদের দেশে প্রচলিত প্রথায় তাঁতির পরিবারের বালকবালিকাও তাঁত চালানোর কাজে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে—কেহ বা সুতা ডবল করিয়া দেয়, কেহ বা নলি ভরিয়া দেয়—এইভাবে সকলেই ছোট ছোট আংশিক কাজের অংশ গ্রহণ করে, পরে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তাহারা নিজেরাই বৃহৎ তাঁত চালনা করিতে পারে। এইরূপ প্রথা পারিবারিক শিল্পে চলিয়া আসিতেছে এবং চলিতে বাধারও কোন কারণ নাই। কারণ সেখানে তাঁত পরিবারের জীবিকার সংস্থান করে। কিন্তু বিদ্যালয়ে তাহা অনুসৃত হইতে পারে না; যেখানে বিদ্যার্থী স্বয়ং আপন হাতে কাটা সুতায় তাঁতের কাজ শিখিবে, ইহাই স্বাভাবিক।

বিদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষাশিল্পের প্রগতি

স্থান ও কাল-ভেদে শিক্ষা-ব্যবস্থার তারতম্য হইয়া থাকে। ইওরোপীয় দেশসমূহের বিদ্যালয়ে (প্রাথমিক ও উচ্চ) শিক্ষাশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাশিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ও প্রথা সেইসকল দেশে প্রচলিত আছে। ইংলণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্মানি, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিদ্যালয়সমূহের যে শিক্ষাশিল্পের চর্চা হয়, সে সম্বন্ধে আমার বহু বৎসরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, প্রতিটি দেশ নিজের প্রয়োজন বুঝিয়াই বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে। আবার এ-ও সত্য যে, শিল্পশিক্ষার সম্বন্ধে যে-সকল মতবাদ ও নীতি প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বর্তমান ছিল, তাহা যুদ্ধসংঘাতের ফলে দ্রুত পরিবর্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। শিক্ষানীতিকে সমগ্র দেশের সমাজনীতির আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা যায় না, তাহা সম্ভব নহে। সমাজনীতি ও অর্থনীতি পরিবর্তিত হইলে আবশ্যিক জনশিক্ষার নীতিতে পরিবর্তন অনিবার্য। বিশেষ করিয়া যুদ্ধের ফলে যে সকল দেশের সাংস্কৃতিক জীবন বার বার বিপর্যস্ত হইতেছে, তাহাদের তো কথাই নাই। বরং যে সকল দেশ যুদ্ধ এড়াইতে সক্ষম হইয়াছে, সেইসকল দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি একটা স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারা অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডে এইরূপ পরিবর্তন গভীর হইয়াছে।

"In the United Kingdom profoundly important developments in every field of education took place or were set in motion as a result of the second world war. The need for increased food production greatly encouraged school gardening, and keeping of live stock, the work of numerous schools began to revolve around the school 'farm' which provided abundant matter for class-room study as well as out-door activity. Children were

released for limited periods to help farmers to prepare and harvest the crops. Evacuated children learned to launder and darn their clothes,…cook their meat, practise local handicrafts make local surveys and study local life in all its aspects"—British Education—By Dent.

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষাশিল্পের চর্চা ও গবেষণা পরাধীনতার যুগে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে সামান্যই হইয়াছিল। দেশ এখন উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা এখনও ইংলণ্ড বা আমেরিকাবাসীদের প্রয়োজনে রচিত পাঠ্যপুস্তকই আমাদের শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রে ও বিদ্যালয়ে অনুসরণ করিতেছি, তাহাও অবস্থার তারতম্য না বুঝিয়া। কিন্তু এরূপ আশা করা অন্যায় নয় যে, বুনিয়াদি আবশ্যিক শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ফলে শিক্ষাব্রতীদের চিন্তাধারা দেশের প্রয়োজনে ও বিদ্যার্থীদের প্রয়োজনে ক্রমশঃ নূতনভাবে স্ফূর্তি লাভ করিবে, শিক্ষার সাঙ্গীকরণের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাব্রতিগণ ক্রমশঃ উপলব্ধি করিবেন।

শিল্প-শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের কর্তব্য

আসল কথা এই যে সকল দেশেই যার যার প্রয়োজনে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সর্বমানবের জন্য একটি অখণ্ডনীতি ও ব্যবস্থা এখনও পৃথিবীতে স্থিতি লাভ করে নাই। পরশোষণনীতি যদি আমাদের ত্যাজ্য হয়, মানবমৈত্রী যদি আমাদের ব্যক্তিগত, সমাজগত ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ হয়, তবে এ দেশের চিরন্তন "ত্যাগের দ্বারা ভোগ করা"র আদর্শই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আমাদের শিক্ষার প্রগতিকে সেই পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। আজ বিশ্বময় সংঘাত ও ভীতির প্রাবল্য দেখা গিয়াছে। মানবতার বিকাশই যদি ইওরোপ-আমেরিকার লক্ষ্য হইত (হয়তো তাহারাও একদিন সেই লক্ষ্যকে গ্রহণ করিবে) তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষানীতি সেই আদর্শেই গঠিত হইত; পৃথিবী হইতে যুদ্ধের ভীতিও হয়তো চলিয়া যাইত। যে দুর্নীতি এই সংঘাতের জন্ম দিয়াছে, সেই নীতির কুশলতা যতই হোক না কেন আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে নিঃসংকোচে তাহা বাদ হইতে হইবে।

ভারতের সনাতন শিক্ষার আদর্শ কি? এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতে গেলে বলিতে হয়: মানবতার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য সাধারণ শিক্ষা, বস্তুজ্ঞান ও আত্মবিজ্ঞানের চর্চা ও ইহাদের সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস—এদেশের গৌরবময় যুগে যেমনটি প্রকটিত হইয়াছিল, তেমনটি অন্য কোন সভ্যতায় বড় দেখা যায় না। অঙ্ক-গণনা-পদ্ধতি, জ্যামিতি, সামাজিক অনুশাসন, অর্থনীতি, বহু দার্শনিক মতবাদ প্রভৃতির সামঞ্জস্য ও সমন্বয়-প্রচেষ্টা এদেশে হইয়াছিল। বিদ্যাদানের ক্ষেত্রে গুরুগণ যে আদর্শে প্রণোদিত হইয়া বিষয়-সম্ভোগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ আমাদের বস্তু-তন্ত্রময়, স্বার্থদ্বন্দ্ব বিক্ষিপ্ত জীবনের পক্ষে আবার আলোচনা ও বিচারের বিষয় সন্দেহ নাই। শিক্ষা-গ্রহণকালে সংযমাত্মক জীবনযাপন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই একালের শিক্ষাব্রতীদের বিচারের বিষয়। এদেশে বিদ্যার চর্চা এমন এক স্তরে পৌঁছিয়াছিল যে, শিক্ষক আপন বিদ্যার্থীর জন্য প্রার্থনা করিতেন—"ব্রহ্মচারিগণ শম অর্থাৎ মনঃস্থৈর্য লাভ করুক।" নিজের সম্বন্ধে প্রার্থনা করিতেন—"আমি যেন ধনবান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হই।" এদেশকে, এদেশবাসীকে মহত্তর সভ্যতার ধারক হইতে হইলে বুদ্ধের ন্যায় মহামানবের বাণীকে আমাদের শিক্ষানৈতিক জীবনে সফল করিয়া তুলিতে হইবে। বুদ্ধবাণী এদেশেরই প্রতিভার দান।

শিক্ষা- ও বিদ্যাভ্যাস-দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান-দ্বারা জীবন সম্পূর্ণ বিকশিত করার মহত্তর আদর্শ অন্য কোন সভ্যতা তেমনটি করিতে পারিয়াছে কিনা, তাহা দেশের শিক্ষাব্রতীদের যাচাই করার দিন আসিয়াছে। সৃষ্টির বিচিত্র বিকাশের মূলে যে শক্তি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এদেশের প্রাচীন শিক্ষা-গুরু বলিতে পারিয়াছিলেন—"হে ঐশ্বর্য, সহস্র-শাখা অর্থাৎ বহুরূপ যে তুমি, তোমাতে আমি আপনাকে পবিত্র করি।"—"তুমি আশ্রয়, আমাকে আলোকিত কর অর্থাৎ তন্ময় কর।" জ্ঞানের দ্বারা জীবনকে আলোকিত করার কি অদ্ভুত প্রচেষ্টাই না এদেশে হইযাছিল। ত্যাগের শক্তি অসাধারণ, ত্যাগের মহিমায় এদেশের বিশেষ বিশেষ যুগ মহিমান্বিত হইয়াছে।

সারাদেশে জনসাধারণের প্রতিভাবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইলে দেশের গৌরব আমাদের প্রণম্য মহাজনদের আদর্শকে বিচার করিয়াই ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। সত্য, ন্যায় ও নীতির প্রাণস্বরূপ মৈত্রী ও প্রীতির আদর্শকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে হইবে। যে শিক্ষা- ও সমাজ-ব্যবস্থা হিংসার উদ্রেক করে, তাহা যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গী সেইদিকে ফিরাইতে হইবে। তবে আমরা শিক্ষার মাধ্যমে মহত্তর সভ্যতা রচনার অধিকারী হইব।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ*

স্বামী সিদ্ধানন্দ

পূর্ববঙ্গের জ্যোতিঃস্বরূপ মহাপুরুষ নাগ-মহাশযের অসুখের সংবাদ পাইয়া শ্রীলাটু মহারাজ একদিন "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ"-প্রণেতা শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলিলেন "বেদ-বেদান্ত পডবার ঢের সময় পাবেন, কিন্তু নাগমহাশয পৃথিবী হ'তে চ'লে গেলে অমন মহাপুরুষের আর কোথাও কখনো সাক্ষাৎ পাবেন না, এ সময়ে তাঁর সেবা করাব সুযোগ ছাড়বেন না"। শ্রীলাটু মহারাজেব এই প্রেরণাতেই শরচ্চন্দ্রের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সেই রাত্রেই নাগমহাশয়কে দেখিতে দেওভোগ যাত্রা করেন এবং তথায় শেষ অবস্থায় তাঁর অনেক সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বিলাত হইতে প্রথমবার ভারতে ফিরিবার পরে শ্রীলাটু মহারাজ সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। স্বামীজী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আলমোড়া, রাজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। সেই সব কথা স্মরণ করিয়া শ্রীলাটু মহারাজ বলিতেন, "অমন গুরু ভাই কি আর হয়? কত যত্ন ক'রে আমায় নিয়ে গিয়ে সব জায়গা দেখালে, যাতে আমার কোনও অসুবিধা না হয়। স্বামীজীর তো আপন দুই ভাই আছে, তাদের কখনো তিনি এমন যত্ন করেন নাই। গুরু ভাই সহোদর ভাইএর চেয়ে খুব আপনার হয়।"

শ্রীলাটু মহারাজেরও গুরুভ্রাতৃগণের প্রতি ভালবাসা ছিল অগাধ। আলমবাজার মঠে যখন শ্রীকালী মহারাজের (শ্রীঅভেদানন্দ স্বামীর) পায়ে অসুখ (thread worm) হয তখন তিনি তাঁহার যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন।

সংযমও ছিল তাঁর অপরিসীম। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ ঠাকুরের প্রধান উপদেশ ছিল; একটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে শ্রীলাটু মহারাজ কিরূপে উহা পালন করিতেন। কাশ্মীর ভ্রমণের সময় তিনি স্বামীজীর সঙ্গে বোটে (নৌকাতে) থাকিতেন। ঐ বোটের মাঝির একটি মেয়ে

* গ্রন্থাকারে শীঘ্র প্রকাশিতব্য পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হইতে।

দেখিতে খুব সুশ্রী ছিল, সে তার বাপের সঙ্গে বোটেই থাকিত। শ্রীলাটু মহারাজের সহিত একটু রহস্য করিবার উদ্দেশ্যে স্বামীজী সেই মেয়েটিকে একদিন বলিলেন, "ত্যাখ্, এই পানটি ওধারে যে সাধু বসে আছে, তুই তার হাতে দিয়ে আয় দেখি"। বালিকা স্বামীজীর এই কথায় খুশী হইয়া লাটু মহারাজের নিকটে গিয়া তাঁকে পানটি দিতে গেল। তার পান দেবার আগ্রহ দর্শনে শ্রীলাটু মহারাজ প্রথমে বিরক্ত, তার পর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি এতদিন বোটে রয়েছি, কই। একদিনও তো এই মেয়েটি আমায় পান দিতে আসে নাই, আজই বা আসে কেন? এ দেখছি নিশ্চয়ই বিবেকানন্দের কারসাজি, বটে। আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে? না, এ বোটে আর থাকা হবে না, এ স্থান ত্যাগ করাই উচিত।—যেমন মনে মনে এই সংকল্প, অমনি সঙ্গে সঙ্গে লাটু মহারাজ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন,—ডুবে যাব, কি ভেসে যাব—সে চিন্তা তাঁর একেবারেই নাই! স্বামীজী আড়াল হইতে দেখিতেছিলেন লাটু কি করে। তিনি যে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন—এতটা তিনি মনে করেন নাই। তখন তিনি তাড়াতাড়ি, মাঝি-মাল্লাদের ডেকে লাটুকে জল হইতে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লাটু মহারাজ তো কোনমতেই বোটে উঠিতে চান না। শেষটা বহু সাধ্যসাধনার পর স্বামীজী শ্রীলাটুকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করেন।

স্বামীজী ভারতের উত্তর-পশ্চিমদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে খেতড়ীতে আসিয়া কিছুদিন তাঁহার শিষ্য খেতড়ী-রাজের নিকট অবস্থান করেন। সেই সময়ে শ্রীলাটু মহারাজও তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। ঐ রাজার ধারণা ছিল যে স্বামীজীর গুরুভাই লাটু মহারাজও ইংরেজীভাষা জানেন, তাই তিনি একদিন একটা বড় Globeএর (গোলাকার মানচিত্রের) সামনে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সেই মানচিত্রে অঙ্কিত কোন একদেশের বিষয় ইংরেজী ভাষায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীলাটু মহারাজ তো নিরুত্তর, কেবল দাঁড়াইয়া মানচিত্র দেখিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে স্বামীজী কিছু তফাতে বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। লাটুমহারাজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে সেই দেশ সম্বন্ধে কতকথা এমনভাবে বুঝাইতে লাগিলেন যে তিনিও খুব খুশী হইয়া গেলেন; অথচ স্বামীজী রাজাকে ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিলেন না যে তাঁহার গুরুভাইটি ইংরেজী লেখাপড়া জানেন না। এইরূপে স্বামীজী রাজার নিকটে শ্রীলাটু মহারাজের মান সম্ভ্রম বজায় রাখিলেন। স্বামীজী তাঁহার এই গুরুভাইটির নিরক্ষরতার আবরণের ভিতরে এক অদ্ভুত গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন। পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ বলেন, শ্রীলাটু মহারাজ যে আমাদের গুরু-ভাই ছিলেন, ইহা যথার্থ ই আমাদের গৌরবের বিষয়।

স্বামী বিবেকানন্দের গুণ ও মহিমার কথা বলিতে বলিতে শ্রীলাটু মহারাজ আত্মহারা হইয়া যাইতেন। একবার তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীলাটু মহারাজ বলিতে লাগিলেন: ত্যাখ, প্রথমবার বিলাত হ'তে এসে একদিন সেই সাবেক বরানগর মঠের চালে মোটা চাদরখানি গায়ে দিয়ে স্বামীজী বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন, 'ভাই লাটু! আমি সেই নরেন, তুইও যেমন ভিখারী, আমিও সেইরকম ভিখারী সন্ন্যাসী; গুরুভাইদের থাকবার জন্য মঠ স্থাপনা করতে হ'ল, আমার জন্য কিছু দরকার নেই, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এই এত বড় ব্যাপার হ'য়ে গেল। আজ তোর কাছেই ভিক্ষা করা যাক্, আয় দুজনে একসঙ্গে খাই।'—আমি তখন খেতে যাচ্ছিলাম স্বামীজীও আমার সঙ্গে একপাতে খেতে বসে গেলেন, তাতে আমার মনে কোনো ভিন্ন ভাব হয় নাই, বরং আমার প্রাণ 'হরষিত' হ'ল।

অনুতাপ

[একটি প্রচলিত কাহিনী-অবলম্বনে]

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

রূপচতুর্ভুজ! কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশদাম-শোভিত বংশীধারী শ্যাম, কিশোর মূর্তি। যেমন বিগ্রহের রূপ পরিকল্পনা, তেমনি নাম পরিকল্পনা! এ কল্পনার মধ্যে একটি সুমধুর ভাবব্যঞ্জনা যেন সুষম ছন্দে স্থির হয়ে আছে।

রূপচতুর্ভুজের মন্দির—বিশেষ কোন তীর্থস্থানের বিখ্যাত কোনো দেবমন্দির নয়। উদয়পুরের নিকটবর্তী কোন একটি গ্রামের গ্রামদেবতা। প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরগুলির মতো এখানেও নিত্য-সেবার ব্যবস্থা আছে, এবং একটি পূজারী-বংশও আছে। পুরুষানুক্রমে এঁরাই দেবসেবার অধিকারী।

এ সময়ে পুরোহিত 'দেবা' ছিলেন বিগ্রহের সেবাইত। দেব-সেবা করতে করতে দেবার চুলে পাক ধরেছে, দেহে এসেছে দুর্বলতা, কিন্তু জীবিকা-নির্বাহের জন্য এ কাজ তাঁর না করলেও নয়।

একজন বৃদ্ধ পুরোহিতের নাম 'দেবা'! এ কেমন অশ্রদ্ধাপূর্ণ অসম্মানসূচক অভিধা? এমন কেন? কেন—সে কথা বলতে হ'লে বলতে হয়, দেবার নিজের বাল্যজীবনই এই নামের জন্য দায়ী।

কে জানে সম্পূর্ণ কি নাম ছিল দেবার। হয়তো দেবনাথ, হয়তো দেবরাজ, হয়তো দেবজীবন, হয়তো বা অমনি একটা কিছু। কিন্তু সে কথা এখন আর কারো মনে নেই। সবাই জানে 'দেবা'।

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেও ছেলেবেলায় তার আচরণ ছিল রাখাল ছেলেদের মতোই। বিদ্যাভ্যাসে আদৌ মন নেই, মাঠে জঙ্গলে পাহাড়ের কোলে কোলে খেলে বেড়ানোতেই দেবার একান্ত আনন্দ। কাজেকাজেই মূর্খ দেবার পক্ষে শাস্ত্রাধ্যয়ন বা পূজাপদ্ধতি শিক্ষা সম্ভব হ'লনা, পিতার মৃত্যুর পর কেবলমাত্র উত্তরাধিকার-সূত্রেই কিশোর দেবা দেবসেবার অধিকার লাভ ক'রল। উত্তরাধিকার-সূত্রে কর্মে অধিকার জন্মালেও, শ্রদ্ধা-সম্মানের অধিকার তো জন্মায় না। গ্রামের সকলে অবহেলায় উচ্চারণ করে "দেবা পূজুরী"। আজ পর্যন্ত সেই নামই রয়ে গেছে। কিন্তু আজীবন দেবসেবার ফলে মূর্খ দেবার অন্তরের অজ্ঞান-অন্ধকার কি এতোটুকুও দূর হয় নি? কে জানে সে কথা!

লোকে দেখে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিত্য প্রভাতে এসে মন্দিরের দরজা খোলেন, মন্দিরতল মার্জনা করেন, বাসি ফুলপাতা বাইরে ফেলে দিয়ে নতুন মাল্য রচনা ক'রে বিগ্রহের হাতে গলায় মাথায় পরান, প্রদীপ জ্বালেন, ঘণ্টা নাড়েন, 'ভোগ' দেন। অতঃপর সেবাইতের প্রাপ্য লাড্ডু মিঠাই ইত্যাদি প্রসাদটুকু পুঁটুলিজাত ক'রে মন্দির-দ্বারে শিকল তুলে দিয়ে গৃহে ফিরেন—এই পর্যন্ত।

সন্ধ্যাতেও সেই একই পদ্ধতি। তবে প্রভাতে যেমন সমগ্র জগৎ-সংসারে কর্মের ঝন্‌ঝনা বাজে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের অসংখ্য আহ্বানে চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, সন্ধ্যায় তো তেমন নয়! সন্ধ্যায় পাখীরা বাসায় ফিরে ডানা মুড়ে বসে, রাখালবালক-তাড়িত ধেনুর দল গোহালে এসে আশ্রয় নেয়, চাষী ধান কাটা বন্ধ করে, কুমোরের চাক থামে, কামারের 'নেহাই' শীতল হয়। সন্ধ্যায় গৃহস্থের মেয়েরা দিনের কাজ সমাপন ক'রে রাতের কাজ স্থগিত রেখে স্থির হ'য়ে বসে, শিশুরা গায়ের ধুলো ঝেড়ে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়।

সন্ধ্যার আকাশে অনন্ত অবসরের সুর বাজে।

তাই পুরোহিত দেবা সন্ধ্যা পূজা শেষ হ'য়ে গেলেও নিশ্চিন্ত চিত্তে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মন্দিরে যাপন করেন। হয়তো কখনো পরদিনের পূজার

বাসনপত্র পরিষ্কার ক'রে রাখেন, কখনো মৃদু গুঞ্জনে গান গাইতে থাকেন, আর রাত্রি গভীর হ'লে বিগ্রহের রাজবেশ উন্মোচন ক'রে রাত্রিবেশ পরিয়ে 'শয়ান' দেন; প্রসাদী মালাটি মাথায় বেঁধে নিয়ে দুয়ারে তালা লাগিয়ে ফেরেন। এই নিত্যকর্ম দেবার।

গৃহস্থেরা মন্দিরে পূজা দিতে এলে দক্ষিণা দেন যৎসামান্য, হাস্যপরিহাসের ক্ষেত্রে বলেন "যেমন বামুনা, তেমন দক্ষিণা।" মেয়েরা কাঁদুনে ছেলেকে শাসায়: ওই দেবা আসছে। দেবা যেন জুজুবুড়ি।

কিন্তু এজন্য দেবার মনে কোন ক্ষোভ নেই। শান্ত স্বল্পবাক্ প্রসন্নচিত্ত ব্রাহ্মণ নিজের কাজ, নিজের সংসার নিয়েই আছেন। তথাপি বিড়ম্বনা আসে; এই নিজেকে নিয়েই বিড়ম্বনা।

এক সন্ধ্যায় ঘোরতর বিপদে পড়ে যান দেবা।

সেদিন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, সন্ধ্যাকালেও বাতাসের লেশ নেই, সন্ধ্যারতি সমাপনান্তে দেবা নিতান্ত তৃষ্ণা অনুভব করেন। এখনো মন্দিরে কিছু কাজ অসমাপ্ত আছে; গৃহ অনেকটা দূর, দেবা ঈষৎ ইতস্ততঃ ক'রে প্রসাদী লাড্ডু দুটির সহযোগে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত জলটুকু পান ক'রে ফেলেন। আজ আর মন্দিরে মধ্যে বসে সঙ্গীত সাধনা সম্ভব নয়, ভিতরে অসহ্য গুমোট; দেবা অন্যদিন অপেক্ষা আগেই প্রসাদী মালাটি মাথায় বেঁধে নিয়ে বিগ্রহকে 'শয়ান' দেন, এবং দ্রুতহস্তে অসমাপ্ত কাজগুলি সারতে থাকেন, সহসা মন্দির-দ্বারে অধীর করাঘাত।

এ কি! কার এই করাঘাত! এমন তো কোনোদিন হয় না। এতো রাত্রে গ্রাম-প্রান্তে অবস্থিত এই মন্দিরের দিকেও কেউ আসে না, পূজা ইত্যাদি যা কিছু দিনের বেলাই শেষ ক'রে যায়। কেন কে জানে, কী এক আতঙ্কে বুকটা কেঁপে ওঠে দেবার। তিনি ত্রস্তে ব্যস্তে মাথায় বাঁধা মালাটি নামিয়ে রেখে মন্দিরদ্বারে ছুটে আসেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ দেবার জ্ঞানচৈতন্য প্রায় লুপ্ত হবার উপক্রম হয়।

মন্দির দ্বারে শিকারীর বেশ পরিহিত অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত স্বয়ং মহারাণা বাহাদুর।

না, চিনতে ভুল হয়নি দেবার। মাত্র কিছুদিন আগেই মহারাণা পিতৃশ্রাদ্ধ-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ের আয়োজন করেছিলেন, দেবা সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। যদিও দেবা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নন, তথাপি দেবমন্দিরের পুরোহিতের অধিকারেই রাজসভায় উপস্থিত হবার অধিকার লাভ করেছিলেন।

চিনতে ভুল হয় না, কিন্তু দেবার আর বাক্য-স্ফূর্তি হয় না। কে জানে কেন এই আবির্ভাব! দেবা যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ, সেই সংবাদটুকু কি কেউ রাজকর্ণে পরিবেশন করেছে? সেই অপরাধে কি বৃদ্ধ বয়সে দেবার এই ক্ষুদ্র জীবিকাটুকু যাবে? খুব সম্ভব তাই। গ্রামে হিতকামীর তো অভাব নেই!

দেবা নীরব, নতমস্তক—বদ্ধাঞ্জলি।

রাণা কিন্তু দেবার ভীতিকর কিছু বলেন না, তিনি যা বলেন তার সার মর্ম এই—তিনি শিকারের ঝোঁকে মৃগশিশুর পিছন পিছন ছুটে সঙ্গীদল থেকে বিচ্যুত, এবং পিপাসার্ত, এখানে দেব-মন্দিরের দীপশিখা দেখে, আশান্বিতচিত্তে পিপাসা নিবারণার্থে ছুটে এসেছেন। এখন পূজারী তাঁকে কিঞ্চিৎ জলদান ক'রে শান্ত করুন। তিনি বড়ো শ্রান্ত ক্লান্ত, এইদণ্ডে চাই—শুধু একটু জল।

জল! দেবার সমস্ত বুকটা রাজপুতনার মরুভূমির মতোই ধু ধু করে ওঠে। কণ্ঠে তালুতে সেই মরুভূমির শুষ্কতা। আজ সন্ধ্যাতেই দেবা বিগ্রহের পানপাত্রে জল ঢালার পর দেখেছেন কলসীতে আর বিন্দুমাত্র জল নেই। আজকের প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপে মাটির কলসীটাই অর্দ্ধেক জল শুষে নিয়েছে। কাজ মিটে গেছে বলে রাত্রের অন্ধকারে আর

দূরবর্তী কূপ থেকে জল সংগ্রহ করতে যাননি দেবা, আর আজকেই এই দুর্বিপাক!

দেবা হাতজোড় ক'রে বলেন, "প্রভু একটু বিশ্রাম করুন, আমি জল আনি।"

অধীর রাণা বিরক্তস্বরে বলেন, "বিশ্রামের প্রয়োজন নেই পূজারী, সর্বাগ্রে জল আনো।"

দেবা দ্রুতগতিতে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে হতাশভাবে একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেন, নাঃ, কোথাও নেই একবিন্দু জল। অতএব আর করবার কি আছে? শূন্য কলসীটি উঠিয়ে নিয়ে দেবা মন্দিরের বাইরে পা বাড়ান। পিপাসার্ত রাণার ব্যাপার বুঝতে দেরি হয় না।

মেজাজ সপ্তমে উঠে। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, "ঠাকুর কি মৃত্তিকা খনন ক'রে জল আনতে যাচ্ছেন?"

দেবার হাত পা অবশ হয়ে আসে, তথাপি তিনি কষ্টে সাহস সংগ্রহ ক'রে বলেন, "না, প্রভু, অদূরেই দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত নির্মল কূপ আছে, আমি এই দণ্ডেই—"

রাণা ব্যঙ্গহাস্যে বলেন, "আজ বোধ করি দেববিগ্রহের ভাগ্যেও পানীয় জল জোটেনি?"

দেবা বিস্মিতভাবে বলেন, "সে কী প্রভু?"

"অগত্যা আর কি ভাবা যায়। কেন, সেই প্রসাদী জলটুকু দান ক'রেই তো আমার তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারতেন?"

দেবা প্রমাদ গণেন। রাণা উত্তরের আশায় অপেক্ষমাণ, ভয়ে দেবার হাত পা থর থর করতে থাকে। 'জলটুকু আমি পান ক'রে ফেলেছি'—এ কথা কেমন ক'রে এই তৃষ্ণার্ত রাজ-অতিথির সামনে উচ্চারণ করা যায়? দেবা মনে মনে ভাবেন, লোকমুখে শুনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নাকি ভগবান বিরাজমান, তবে অবশ্যই আমার মধ্যেও তিনি আছেন। অতএব যা থাকে কপালে—

দেবা নতমস্তকে বলেন, "প্রভু দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত জল স্বয়ং দেবতাই গ্রহণ করেছেন।"

রাণা চমকে ওঠেন।

পরক্ষণেই ক্রোধে তাঁর আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। উঃ, কী পাপিষ্ঠ শয়তান এই ধড়িবাজ ব্রাহ্মণ!

নিশ্চয়ই আলস্যের জন্য আজ জল আনয়ন করেনি, দেবতাকে উপবাসী রেখে দিয়েছে, আর এখন বিপদে পড়ে এরূপ ভয়ঙ্কর মিথ্যাকথা অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করছে। তিনি হাতের তরবারি স্পর্শ ক'রে বলেন, "ব্রাহ্মণ, দেবতার স্থানে মিথ্যাকথা বলার শাস্তি কি জানো?"

দেবা বোঝেন আজ তাঁর জীবনের শেষ দিন, তবু ভয় এমন জিনিস যে তিনি সাহস ক'রে মাথা তুলতে পারেন না। রাণা গম্ভীরভাবে বলেন, "থাক্, ব্রাহ্মণরক্তে আমার তরবারি কলঙ্কিত করতে চাইনা। তোমার বিচার কাল হবে।"

রাণাকে প্রস্থানোদ্যত দেখে দেবা ভয় ভুলে ব্যগ্র ভাবে বললেন, "প্রভু আগামী কাল যা হয় হোক—, আপনি জলপান না ক'রে যাবেন না। পিপাসার্তকে 'জল দান' না করতে পারলে আমার আজন্মের দেবসেবার ফল ব্যর্থ।"

মহারাণা গর্জন ক'রে বলেন, "মিথ্যাবাদীর হাতের জল আমি গ্রহণ করি না।"

মিথ্যাবাদী! দেবার সমস্ত দেহে সহসা এক অদ্ভুত সাহসের জোয়ার আসে, তিনি মাথা তুলে স্থিরস্বরে বলেন, "আমি মিথ্যাবাদী নই।"

"মিথ্যাবাদী নও?"

"না।"

রাণা সহসা কি ভেবে ক্রোধ সংবরণ ক'রে বলেন, "বেশ! তা'হলে জল আনো, আমি মন্দির মধ্যে অপেক্ষা করছি।"

ফাঁড়া কাটল ভেবে দেবা দ্রুতপদে জল আনতে যান, আর মহারাণা মন্দির মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখেন, দেবতা শয্যায় শায়িত, এবং নিকটেই একটি শূন্য জলপাত্র ও মিষ্টান্নের পাত্র অবস্থিত। মহারাণার ওষ্ঠে একটু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। ওঃ!

লোভী ব্রাহ্মণ নিজেই প্রসাদের সদ্ব্যবহার ক'রে রেখেছে।

দরিদ্র বৃদ্ধ গ্রাম্য ব্রাহ্মণের প্রতি একটু কৃপা অনুভব করেন মহারাণা। অতঃপর দেবা জল নিয়ে উপস্থিত হ'লে তিনি ক্রোধ প্রকাশ না ক'রে সহাস্যে বলেন, আগামীকাল তিনি রূপচতুর্ভুজের ভোগ চড়াবেন, এবং মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত উপস্থিত থাকবেন। কারণ তিনি দেবতার আহার ও জলপান দেখতে বিশেষ উৎসুক। বলা বাহুল্য দেবা নীরব।

রাণা বিদায়গ্রহণ-কালে হাত বাড়িয়ে বলেন, "পূজারী ঠাকুর, ওই প্রসাদী মালাটি আমাকে দাও।"

আবার। আবার সেই বিপদ।

হা ভগবান, হা রূপচতুর্ভুজ, দেবা আজ কার মুখ দেখে শয্যাত্যাগ করেছিলেন? এ মালা কেমন করে রাজ-শিরে অর্পণ করবেন দেবা, এ যে দেবার নিজের ব্যবহৃত মালা? মনে পড়ে রাণার ক্ষণপূর্বের অগ্নিমূর্তি। কম্পিত হাতে মালাটি তুলে দেন দেবা।

মহারাণা গলায় পরবার পূর্বে প্রদীপের আলোয় মালাটি নিরীক্ষণ করতে যান, পাছে পুষ্পে কীট ইত্যাদি থাকে, আর নিরীক্ষণ ক'রেই ঘৃণা ও ব্যঙ্গের সংমিশ্রণে গঠিত একটি ভয়াবহ হাসি হেসে বলেন, "রূপচতুর্ভুজের কেশকলাপে আজকাল বুঝি পাক ধরেছে ঠাকুর?" দেবা হতবাক্।

মহারাণা আবার বলেন, "দেবতার মালায় একগাছি পক্বকেশ জড়িত দেখছি। নারায়ণ বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছেন, কেমন? তাই না?"

আবার সেই ভয়। বুদ্ধিভ্রংশকারী রাজভয়! দেবা মন্ত্রচালিতের মতো বলে ফেলেন, "হ্যাঁ, মহারাণা।"

উঃ! কী ধৃষ্টতা। কী দুঃসাহস। রাজরক্তে আর কতো সহ্য যায়। তবু মহারাণা দাঁতে দাঁত চেপে রোষ সংবরণ ক'রে বলেন "আচ্ছা! ওহে সত্যভাষী ব্রাহ্মণ, আগামী কাল গ্রামসুদ্ধ লোকের সামনে তোমার সত্যভাষণের বিচার হবে।"

মালাটি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলে দিয়ে মহারাণা বীরদর্পে মন্দির ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবাও লুটিয়ে পড়ল দেবতার সামনে।

'প্রভু চতুর্ভুজ, এ কী করলে!—কেন দেবার মুখ হ'তে এমন নির্লজ্জ মিথ্যাকথা উচ্চারণ করালে?'

না জানি আগামীকাল এই বৃদ্ধের কপালে কী লাঞ্ছনা আছে। মৃত্যুদণ্ড হ'লেও বা ভালো, কিন্তু যদি গ্রামসুদ্ধ সকলের সম্মুখে অপমানিত হ'তে হয়! প্রভু, শুনেছি তুমি নাকি লজ্জানিবারণ হরি, যুগে যুগে কালে কালে তুমি ভক্তের লজ্জা নিবারণ ক'রে আসছ, আজ কি তোমার সেই চিরকালের নাম আর একবার সার্থক করবে না?

কাতর প্রার্থনার মুহূর্তে আবার অন্য বোধ আসে দেবার। তিনি হতাশ চিত্তে চিন্তা করেন—আমি কোন্ মুখে বলছি, নারায়ণ ভক্তকে রক্ষা করো! কবে আমি তাঁ'তে অনুরক্ত হয়েছি? কেবলমাত্র উদরান্নের জন্যই তো আমার এই দেব-সেবা! এই দেবসেবার আবার অহঙ্কার!

চোখের জলে বুক ভেসে যায় দেবার। অনুতাপের অনলে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে ওঠে, অনন্তের ধ্যানে অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়মন্দিরে জ্ঞানের শিখা জ্বলে ওঠে। অনুতাপ আর আত্মচিন্তা! যেন দু'টি অরণি-কাষ্ঠ। যুগপৎ দুইয়ের সংঘর্ষে জ্ঞানালোক জ্বলে ওঠে। রাজভয়ে ভীত দেবার দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হয়। এ কী করলাম! এই শুধু চিন্তা দেবার।

রাজরোষ থেকে অব্যাহতি পাবার প্রার্থনা আর মনে ঠাঁই পায় না, অবিরত চোখের জলে বুক ভাসে। হে চতুর্ভুজ নারায়ণ, হে ত্রিলোকনাথ, যে মুখ হ'তে সামান্য মানুষের ভয়ে তোমার মূর্তিমান বিগ্রহের সামনে মিথ্যাবাক্য উচ্চারিত হয়েছে, সেই মুখ এই মুহূর্তে দগ্ধ হোক, ভস্ম হোক, অথবা ভয়াবহ—বিকৃত—কুৎসিত হ'য়ে যাক। গ্রামবাসীর সম্মুখে সেই বিকৃত দগ্ধ মুখ দেখিয়ে যেন আপন পাপ ব্যক্ত করবার সাহস জন্মায় দেবার।

কাঁদতে কাঁদতে কখন এক সময় ঘুম এসে যায় অনুতপ্ত হতভাগ্যের। ভোর রাত্রে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেন দেবা : বংশীধারী শ্যামকিশোর রূপচতুর্ভুজের কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদামগুলি উজ্জ্বল রূপালী হ'য়ে গেছে। সেই শুভ্র উজ্জ্বল কুঞ্চিত কেশের নীচে অবস্থিত অপূর্ব সুন্দর আননে এক অদ্ভুত অভয় হাস্য!

প্রভাত হ'তে না হ'তে গ্রামে 'ঢেঁড়া' পড়ে গেছে—চতুর্ভুজের মন্দির-প্রাঙ্গণে সকলের জমায়েৎ হবার জন্যে। দেবার বিচার হবে। কৌতূহলী জনতা দলে দলে এসে হাজির হচ্ছে।

দেবা কিন্তু নিদ্রাতুর।

ভোরের সূর্য সাদা হ'য়ে উঠতে না উঠতেই বেজে ওঠে কাড়া নাকড়া—মহারাণা আসছেন! সঙ্গে জল্লাদ—জ্বলন্ত সাড়াশি দিয়ে দেবার জিভ ছিঁড়ে নেবার জন্যে। দেবমন্দিরের পূজারী হ'য়ে যে ব্যক্তি রাজ সকাশে মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করে, এ ছাড়া আর কি শাস্তি দেওয়া যায় তাকে?

"এই বুড়ো ওঠ্!" প্রহরীদের চীৎকারে ধড়মড় ক'রে উঠে বসেন দেবা। অবাক হ'য়ে এদিক ওদিক চান, জনতার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যায় সব কথা। কিন্তু দেবার হৃদয় থেকে ভয় দূর হ'যে গেছে। যে সমর্পিত-প্রাণ, তার কাছে ভয়ের বাসা! কোথায় বাসা নেবে? যেখানে ঈশ্বরানুভূতি, সেখানে ভয়ের মৃত্যু! যেখানে আত্মোপলব্ধি, সেখানে ভয়ের শেষ!

দেবা শিষ্টনীতি অনুসারে মহারাণাকে অভি-বাদন করেন। মহারাণা তীব্রস্বরে বলে ওঠেন, "এই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের জিভ জ্বলন্ত সাড়াশী দিয়ে ছিঁড়ে নাও। এ দেবতার সম্মুখে, রাজার সম্মুখে মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করেছে।"

হিংস্র জনতা কোলাহল ক'রে ওঠে। একের অপমানে অপরের আনন্দ! একের লাঞ্ছনায় অপরের উল্লাস! শত্রু হোক বা না হোক, চোখের সামনে কাউকে অপমানিত হ'তে দেখলেই মানুষের ভিতরের হিংস্র পশুটা উল্লসিত হয়ে ওঠে।

দেবা কোনদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। শুধু স্থিরভাবে বলেন, "আমি মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করিনি মহারাণা!"

"ফের! ফের এই নির্লজ্জতা!... ওহে শুনছ তোমরা, এই ভক্ত ব্রাহ্মণ বলেছে : চতুর্ভুজ নারায়ণ বৃদ্ধ হ'য়ে গেছেন, তাঁর কেশ পাক ধরেছে। বলেছে : বিগ্রহ জলপান করেছেন। এখন আবার বলছে, সে নাকি সত্য কথা বলেছে। এর কি শাস্তি হওয়া উচিত?"

জনতার মধ্যে কোলাহল ওঠে—

"জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ!" "বন্য কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো!" "জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত করা!"—"মার, মার, মেরে ফেল!"

একজন গ্রাম্য বৃদ্ধ এগিয়ে আসেন। জনতাকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে দুই হাত তুলে বলেন, "আচ্ছা, শাস্তিদানের পূর্বে একবার সত্য মিথ্যা যাচাই হোক না! মশারির আবরণ থেকে উন্মুক্ত ক'রে রূপচতুর্ভুজকে দেখা হোক।"

"ঠিক ঠিক!"

"এই দেবা, ঠাকুরকে ঘুম থেকে তোল্!"

দেবা ধীরে ধীরে বিগ্রহের সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হন, ধীরে ধীরে বিগ্রহের মশারি সরিয়ে দেন।

মন্দিরের ঘুলঘুলি পথে সকালের উজ্জ্বল আলো এসে ভিতরে ঝিকিমিকি করছে, ঝিকিমিকি করছে বিগ্রহের অঙ্গাভরণ, স্বর্ণালঙ্কার। আর সেই আলোয় ঝকমক করছে শুভ্র কুঞ্চিত কেশদাম। প্রস্তরময় দেবতার চুলগুলি রূপোর তারের মতো জ্যোতির্ময় হ'য়ে গেছে।

সেই কেশকলাপের নীচে অপূর্ব সুন্দর আননে অদ্ভুত এক অভয় হাস্য!

যাদু! যাদু! মায়া! কী দুঃসাহস! পাপিষ্ঠ দেবতাকে যাদু করেছে!

মহারাণা তীব্র গর্জনে বলে ওঠেন, "ভেবেছিলাম

ব্রাহ্মণের রক্ত গ্রহণ করবো না, কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর পাপিষ্ঠ লোককে জীবিত রাখাও মহাপাপ। রাতারাতি ও দেবতার মাথায় নকল কেশ পরিয়েছে, ওই নকল কেশগুলি উৎপাটন ক'রে এনে ব্রাহ্মণের গলদেশে জড়িয়ে দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে হত্যা করো।”

জল্লাদও কেঁপে ওঠে। কে পালন করবে এই আদেশ! হোক নকল, তবু কে উৎপাটন করবে দেবতার কেশ! কেউ না পারে, স্বয়ং মহারাণা আছেন।

সত্য-গর্বে গর্বিত মহারাণা নিজেই সদর্পে এগিয়ে যান, এবং সবলে বিগ্রহের ললাটের এক গোছা কেশ উৎপাটিত ক'রে নেন। সঙ্গে সঙ্গে রূপচতুর্ভুজের সুগঠিত ললাটের উপর গড়িয়ে পড়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত!

মূর্চ্ছিত হ'য়ে লুটিয়ে পড়েন মহারাণা!

* * *

কিংবদন্তী আছে অদ্যাবধি নাকি রাণা বা রাণা-বংশীয়দিগের উক্ত মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই।

জাগে ওই স্নেহের আহ্বান

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

আসিছেন জগৎ-জননী মৃত্তিকার ধরণীর 'পরে,
অম্লান স্বর্গীয় দ্যুতি ঝরিতেছে দিকে দিগন্তরে!
নেমে আসে অপার্থিব অলৌকিক রূপের প্রকাশ,
বনানী সাজিছে শ্যামা, গাঢ় নীল অসীম আকাশ!
ফুলে ফুলে ভ'রে গেছে মাঠ বাট বন উপবন,
মধুর সুরভি-শ্বাসে সুরভিত মৃদু সমীরণ।
জলে স্থলে জাগে সাড়া বিহঙ্গের সুমধুর গানে,
সুরে সুরে ভুবনের প্রাণ-ছন্দ বাজে সবখানে।
জড়েতে চেতনা জাগে, হাসি ঝরে দিগ্বধূ-অধরে,
ধরণীর অঙ্গে অঙ্গে ত্রিদিবের সুধা-ধারা ক্ষরে!

আসিছেন দশভুজা, আসিছেন কল্যাণ-রূপিণী,
আসিছেন বরাভয়া, সর্বময়ী নিখিল-ব্যাপিনী!
আসিছেন আদি-মাতা, সন্তানেরে বক্ষে তুলে নিতে,
অপার স্নেহের উৎস পিপাসার্ত হৃদয়ে ঢালিতে!
আসিছেন মহাশক্তি শক্তিহীনে শক্তি দানিবারে,
শুনাতে সান্ত্বনা-বাণী দীনাতুর সকল-হারারে!
ওরে অন্ধ, ওরে মূঢ়, চেয়ে দেখ্ খুলিয়া নয়ন,
মায়ের রূপের ভাতি ছেয়ে গেছে আকাশ-ভুবন।
মায়ের আশিস্ ঝরে ধরণীর ধূলি-পঙ্ক 'পরে,
তুলে নে' মস্তক পেতে রিক্ত নিঃস্ব অন্তরে অন্তরে!

খুঁজিয়া ফিরিস্ তোরা মরুভূমে কোথা তৃষ্ণাবারি,
মা'র দশভুজে রাজে তৃষ্ণাহারী অমৃতের ঝারি।
ছুটে আয় একবার, ফিরে আয় মায়ের সন্তান,
অনন্ত আকাশে শোন্—জাগে তাঁর স্নেহের আহ্বান।
মরীচিকা-ভ্রান্ত হ'যে কোথা যাস্, আয় ফিরে আয়,
সঁপে দে' হৃদয়-মন জননীর দু'টি রাঙা পায়!

'টাহো'র তীরে বেদান্ত-কুটীর

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। আমেরিকায় এখন গ্রীষ্মকাল—প্রখর কর্মজীবন থেকে একটু ছুটি নিয়ে আমেরিকানদের নিজের নিজের সুযোগ- এবং সঙ্গতি-অনুযায়ী কিছুকাল কোন ঠাণ্ডা জায়গায় বেড়িয়ে আসবার বহু-প্রত্যাশিত সময়। এদেশে ঘরে আর এখন কারো মন টেকে না। তিন লক্ষ বিরাশী হাজার বর্গ মাইলের এই বিরাট রাষ্ট্রে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের অভাব নেই; তাই, উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সব দিকেই বেড়াবার জায়গা প্রচুর। লক্ষ লক্ষ নরনারী ঘরের চিন্তা, কাজের চিন্তা, রাজনীতি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান-চর্চা আপাততঃ শিকেয় তুলে রেখে পথে বেরিয়ে পড়েছে—ট্রেনে, মোটরে, এরোপ্লেনে, বাসে আবার জাহাজেও। যেমনভাবে হোক দৈনন্দিন চালু জীবনের একঘেঁয়ে চাপ থেকে কিছুদিনের নিষ্কৃতি চাই-ই চাই। স্কুল কলেজ এবং সরকারী ও বেসরকারী সব অফিসেই গরমের ছুটির ব্যবস্থা আছে। যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাঁরাও স্বেচ্ছায় কিছুদিন গরম কালে বাহিরে বেড়াবার আনন্দ ভোগ করবার অবসর করে নেন, আর্থিক ক্ষতির প্রশ্ন তোলেন না। আমেরিকার নানা অঞ্চলে 'ন্যাশনাল পার্ক' বা সংরক্ষিত বন রয়েছে। তাঁবু এবং কয়েক সপ্তাহের ভ্রাম্যমাণ সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মোটর বা ষ্টেশন-ওয়াগনে ভর্তি করে বহু শত পরিবার এই 'ন্যাশনাল পার্ক'গুলির উদ্দেশ্যে চলেছে—বড় বড় রাস্তায় এই সময়কার এটি খুব সাধারণ দৃশ্য। আরণ্য প্রকৃতির মাঝখানে এদের গ্রীষ্মাবকাশ কাটবে। যান্ত্রিকতার শৃঙ্খল থেকে কয়েক দিন তো ওরা মুক্তি পাবে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বেদান্ত-সমিতির ভারতীয় সন্ন্যাসীদেরও গরমের ছুটি, কেননা, বেদান্তের ক্লাসে বা বক্তৃতায় যারা আসবে তাদের অনেকেই এ সময়ে বাইরে চলে যায়। তা ছাড়া সারা বছরই বেদান্ত-সমিতির কাজে সন্ন্যাসীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়—মাস দুই তাঁদের একটু বিশ্রাম খুবই প্রয়োজন। নিজ নিজ কর্মকেন্দ্রেই কেউ বিশ্রাম নেন, কেউ বা বাইরে কোথাও যান।

স্যানফ্রান্সিসকো বেদান্ত-সমিতি ১৯৩৮ সালে ক্যালিফর্নিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে লেক টাহো (Lake Tahoe) নামক স্থানে পাহাড়ের গায়ে একটি আশ্রম-গৃহ নির্মাণ করেন। ঐ বাড়ীটির সংলগ্ন দু'শ একর পাইন, দেওদার এবং সিডার গাছের বন ঐ সমিতির দখলে। অতএব এই আশ্রমটির নির্জনতা ব্যাহত হবার কোন আশঙ্কা নেই। স্যানফ্রান্সিসকো বেদান্ত-সমিতির সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা এবং আমেরিকার অন্যান্য আশ্রম থেকেও কোন কোন সন্ন্যাসী লেক টাহোর এই আশ্রমে গ্রীষ্মের ছুটির পুরো বা খানিকটা অংশ কাটিয়ে যান। বাড়ীটি থেকে কয়েক শত ফুট নীচেই ২৩ মাইল লম্বা এবং ১২ মাইল চওড়া বিরাট হ্রদ—লেক টাহো। স্বচ্ছ নীল তার জল। হ্রদের চারিদিকে আট থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু পর্বতমালার প্রাচীর। শীতকালে সমস্ত পাহাড়ই বরফে ঢেকে যায়। এখন এই জুলাইতে কোন কোন পাহাড়ের চূড়ায় কিছু বরফ রয়েছে। লেক টাহো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬২২৮ ফুট উচ্চে, আয়তন ১৯৩ বর্গমাইল, সর্বাধিক গভীরতা ১৬৪৫ ফুট।

টাহো হ্রদের এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ পাহাড় ও অরণ্যানীর শোভা অতি সুন্দর। এই অঞ্চলটি

'সিয়েরা নেভাডা' (Sierra-Nevada) পর্বতমালার অন্তর্গত। বর্তমান ক্যালিফর্নিয়া প্রদেশের পূর্ব সীমায় উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৪০০ মাইল ধরে এই পর্বতমালা বিস্তৃত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব বা মধ্য অঞ্চল থেকে সোজাসুজি প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে ক্যালিফর্নিয়া রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে 'সিয়েরা-নেভাডা' পর্বতশ্রেণী উল্লঙ্ঘন না করে উপায় নেই। আজ এই উল্লঙ্ঘন অতি সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়, কেননা, একাধিক প্রশস্ত রাজপথ এবং রেলপথও ঐ পর্বতমালার বুকের উপর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত হয়েছে এবং মোটরে বা রেলগাড়ীতে বসে সিয়েরা নেভাডার শৈলমালা অতিক্রম করবার সময়ে ওর ভয়াবহতা সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তাই আজকাল-কার যাত্রীদের চিত্তে উঁকি মারে না। কিন্তু একশ' বছর আগে অবস্থা এরূপ ছিল না। তখন এই পর্বতমালা ছিল একান্তই দুরতিক্রম্য। এর পূর্বদিক হাজার হাজার ফুট এত খাড়া এবং অনিয়তভাবে উঠেছে যে আরোহণেচ্ছুরা দূর থেকে দেখেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তো এবং উল্লঙ্ঘনের সঙ্কল্প ত্যাগ করতো। ফলে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইয়োরোপীয়, (বিশেষতঃ মেক্সিকো থেকে স্পেনদেশীয়) আগন্তুকগণ কর্তৃক আমেরিকার পশ্চিম উপকূলস্থ ক্যালিফর্নিয়া রাজ্য ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হতে আরম্ভ হবার পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্যালিফর্নিয়ার পূর্বসীমায় এই সিয়েরা নেভাডা পর্বতমালা একটি দুর্লঙ্ঘ্য বহস্য-প্রাচীরই রয়ে গিয়েছিল।

যবনিকা উঠবার সূত্রপাত হল ১৮৪৮ সালের ২৪শে জানুআরির অভিনব একটি আকস্মিক ঘটনার পর থেকে। ঐ তারিখে উত্তর ক্যালিফর্নিয়ায় জেম্‌স্ মার্শাল নামে জনৈক কাঠের কারখানার মালিক কারখানার কাজে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হলুদবর্ণ এক রকম ধাতব পদার্থের কিছু আঁশ পেয়ে যান। পরে প্রমাণিত হয় যে ঐ আঁশগুলি খাঁটি সোনা। কয়েক মাসের মধ্যেই এই খবর চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে এবং ফলে ১৮৪৯ সালে শুরু হয় ক্যালিফর্নিয়া, তথা আমেরিকার ইতিহাসের একটি চিহ্নিত ঘটনা—'স্বর্ণ-অভিযান' (Gold rush)। দলে দলে ভাগ্যান্বেষী উত্তর ক্যালিফর্নিয়ার ঐ অঞ্চলে সোনার খনি আবিষ্কারের জন্য রওনা হন। স্থলপথে ঐ বাঞ্ছিত ঐশ্বর্যভূমিতে পৌঁছুতে গেলে দুর্লঙ্ঘ্য সিয়েরা নেভাডা না ডিঙালে উপায়ান্তর নেই। অনাহার, অনিদ্রা এবং আরও বহুবিধ দুঃসহ কষ্ট বাধা বিপত্তি বরণ করে সিয়েরার গভীর জঙ্গল এবং উত্তুঙ্গ বরফাবৃত রূঢ় পাহাড়গুলির ভিতর ভাগ্যান্বেষীরা প্রবেশ করতে আরও করেন এবং অবশেষে পর্বতপ্রাচীরের পশ্চিমে নেমে পূর্বোক্ত স্বর্ণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই দুঃসাহসিক চেষ্টায় অবশ্য অনেকের মৃত্যুও ঘটেছিল। যাহোক ভাগ্যান্বেষীদের অভিযান সার্থক হয়েছিল। ক্যালিফর্নিয়ার ঐ অঞ্চল অচিরে এক বিস্তৃত সোনার খনি এলাকায় পরিণত হয় এবং ১৮৫০ সালে ক্যালিফর্নিয়া রাজ্য মেক্সিকোর স্পেনীয় আধিপত্য থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে আসে।

কিন্তু স্বর্ণ-অভিযানের আর একটি অবান্তর ফলও আমেরিকার ভূগোল ও ইতিহাসে কম চমৎকারী নয়। তা হল সিয়েরা নেভাডার শত শত বর্গ মাইল-ব্যাপী বিরাট দেহে ছোট বড় শত শত হ্রদের* আবিষ্কার। যে সোনা দিয়ে মানুষ পৃথিবীর ভোগৈশ্বর্য লাভ করতে পারে—পার্থিব মূল্য তার বিপুল সন্দেহ

* সিয়েরা-নেভাডার "যোসেমাইট পার্ক' নামক সংরক্ষিত বনে ৪২৯টি হ্রদ রয়েছে। টাহো হ্রদের দক্ষিণে ২২০ বর্গ-মাইলের মধ্যে ১০০ টিরও বেশী হ্রদ আছে। হ্রদগুলির সন্নিবেশও বড় বিচিত্র। কোনটি বৃক্ষপল্লবহীন কোন পাহাড়ের শিখর-দেশে, কোনটি বা রূক্ষ গিরিবর্ত্মের ভিতর, কোনটি বা গভীর জঙ্গলাকীর্ণ খাদের মধ্যে, কোনটি আবার কোন পার্বত্য তটিনীর নিম্নভাগে।

নেই, কিন্তু এই যে পাইন, সিডার, দেওদার, ইউকেলিপটাস এবং আরও নানারকম সুশোভন বৃক্ষরাজির সবুজ-শ্রীর মাঝে মাঝে বিশ্বস্রষ্টা এক একটি স্বচ্ছ জলরাশি বসিয়ে রেখেছেন—এগুলি মানুষের এক উচ্চতর প্রকৃতির কাছে অপরিমেয় সম্পদ্। স্বর্ণমূল্যে এর দাম নিরূপণ করা যায় না। যাঁরা সোনা খুঁজতে এসে সিয়েরা নেভাডার হ্রদের সৌন্দর্য-রাজ্য আবিষ্কার করেছিলেন, মানুষ তাঁদের কাছে বেশী ঋণী শেষের আবিষ্কারটির জন্যে। ক্যালিফর্ণিয়ার সোনার খনি মানুষের উন্মত্ত লোভে আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ক্যালিফর্ণিয়ার সৌন্দর্য উৎস এই হ্রদগুলি তাদের স্নিগ্ধগম্ভীর স্বচ্ছসুষমা এখনও সমানভাবে ধারণ করে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বহু শতাব্দী ধরে থাকবে। মানুষের ভিতর কাম-মোহ-লোভের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট যে রসময় পুরুষ রয়েছেন তিনি যেমন অমর—তাঁর জন্যে প্রকৃতির এই নৈবেদ্যও তেমনি অফুরন্ত।

'স্বর্ণাভিযানের' শুরু হতে এক বৎসরের মধ্যে সিয়েরা নেভাডার অনেকগুলি হ্রদ আবিষ্কৃত হ'ল, কিন্তু টাহোকে তখনও পুরোপুরি খুঁজে পাওয়া যায় নি। কোন কোন অভিযাত্রী দূর থেকে এই বিরাট হ্রদের খানিকটা অংশ মাত্র দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু চারিপাশের খাড়া পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে হ্রদটির প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভ করতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দুরতিক্রম্য পর্বত ও ঘন অরণ্যানীর মধ্যে লুকিয়ে-থাকা কিন্তু 'এখনও-অনাবিষ্কৃত' একটি বিরাট হ্রদের কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। ঐ সব লিখিত বিবরণ অন্যান্য সাহসিকদের মনে কৌতূহল উদ্রিক্ত করেছিল এবং এই সুগুপ্ত অতিকায় জলরাশির সম্বন্ধে বহুতর লৌকিক এবং অলৌকিক কথা-উপকথারও সৃষ্টি হয়েছিল। যাহোক, ১৮৬০ সালে টাহোতে পৌঁছবার রাস্তা এবং এর ভৌগোলিক অবস্থানও নির্দিষ্ট হয়। হ্রদটির 'টাহো' নামকরণ হয় আরও দু বৎসর পরে। এই অঞ্চলের আদিম উপজাতীয় আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানদের ভাষার দুটি শব্দ থেকে এই নামের উৎপত্তি। 'টা' মানে উঁচু বা খুব বড়, আর 'হ' মানে জল।



টাহো হ্রদ

এর পরই আরম্ভ হ'ল 'সভ্য' অর্থাৎ অর্থগৃধ্নু মানুষের আর এক নূতনতর প্রচেষ্টা। টাহোর তটবর্তী অতিকায়বৃক্ষরাজি-শোভিত দূরবিস্তৃত যে পার্বত্য বনে হয়তো হাজার হাজার বৎসর বনের পশু এবং উপজাতীয় অরণ্যচারী মানুষ ছাড়া অপর কারো পদসঞ্চার হয়নি, সেই বনভূমি কেঁপে উঠলো কাঠের ব্যবসায়ী, মাছের কারবারী এবং ঘাস-উৎপাদকদের কল কারখানার শব্দে! জঙ্গল পরিষ্কার হতে লাগলো, বাড়ী ঘর রাস্তা তৈরী শুরু হ'ল, উপত্যকায় চাষের যন্ত্রপাতি চলতে আরম্ভ করলো। ভ্রমণকারীদেরও দেখা যেতে লাগলো এবং তাঁদের জন্যে খাড়া হ'ল সরাই, হোটেল ইত্যাদি। এ সত্ত্বেও এই বিরাট হ্রদ ও তার পারিপার্শ্বিকের সৌন্দর্য তখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষুণ্ণ হয়নি। রেভারেণ্ড টমাস স্টার কিঙ্ নামে একজন ধর্মযাজক ১৮৭০ সালের গ্রীষ্মে টাহোতে বেড়াতে আসেন। তিনি লিখে গেছেন :

"এই বিরাট হ্রদের তটভূমির অধিকাংশই অনধিকৃত রয়েছে, তীরের চারিপাশের পাহাড়ে বিরাট বিরাট বৃক্ষকুঞ্জের অনেকগুলিতে মানুষের পদচিহ্ন এখনও পড়েনি। এই হ্রদের সুদূরব্যাপ্ত স্বচ্ছ জলরাশি যেন বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা ও নির্মলতার প্রতীক। হ্রদটির জন্মের প্রারম্ভ থেকে এর জল মর্ত্যমানুষের কোন কাজে উচ্ছিষ্ট হয়নি। এখানকার নিভৃত আরণ্য সৌন্দর্যের কখনও তিলমাত্র হানি হয়নি।"

কিন্তু টাহোর এই একান্ততা বেশী দিন অব্যাহত থাকেনি। বৎসরের পর বৎসর হ্রদের চারিপাশে বসতি গড়ে উঠতে লাগলো, ছোট ছোট শহর জমতে আরম্ভ করলো, হ্রদের এলাকায় পৌঁছুবার জন্য নানা দিক থেকে প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হ'ল, হ্রদের তটে জায়গায় জায়গায় বীচ্ (beach) বা সন্তরণ ও ভ্রমণের প্রশস্ত বালু-তট নির্মিত হ'ল, হ্রদের বিশাল বুকে ছোট বড় নানা বাষ্পীয় এবং তৈলচালিত পোত জুটতে লাগলো। ১৮৭৩ সালে টাহো শহরে মাত্র ৫০টি বাড়ী ছিল, ১৮৮৯ সালে এদের বিভিন্ন এলাকায় টাহো শহরের অনুকরণে ৭৮টি বসতি গোনা যেত। আজ ১৯৫৭ সালে টাহো হ্রদকে বেড়ে ২৫টি শহর এবং কুড়িটি ডাকঘর রয়েছে। বাড়ীঘর হাজার হাজার।

* * * *

টাহো হ্রদের পশ্চিম কূলে একটি জায়গায় হ্রদের এক অংশ জমির দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। এই অংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'কার্নেলিয়ান উপসাগর' (Carnelian Bay)। এখানকার তট থেকে যে পাহাড়টি উঠেছে তারই উপর আমাদের 'বেদান্ত-কুটির'। এই জুলাইতে স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সমিতির দুইজন ভারতীয় সন্ন্যাসী ও একজন আমেরিকান ব্রহ্মচারী এবং নিউইয়র্ক বেদান্ত-সমিতির স্বামী পবিত্রানন্দজী এখানে বিশ্রাম করতে এসেছেন। এর আগে জুন মাসে এসেছিলেন প্রভিডেন্স এবং বোস্টন বেদান্ত-কেন্দ্রদ্বয়ের পরিচালক স্বামী অখিলানন্দজী। ঐ সময়ে একটি বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে টাহোতে আমেরিকার প্যাসিফিক উপকূলের দার্শনিক-সম্মেলন আহূত হয়েছিল। আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এসেছিলেন। অখিলানন্দজীকে বিশেষ আমন্ত্রণদ্বারা বোস্টন থেকে ডেকে আনা হয়েছিল, কেননা 'Hindu Psychology' (হিন্দু মনোবিজ্ঞান) এবং 'Hindu View of Christ' (হিন্দুর দৃষ্টিতে খ্রীষ্ট)—এই বই দুখানির লেখক হিসাবে এদেশের অনেক দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীর কাছে তিনি সুপরিচিত। প্রায় একমাস টাহোর 'বেদান্ত কুটিরে' বাস করে তিনি ঐ সম্মেলনের অধিবেশনগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ও ক্লাসগুলি প্রভূত সমাদর লাভ করেছিল। ছাত্রছাত্রীরা বলতো, আমরা কলেজে পুঁথিতে আলোচনা তো বহুত শুনেছি, ওতে আমাদের প্রাণ ভরে না; we want to hear the

Swami—আমরা এই স্বামীজীর কথা শুনতে চাই। অখিলানন্দজীর সপ্রেম ব্যবহার এবং সদাপ্রফুল্ল স্বভাব তরুণদের মুগ্ধ করেছিল। তাঁর একটি প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল 'মানসিক স্বাস্থ্য ও ধর্ম' (Mental Health and Religion)।

পূর্বোক্ত সন্ন্যাসিত্রয় বিকালে বনের মধ্যে বেড়াতে বেরিয়েছেন—পাইন, সিডার ও দেওদারের বন। ওঁদের মনে পড়ছে হিমালয়ের পরিবেশের কথা। প্রায় এক হাজার ফুট নীচে হ্রদের চারিপাশের 'হাই-ওয়েতে' অনবরত অসংখ্য মোটরগাড়ীর যাতায়াত এবং হ্রদের তটে তটে গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করতে আগত হাজার হাজার নরনারীর ভিড়ের কথা—উপরের এই জঙ্গলে অনায়াসেই ভুলে থাকা যায়। ওই-খানেই আমেরিকা—প্রচণ্ড রাজসিক প্রবৃত্তির তীব্রবেগে সদা-সঞ্চরণশীল মহাশক্তিমান্ 'ডলারে'র একনিষ্ঠ উপাসক আমেরিকা! কিন্তু এক হাজার ফুট উপরে এই শান্ত আরণ্য প্রকৃতি হিমালয়ের বনভূমির সহিত যেন এক ধর্মে বাঁধা। মানুষ তার অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের জন্যে মানুষের সঙ্গে ভেদ গড়ে তোলে, এই ভেদ যে কত কৃত্রিম তা সে বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতিতে তো কোন ভেদ নেই। দশ হাজার মাইল দূরের নির্জন বনভূমিতে দশ হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত বৃক্ষ-লতা-পাতার একই শান্তি বিকীর্ণ হয়। সন্ন্যাসীরা তাই সাময়িকভাবে ভুলে গেছেন যে তাঁরা ভারতবর্ষের পাহাড়ে আসেন নি, ঝাউ দেবদারুর মাথায় হাওয়া বয়ে সেই মিষ্টি অনবচ্ছিন্ন সিরসির শব্দ, গাছপালার নীচে প্রবাহিত পাহাড়ী নদীর সেই একতান কলকল সঙ্গীত, এই জনহীন প্রশান্ত পারিপার্শ্বিকে হিমালয়ের তপোবনেরই মতো চিত্তে চরাচরব্যাপী পরম সমতার অনুধ্যান।

হাজার ফুট নীচে ওদের গ্রীষ্মাবকাশের জীবন-ধারা দেখতে সন্ন্যাসীরা একদিন দুপুরে বেরিয়েছেন। হ্রদের চারিপাশ বেড়ে প্রশস্ত রাজপথ—১০০ মাইলেরও উপর লম্বা। জর্জ গাড়ী চালাচ্ছে—৩২ বৎসর বয়স্ক আমেরিকান যুবক জর্জ জিলেট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকান পদাতিক-বাহিনীর একজন সৈনিক ছিল সে। বেলজিয়ামে শত্রুর বুলেট একদিন তার পাঁজর ভেদ করে দেয়—বাঁচবার কোনই আশা ছিল না, তবুও বাঁচে। দেশে ফিরে ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম্-এ পাশ করে। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা অত্যাচার লোভ দম্ভ—জর্জ দুচোখে দেখেছে। জীবনের গভীরতর প্রশ্ন তাকে উন্মনা করে। এমন সময় পেল বেদান্তের সন্ধান; আকৃষ্ট হয়। জীবন রহস্যের সমাধান জর্জ বেদান্তের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে এবং ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করেছে। ভারতীয় সন্ন্যাসীরা তার বড় আপনার জন।

একশ' মাইল দীর্ঘ রাস্তার ডান পাশে সুবিশাল টাহো হ্রদ—বামপাশে পাহাড় এবং উপত্যকা। রাস্তা যে বরাবর হ্রদের তট দিয়ে গেছে তা নয়, কোথাও তটের উপর—যেখানে কোন বন উপবন বসতি পড়েছে, সেখানে রাস্তা বামে সরে এসেছে। এক এক জায়গায় বিশেষ বিশেষ নাম নিয়ে স্নানের জায়গা বা বালুতট (beach)। এখানে শত শত নরনারী বালকবালিকা রৌদ্র সেবন এবং স্নানের জন্য ভিড় করেছে। আশ্চর্য, যে সভ্যতার একটি প্রধান স্তম্ভ হ'ল পোষাক সেই সভ্যতার মেয়েপুরুষরা গ্রীষ্মাবকাশে ছুটির জায়গাতে বেশভূষা সম্বন্ধে একেবারেই বেপরোয়া! যে রকম খুশি, যত কম খুশি পোষাক পরে দলে দলে সবাই বালুতটে উপস্থিত। কেউ কেউ ছোট মাদুর বা গালিচা নিয়ে এসেছে, বালুকার উপর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। এক ঘণ্টা এই রকম পড়ে থাকবে। উপরে অনন্ত আকাশ, সামনে দূর-প্রসারিত স্বচ্ছ নীল জলরাশি, নীচে পৃথিবীর মাটি। ওদের চেতনা বোধ করি একটা নতুন অনুভূতিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। যন্ত্রের শৃঙ্খল নেই, লোকাচারের ভ্রূকুটিও

নেই, রাজনীতি সামাজিকতা, এ সবও যে বন্ধন—তাই যেন ওরা আজ বলতে চায়। কারাও বা শুধু বালির উপর শুয়ে পড়েছে। অনেকে জলে নেমে সাঁতার কাটছে। সম্ভবণের অনেক ক্লাব জায়গায় জায়গায়। স্থানে স্থানে নানা ছাঁদের, নানা আকারের মোটর বোটের ঘাঁটি। ভাড়া নিয়ে একজন বা দুজন বা বেশী—টাহোর জলের উপর সেই বোট ছুটিয়ে চলেছে। সকাল থেকে আরম্ভ করে বিকাল পর্যন্ত টাহোর বুকে শত শত এই মোটর বোটের অভিযান চলে। তুমুল শব্দ! কোন কোনটির গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ মাইলেরও উপর।

রাস্তার ডানপাশে হ্রদের তটে, অথবা বামপাশে কোন উপত্যকায় মাঝে মাঝে 'ট্রেলার ক্যাম্প' বা চলমান ঘরের ছাউনি। একটি সুবৃহৎ গাড়ীর মতো দেখতে, অ্যালুমিনিয়ম বা অপর কোন হালকা উপাদানে তৈরী, চাকা-বসানো ক্ষুদ্র ঘরের নাম 'ট্রেলার'। এই ঘরের মধ্যে একাধিক কক্ষ আছে; চেয়ার, টেবিল, শয্যা, খাবার সরঞ্জাম, মুখধোবার বেসিন—কোনটিরই অভাব নেই। মোটর কারের পেছনে জুড়ে ট্রেলারটি যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া যায়। গ্রীষ্মের ছুটি যারা কাটাতে আসে তাদের অনেকেই হোটেলে বা ভাড়াটে ঘরে না থেকে ট্রেলারে থাকে। এতে খরচ কম পড়ে। এক একটি ট্রেলার ক্যাম্পে ৫০।৬০, এমনকি একশ' পর্যন্ত ট্রেলার রয়েছে। ট্রেলার ক্যাম্প ছাড়া অন্য জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে ট্রেলার রাখবার নিয়ম নেই এখানে।

টাহো পরিক্রমার একশ' মাইল রাস্তার দুপাশে বড় হোটেল এবং ভাড়াটে বাড়ী। হোটেলগুলি এ সময়ে সরগরম। হোটেলগুলির পরিচ্ছন্নতা এবং হোটেল-কর্মচারীদের অমায়িকতা দেখবার মতো। টাহো হ্রদের খানিকটা অংশ ক্যালিফর্নিয়ার অব্যবহিত পূর্বদিকের সংলগ্ন প্রদেশ নেভাডার মধ্যে পড়েছে। ক্যালিফর্নিয়ায় জুয়া-খেলা বে-আইনী, কিন্তু নেভাডায় নয়। তাই পরিক্রমার রাস্তাটি ক্যালিফর্নিয়ার সীমা পার হলেই দু'ধারে অনেক জুয়ার আড্ডা দেখা যায়। গ্রীষ্মাবকাশ কাটাবার এও একটা বড় আকর্ষণ। জায়গায় জায়গায় 'গিফ্‌ট্ শপ'। যারা ছুটিতে এখানে আসে তারা প্রিয়-জনদের উপহার দেবার মতো নানারকমের দ্রব্যসম্ভার এই দোকানগুলিতে কিনতে পারে, শুধু আমেরিকান জিনিস নয়—চীন, জাপানী, মেক্সিকো এবং অন্যান্য নানাদেশের কুটীরশিল্পের নমুনা। ভ্রমণবিলাসীরা খুব উৎসাহের সঙ্গে এই সব জিনিস কিনে নিয়ে যায়—টাহোর স্মৃতি।

রাস্তার বামপাশে মাঝে মাঝে এক একটি রাস্তা পাহাড় এবং উপত্যকার ভিতর দিয়ে হ্রদের বিপরীত দিকে বেরিয়ে গেছে। কোনটি বা কোন পর্বতশিখরে, কোনটি বা সিয়েরা নেভাডার আর কোন হ্রদের অভিমুখে। যারা গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে আসে তারা এসব রাস্তা ধ'রে এক একটি জায়গায় এক একদিন বেড়াতে বা চড়ুইভাতি করতে যায়। ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে চড়াই-উৎরাই করাও গ্রীষ্মাবকাশের একটি আনন্দ। ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়।

* * * *

ভারতীয় সন্ন্যাসীরা বেদান্ত-কুটীরে ফিরে এসেছেন—আমেরিকায় তাঁদের স্বকীয় ভারতবর্ষে। ফিরে এসে তাঁরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। হাজার ফুট নীচেকার জীবন থেকে হাজার ফুট উঁচুকার জীবনে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিপুল বই কি। আমেরিকার ঐশ্বর্য আছে, উদ্যম আছে, বহুমুখী কারিগরী-বিজ্ঞান আছে—সেই ধনবল, কার্যকারিতা ও বৈজ্ঞানিক কুশলতার প্রয়োগে এই দেশে টাহো এবং টাহোর মতো এমন শত শত হাজার হাজার স্থান বিরাম এবং প্রমোদের জন্য গড়ে

উঠেছে। কর্মব্যাপৃতির ফাঁকে ফাঁকে শরীর মনের বিশ্রাম ও বিনোদের প্রযোজন অবশ্যই অনস্বীকার্য। কিন্তু সন্ন্যাসীরা ভাবছেন ভারতবর্ষে টাহোর মতো মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীতে ভারতবাসী কি গড়ে তুলেছে এবং তোলে? গড়ে তুলেছে মন্দির; পূজা, উপাসনা এবং নিভৃত চিন্তার স্থান: গড়ে তুলেছে আধ্যাত্মিক আদর্শে অনুপ্রাণিত কারুকলা, ভাস্কর্য। ভাবতে এখনও সহস্র সহস্র নরনারী পাওয়া যাবে যারা জীবনের অবসর কাটাতে চায় অতি-জীবনের অনুসন্ধানে। আমোদ-প্রমোদ অবশ্যই প্রযোজন, কিন্তু একমাত্র প্রযোজন নয়। এই পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের উত্তেজনায় কেবলই ছুটে চলা মনুষ্যজীবনের গরিমাকে ক্ষুণ্ণ করে। এই গরমে টাহোতে হাজার হাজার আমেরিকান পুরুষ মেয়ে ছুটি কাটাতে এসেছে; তাদের কাছে ঐ উদার গম্ভীর পর্বতমালা, ঐ শ্যামল বনরাজি, ঐ নীল স্বচ্ছ প্রশান্ত জলরাশি—শুধু কি এই মর্ত্যলোকের ভাষাই শুনিয়ে যাবে? কেউ কি শুনবে না প্রকৃতির এই মহান দূতদের নিকট সত্যশিবসুন্দরের চিরন্তন বাণী, কেউ কি দেখবে না ওদের মূর্তির মধ্যে 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'এর প্রতিচ্ছায়া?

ধ্যানের ঠাকুর

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মন্ত্র আমি জানিনাক, জপতপে নাহিক বিশ্বাস
পরের রচিত স্তোত্রে দেবতার চিত্তবিনোদন
অনাদিকালের রীতি, প্রাণায়ামে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
হয়ত নিহিত তত্ত্ব আছে তাতে, আত্ম উদ্‌বোধন।

কিছুমাত্র লাভ ক্ষতি নাহি তাতে জেনেছি নিশ্চয়
শুধু সত্য ধ্যানযোগ, তন্ময়তা নিরালা নির্জনে,
একান্ত প্রাণের মাঝে শিহরণে জাগিবে বিস্ময়
রূপ হতে অরূপের ব্যবধান রহিবে না মনে।

আমরা ঝড়ের শব্দে ছুটে যাই পথে ও প্রান্তরে
বিদ্যুৎ-চিহ্নিত পথে খুঁজে ফিরি শুধু অকারণ,
আকাশের বর্ণচ্ছটা লুটে নিই প্রলুব্ধ অন্তরে
কোথায় অস্তিত্ব তব? কোন স্বর্গে কর বিচরণ?

আমাদের কল্পনার বিচিত্র বিকাশ মাত্র তুমি
অপ্রত্যক্ষ হে দেবতা মানুষেরই মহিমা-সম্বল,
আকাশে উন্নত শীর্ষ পদতলে শ্যাম বনভূমি
স্বর্ণসিংহাসনে তবু আমাদেরি দীপ্তি অচঞ্চল।

তোমারে চিনিনা আমি, তবু আমি জানি একজনে
সে আমার মিশে আছে এ প্রাণের শোণিত-প্রবাহে,
ধ্যানের ঠাকুর সে যে, ফিরি আমি তারি অন্বেষণে;
শ্রাবণের বৃষ্টিধারা সে আমার মর্ম-দাবদাহে।

কৈলাস ও মানস-সরোবর

স্বামী নির্বৈরানন্দ

সংযোগটা আকস্মিক, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত। ৬ই জুন, ১৯৫৫। যথাসময়ে বেনারস এক্সপ্রেসে উঠে বসলাম আমরা তিন জন। "জয় কৈলাসপতিকী জয়" ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্যে ট্রেন হাওড়া ষ্টেশন ছাড়ল। পরদিন শিবপুরী কাশী। পুণ্যক্ষেত্রে ত্রিরাত্রি বাস করে গঙ্গাস্নান ৺বাবা বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করে অদ্বৈত-আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দজীর কাছ থেকে তাঁর পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা আহরণ করে আমরা লখনৌ হ'য়ে আলমোড়া পৌঁছে দেখি বাস-ষ্ট্যাণ্ডে আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য অনেকে উপস্থিত। অনুভব করলাম সর্বত্র আমাদের আত্মীয়, সর্বত্রই আমাদের ঘর। আলমোড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ আমাদের জন্য তিনটি 'বিশ্বাসী' কুলির ব্যবস্থা করে দিলেন। আলমোড়া থেকে গার্বিয়াংএর দূরত্ব ১৪৫ মাইল। প্রত্যেক কুলিকে ৬৩৲ হিসাবে দিতে হবে। আরও একটি দল আলমোড়ায় এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তাদের কুলির ব্যবস্থা না হওয়ায় আমরাই আগে গার্বিয়াংএর পথে রওনা হলাম—পদব্রজেই, ১১ই জুন। আমাদের তখন এক চিন্তা, কেমন করে নির্বিঘ্নে যাত্রা সফল হবে, কৈলাসপতির দর্শন কেমন করে লাভ করব।

কুলিদের নিয়ে প্রথমটায় বেশ একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। একজন কুলি মাল বেশী বলে আপত্তি করে—আর একজন ৩।৪ মাইল চলার পর সরে পড়ল। তাই সহযাত্রী একজনের উপর ভার দিলাম ওদের সঙ্গে সঙ্গে আসবার জন্য।

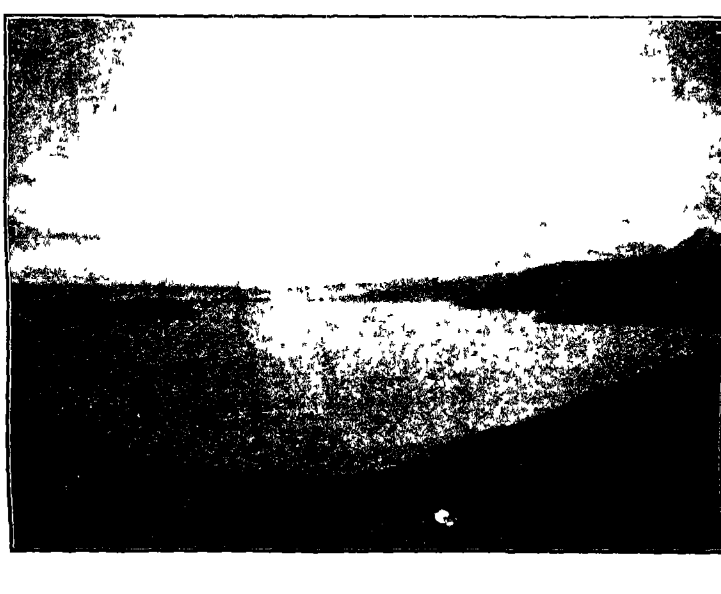
দারুণ রোদের তেজ। আলমোড়া থেকে ৮২ মাইল পথ চলার পর আমরা বেলা ২॥•টার সময় 'বেড়চিনা'তে এসে পৌঁছাই। এবার আমাদের চড়াই-উৎরাইএর পালা শুরু। এখানে যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দিরের স্থানটী বড়ই মনোরম, কাছেই নদী। আমরা খুব আনন্দে স্নান ক'রে কাপড় চোপড় কেচে নিলাম। সেরসিং-এর দোকানে ভাত, ডাল, তরকারি খেয়ে ভারি তৃপ্তি হল।

পরের দিন খুব ভোরে রওনা হয়ে ৫ মাইল হেঁটে 'ডালচিনা' পেলাম। সেখানে না থেমে আরও আগে 'কানারীচিনা'য় দুপুরের আহার ও বিশ্রামের কথা। এবার নিজেদের রান্নার পালা। দলের কেউ-ই রান্না জানেন না। আমিই এ গুরু দায়িত্ব মাথা পেতে নিলাম। কানারীচিনায় ডাকঘর আছে, জলের কিন্তু অত্যন্ত অভাব। কুলিরা বললে মাইল দুই এগিয়ে গিয়ে নদী পাওয়া যাবে। উৎরাই করে ত নেমে গেলাম—আবার চড়াই করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। দু মাইল অগ্রসর হলে দোকান পাওয়া যাবে শুনলাম। সহযাত্রী ইতিমধ্যে কুলিদের নিয়ে 'কানারীচিনায়' এসে হাজির। কুলিরা আর এগিয়ে যেতে চায় না। আমাদের বহু নীচে দেখতে পেয়ে ফিরে যেতে ইঙ্গিত করছে। শংকর ফিরে যেতে রাজী নয়। কাজেই একটী দোকানে গিয়ে হাজির হলাম। দোকানদার খাবারের ব্যবস্থার জন্য বাড়ীর ভেতর গেল। কিছু পরেই অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে এসে বললে, "মহারাজ, আমার ছেলেটিকে সাপে কামড়েছে—আপনারা দয়া করে কিছু ওষুধ দিন। ছেলেটিকে আমার বাঁচিয়ে দিন মহারাজ।" বেচারার এই বিপদ দেখে আমাদের ভারি দুঃখ হ'ল। সহযাত্রী একটা ওষুধ বলে দিলে, কিন্তু সেখানে পাওয়া গেল না। বেচারার জন্য দয়াল ঠাকুরের কাছে মৌন প্রার্থনা জানিয়ে ফিরে এলাম। এসে সঙ্গে শুকনো চিঁড়ে ফল, যা ছিল তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল।



দূর হইতে কৈলাস

তিনটি ফ্লাস্কের মধ্যে একটা পড়ে ভেঙে গেল। তাই মন খারাপ। সরযূ-নদীর তীরে সেরাঘাটে এসে উপস্থিত হলাম বিকেলে। এই সেই পবিত্র সরযূ রামায়ণের আদি ও অন্তে প্রবাহিতা।



মানস-সরোবর

আমি কিছু পূর্বেই এখানে পৌঁছে রান্নাবান্না আরম্ভ করে দিয়েছি। দুপুরে ভাত খাওয়া হয়নি। সকলে বেশ তৃপ্তি করে নদীতে স্নান করে আহার করলাম। সেরাঘাটে একটীমাত্র ধর্মশালা। আমরা যাত্রী অনেকগুলি। রাত্রে বেশ গরম—ঘুম বড় একটা কারো হ'ল না। কেউ কেউ আবার নদীর তীরে গেলেন শুতে, কিন্তু হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি আসায় ভিজতে ভিজতে ফিরে এলেন তাঁরা।

ভোরে রওনা হয়ে আমরা দুপুরে এক জায়গায় খাবার ব্যবস্থা করে 'বনস্পতম্'এ এসে উপস্থিত হলাম। স্থানটী ভারি মনোরম। চারিদিকে সবুজ ধানের ক্ষেত—আর খুব সমতল জায়গা দেখে বাংলা-দেশের কথা মনে পড়ে গেল। দিনের আলো নিভে গেলে একজন সঙ্গী পেট্রোম্যাক্সটি জ্বালিয়ে দিল—আর সেই নির্জন অন্ধকার আলোয় ভরে উঠল।

আজ ভোর থেকেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আমরা বর্ষাতি-গায়ে রওনা হলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর এক দোকানে গিয়ে গরম দুধ কিনে দোকানদারকে জিগ্যেস্ করছি, দুধে জল মেশাওনি ত? সে ত চটে বললে, "কী, আমি গরীব হতে পারি কিন্তু অধর্ম করে পয়সা নেব?" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সপরিবারে এই লোকটী ব্রহ্মদেশ থেকে এসে এখানে বসবাস করছে। তার সততা দেখে ভারি



একটি তিব্বতী পরিবার

আনন্দ হ'ল, বললাম কিছু মনে ক'রো না।" এই শুনে সে শান্ত হয়ে প্রাণ খুলে জীবনের সব সুখ দুঃখের কথা বলতে শুরু করে দিল। আমাদেরও শুনতে বেশ লাগল। আসার সময় তার ছেলেমেয়েদের হাতে কিছু বিস্কুট দিয়ে পরিতৃপ্ত হলাম।

রোজ পথ-চলার পরেও রান্নার ভার আমাকেই নিতে হয়েছে। 'থলে' রামগঙ্গার পুল দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় একটী পাহাড়ী যুবকের সঙ্গে দেখা, রোজ ১।০ মজুরি নিয়ে সে পাচকের কাজে নিযুক্ত হয়ে গার্বিয়াং পর্যন্ত যেতে রাজী হ'ল।

এদিকে একটি কুলিকে নিয়ে আর এক বিভ্রাট। সে প্রথম থেকেই অসুস্থ, আমাদের কিছু না বলে ফাঁকি দিয়ে এত দূর চলে এসেছে। পথে আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আর মাল নিয়ে এগোতে পারে না। তখন বেচারার এই বিপন্ন অবস্থা দেখে বললাম, 'তোমাকে আর মাল নিতে হবে না। এমনি আমাদের সঙ্গে চল। খাওয়া পাবে, কিন্তু মজুরি পাবে না। একটু সুস্থ হলে আবার মাল নেবে।' পথে ঘোড়াসমেত একটি লোক পাওয়াতে মালগুলি তার কাছে দিয়ে চলেছি। আমাদের সদয় ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে কুলিটা কিন্তু বেজায় গোলমাল আরম্ভ করল—বলে, আমাকে খাওয়া মজুরি দুইই দিতে হবে, কিন্তু মাল নিতে পারব না। তখন নিরুপায় হয়ে রাগের অভিনয় করে উগ্রমূর্ত্তি ধরে তার প্রাপ্য চুকিয়ে তাকে বিদায় দিলাম। এই দেখে সঙ্গীদের হাসি আর থামতে চায় না।

আবার যাত্রা শুরু হ'ল। একটু চড়াই-উৎরাই করার পরে ঘোড়াগুলির আসল রূপ ধরা পড়ল। একটা ঘোড়া অত্যন্ত রুগ্ণ, সে ত আর এগোতে পারে না দু পা যায়, আবার দাঁড়িয়ে পড়ে, অথচ তার পিঠে কোন মালপত্র নেই, আমি তাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার ভার নিলাম। কিন্তু যে চলবে না তাকে চালাব কেমন করে? অগত্যা তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললাম। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে যখন ডিডিহাটে পৌঁছলাম তখন রাত ন'টা।

শঙ্কর নূতন পাচককে নিয়ে পূর্বেই পৌঁছেছিল। রান্নাও তৈরী, খাওয়াটা খুব তৃপ্তি করেই হ'ল। পরের দিন রুগ্ণ ঘোড়াটিকে মালিকের কাছে রেখে অন্ধকার থাকতেই যাত্রা করলাম। তখনও তারাগুলি একেবারে ম্লান হয়ে যায় নি। নবপ্রভাতের অরুণ আলোয় আবার নূতন আশার সঞ্জীবনী স্পর্শ পেলাম।

দুপুরে 'আসকোট'—পার্বত্য সহর। আলমোড়া থেকে 'আসকোট' ৭০ মাইল দূরে। এখানে রান্নাবান্নার পালা তাড়াতাড়ি সেরে রওনা হওয়া চাই; কেন না আজ জোলজীবি পৌঁছতে হবেই। জোলজীবি স্থানটী ভারি মনোরম। এখানে কালীগঙ্গা ও গৌরীগঙ্গা একত্র মিলিত হয়ে দ্বিগুণ বেগে সমতলের দিকে চলেছে। সঙ্গমস্থলে স্নান করার লোভ সংবরণ করা শক্ত। তাই নানা বাধা সত্ত্বেও স্নান সেরে দূরে একটী পাথরের উপর স্থির হয়ে বসে প্রকৃতির অপূর্ব শোভা দেখতে লাগলাম। বিরাটের চিন্তায় মনপ্রাণ আনন্দে ভরে উঠল।

চমক ভাঙতে দেখি সঙ্গীরা কখন উঠে গেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে উঠতে হ'ল। জোলজীবিতে রাত্রি বাস করে পরের দিন বাবলাকোট হয়ে ধারচুলার দিকে রওনা হলাম।

ধারচুলা আলমোড়া থেকে ৯০½ মাইল। রাত্রে খাবার ব্যবস্থা কিছু ছিল না। চেক পোষ্টের বারান্দায় রাত্রি যাপন করলাম। রাত্রেই আমাদের নাম ধাম সব লিখিয়ে ভোরে গার্বিয়াংএর দিকে রওনা হলাম মনের উল্লাসে।

এবারেই কঠিন পথ আরম্ভ হ'ল। কেবল চড়াই আর উৎরাই, পথও সঙ্কীর্ণ এবং বিপজ্জনক। পাশাপাশি দুজন লোক এক সঙ্গে যেতে পারে না। ধারচুলা থেকে গার্বিয়াংএর পথে পাল পাল ছাগল ভেড়া চলেছে। একদল পার হয়, আর একদল এসে পথ আগলায়। এরই মধ্যে পাশ কাটিয়ে পথ করে নিতে হবে—নইলে ঢেউ থামলে সমুদ্রে স্নান করার মত অবস্থা হবে। উপরের দিকে অনন্ত পাহাড়—আর নীচে, বহু নীচে গম্ভীর-নিনাদিনী কালীগঙ্গা, মধ্যে সরু পথ। একটু পা পিছলেছে তো—একেবারে গড়িয়ে গড়িয়ে হাজার ফিট নীচে, পার্বত্য নদীর স্রোতে।

পথের অবস্থা দেখে সঙ্গীরা ভয় পেয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন—ছাগলের দলটী শেষ হোক তারপর যাত্রা শুরু করব। কিন্তু এক একটী দল পার হতে এক ঘণ্টা, কাজেই বুঝিয়ে সুজিয়ে ধরাধরি করে সকলকে নিয়ে অগ্রসর হতে হ'ল।

প্রাণ তো ওষ্ঠাগত। দু মাইল পথ চলার পর তপোবনে এসে দেখি,—একটী সুন্দর আশ্রম; দেখে ভারি আনন্দ হ'ল। আরো এগিয়ে দেখি আমাদের আশ্রম একটী। স্বামী অনুভাবানন্দজী হিমালয়ের এই মনোরম স্থানে ছিলেন একদিন, কিন্তু আশ্রমটি আজ শূন্য পড়ে আছে।

প্রায় সাত মাইল হাঁটার পর আমরা 'এলা'য় এসে হাজির হলাম। একটী মাত্র ছোট্ট ধর্মশালা; কিন্তু যাত্রী আমরা অনেকগুলি। কালীনদীতে স্নান করে খাওয়া দাওয়া সারা হ'ল। রাত্রিটি ওখানে কাটিয়ে আবার আরো দুর্গম পথে যাত্রা শুরু। এই চড়াইটির নাম 'পঙ্গুর'। জানি না 'পঙ্গু' থেকেই পঙ্গুর নাম হয়েছে কি না। সঙ্গীরা সত্যি পঙ্গু হয়ে পড়লেন।

"জয় কৈলাসপতিকী জয়" ধ্বনি করে "মুখে হাসি বুকে বল"—এই সঙ্কল্প নিয়ে চলতে থাকি। সকলে অতি ধীরে ও সন্তর্পণে চলি। চড়াই শেষ করতে প্রায় ৫ ঘণ্টা লাগল। উপরে উঠে একটী চায়ের দোকানে সঙ্গীদের রেখে রান্নার ব্যবস্থায় গেলাম।

ভয়ঙ্কর মাছির উৎপাত। অতি কষ্টে খাওয়ার পর্ব শেষ করেই রওনা হতে হ'ল। বিশ্রাম করার উপায় নেই। তিন মাইল 'ছোসার' চড়াই শেষ করে সিরকাতে এসে হাজির হই। জায়গাটি ভারি সুন্দর। বহু আপেল ও নাসপতির বাগান রয়েছে। এই সিরকাতেই আমরা হিমালয়ের শীতের প্রথম প্রকোপ অনুভব করি।

রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় শীত আরো বেড়ে গেল। কনকনে শীতের রাত পার হয়ে সকালে আবার নবীন উৎসাহ নিয়ে রওনা হলাম। ২।৩ মাইল ক্রমাগত চড়াই-উৎরাই করে সকলে ক্লান্ত। এগার হাজার ফিটে উঠে পড়েছি। কি দারুণ ঠাণ্ডা। প্রস্তর-বহুল উৎরাই পথে—হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি। ক্রমে বেলা ১০টায়—গার্বিয়াংএ এসে পৌছলাম। এই গার্বিয়াং ভারতের শেষ সীমায় একটি গ্রাম। কৈলাসের দুর্গম পথে এই হ'ল বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার শেষ পোষ্ট অফিস। গ্রামটির দুপাশে বিরাট পর্বত বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে আছে।

আজ এখানে বিশ্রাম। তিব্বতের পথ এখান থেকেই শুরু হবে। পরে শীত আরো বেশী। এখান থেকেই তাঁবু, ঘোড়া, জব্বু, খাবার দ্রব্য প্রভৃতি সব হিসাব করে সংগ্রহ করে নিতে হবে। এর পর আর কোথাও কিছু পাবার আশা নেই।

পঁচিশে জুন আমরা বুকে নবীন আশা উদ্যম নিয়ে—আবার যাত্রা শুরু করি। মনে হ'ল কৈলাসপতির আশীর্বাদে অসীম দুঃখকষ্ট ভোগ করেও গার্বিয়াং পর্যন্ত যখন আসতে পেরেছি তখন তিনি কৃপা করে বাকীটুকুও নিয়ে যাবেন। গার্বিয়াংএ আমাদের গাইড কীচখাম্পার বাড়ীতে সকলের আদর-যত্নে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।

আমাদের দলে এবার হ'ল সবসুদ্ধ একুশ জন। বার জনের দল আগের দিনেই রূপসিংকে গাইড নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। এতগুলি যাত্রী তাদের ঘোড়া, তাঁবু, লোকজন সঙ্গে নিয়ে যখন পথ চলছে তখন দেখে মনে হচ্ছিল—যেন এক বিরাট বাহিনী কোন রাজ্য জয় করতে চলেছে। রাজ্য জয়ই বটে। জানা ছেড়ে অজানার রাজ্যে, শিবের সন্ধানে চলেছি!

কালীনদীর পুল পার হয়ে আমরা নদীর ধারে ধারে সংকীর্ণ পথে সন্তর্পণে চলেছি। সব সময়ে প্রাণটি যেন হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে যেতে হচ্ছে। কোন্ মুহূর্তে যে ঘোড়া আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলে দেবে—নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য, তার ঠিকানা কিছু নেই। একটি ছোট নদী পার হচ্ছি—হঠাৎ দেখতে পেলাম—সহযাত্রী একজন ঘোড়া থেকে উল্‌টে পড়ে ডান হাতখানি ভেঙে ফেলেছেন। ধরাধরি করে তাকে নিয়ে কালাপানিতে যখন পৌঁছলাম তখন দেখি, আগের ১২ জনের দলও ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন।

পরের দিন আমাদের বিখ্যাত লিপুলেক অতিক্রম করতে হবে। আমরা দলবল নিয়ে এক বিস্তীর্ণ উপত্যকা 'শিযাংচুং'এ এসে পৌঁছেছি। কীচখাম্পার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুকুর চারিদিক পাহারা দিচ্ছে। একে একে সব তাঁবুগুলি পড়ল। তখনও বেলা আছে। পাশেই একটি বরফ-গলা ছোট্ট নদীর কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এদিকে ওদিকে যে দিকেই তাকাই শুধু দেখি বরফ—আর বরফের পাহাড়। আমরা যেন বরফের দেশে এসে পড়েছি।

লিপুলেকপাস্! দূর থেকে লিপুপাস দেখে মনে হয় না যে, ঐ স্থানটি অতিক্রম করা এমন কিছু কষ্টকর বা ভীতিজনক। ওখানকার আবহাওয়ার পরিবর্তন এত দ্রুত হয় যে আধ ঘণ্টার মধ্যেই তুষার-ঝটিকায় আক্রান্ত হয়ে ঐ গিরিবর্ত্মে বিপদ্‌গ্রস্ত হতে হয়। তবে ভোরের দিকে স্থানটি অতিক্রম করা কিছুটা সহজসাধ্য, কেননা বরফ পড়া ভোরের দিকেই কিছু কম থাকে, যত বেলা বাড়ে ততই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

ভীষণ ঠাণ্ডা রাত্রি। যেন বরফের ঘরে বাস করছি। শ্বাসকষ্টও সকলকে বেশ ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। আকাশের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হয়ে উঠল। একটা বিরাট নিস্তব্ধতা সমস্ত পর্বত-গাত্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ধীরে ধীরে বরফানি হাওয়া আরম্ভ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি, শীতে শরীরের রক্ত যেন জমে গেল। মনে হ'ল এ দুর্যোগ রাত্রি আর শেষ হবে না। উনুনের কাছে যাই একটু আগুনের সন্ধানে। আগুনও যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—তারও তাপ নেই মোটেই, আবার ফিরে আসি। কম্বল বিছানাপত্র সব ভিজে-ভিজে, তাই সম্বল করে গায়ে জড়িয়ে বসি। সঙ্গে কফি ছিল—তাই একটু একটু খেয়ে সকলে শরীর গরম করি। কিন্তু ঘুম আর হ'ল না।

ভোরেই রওনা হতে হবে ঐ লিপুপাস পার হওয়ার জন্য। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে সকলে চলেছি, ধীর স্থির মন্থর গতি। সকলের মনে এক গভীর আতঙ্ক! হঠাৎ ঝিরঝির করে হিম-ঝঞ্ঝা আরম্ভ হ'ল। মল্লিকা ফুলের মত অজস্র হিমবিন্দু ধীরে ধীরে সমস্ত পথঘাট ছেয়ে ফেলল। ক্রমে সর্বাঙ্গ ঢেকে গেল তুষারে। বুঝি লিপুপাস আর পার হওয়া যাবে না। অতিকষ্টে কীচ্‌খাম্পা ও পাচক চংবুর সাহায্যে আমরা এই ভয়ঙ্কর লিপুপাস অতিক্রম করলাম।

কৈলাসপতির কৃপায় এই লোকগুলির যে সাহায্য পেলাম তা সারা জীবনে ভুলতে পারব না।

বেলা তিনটার সময় আমরা 'পাংলা' নামক স্থানে এসে পৌঁছাই। এখানে চেক্‌পোষ্ট-এ সমস্ত চেক্ করে। কাছে কোন গ্রাম নাই। দুটী ধর্মশালা আছে। আমরা চারটি দলই একত্র মিলিত হলাম। দলের প্রতিনিধি হিসাবে এক এক জন এগিয়ে গিয়ে চীনা চেক্ পোষ্টের অফিসারের কাছে গিয়ে নিজ দলের নাম ঠিকানা প্রভৃতি লিখিয়ে এলেন। পরে তারা প্রত্যেকটি জিনিষ তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগল। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বাদ গেল না। রাষ্ট্রের সম্মান রক্ষার

জন্ত মাথার টুপি ও চশমা খুলতে হয়। ছাতাও বন্ধ করবার কথা—কিন্তু অত্যধিক রোদে সকলে ছাতা বন্ধ করলে না। চলে আসার সময় অফিসার বললে—'আপনাদের এইরকম পরীক্ষা করতে বাধ্য হলাম রাষ্ট্রের আদেশে'।

আমরা এবার তিব্বতের বিখ্যাত মালভূমির উপর দিয়ে চলেছি। এখন চড়াই উৎরাই আর বিশেষ নেই—শুধু কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় অধিকাংশ স্থানের আকৃতি। প্রথম যখন গিরিশৃঙ্গের উপর থেকে তিব্বতের মালভূমির দিকে তাকালাম তখন চারিদিকের মনোরম দৃশ্য দেখে কেবলই মনে হচ্ছিল, কি অপূর্ব মহিমা। অরূপের এ কি রূপের সজ্জা।

আমরা কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটা মোড় ঘুরতেই তাকলাকোট দেখতে পেলাম। কিছু পরে আমরা সেখানে এসে গেলাম। এখানে ভারত তিব্বতের মধ্যে জিনিষ পত্রের কেনা-বেচা ও বিনিময় হয়। এখানে আমাদের ঘোড়া, জব্বু প্রভৃতি নূতন করে ব্যবস্থা করে নিতে হবে। গার্বিয়াংএর ব্যবস্থা আর এ পথে চলবে না।

যাই হোক্ কীচখাম্পার চেষ্টায় সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের যোগাড় হয়ে গেল। এক দল যাত্রী তীর্থাপুরীর দিকে রওনা হ'ল। সহযাত্রীর হাত-ভাঙার জন্য আমরা ও পথে যেতে আর সাহস করলাম না। খড়ি মাটির মত ধপধপে সাদা পাহাড়, বৃক্ষলতা বিশেষ নেই। পাহাড়ের নীচে নানাবর্ণের চিত্রিত গুম্ফা। তিব্বতের সব গুম্ফারই কারুকার্য প্রায় একই রকম।

কৈলাসপতির জয় দিয়ে তাকলাকোট থেকে বেরিয়ে পড়লাম; তিব্বতের রাজপ্রতিনিধির প্রতাপ এ সব অঞ্চলে খুব বেশী। কীচখাম্পা রাজপ্রতিনিধির নিকট আমাদের পরিচয় দেন। ভাইকে আমাদের দলের সঙ্গে দিয়ে তিনি নিজে তীর্থাপুরীর দলের সঙ্গে গেলেন।

আমরা মাইল দশেক অগ্রসর হওয়ার পর 'রিংগাইবু'তে উপস্থিত হয়ে তাঁবু খাটাবার ব্যবস্থা করলাম। এখানে প্রচণ্ড শীত। সামনেই 'মান্ধাতা' পর্বত। ওখান থেকে একটী বরফের নদী আমাদের তাঁবুর নিকট দিয়েই বয়ে গেছে। কোন রকমে দুপুরের আহারাদি সেরে বিশ্রাম লওয়া গেল। পরদিন ভোরেই কিছু জলযোগ করে আবার যাত্রা।

সামনে বেশ একটী উঁচু পাহাড়। ওটিকে ডিঙিয়ে না গেলে মানস-সরোবর পাওয়া যাবে না। ভয়ঙ্কর চড়াই-উৎরাই। পথে এক মালভূমিতে তাঁবু ফেলতে হ'ল। প্রচণ্ড বায়ুর বেগ দেখা দিল। তাঁবু ফেলাই এক সমস্যা। সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে চায়। রান্না করব কি, উনুন জ্বলতে চায় না। রান্না ত হ'ল, কিন্তু খাবারের উপর যত রাজ্যের ধূলো ও ময়লা উড়ে পড়তে লাগল।

গাইড বলে উঠল,—আর সাত আট মাইল হাঁটার পর শ্রীশ্রী৺ কৈলাস দর্শন হবে। এ কথা শুনা মাত্র আনন্দে হৃদয় নেচে উঠল। এত দুঃখ কষ্ট অনাহার অনিদ্রা—এতদিনে সার্থক হবে।

গাইড বলছে,—'আজ কৈলাস ও মানস দর্শন হবে।' বারে বারে শুধু ঐ কথাকটির ঝঙ্কার হৃদয়ে বেজে উঠছে, আজ কৈলাস দর্শন হবে! কেবলই মনে হচ্ছে সেই চিরদুর্লভ, জন্ম-জন্মান্তরের আশা ও আকাঙ্ক্ষার ধন—যাঁর জন্য এ দুর্গম পথ যাত্রা—এই প্রাণান্তকর তপস্যা—সেই রূপাতীত রূপের দর্শন মিলবে। কি এক অব্যক্ত আনন্দে যন্ত্রচালিতের মতো চলছি। কেবলই মনে হচ্ছে, আর কতক্ষণে তাঁকে দেখব—যাঁকে দেখবার জন্য বেরিয়েছি।

চড়াই পথে উঠছি। বিহ্বল হয়ে চারদিকে তাকাই—কই, তুমি আর কতদূরে! পর্বতের

সানুদেশে এ সেই এক অনির্বচনীয় অপূর্ব দৃশ্য দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। ৭।৮ মাইল পথ কখন যে শেষ করে ফেলেছি তা আমরা কেউ টের পাই নি! ঠিক সামনেই দেখা গেল—শুভ্র তুষারমণ্ডিত কৈলাসপতির ভাবগম্ভীর রূপ, উজ্জ্বল সূর্যালোকে দেখাচ্ছিল আরো অপরূপ।

আকাশ আজ নির্মল স্বচ্ছ। এতদিন যা কল্পনা-রাজ্যে ছিল—আজ তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভক্তি-গদ্‌গদকণ্ঠে সকলে সমস্বরে "জয় কৈলাসপতিকী জয়" "জয় গঙ্গামাঈকী জয়" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললে। আমিও আপন ভাবে উদাত্ত কণ্ঠে 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্র' পাঠ করতে শুরু করে দিয়েছি। এইভাবে সকলেই যে যার মনের আকাঙ্ক্ষা প্রাণভরে মিটিয়ে নিলেন। ধী'র ধীরে এগিয়ে চলেছি। চার পাঁচ মাইল অগ্রসর হয়েই দেখতে পেলাম—অপূর্বশোভন মানস-সরোবর।

আজ কী পুণ্য দিন! কৈলাস ও মানস-সরোবরের দর্শন পেলাম। ক্রমে এসে পড়লাম মানসের তীরে।

মানস সরোবর। তিব্বতের মালভূমিতে পনের হাজার ফিট উপরে কি দেখছি। এ যে মহা সমুদ্র। চারিদিকে শুধু নির্মল অগাধ জলরাশি। উপরে সুনীল আকাশের চন্দ্রাতপ। নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ পড়াতে তারা অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে।

একবার তাকাই কৈলাসের দিকে, আবার দেখি মানস-সরোবরের অপরূপ রূপ। জল অতি স্বচ্ছ—তাই আকাশের নীল আভার সঙ্গে যেন মিশে গেছে। চারিপাশেই পর্বতগাত্র; তাই এই সুন্দর সরোবরের ৬০ মাইল পরিধি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গভীরতা কোন কোন স্থানে ৩০০ ফুট!

জল বরফের মত শীতল। প্রথম দিন স্নান করতে অনেকেই ইতস্ততঃ করছিলেন—আমি ত "জয় কৈলাসপতিকী জয়" বলে নেমে পড়লাম। জল প্রথমেই খুব গভীর নয়—তবে বেশ ঢেউ রয়েছে; দেখেই ভয় হচ্ছে; যাক্ সাহস করে নেমে এক ডুব দিলাম। সমস্ত শরীর যেন হিম-শীতল হয়ে গেল। কোন রকমে তীরে উঠে ভিজে কাপড়-জামা বদলে সর্বাঙ্গ কম্বল দিয়ে ঢেকে একটু রোদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। সূর্যদেব সেদিন উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত করে রেখেছেন। সেই রোদে কিছুক্ষণ থাকার পর শরীরে যেন সাড় এল। শান্ত আনন্দে মন প্রাণ ভরে গেল। শরীর মনে নব শক্তি, নবীন চেতনা জেগে উঠেছে। প্রাণে অপরিসীম আনন্দের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। আজ আর ক্লান্তি নেই, কষ্ট নেই, দুঃখ নেই; অন্তরে বাহিরে অপূর্ব শান্তি বিরাজ করছে।

এখানেই আমাদের তাঁবু পড়ল। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আর তেমনি ধুলো। তাঁবু আটকে রাখাই এক সমস্যা। পরের দিন গুরুপূর্ণিমা। সকলেই স্নানাদি করলেন। তীরে নানা রকমের পাথরের নুড়ি। প্রবাদ আছে মানস-সরোবরে 'পরশ পাথর' পাওয়া যায়। তাই সকলে এটা ওটা কুড়িয়ে লোহাতে ছুঁইয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছেন। কিন্তু লোহা ত সোনায় পরিণত হ'ল না!

কবি কালিদাসের বর্ণনাতে আছে মানস-সরোবরে কত কমল প্রস্ফুটিত! কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পর একটী কমলেরও দর্শন পাওয়া গেল না। খবর নিয়ে জানলাম ওখানে কোন কালে পদ্ম ফোটে না। তবে সহস্র সহস্র রাজহাঁস রয়েছে। ঢেউ এর সঙ্গে সঙ্গে তারাও মনের আনন্দে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো বা বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে কোন রাজহংসী শৈবালদলের মধ্যে খাবারের সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরছে। আর রয়েছে অনেক মাছ, দেখতে মহাশোল মাছের মত।

এখান থেকেও কৈলাস প্রায় ২০ মাইল। পথও অতি দুর্গম। আমরা কৈলাসপতির জয় দিয়ে এগিয়ে চললাম, একদিকে দর্শন করি কৈলাস—আর একপাশে মানস। যত এগোই ততই গভীর আগ্রহে হৃদয় মন ভরে উঠে। কিন্তু পথে প্রচণ্ড হাওয়া আর তার সাথে ধুলো। সর্বদেহ সাদা ধুলোতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এ যেন দর্শন দেবার পূর্বে শিবই কৃপা করে বিভূতিভূষিত করে দিচ্ছেন তাঁর দর্শন-ভিখারী সন্তানদের। আঠারো হাজার ফিট উপরে—কৈলাস শিখরের পাদদেশ দিয়ে আমরা চলেছি। পথ অতি দুর্গম ও বিপদসংকুল। কখনো গিরিখাতের ভেতর দিয়ে আবার কখনো প্রস্তরস্তূপের উপর পায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে চলেছি একটা নেশার ঝোঁকে। সামনে আশে পাশে সর্বত্রই বরফ। এই ঠিক ঠিক বরফের রাজ্য। বরফের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে চলেছি—একটু পা পিছলে গেলে ছিট্‌কে পড়তে হবে বহু দূরে। শৈলশিরার শেষ প্রান্তে ডেরাগুম্ফের সামনে এসে পড়েছি। ডেরাগুম্ফার লামা হলেন কৈলাসপতির পূজারী। আহা! এ কী দেখছি—অতি নিকটে বাবার বিরাট লিঙ্গমূর্তি—গৌরীপট্ট-সহ পূর্ণ দর্শন! এক অনুপম রূপমাধুরী দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মুগ্ধ নেত্রে পাথরের মত নীরব নিথর হয়ে জন্ম-জন্মান্তরের অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে বুভুক্ষুর মত চেয়ে আছি! যেন স্থান কাল পাত্র—সব কিছু চলে গিয়েছে। এক অপূর্ব অনুভূতি, বর্ণনার অতীত!

কৈলাসপতির আরাধনা শেষ করে আমরা ভাবের ঘোরে 'ডের'ফুক' গুম্ফার ভেতর গেলাম। গুম্ফাতে সকলেই ডাবা (ব্রহ্মচারী), লামা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) একজনও উপস্থিত নেই। আমাদের দেখে অল্পবয়স্ক 'ডাবা'রা ছুটে এসে বলে, 'লামাগুরু, পয়সা দেনা—খানা দেনা'। তাদের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। ডাবাদের হাতে কিছু বাদাম পেস্তা, কিশ্‌মিস্ ও খুচরা পয়সা দিয়ে কৈলাসের পূজারীর হাতে প্রচুর ধূপকাঠি কর্পূর প্রভৃতি দিলাম। গুম্ফার ভেতরে ছোট্ট গুহার মধ্যে প্রবেশ করে বহু দেবদেবীর মূর্তি দেখতে পেলাম। প্রধান মূর্তি বুদ্ধদেবের—বেশ সৌম্যদর্শন।

আজ আমাদের ডুরমালা অতিক্রম করে ১৮৭৫০ ফিট পর্যন্ত উঠে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছাতে হবে। আমরা বেশ হুঁশিয়ার হয়ে ঘোড়ায় যাচ্ছিলাম। রাস্তা এত দুর্গম যে পদে পদে সওয়ার-সমেত ঘোড়া পড়ে গিয়ে পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ডুরমালাতে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফের এক পশলা বৃষ্টি ঝুরঝুর করে নেমে এল। আমাদের গায়ে মাথায় পড়ছে তুষার বৃষ্টি—এ যেন উমানাথের আশীর্বাদ!

একটু অগ্রসর হয়ে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছলাম; কুণ্ডের পরিধি প্রায় আধমাইল। গাইড্‌কে সঙ্গে নিয়ে কুণ্ডের নীচে নেমে পবিত্র জল স্পর্শ করে উপরে উঠে এলাম। মাইলখানেক নামার পর অনেকটা সমতল; একপাশে চলেছেন কলকল ধ্বনি-মুখরিত গৌরীগঙ্গা।

নদী পার হয়ে আমাদের তাঁবুতে যেতে হবে। তুষার গলা জল। সহযাত্রী একজন জব্বু চড়ে নদী পার হতে গিয়ে ভেসে গেলেন। গাইড্ তার জীবন বিপন্ন করে তাকে খরস্রোত থেকে উদ্ধার করল। তাঁবুতে পৌঁছে বরফের জ্বালায় তিনি পুড়ে যাচ্ছিলেন। উপশমের জন্য ব্রাণ্ডি দেওয়া হ'ল।

রাত্রে কারও ঘুম হল না। পরদিন প্রত্যূষে চাপ চাপ বরফ তাঁবুর উপরে নীচে সর্বত্র পড়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। বরফের বাড়াবাড়ি দেখে সহযাত্রীরা ফিরবার জন্য ব্যাকুল। বুঝিবা সকলকেই বরফে জমে যেতে হবে। অরুণদেবতার করুণামাখা আশিস গায়ে মাথায় পড়ামাত্র আমরা কৈলাস-পরিক্রমা সমাপ্ত করে বাবাকে বিদায়প্রণতি জানিয়ে মানসের দিকে যাত্রা করলাম।

একটি মৎস্যপূর্ণ নদীর তীরে তাঁবু ফেলা হল। মাছের খেলা দেখছি তার ফাঁকে কৈলাসপতিকে

প্রাণ ভরে দেখে নিচ্ছি। যত দিন যাবে ততই আমরা তাঁর থেকে দূরে বহুদূরে চলে যাব। থাকবে শুধু মধুর স্মৃতি। এক ঘণ্টা চলার পর আমরা আবার মানসের তীরে 'পড়াও' করলাম, মানে তাঁবু ফেললাম। প্রত্যুষে সকলেই তৃপ্তি করে মানসে স্নানাদি সেরে নিলাম। তাড়াতাড়ি আহারান্তে প্রত্যাবর্তনের পালা শুরু হ'ল। আমরা প্রাণের আবেগে কৈলাস ও মানসের উদ্দেশ্যে বার বার বিদায় প্রণতি জানালাম। এখন আমাদের উদ্দেশ্য তাক্‌লাকোট্‌। বেলা ১০টা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ পর তুষার-ঝটিকার তাণ্ডব শুরু হল। প্রাণ যেন যায় যায়। আমরা অতিকষ্টে রাক্ষসতাল ও মানসকে দুপাশে রেখে পথ চলছি। দুটি পাহাড়ের মধ্যে একটি ছোট নদীর শ্যামল তীরে তাঁবু ফেলা হল।

সাংচুং-এ রাত কাটিয়ে বেলা দশটায় তাকলাকোট। তিব্বতের স্থানীয় শাসনকর্তা জংপং সাহেবের কাছ থেকে আমাদের তিব্বত ত্যাগের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হ'ল। এখানে রাত্রি যাপন করে জব্বু, ঘোড়া ইত্যাদির ভাড়া চুকিয়ে রওনা হলাম গার্বিয়াং। তিব্বত এখন মহাচীনের অন্তর্গত। তাকলাকোট থেকে গার্বিয়াংএর পথে একমাইল এগোলেই মহাচীন ও ভারতে সীমান্তের মুখে চীনা 'চেক পোষ্টে' পৌঁছুলে তল্লাশ শুরু হল। অপর একটি দলের এক যাত্রীর নোট বই খুঁজে দেখে চীনা সান্ত্রীরা গম্ভীর ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। যাত্রীটি বৃন্দাবনী এক সাধুকে টুকরো কাগজে এঁকে রাক্ষসতাল, কৈলাস ও তীর্থাপুরীর রাস্তা দেখিয়েছিলেন, সেই টুক্‌রোটি নোটবুকের ভেতরে পাওয়া গেছে। একের ভুলের মাশুল—সবাইকে দিতে হবে। আমাদের দলটিও রাতের মত আটক্‌ পড়ল। শুনলাম কাল সকালে তাকলাকোট্‌ থেকে 'চেক্‌পোষ্টের' ভার প্রাপ্ত সেনানায়ক ফিরে এলে আমাদের বিচার হবে। আমাদের দলটির পাসপোর্ট আলাদা, এই যুক্তিতে অনেক ওকালতি করা গেল, কিন্তু নিষ্ফল! সারা রাত প্রচণ্ড শীত এবং উদ্বেগে কাটিয়ে ভোরবেলা সবাই মিলে খোলা আদালতে হাজির হলাম। হাকিম রায় দিলেন, আমাদের দলটি নির্দোষ; অতএব অন্যদের সঙ্গে আমাদের আটকে রাখবার জন্য চীনরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তিনি দুঃখ প্রকাশ করছেন।

অপর দলকে সাবধান করে তিনি বললেন, "চীন ও ভারত মিত্র রাষ্ট্র। পরস্পরের সীমান্তের অভ্যন্তরে তীর্থ যাত্রা উপলক্ষ্যে দুই দেশের ধর্মপিপাসুদেরই গতায়াত আছে। আপনারা আমাদের দেশে তীর্থ করতে এসেছেন, ভবিষ্যতে আরো অনেক আসবেন। আপনাদের চলাফেরা এবং আচরণে এমন কিছু থাকা উচিত নয়, যার দ্বারা আমরা পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ হই। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আপনাদের এখানে একরাত্র আটকাতে হ'ল বলে কিছু মনে করবেন না।"

বিচারক নিজের আসন ত্যাগ করে এসে আমাদের সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

ছাড়া পেয়ে আবার নূতন উৎসাহ নিয়ে গার্বিয়াংএর দিকে যাত্রা করলাম। দলের কয়েক জন, যারা গতকাল আমাদের আগেই সীমান্ত পেরিয়ে গিয়েছিলেন, দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে আজ পুনরায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে অভিভূত হলেন।

সম্মুখে লিপুলেক্‌-পাস আজই অতিক্রম করে কালাপানি পার হতে হবে। তুষারাচ্ছন্ন লিপুলেকের মাইল দুই অতিক্রম করার পর তিব্বতগামী এক বিরাট ব্যবসায়ীদলের ভেতর কীচথাম্পার মেয়ে ও জামাইকে দেখে খানিক দাঁড়িয়ে গল্প সল্প করা গেল।

ভারতীয় জব্বু ও ঘোড়ার পিঠে মালপত্র নিয়ে আমাদের সহযাত্রী শংকর প্রায় আধ মাইল

এগিয়ে পড়েছে। এদিকে এমন ঝেঁপে ঝড়বৃষ্টি এল যে আর এগোতে পারা যাচ্ছে না। অপর দলের তাঁবু পড়েছে, অগত্যা সেখানেই আশ্রয় নিলাম।

ভোরে উঠে আবার পায়ে চলার পথ। তিব্বতের উষর পর্বতমালা অতিক্রম করে আজ ভারত ভূমির প্রথম গ্রাম গার্বিয়াংএ পদার্পণ করব। তুষার-ঢাকা লিপুলেক-পাস্ পেরলে ভারতের সরস মৃত্তিকায় চোখে পড়ে দিগন্তব্যাপী গোলাপ, লিলি, এবং জানা-অজানা বিচিত্রবর্ণের অগণিত ফুলের সমারোহ! উপরে গাঢ় নীল আকাশ। আর নীচে যেদিকে যতদূর তাকাও শুধু ফুল, ফুল, আর ফুল—বহুবর্ণ ফুলের গালিচা যেন বিছিয়ে রেখেছে।

গার্বিয়াংএ পৌঁছে ভারতীয় চেক-পোষ্টে রিপোর্ট করলাম, পুনরায় আশ্রয় নিলাম কীচখাম্পার গৃহে। পরদিন ভোরে আবার যাত্রা শুরু। উদ্দেশ্য—ধারচুলার পথ দিয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম। বোধির চড়াই পেরিয়ে মালপাচে বৃষ্টির জন্য আটকে গেলাম।

পরদিন যখন যাত্রা করি তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। দু মাইল যেতে না যেতেই দেখি প্রবল বর্ষার চাপে পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে ধ্বস নেমেছে। কালীগঙ্গার পাড় ধরে চলেছি, পথ অতি দুর্গম। জনপ্রাণীর গতায়াত নাই। ধাবমান ফেনায়িত জলকল্লোলে কর্ণ বধির হবার উপক্রম। ক্ষণপরেই নদীর উভয় তীরে শুরু হ'ল পাথর খসার শব্দ—যেন মহাযুদ্ধে কামান গর্জাচ্ছে! পেছনেও মৃত্যু—সম্মুখেও মৃত্যু! অতএব এগিয়ে চলাই ভাল। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছি। সামনেই হঠাৎ প্রচণ্ড বজ্রপাতের আওয়াজ—উপর থেকে এক বিরাট পাথর খসে পড়ে রাস্তার খানিকটা গুঁড়িয়ে নিয়ে নীচে কালীনদীতে অদৃশ্য হয়ে গেল। চতুর্দিকে মৃত্যুর তাণ্ডব—নীচে খরস্রোতা কালীনদীর গর্জন, পাশেই বর্ষা-ভেজা সু-উচ্চ পিচ্ছিল পর্বতগাত্র থেকে খসে-পড়া পাথরের কামান-ধ্বনি! আর সব দিকে সর্বত্র সহস্র ধারায় ফেনায়িত পাগলা ঝোরার আওয়াজে কানে তালা লেগে গিয়েছে।

কুলিরা সব জবাব দিল, আর একপাও এগোবে না। কি করা যায়—সত্যিই এই ধ্বস পেরিয়ে যাওয়ার সাহস যে কারো আছে, তা তাদের মুখ দেখে মনে হয় না। অগত্যা আমি শ্রীগুরুস্মরণ করে অতি সন্তর্পণে ধ্বসের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ালুম। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেওয়ার পর যেন কুলিরা বুকে বল পেল।

এক ফার্লং জুড়ে ধ্বস নেমেছে। অতি সন্তর্পণে সবাই মিলে সেটাকে পার হওয়া গেল। কিন্তু তবু কি বিপদের শেষ আছে? পথের স্থানে স্থানে রাস্তা ভাসিয়ে প্রবল খরস্রোত কালীনদীতে গিয়ে নেমেছে। এমন স্রোত যে পা রাখা দায়, তবু তারই ভেতর দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে। খরস্রোতগুলো ছুঁচলো লাঠির ডগা পুঁতে কোন প্রকারে পার হওয়া গেল—ছোটগুলো লাফিয়ে। অবশেষে ধারচুলা পৌঁছলাম। তিব্বতের প্রস্তরাকীর্ণ বরফ-ঢাকা উষর ভূমির পরে এতদিনে সবুজ শস্যাস্তীর্ণ বনভূমি ও সমতলে বায়ু আন্দোলিত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত দেখে চোখ জুড়ালো।

ধারচুলা থেকে পৌঁছলাম 'পিথরাগড়'। পিথরাগড় পূর্বে নেপালের অধীনে ছিল। ইংরেজের সঙ্গে বহুবার এখানে নেপালের যুদ্ধ হয়েছে। বেশ সমৃদ্ধশালী শহর—খৃষ্টান মিশনারীদের একটি প্রধান আড্ডা। পিথরাগড় থেকে পরদিনই মায়াবতীর রাস্তায় বাসে করে এসে পৌঁছলাম 'লোহাঘাট'।

দুর্গমের যাত্রা শেষ হ'ল। নানাদিক দেশ থেকে এসে সকলে একদা একত্র হয়েছিলাম—দূরের

লোক রয়েছিল পরম আত্মীয়, বিপদের বন্ধু। আজ এখানে হবে সকলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। জীবন-নাট্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র নাটকের একটি অঙ্ক এখানেই শেষ।

চলতি পথের পরিচয়—কিন্তু, তবু কি নিবিড় স্নেহবন্ধনে বাঁধা পড়েছি এদের সঙ্গে, কত তুহিন-শীতল হিম-রাত্রি, জন-মনুষ্যহীন বরফের প্রান্তরে এক তাঁবুতে একত্র রাত কাটানো, কত কুসুমাস্তীর্ণ পার্বত্য প্রদেশ, কত তুষারকীর্ণ মরুপথ, কত চড়াই-উৎরাই, দিক্‌চিহ্নহীন কঠিন নীরস পর্বতগাত্রে একত্র পথ চলা—সব আজ এখানে এসে শেষ হ'ল। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম; এবার মায়াবতীর পথে আমার একমাত্র সঙ্গী শঙ্কর।

গৌতম বুদ্ধের সাধনা

[যজ্ঞ-তপস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মত]

ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক

"চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িতে।
বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্বব্যাধিপ্রমোচকঃ॥"

হে বুদ্ধদেব! ক্লেশরূপ ব্যাধি-দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া বহুকালযাবৎ জীবলোক আতুর অবস্থায় পতিত ছিল, তুমিই সর্বপ্রকার ব্যাধির প্রমোচনকারী বৈদ্যরাজ বা চিকিৎসক-প্রধান হইয়া সমুৎপন্ন হইয়াছ।

গৌতম বুদ্ধ এক বিরাট ব্যক্তিত্ব লইয়া ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বয়ং-আচরিত ও জগতে উপদিষ্ট ও প্রচারিত ধর্ম ছিল বহুলাংশে নীতিমূলক। ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণে তাঁহার যুক্তিমত্তা ও মানবের মনস্তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার প্রজ্ঞা-বৈশারদ্য কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র জগতে সুবিদিত। সর্ববিশ্বহিতকর তদীয় ধর্মোপদেশের যতই প্রচার ও আলোচনা হইবে, ততই পৃথিবীতে সুখ ও শান্তিধারার প্রবাহ লক্ষিত হইবে। জগৎ হইতে দুর্নীতির বিলয় ঘটাইতে হইলে বুদ্ধের উপদিষ্ট সুনীতিসমূহের গ্রহণ বিধেয়। এমনকি, রাজনীতি-ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ ধর্মের শীলাদির প্রভাব বিস্তারিত হইবার যোগ্য। শ্রীবুদ্ধের ব্রহ্মবিহারের কল্পনায় মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা—এই চারিটির যে আচরণ-নির্দেশ আছে, তাহা চিরকালই স্মরণীয়। এই সব কথা ভাবিয়াই এই মহাপুরুষ বা অবতারের জীবনচরিতের একটি বিষয় লইয়া এই প্রবন্ধ রচিত হইল।

প্রাগ্‌বুদ্ধ যুগের ভারতীয় ধর্মে পৌরোহিত্য ও কর্মকাণ্ডের অত্যধিক প্রভাব দৃষ্ট হয়। উপনিষদ্‌গুলি সেই প্রভাবের অনেকটা বিরোধিতা সম্পাদন করিয়াছে। তৎপরে বুদ্ধদেবও যজ্ঞ তপস্যাদি ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধের কথাবস্তু সংগৃহীত হইয়াছে তিনখানি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে, যথা: পালি ভাষায় রচিত 'নিদান-কথা', সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত তিন ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত গাথা-নামক ভাষায় রচিত 'মহাবস্তু-অবদান', এবং মহাকবি ও মহাদার্শনিক অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ-চরিত'।

পাঠকমাত্রই জানেন কেমন করিয়া বোধিসত্ত্ব গৌতম স্নেহবান্ পিতা রাজা শুদ্ধোদন, স্নেহময়ী মাতৃসদৃশা মাতৃষ্বসা গৌতমী, রূপলাবণ্যবতী ভার্যা যশোধরা ও নবজাত শিশুপুত্র রাহুলকে এবং আত্মীয়স্বজনসহ সমগ্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংসারে ত্রিতাপের অভিঘাতে খিন্ন হইয়াই জগতের লোকেরা মুক্তিকামী হয়।

ছন্দককে বিদায় দিয়া গৌতম সর্বপ্রথম এক

তপোবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাই বশিষ্ঠ-গোত্রনামা এক ঋষির আশ্রম। আশ্রমবাসী বিপ্রেরা বোধিসত্ত্বের অলৌকিক শরীরলক্ষণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সেখানে একটি তপস্বীকে তিনি তপস্যার তত্ত্ব ও সেই আশ্রমে প্রচলিত ধর্মবিধির আচরণ ও তৎফলবিষয়ক প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, কোন কোন তপস্বী অগ্রাম্য, সলিল-প্ররূঢ় অন্ন, বৃক্ষপর্ণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করেন; কেহ উঞ্ছবৃত্তিক হইয়া, কেহ বা বল্মীক মধ্যে ভুজঙ্গসহ বাস করিয়া, কেহ জটাকলাপধারী হইয়া, কেহ দুই সন্ধ্যায় অগ্নির উপাসক হইয়া, কেহ বা আবার মৎস্যসহ জলে বাস করিয়া কাল অতিবাহিত করেন। এইরূপ নানাভাবে তপস্যা করিয়া কেহ তৎফলে স্বর্গে যাইয়া বা মর্ত্যলোকেই সুখ অনুভব করেন। তখন রাজকুমার সন্ন্যাসী গৌতম নিজের কথা বলিতে যাইয়া এই প্রকার তপস্যাদির এইরূপ একটি সমালোচনা করিলেন:

"দুঃখাত্মকং নৈকবিধং তপশ্চ স্বর্গপ্রধানং তপসঃ ফলং চ।
লোকাশ্চ সর্বে পরিণামবন্তঃ স্বল্পে শ্রমঃ খল্বয়মাশ্রমাণাম্॥"

(বুদ্ধচরিত)

'এই অনেকবিধ তপস্যা দুঃখময়, তপস্যার ফলের মধ্যে স্বর্গই প্রধান; স্বর্গাদি-লোক-সকল পরিণাম-যুক্ত (অর্থাৎ পরিবর্তন ও ক্ষয়শীল), তাই দেখা যাইতেছে যে, আশ্রমবাসীদের এই শ্রম যেন অল্প-বস্তুলাভের জন্য (গুরুতর তত্ত্বলাভের জন্য নহে)।' তাঁহার মতে স্বর্গফলের জন্য নিয়মাদির আচরণ মহত্তর বন্ধনের হেতু হইতে পারে। ইহা তো দুঃখ-দ্বারা অন্য দুঃখ অন্বেষণমাত্র।

"ইহার্থমেকে প্রবিশন্তি খেদং স্বর্গার্থমন্যে শ্রমমাপ্নুবন্তি।
সুখার্থমাশাকৃপণোঽকৃতার্থঃ পতত্যনর্থে খলু জীবলোকঃ॥"

(বুঃ চঃ)

'কেহ কেহ ঐহিক সুখাদি লাভের জন্য দুঃখপূর্ণ বিষয়ে প্রবেশ করে, অপর কেহ কেহ স্বর্গার্থে শ্রম অবলম্বন করে। কিন্তু, জীবলোক সুখের আশা করিয়া, নিজকে দীন বোধ করিয়া, অকৃতার্থ হইয়া অনর্থে পতিত হয়'। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এমন বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করা উচিত "যত্র পুনর্নকার্যম্"—যাহাতে আর কোন করণীয় করিতে হইবে না। কৃচ্ছ্রসাধনে বা শরীরপীড়া-দ্বারাই ধর্ম হয় না। চিত্তের বশেই মানুষের শরীর—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পথে চলে, তাই চিত্তের দমনই তাহার উপযুক্ত কার্য, কারণ, চিত্ত-ব্যতিরেকে শরীর ত কাষ্ঠপ্রায়।

এইভাবে অনেক যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়া সে দিন বোধিসত্ত্ব সন্ধ্যাসময়ে তপঃপ্রশান্ত সেই তপোবনে প্রবেশ করিলেন। কয়েক রাত্রি সেখানে বাস করার পরে তিনি তপস্যার পরীক্ষা করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ তপস্বী সম্মান-সহকারে গৌতমকে বলিতে লাগিলেন—"হে বৎস! তুমি আমাদের আশ্রমে থাকাতে ইহা পূর্ণ প্রতিভাত হইতেছে; তুমি চলিয়া গেলে ইহা শূন্য বোধ হইবে। সুতরাং তোমার এখানেই থাকা উচিত। সম্মুখে তুমি যে হিমালয় পর্বত দেখিতেছ সেখানে কত ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিরা তপস্যা করিয়া থাকেন এবং সেখানে অনেক পুণ্যতীর্থ রহিয়াছে"। তপস্বিমুখ্য এইরূপ অনুরোধ করিলেও ভবপ্রণাশের জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ গৌতম তাঁহাকে বলিলেন—তপোবনের মুনিদিগের আমার প্রতি স্বজনভাবদর্শনে আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং আপনাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে আমারও দুঃখ হইবে। কিন্তু,

'স্বর্গায় যুষ্মাকময়ং তু ধর্মো মমাভিলাষস্তুপুনর্ভবায়।
অস্মিন্ বনে যেন ন মে বিবৎসা ভিন্নঃ প্রবৃত্ত্যা হি নিবৃত্তিধর্মঃ॥'

(বুঃ চঃ)

'আপনাদের ধর্মাচরণ স্বর্গলাভের আশায়; আমার অভিলাষ অপুনর্ভবের (অর্থাৎ জন্মান্তরচ্ছেদের) জন্য। এই কারণে, এই বনে বাস করিবার ইচ্ছা আমার নাই। যে হেতু প্রবৃত্তিপর ধর্ম হইতে নিবৃত্তিপর ধর্ম ভিন্ন রকমের।' পরিব্রাজক গৌতমের অর্থবৎ, ওজস্বী ও গর্বিত বচন শুনিয়া তপস্বীরা তাঁহার প্রতি অত্যধিক সমাদর প্রকাশ

করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্য হইতে একটি ভস্মশায়ী দ্বিজ গৌতমকে বলিলেন—"হে ধীমন্! তোমার সংকল্প উদার, যে-হেতু তুমি জন্মপরিগ্রহে দোষদর্শী হইয়া স্বর্গ ও অপবর্গের (মোক্ষের) বিচার করিয়া নিজে অপবর্গেই মতি রাখিয়াছ।

'যজ্ঞৈস্তপোভির্নিয়মৈশ্চ তৈস্তৈঃ স্বর্গং যিযাসন্তি হি রাগবন্তঃ।
রাগেণ সার্ধং রিপুণেব যুদ্ধা মোক্ষং পরীপ্সন্তি তু সত্ত্ববন্তঃ॥'
(বুঃ চঃ)

যাঁহারা (বিষয়-সুখে) রাগযুক্ত তাঁহারাই সর্বপ্রকার যজ্ঞ, তপস্যা ও নিয়ম আচরণ করিয়া স্বর্গে যাইতে ইচ্ছুক; কিন্তু যাঁহারা সত্ত্বগুণী লোক তাঁহারা রাগ বা বিষয়াসক্তিকে শত্রু মনে করিয়া, ইহার সহিত সংগ্রাম করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন।

মহাবস্তু-অবদানে উক্ত হইয়াছে যে, যখন বোধিসত্ত্ব বশিষ্ঠের সেই ধর্মারণ্যে প্রথম প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সেই নির্বাত সাগরের ন্যায় অব্যগ্র মুনিকে দর্শন করিয়া ধর্মাত্মা শাক্যরাজকুমার তৎসমীপে ভূমিতে উপবেশন করিলেন। কাঞ্চন-স্তম্ভসদৃশ, জন্মশত-সঞ্চিত গুণসঞ্চয়ে লব্ধ শুভ শারীরলক্ষণযুক্ত সন্ন্যাসী রাজকুমারকে সবিশেষ লক্ষ্য করিয়া ঋষি বলিয়াছিলেন—

"স্নিগ্ধগম্ভীরশব্দেন স্বরেণ অনুনাদিনা।
ত্রৈলোকমর্হতে কৃৎস্নমাজ্ঞাপয়িতুমোজসা॥
ব্যঞ্জনানি হি যা যস্ত লক্ষণানি চ লক্ষয়ে।
যুক্তোঽয়ং সর্বভূতানাং ত্রিলোকপতিরীশ্বরঃ॥" (মহাবস্তু)

(এই ব্যক্তি) তাঁহার স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও অনুনাদকারী স্বরের শব্দদ্বারা নিজ তপোবলে সমগ্র ত্রৈলোক্যকে আজ্ঞা করিবার যোগ্য। তাঁহার (শরীরে) আমি যে-সব লক্ষণ ও ব্যঞ্জন (চিহ্ন)-সমূহ লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে (মনে হয় যে) তিনি ত্রিলোকে সর্বজীবের অধিপতি হইবার উপযুক্ত। কি কারণে তাঁহার তপোবনে আগমন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে গৌতম বশিষ্ঠকে বলিয়াছিলেন,

"ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবঃ শুদ্ধোদন-নৃপাত্মজঃ।
বিহায় পৃথিবীং রাজ্যং উজ্ঝিত্বা মোক্ষমাশ্রিতঃ॥
লোকস্তু বহুভিদুঃখৈর্দৃষ্ট্বৈবং সমভিদ্রুতম্।
মোক্ষার্থমভিনিষ্ক্রান্তো জাতিব্যাধিজরাদিভিঃ॥
যত্র সর্বং ন ভবতে যত্র সর্বং নিরুধ্যতে।
যত্রোপশমাতে সর্বং তৎপদং প্রার্থয়াম্যহম্॥"

—আমি ইক্ষ্বাকুবংশজাত ও শুদ্ধোদন রাজার পুত্র, পৃথিবী ছাড়িয়া ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া মোক্ষকে আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু, জন্ম ব্যাধি ও জরা প্রভৃতি বহুবিধ দুঃখদ্বারা এইভাবে লোককে সংপীড়িত দেখিয়া আমি মোক্ষের অন্বেষণে (গৃহ হইতে) অভিনিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। আমি সেই পদ বা স্থানই প্রার্থনা করি, যাহাতে কোন কিছুই ভব বা সত্তা লাভ করে না, যাহাতে সব কিছুই নিরোধ বা বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং সব কিছুই উপশম বা নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। বশিষ্ঠ সর্বশেষে বোধিসত্ত্ব গৌতমকে এই কথা বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন:

ঈদৃশেন হি বৃত্তেন বৃত্ত্যা লক্ষণসম্পদা।
প্রজ্ঞয়া চ মহাভাগ ন কিঞ্চিদ্ যং ন প্রাপয়ে॥

—হে মহাভাগ! তোমার ঈদৃশ আচরণ, তোমার শরীরলক্ষণের উপযোগী ব্যবহার ও প্রজ্ঞাদ্বারা—তুমি না পাইতে পার' এমন কিছু নাই।

সেই আশ্রমের পূর্বোক্ত ভস্মশায়ী ব্রাহ্মণ তপস্বীর নির্দেশে, গৌতম বিন্ধ্যকোষ্ঠে (মহাবস্তুর মতে, বৈশালীতে) শ্রেয়োবিষয়ে লব্ধচক্ষুঃ নৈষ্ঠিক মুনি অরাড়কালামের নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভের আশায় তাঁহার আশ্রমে চলিয়া গেলেন। এই ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী তত্ত্ববিৎ ব্রহ্মবাদী মুনিকে সাক্ষাৎ করার পথে, (মহাবস্তুর মতে, মুনির সহিত সাক্ষাৎকার লাভের পরে) গৌতম মগধদেশের রাজধানী রাজগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। এই রাজগৃহ নগর তখন 'পঞ্চাচলাঙ্ক' অর্থাৎ পাঁচটি গিরিদ্বারা পরিবৃত বলিয়া পরিচিত ছিল। গৌতম সেখানে শ্রেণ্য রাজা বিম্বিসারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন রাজগৃহ-প্রদেশের পাণ্ডবপর্বতের এক গুহায় বাস করিতেন এবং খাদ্য-সংগ্রহের জন্য নগর মধ্যে যাইতেন। রাজা ভিক্ষুবেশী শাক্য-

কুমারকে বাহিরের প্রাসাদ হইতে লক্ষ্য করিয়া রাজদূত পাঠাইয়া জানিলেন যে, ভিক্ষুটি শুদ্ধোদন রাজার পুত্র গৌতম, যাঁহার সম্বন্ধে পূর্বে বিপ্রগণ বলিয়াছিলেন যে, হয় তিনি শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান অথবা রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন—"জ্ঞানং পরং বা পৃথিবী-শ্রিয়ং বা বিপ্রৈর্য উক্তোঽধিগমিষ্যতীতি"।

রাজা অমাত্য ও পরিজন সঙ্গে করিয়া পাণ্ডব-পর্বতে যাইয়া দেখিলেন যে, সেই কাষায়ধারী কুমার-সন্ন্যাসী এক বৃক্ষমূলে পর্যঙ্কবন্ধে একাগ্রচিত্তে সমাধিনিমগ্ন হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাজা বিম্বিসার গৌতমের সহিত কথোপকথন-সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেন তিনি কুলধারা রক্ষা না করিয়া, এই বয়সে ভিক্ষাচরণে মতি দিয়া, রাজ্যপালন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে শাস্ত্রকারদিগের মতে ধর্মাচরণ কেবল স্থবিরদিগেরই আচরণীয়। রাজা গৌতমকে আরও স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে—যদি একান্তই ধর্মাচরণ করিতে হয়, তবে তাঁহার যজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত; কারণ, অনেক রাজর্ষি ও মহর্ষি যজ্ঞ সম্পাদন-দ্বারাই স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। গৌতম উত্তরে রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, অকল্যাণের হেতুভূত সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু ত্যাগ করিয়া, আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইয়া, তিনি জরা ও মৃত্যুর ভয় বিশেষভাবে বুঝিয়া মুমুক্ষাবশতঃ ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাজা তাঁহাকে নিজ-রাজ্যের অর্ধভাগ দান করিতেও চাহিয়াছিলেন—কিন্তু, গৌতমের নিকট রাজ্য ও দাস্য সমান প্রতিভাত হইত, কারণ—

"নিত্যং হসত্যেব হি নৈব রাজা, ন চাপি সন্তপ্যত এব দাসঃ।"

—রাজাও নিত্যই হাসেন না, আর দাসও নিত্যই সন্তাপ ভোগ করে না। গৌতম রাজাকে আরও বলিয়াছিলেন যে, রাজ্যব্যতিরেকেও তাঁহার মনস্তুষ্টি আছে। শান্তির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ ধ্যান অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগী হইয়াছেন; মানুষ-লোকের কথা দূরে থাকুক, তপস্যাদির আচরণের ফলে তিনি স্বর্গ-লোকেও রাজত্ব করিতে চাহেন না। ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের সেবা তিনি অনর্থ মনে করেন, এবং যাহাতে জন্ম, জরা, রোগ, মৃত্যু, ভয় ও মানসিক ব্যথা বিদ্যমান নাই এবং যাহার লাভে পুনঃ পুনঃ কোন কর্মই আর করিতে হয় না— সেই বস্তুকেই তিনি পরমার্থ বলিয়া মনে করেন। যজ্ঞসম্পাদনে দোষদর্শী হইয়া গৌতম বিম্বিসারকে এইরূপ বলিয়াছিলেন :

"নমো মখেভ্যো ন হি কাময়ে সুখং পরস্য দুঃখক্রিয়য়া যদিষ্যতে

—'যজ্ঞসমূহকে আমি নমস্কার করি—তদ্দ্বারা আমি কোন সুখ আকাঙ্ক্ষা করি না—কারণ, এই-সবে অপর প্রাণীর দুঃখ-সম্ভাবনা আছে'। তিনি ভাবিতেন যে পরহিংসা ইহলোকে বা পরলোকে সুখবিধান করিতে পারে না।

মগধরাজ গৌতমকে আশীর্বাদ করিলেন :

'তং খো তথা ভোতু স্পৃশাহি নির্বৃতিং
বোধিং চ প্রাপ্তো পুনরাগমেসি।
মহং ঋি ধর্মং কথয়েসি গৌতম
যমহং শ্রুত্বা ন ব্রজেয় স্বর্গতিম্ ॥" (মহাবস্তু)

—(তুমি যেরূপ চাহ) তাহা যেন সেইরূপই হয়। তুমি যেন নির্বাণ স্পর্শ বা লাভ করিতে পার। বোধি বা সম্যক্‌সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় (এখানে) আসিও। হে গৌতম। (তখন) তুমি আমাকে ধর্মকথা বলিও—যাহা শুনিয়া আমি স্বর্গে যাইতে পারি। বোধিসত্ত্বও বিদায়কালে বলিলেন :

"তং খো মহারাজ তথা ভবিষ্যতি
বোধিং স্পৃশিষ্যামি ন মেহত্র সংশয়ঃ।
প্রাপ্তো চ বোধিং পুনরাগমিষ্যং
ধর্মং চ তে দেশয়িষ্যং প্রতিশৃণোমীতি ॥" (মহাবস্তু)

—হে মহারাজ! সেইরূপই হইবে। আমি যে বোধি প্রাপ্ত হইব সে-বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। বোধি প্রাপ্ত হইয়া আমি পুনরায় (এখানে) আসিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তখন আমি আপনাকে ধর্মের দেশনা বা উপদেশ প্রদান

করিব। পাঠক জানেন—গৌতম 'বুদ্ধ' হইয়া মগধরাজকে ধর্মদানরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

বিন্ধ্যকোষ্ঠেই হউক, আর বৈশালীতেই হউক, গৌতম বিমোক্ষবাদী ও আত্মাতে বিশ্বাসী অরাড় কালামের আশ্রমে যাইয়া মুনির সহিত পরমার্থ-বিষয়ক আলাপ করিয়াও সম্যক্ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। গৌতমের আশ্রমে আগমনের পরেই মুনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার রাজ্যভোগ ছাড়ার ও গৃহত্যাগের বিষয় অবগত আছেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি জ্ঞানপ্লবে চড়িয়া শীঘ্রই সর্বদুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারিবেন। বোধিসত্ত্ব অরাড়মুনিকে জরা মরণ ব্যাধি প্রভৃতির হাত হইতে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি তাঁহার নিজ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গৌতমকে উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, অজ্ঞান, কর্ম ও তৃষ্ণা—এই তিনটিই সংসারের হেতু এবং মানুষ অবিদ্যার বশে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে। তিনি তাঁহা'ক আরও বলিলেন যে, পরমব্রহ্মবাদীদিগের মতে মুমুক্ষুরা প্রথমে গৃহত্যাগ করিবেন এবং ভিক্ষার আশ্রয় লইবেন, শীলাচরণ করিবেন, নির্দ্বন্দ্ব হইয়া বিবিক্তসেবী হইবেন এবং তার পর প্রথম হইতে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মনির্বাণ—সুখ ও শান্তি অনুভব করিবেন। মুনি আকাশরূপী আত্মার উপলব্ধি ও আকিঞ্চন্যের কথাও বলিলেন এবং সর্বশেষে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গৌতমকে ইহাও বলিলেন :

"এতৎ তৎ পরমং ব্রহ্ম নির্লিঙ্গং ধ্রুবমক্ষরম্।
যন্ মোক্ষ ইতি তত্ত্বজ্ঞাঃ কথয়ন্তি মনীষিণঃ ॥"   (বু: চঃ)

—ইহাই সেই পরম ব্রহ্ম—যাহা নির্লিঙ্গ, ধ্রুব ও অক্ষর এবং যাহাকে তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা মোক্ষ-নামে অভিহিত করেন। মুনি গৌতমকে বলিলেন, যদি তিনি ইহা বুঝিয়া থাকেন এবং যদি ইহাতে তাঁহার রুচি হইয়া থাকে, তবে এই মোক্ষবাদ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু, গৌতম মনে করিলেন বিকারপ্রকৃতি হইতে মুক্ত হইলেও ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মায় প্রসবধর্ম ও বীজধর্ম রহিয়া যায়। তিনি আরও মনে করিলেন যে, অরাড়-প্রোক্ত অজ্ঞান, কর্ম ও তৃষ্ণার ত্যাগ হইতেই মোক্ষ উৎপন্ন বা উপলব্ধ হইতে পারে না, কারণ, "আত্মনস্তু স্থিতির্যত্র তত্র সূক্ষ্মমিদং ত্রয়ম্"—যে ক্ষেত্রে আত্মার স্থিতি স্বীকৃত হয়, সেখানে এই তিনটি সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যাদি ধর্মমতের মোক্ষে গৌতম দোষদর্শী হইয়া ভাবিলেন—"সত্যাত্মনি পরিত্যাগো নাহংকারস্য বিদ্যতে"—আত্মা থাকিলে অহংকার বা আমি-জ্ঞানের আত্যন্তিক পরিত্যাগ ঘটিতে পারে না। সত্ত্বের (জীবের) আত্মা 'জ্ঞ' বা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' হইলে, তাঁহার কোন না কোন জ্ঞেয় থাকিয়া যায়। আবার "জ্ঞেয়ে সতি ন মুচ্যতে"—জ্ঞেয় থাকিলে তাঁহার মুক্তি হয় না। কাজেই তিনি অরাড়মুনিকে বলিয়াছিলেন—"তস্মাৎ সর্বপরিত্যাগান্ মন্যে কৃৎস্নাং কৃতার্থতাম্"—এই প্রকার যুক্তি দ্বারা বলা যায় যে সর্ববিষয়ের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ বা বিলয় ঘটিলেই সমগ্র কৃতার্থতা লাভ সম্ভবপর হইতে পারে। তাই এই মুনি-প্রোক্ত ধর্মকে তিনি অসমগ্র মনে করিলেন, এবং দুঃখিত হইয়া অরাড়প্রোক্ত মার্গ বা ধর্ম-পথকে নির্বাণগামী মনে করিলেন না এবং সেই মুনির আশ্রম ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে চলিয়া গেলেন। গৌতম সেখানে রামপুত্র উদ্রক-নামক মুনির আশ্রমে যাইয়া "আত্মগ্রহাচ্চ তস্যাপি জগৃহে ন স দর্শনম্"—সেই মুনিও আত্মা স্বীকার করেন বলিয়া তিনি তাঁহার দর্শনও মানিয়া নিলেন না এবং সেই আশ্রম ছাড়িয়া গয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

চিত্র-পরিচয়

শ্রীশ্রীদুর্গার রঙীন ছবিখানি একটি প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত, উহা আমরা ২০, শ্যামপুকুর লেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের পৈতৃক বসতবাটী)-নিবাসী শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের উপরি-উক্ত গৃহে পদার্পণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যান্য দেবদেবীর চিত্রের সহিত এই চিত্রটিও দর্শন করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে 'উদ্বোধন'—১৩২৯ পৌষ-সংখ্যায় বর্ণিত আছে : "যে ঘরে তাঁহাকে উপবেশন করান হয় সেই ঘরে দেবদেবীর কয়েকখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র বর্তমান ছিল, ঠাকুর সেগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হন ও ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহাদের স্তবগান করিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত প্রতীয়মান হয়।......

স্বামী আত্মানন্দজীর দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি—গত ৩০শে অগষ্ট রাত্রি ২ ঘটিকার সময় চণ্ডীগড় (পূর্ব পাঞ্জাব) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৬১ বৎসর বয়সে স্বামী আত্মানন্দজী দেহত্যাগ করিয়াছেন। সহসা তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রে তীব্র বেদনা অনুভূত হয় এবং পনের মিনিট মধ্যে উহাই তাঁহার জীবনাবসানের কারণ হয়।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, এবং ১৯২০ খৃঃ ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিয়া ১৯২৬ খৃঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি কিছুকাল রেঙ্গুন রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমেরও কর্মী ছিলেন। স্বামী আত্মানন্দ সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন (১৯২৮—১৯৩৩ খৃঃ)। ১৯৩৪ খৃঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচারকরূপে প্রেরিত হইয়া প্রায় এক বৎসর বিভিন্ন শহরে ও প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের সহিত বেদান্ত প্রচার করেন। সুবক্তা স্বামী আত্মানন্দ ভারতবর্ষেও নানাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। ১৯৩৯ খৃঃ লাহোরে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র স্থাপিত হইলে স্বামী আত্মানন্দ তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৭ খৃঃ দাঙ্গার সময় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ঐ কেন্দ্র বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিতে হয়। অতঃপর পূর্বপাঞ্জাবের নির্মীয়মাণ রাজধানী চণ্ডীগড়ে ঐ কেন্দ্র স্থানান্তরিত করিবার নির্দেশ পাইয়া তিনি প্রাপ্ত জমির উপর গৃহাদি নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিছুদিন যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না, কিন্তু ঐ বিষয়ে তাঁহার ঔদাসীন্য দেখা যাইত। তাঁহার দেহত্যাগে সংঘ একজন অভিজ্ঞ কর্মী হারাইল। সকলের প্রিয় স্বামী আত্মানন্দ আনন্দময় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মুক্ত আত্মা পরমা শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্য-বিবরণী

কনখল : হরিদ্বারের নিকটে শান্ত পরিবেশে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবা প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আর্তসেবায় নিরত। মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ নিজেরাই রোগীদের সেবা পরিচর্যা করিয়া থাকেন। দুই জন অভিজ্ঞ এবং পাশ-করা ডাক্তার ত্যাগ ও সেবার ভাবে আশ্রমে থাকিয়া রোগীদের চিকিৎসা করেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৫৬ খৃঃ কার্যবিবরণীতে ইহার উল্লেখযোগ্য সেবাকার্য : আন্তর্বিভাগে ও বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা ১,৫৬৯ ও ৮৯,১৫৪ জন ; ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-সংখ্যা প্রায় ৩০০০। এবারের নূতন সংযোজন এক্স্-রে ব্লক সেবাশ্রমের বহুদিনের একটি অভাব পূরণ করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সুসম্পন্ন এবং অর্ধকুম্ভ-সেবাকার্যও সুপরিচালিত হইয়াছিল। জনসাধারণ এবং সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গতার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।

ভিত্তিস্থাপন

বৃন্দাবন : বহু বৎসর যাবৎ যমুনার বন্যার জন্য বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কাজকর্ম ব্যাহত হইতেছিল। সম্প্রতি আশ্রম হইতে ১½ মাইল দূরে জয়পুর মন্দিরের সম্মুখে যে বিস্তৃত জমি পাওয়া গিয়াছে সেখানে গত ২১শে অগষ্ট বৈকালে যুক্তপ্রদেশের রাজ্যপাল মাননীয় শ্রী ভি. ভি. গিরি নূতন সেবাভবনের 'আধারশিলা' স্থাপন করিয়াছেন।

তৎপূর্বে তিনি বর্তমান সেবাশ্রম দেখিয়া সন্তুষ্ট হন, এবং ভিত্তিস্থাপনের পর তাঁহাকে প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে তিনি মিশনের বহুমুখী সেবার বিষয় উল্লেখ করেন। দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী নবপ্রচেষ্টায় বৃন্দাবন সেবাশ্রম যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন, তাহা বুঝাইয়া সাহায্যার্থ সকলকে অগ্রসর হইতে আহ্বান জানান।

বিদ্যার্থি-সংবাদ

বেলঘরিয়া : রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী-আশ্রমের প্রাক্তন ও বর্তমান বিদ্যার্থীদের অষ্টম মিলনোৎসব ১৫ই-১৮ই অগষ্ট বিশেষ আনন্দ-সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পতাকা-উত্তোলন, পূজা, হোম প্রভৃতি প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পর উৎসবের প্রকাশ্য অধিবেশনে স্বামী সন্তোষানন্দজী বিদ্যার্থী-আশ্রমের আদর্শ বুঝাইয়া দেন। ছাত্রদের ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শনী, বিচিত্রানুষ্ঠান, অভিনয়, নৈশবিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ প্রভৃতিও উৎসবের অঙ্গ ছিল। সম্মেলনের মূল সভাপতি স্বামী বীতাশোকানন্দজী বলেন, স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে ছাত্রদিগকে তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। সর্বপ্রকার বাধা জয় করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হওয়াই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ—এই জয় করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়া শক্তি অর্জন করার উপযুক্ত সময় ছাত্রজীবন।

বেলুড় বিদ্যামন্দির : গত ১০ই অগষ্ট বিদ্যামন্দিরে বাৎসরিক 'ভ্রাতৃবরণ' উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নবপ্রবিষ্ট বিদ্যার্থিগণ সকলে বিদ্যার্থি-ব্রত-হোমে অংশগ্রহণ করে, এবং পুরাতনের সহিত আনুষ্ঠানিকভাবে তাহাদের পরিচিত করাইয়া দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত প্রীতি-সম্মেলনে নূতন ছাত্রগণ বিদ্যামন্দিরের ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়।

রাজপুর : গত ৮ই সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ছাত্রাবাসে নূতন ছাত্রদের 'স্বাগত' আমন্ত্রণ জানাইয়া একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষ্যে পূজা হোম ও প্রীতিসম্মেলনের ব্যবস্থা হয়, যাহাতে নবাগতেরা রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের প্রকৃত রূপটি ধরিতে পারে। স্বামী নির্বাণানন্দজীর উপস্থিতিতে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

১৮৫৭-১৯৫৭

এ বৎসর ১৫ই অগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা-লাভের দশম বার্ষিক উৎসবের সহিত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের অভ্যুত্থানেরও শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে দেশব্যাপী নানা উৎসবের আয়োজনে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীরদের প্রতি স্মৃতি-অর্ঘ্য নিবেদিত হয়। কলিকাতার মুজিয়ামে অন্যান্য চিত্রের সহিত ১৮৫৭ খৃঃ পটভূমিকায় অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র প্রদর্শিত হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে—বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐ আন্দোলন কিরূপ দেখাইযাছিল, তাহার সংরক্ষিত চিত্রগুলি এবং ঐ সময়ের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি দর্শনীয়। বেলভেডিয়রে জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রদর্শিত—এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়া রচিত বিবিধ গ্রন্থ, এই সংগ্রামের প্রামাণ্যপত্র এবং দেশী ও বিলাতী শিল্পীর অঙ্কিত বহু পুরাতন চিত্র ও ফটো উল্লেখযোগ্য।

রনজি-ষ্টেডিয়মে প্রদেশ-কংগ্রেস-আযোজিত প্রদর্শনীতে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার একটি রূপ উদ্ঘাটিত হয়। বিশিষ্ট বক্তাগণ বিভিন্ন দিনে বাংলার কৃষ্টি, সাহিত্য এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার অবদান সম্বন্ধে বলেন। পনেরই আগষ্টের পূর্বে ও পরে মোট ২৪ দিন ধরিয়া এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। একই সময়ে অনুষ্ঠিত শ্রীঅরবিন্দ-উৎসবও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পুরাতত্ত্বের নূতন তথ্য

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-বিভাগের বার্ষিক বিবরণে গত বৎসরের খনন-কার্যে নানাস্থানে এমন সব তথ্য ও নিদর্শন পাওয়া গিযাছে যাহাদ্বারা ভারতের বহু-প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়।

রাজস্থানে চম্বলনদীর অববাহিকায় ব্যাপক খনন-কার্যের ফলে মালব-অঞ্চলে, তাপ্তীর তীরে এবং গোদাবরীর উৎসে প্রস্তরের কুঠার প্রভৃতি পুরাতন প্রস্তরযুগের দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বীরভানপুরের মৃত্তিকাজাত পদার্থ লইয়া তথ্যানুসন্ধানের ফলে দামোদর-অববাহিকার বহুপ্রাচীনতা প্রথম প্রমাণিত হইতেছে।

হরপ্পা-কৃষ্টির গুজরাটী রূপের পরিচয় পাওয়া যায় লোথালের নগরপরিকল্পনায়; সেখানে প্রাপ্ত শীলমোহর হরপ্পার অনুরূপ। প্রভাস-পাটন (সোমনাথ)-এ হরপ্পা-সভ্যতার রূপান্তরের এবং তাহার পরবর্তী কয়েকটি কৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায়। নর্মদার মোহনাতেও হরপ্পার শেষযুগের লাল-কালো-দগ্ধ মৃত্তিকাজাত পদার্থ পাওয়া যায়।

নূতন খনন-কার্য-দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে উজ্জয়িনী-নগরী খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথম-দিকেই আরম্ভ হইয়াছিল, এবং চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সভ্যতার বিচিত্র স্তরের সাক্ষ্য এখানে পাওয়া গিয়াছে। কৌশাম্বীর খনন-কার্যে কালো পালিশ-করা মৃত্তিকা-যুগের পূর্ববর্তী একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, এখানে বৌদ্ধযুগেরও বহু নিদর্শন ক্রমাগত পাওয়া যাইতেছে।

মধ্যভারতে ধানোরায় প্রস্তরাবৃত কবরের গর্ত পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণভারতেও এইরূপ যৌতগা সমাধি-বিবর বিশেষ দ্রষ্টব্য। নাগার্জুন-কোণ্ডায় বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও প্রস্তর-কুঠার, তাম্রখণ্ড, মৃতের ভস্মাধার এবং বুদ্ধপূর্ব ধর্মের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মধ্যপ্রদেশে ও উত্তরপ্রদেশে নানা বর্ণে চিত্রিত পার্বত্য গুহাশ্রয়—বিচিত্র বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলির মধ্যে অন্যতম।

ভাদ্র-সংখ্যার ভ্রম-সংশোধন

বিবিধ সংবাদে ১ম পঙ্‌ক্তিতে '১৮ই শ্রাবণ' স্থলে '১৬ই শ্রাবণ' পড়িবেন।
৪০৮ পৃঃ ২য় কলমে ২০ পঙ্‌ক্তিতে 'চৌরজী খাবা' স্থলে 'চৌরাঙ্গী খাবা' পড়িবেন।

উদ্বোধন

কালী করালী

ওঁ মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং
কর্ণালম্বিনৃমুণ্ডযুগ্মভয়দাং মুণ্ডস্রজাং ভীষণাং।
বামাধোর্ধ্বকরাম্বুজে নরশিরঃ খড়্গঞ্চ সব্যেতরে
দানাভীতি বিমুক্তকেশনিচয়াং বন্দে সদা কালিকাম্ ॥

প্রলয়-মেঘের মতো যাঁহার গাত্রবর্ণ, সকল আবরণ যাঁহার অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, অচৈতন্যরূপে প্রতীয়মান—সাক্ষিচৈতন্য-স্বরূপ কল্যাণ-ধ্যানময় পুরুষের উপর যিনি প্রতিষ্ঠিত, বর্তমান অতীত অনাগত, তথা স্থূলসূক্ষ্মকারণ-প্রত্যক্ষকারী নেত্রত্রয়-সমন্বিতা পরমা প্রকৃতির ধ্যান করি। কর্ণে তাঁহার দোদুল্যমান নৃমুণ্ডগঠিত কর্ণকুণ্ডল। গলদেশে প্রলম্বিত নামরূপাত্মক জগৎ-প্রকাশক অকারাদি বর্ণমালার প্রতীকস্বরূপ মুণ্ডমালা; দেখিতে তিনি ভীষণা, বামদিকের অধঃকরে ধৃত কর্তিত মুণ্ড জীবের অহঙ্কারেরই প্রতীক, ঊর্ধ্বকরে ধৃত জ্ঞানের খড়্গ। করুণাময়ী দক্ষিণাকালীর দক্ষিণ করদ্বয়ে বরাভয় প্রদর্শিত।

সৃষ্টিস্থিতিলয়-লীলা-শীলা বিশ্বপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি সর্বগ্রাসী কালেরও ভক্ষয়িত্রী কালিকা মহামায়া মায়ার সকল পাশ বিমুক্ত করিয়া জন্ম-জীবন-মৃত্যুর—সৃজন-পালন-ধ্বংসের নগ্ন রূঢ় অনাবৃত সমগ্র সত্তারূপে সাধকের বৈরাগ্যময় শ্মশান-হৃদয়ে আবির্ভূতা হন। সেই কালিকাকে আমরা বন্দনা করি, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, ভয়ে আনন্দে সর্বদা তাঁহার বন্দনা করি!

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক পাঠিকা, লেখক লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেদন করিতেছি।

বিজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান

একথা অবিসংবাদিত সত্য যে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান মানব-কল্পনাকেও পরাভূত করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে; বায়ুর গতি, শব্দের গতি পিছনে ফেলিয়া মানুষ আজ আলোকের গতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। কিন্তু চাকচিক্যময় গতিশীল এই যান্ত্রিক সভ্যতার সকল সুখসুবিধার অন্তরালে যখন দৃষ্টি পড়ে অনড় অচল পর্বতপ্রমাণ দুঃখরাশির ও ক্রমবর্ধমান অভাব ও অসন্তোষের উপর, তখন যেন প্রশ্ন জাগে এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় কোথায় যেন একটা ফাঁকি রহিয়াছে, মানব মনের যুক্তি বুদ্ধি ও হৃদয় অনুভূতির মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক রহিয়াছে। মনে হয় বিজ্ঞানের পথে আমরা যত অগ্রসর হইতেছি নীতিজ্ঞানের দিক দিয়া যেন ততই পিছাইয়া পড়িতেছি! কোন কোন ক্ষেত্রে নীতিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করিতেছি না, অথবা সুবিধামত নীতি সৃষ্টি করিতেছি। তাই প্রশ্ন জাগে জড়-বিজ্ঞানের জগতে যেমন বিশ্বজনীন নিয়ম আছে—মনের জগতে, সমাজ-নিয়ন্ত্রণে সেইরূপ সার্বজনিক সার্বকালিক কোন নীতি আছে কিনা?

মানবের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য, প্রকৃতির লুকানো রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য সমবেতভাবে বিজ্ঞানচর্চা চরমরূপ গ্রহণ করিয়াছে আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক গবেষণা-বৎসরে (International Geo-physical Year)। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এখনও যে সত্য অজানা রহিয়াছে, তাহাকে জানিতে হইবে, প্রকৃতির গোপন মণিকোঠায় এখনও কি শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে তাহাকে কাজে লাগাইতে হইবে। এই প্রচেষ্টায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের বৈজ্ঞানিক নির্দিষ্ট কর্মসূচী লইয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। প্রচেষ্টা মহতী, সন্দেহ নাই, কিন্তু উদ্দেশ্য? সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ দেখা দিয়াছে!

কোন এক দেশ—আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা করিলেন, আর এক দেশ কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিয়া যেন তাহাকে পরাস্ত করিল। সমবেত ভাবে গবেষণা দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি ও মানব-সাধারণের কল্যাণই যদি লক্ষ্য ছিল, তবে কোথা হইতে 'জাতীয়' গৌরবের প্রতিযোগিতার ভাব জাগিল, মস্কো হইতে উৎক্ষিপ্ত ঘূর্ণায়মান গোলককে 'সোভিয়েট মুন' বা রাশিয়ার চন্দ্র মনে করি কেন? সমগ্র মানবজাতিই কি মাধ্যাকর্ষণ-বিজয়ী এই বৈজ্ঞানিক কীর্তির গৌরব অনুভব করিবে না? মানুষের গত তিন শতাব্দীর সাধনা আজ সফল হইয়াছে, কিন্তু এই আবিষ্কারের উপর সামরিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া তজ্জন্য যদি সম্ভাব্য বিপদের প্রতিরোধ-প্রস্তুতি শুরু হয়, অথবা ঐ কৃত্রিম উপগ্রহকে যদি ভবিষ্যতের দুর্গ ও মারণাস্ত্রবাহক মনে করিয়া তদপেক্ষা শক্তিশালী যন্ত্র আবিষ্কার করিবার প্রচেষ্টায় ধনজন নিযুক্ত করা হয়—কোন কোন দেশে যাহা হইতেছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ—তবে বড়ই পরিতাপের বিষয়, তবে আমাদের প্রস্তাবিত আশঙ্কাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত: মানুষ বিজ্ঞানের পথে যত অগ্রসর হইতেছে নীতিজ্ঞানের পথে সে ততই পিছাইয়া পড়িতেছে! সমবেত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় আজ পারস্পরিক বিশ্বাস বিনষ্ট; রাজনীতির কূটকৌশল বৈজ্ঞানিকের বিশ্বভ্রাতৃত্ব বিচ্ছিন্ন করিতেছে!

বৈজ্ঞানিক স্বীয় প্রতিভাবলে পরমাণুশক্তি আবিষ্কার করিয়া আণবিক বোমা সৃষ্টি করিয়াছেন—রাজনীতিকের নির্দেশে, সামরিক প্রয়োজনে—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁহাকেই তাহা নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে নিরপরাধ লক্ষ লক্ষ নারী ও শিশুর উপর। এইখানেই বর্তমান মানবের পরাজয়—মানবতার চরম অধোগতি! বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উজ্জ্বল গৌরব গ্লানি কলঙ্কিত। বিজ্ঞান আজ আনন্দের আশীর্বাদ না হইয়া অভিশাপের আতঙ্ক-রূপে দেখা দিয়াছে! বৈজ্ঞানিককেই আজ এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বিজ্ঞানের সহিত নীতিজ্ঞান সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ঘোষণা করিতে হইবে, মানব-কল্যাণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের শক্তি নিয়োজিত করিব না, প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে—কোনও কিছুর বিনিময়ে কাহারও নিকট স্বীয় প্রতিভা বিক্রয় করিব না! তবেই মানুষ বাঁচিবে এবং সভ্যতার পরবর্তী সোপানে উন্নীত হইবে, নতুবা ধ্বংস অনিবার্য এবং সভ্যতার সেই পশ্চাদপসরণের দায়িত্ব রাজনীতিকের সহিত বৈজ্ঞানিককেও ভাগ করিয়া লইতে হইবে।

বর্তমানের যুদ্ধ তীর-ধনুকের যুদ্ধ নয়, বর্শা-বল্লমের যুদ্ধও নয়, কামান-বন্দুকের মতো ট্যাঙ্ক-বম্বারকেও এখন মুাজিয়মে রাখিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে, এবং ইহাই প্রতীয়মান হয় যে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে আগামী যুদ্ধেরই প্রস্তুতি চলিতেছে আন্তর্দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (Inter-Continental Ballistic Missiles) এবং কৃত্রিম উপগ্রহ-জাতীয় আবিষ্কারের মাধ্যমে। কে জানে এই আন্তর্জাতিক গবেষণা-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে আরও কত ভয়াবহ আবিষ্কার হইবে। অবশ্য একথা ঠিক, এই সকল আবিষ্কারের অধিকাংশই বিশুদ্ধ-জ্ঞানের পর্যায়ে, এতদ্দ্বারা আমরা ঊর্ধ্বাকাশের তাপ, চাপ ও বৈদ্যুত ধর্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিব। কিন্তু অগ্নির ধর্ম জানা এক, তাহাকে কাজে লাগানো আর এক, শক্তিকে কাজে লাগানো নির্ভর করে মানুষের বুদ্ধির উপর—বিবেকের উপর। বিবেকবুদ্ধি যদি শুদ্ধ হয় তবেই শক্তি নিয়োজিত হইবে কল্যাণকর্মে, নতুবা শক্তি অকল্যাণ বা ধ্বংসেরও কারণ হইতে পারে। সুবুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত হইলে অগ্নি রন্ধনাদি কল্যাণ-কার্যে সাহায্য করে, দুর্বুদ্ধি-নিয়োজিত হইলে গৃহ ও গৃহাভ্যন্তরস্থ সব কিছু ভস্মীভূত করিবারও কারণ হইতে পারে। আজিকার পৃথিবীর ও মানবসমাজের অবস্থা মনে হয় নিম্নাঙ্কিত প্রতীকেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। রন্ধনরতা জননীর দৃষ্টি এড়াইয়া দুরন্ত শিশু কিছুটা অগ্নি কুণ্ড হইতে বাহির করিয়া লইয়া খেলা করিতেছে, জানে না—এ খেলার পরিণাম কতখানি ভয়াবহ হইতে পারে। জননীর সতর্কবাণী, শাসনবাণী উপেক্ষা করিলে সে যে শুধু নিজেরই ধ্বংস টানিয়া আনিবে তাহা নহে—সকলের ধ্বংসের কারণ হইবে। প্রকৃতির শক্তি যাহারা সংগ্রহ করিতেছে, মহাপ্রকৃতির শাসনবাণীও তাহাদের শুনিতে হইবে। বিজ্ঞানের সহিত আজ নীতিজ্ঞান সংযুক্ত না হইলে সম্মুখে সমূহ বিপদ।

জাপান হইতে প্রত্যাবর্তনকালে হংকং-এ ভারতীয় সমাজের অভিনন্দনের উত্তরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীজওহরলাল নেহরু বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারে বিমুগ্ধ বিশ্ববাসীকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন:

যান্ত্রিক অগ্রগতি যুদ্ধের সম্ভাবনাকে 'সেকেলে' করিয়া ফেলিয়াছে। যুদ্ধ এখন অতীতের একটা হাস্যকর ব্যাপার। (দিগ্‌দেশের) ত্রি-মাত্রিক চিন্তাধারা আর বর্তমানের সমস্যার সহিত খাপ খায় না। আমাদের ইহার বাহিরে যাইতে হইবে। চতুর্থ মাত্রা (মানসিক) নৈতিক মাত্রা। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বা কৃত্রিম চন্দ্র—সমস্যার নৈতিক সমাধান প্রচেষ্টাকে পরিবর্তিত করিতে পারে না। যান্ত্রিক উন্নতি মন্দকে ভাল বা ভালকে মন্দ করিতে পারে

না। বড় বড় যন্ত্র ঘৃণাকে ভালবাসায় পরিণত করিতে পারে না। .. ..

জড়বিজ্ঞানের উন্নতির পর নৈতিক মানের উন্নতির আশায় তিনি বলিয়াছেন, 'পৃথিবী ধীরে ধীরে সভ্য হইবে; আজও মানুষ যথার্থ সভ্য হয় নাই; বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির ব্যবহারে মানুষ খুব অগ্রসর, কিন্তু সে এখনও সভ্য হয় নাই। তখনই মানুষ সভ্য হইবে যখন এই যন্ত্রবিজ্ঞান ধ্বংসকার্যে ব্যবহৃত না হইয়া মানুষের কল্যাণকার্যে নিয়োজিত হইবে।'

সর্বত্র পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যখন শান্তিপ্রয়াসী তখন আণবিক বোমার ও ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা কেন এবং কাহার কল্যাণে? ইহাও সর্বজনস্বীকৃত যে আণবিক যুদ্ধের শেষে জয়ী বা বিজয়ী বলিয়া কেহ থাকিবে না, তবু বিজ্ঞানগর্বিত রাজনীতিচালিত মানুষের আজ শক্তি নাই, সাহস নাই সামরিক উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপরায়ণ আণবিক পরীক্ষা বন্ধ করার। ইহার কারণ পারস্পরিক ভয় ও অবিশ্বাস। এগুলি কোন বৈজ্ঞানিক পদার্থ নয়, নিতান্তই মানসিক ব্যাপার। অতএব আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যাহত করার প্রচেষ্টা শুরু হওয়া উচিত এই মানসিক স্তরে।

বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের সহিত নূতনতর সুখসুবিধার সৃষ্টি হয়, তৎসহ নূতনতর সমস্যাও দেখা দেয়, এইগুলি সমাধানের শক্তিও মানুষকে অর্জন করিতে হইবে আরও শক্তিশালী মনের দ্বারা।

বিজ্ঞান আগাইয়া চলিয়াছে বিদ্যুদ্‌গতিতে, কিন্তু মানুষের মন পিছাইয়া পড়িতেছে, তাহার সহিত তাল রাখিতে পারিতেছে না। তাই আজ এই বিপর্যয়। এখন একান্ত প্রয়োজন—মানবমনের উন্নতির আয়োজন,—যাহাতে সে এই বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান ও শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া সভ্যতার রথ কল্যাণের পথে আগাইয়া লইয়া যাইতে পারে। রথ রথী অশ্ব সারথি একযোগে অগ্রসর হইলেই তাহাকে অগ্রগতি বলা যায়, নতুবা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া বল্গাহীন অশ্ব দ্রুত ধাবমান হইল, উচ্চাসনচ্যুত সারথি পড়িয়া গেল, রথ খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ভাঙিয়া গেল, আর রথের আরোহিগণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া খানায় পড়িয়া রহিল, এ অবস্থা অবশ্যই দুর্গতি।

এই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ এড়াইতে হইলে একান্ত প্রয়োজন শক্তিমান সারথির শান্ত সংযত রথচালনা-কৌশল। গোযান-চালক অপেক্ষা মোটরচালককে অবশ্যই অনেক নিয়ম কৌশল আয়ত্ত করিতে হয়, আবার মোটরচালক অপেক্ষা বৈমানিককে অনেক ধীর স্থির ও কৌশলী হইতে হয়। আদিম যুগের রাষ্ট্র বা সমাজ অপেক্ষা এ যুগের রাষ্ট্র বা সমাজ খুবই ব্যাপক এবং বহুল পরিমাণে জটিল; সেই জন্যই আমাদের বক্তব্য—তাহার সুষ্ঠু চালনার জন্য উন্নততর নীতির প্রয়োজন, পুরাতন নিয়ম নীতিকে বর্জন বা উপেক্ষা করিয়া ত নয়ই, বরং সেইগুলি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া, সময়োপযোগী পরিবর্তন করিয়া রাষ্ট্র-চালকগণ মানব-সমাজকে কল্যাণের পথে আগাইয়া লইয়া চলুন। শ্রীকৃষ্ণ, মুশা, বুদ্ধ ও খৃষ্টের সুনীতিপূর্ণ শিক্ষাদীক্ষা বর্জন করিয়া নহে, উপেক্ষা করিয়া নহে, পরন্তু সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া এবং নবযুগের উপযোগী নূতনতর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া—সর্বমতসহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও সংযম অবলম্বন করিয়া মানবজাতি এক উদার অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হউক।

মহিমান্বিতা শ্রীশ্রীদীপান্বিতা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ভারতবর্ষের জাতীয় উৎসবরূপে এই 'মহিমান্বিতা দীপান্বিতা' স্মরণাতীত কাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে; উৎসবে বহিরঙ্গ লৌকিক আমোদপ্রমোদের প্রাধান্য থাকলেও কোন দেবতার অধিষ্ঠান ব্যতীত তা যেমন সফল হতে পারে না, এই দীপাবলী উৎসবেও সেই ভারতীয় রীতির কোনরূপ বৈপরীত্য ঘটেনি। তথাপি বলা যেতে পারে, অন্যান্য উৎসব অপেক্ষা দীপাবলীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। কারণ এ উৎসবটি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দেবতার অধিষ্ঠাতৃত্বে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এমন কি আপাত-প্রতীয়মান বিরুদ্ধ ভাবের দেবতা একই উৎসবের আরাধ্য হয়েছেন স্থানপাত্রাদি ভেদে। যেমন কোথাও জগজ্জননী দুর্গার অন্যতম রূপ কালিকা হয়েছেন এ উৎসবের দেবতা, আবার কোথাও লক্ষ্মীনারায়ণ। তথাপি এ উৎসবে দীপোৎসর্গের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে ব'লে সর্বত্রই 'দীপান্বিতা' আখ্যার সার্থকতা অব্যাহত আছে।

যদিও সমগ্র ভারতের একই হিন্দুজাতির মধ্যে স্থান ও পাত্রাদি ভেদে অনুষ্ঠেয় একই পর্বে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার এ বিভিন্নতা বিস্ময়াবহ, তথাপি অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা ক'রে দেখলে এসব আচরণের মূল খুঁজে পাওয়া কঠিন মনে হয় না। প্রধানতঃ বলা যেতে পারে, সর্বজন-স্বীকৃত নির্দিষ্ট কোন তথ্য বিভিন্ন পুরাণ ও ইতিহাসের মতভেদ রহিত হয়ে উপস্থাপিত হয়নি; যেমন শারদীয় দুর্গোৎসবের মূল তথ্যটি আমরা কালিকাপুরাণ, মহাভাগবত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি থেকে একই-রূপে পেয়ে থাকি যে শ্রীরামচন্দ্রের জন্যই ব্রহ্মার এ পূজানুষ্ঠান। এমনকি, তিথিগুলির বিশেষত্বের সংবাদ ও প্রমাণরূপে পাওয়া যায় যে, মহাষ্টমী দেবীর আবির্ভাবের ও মহানবমী অসুরনিধনের দু'টি দিন, দশমী বিজয়োৎসবের তিথি। দীপান্বিতার ইতিহাসে এরূপ কোন অবতারের লীলাকাহিনীকে উপজীব্যরূপে উপস্থাপিত করা কঠিন; কারণ বিভিন্ন পুরাণের বিভিন্ন সংবাদ এ উৎসবের বিভিন্ন দেবতার অধিষ্ঠাতৃত্বে প্রেরণা দান করেছে।

আরো একটি কথা—ভারতীয় সভ্যতায় বেদেরই প্রভাব। বেদবাহ্য কোন তত্ত্ব এখানে স্বীকৃত হতে পারে না। পুরাণাদিকে বেদমূল শাস্ত্র ব'লে অঙ্গীকার ক'রে অন্যান্য স্মৃতিপুরাণাদিকেও সম্মান দেওয়া হয়, তাদের অনুশাসন উপদেশাদি অনুসরণ ক'রে লোকযাত্রাপথে ভারতীয়দের পদক্ষেপ। তাই দেখা যায় এই ভারতের মাটিতে বেদ-পুরাণ, স্মৃতি-তন্ত্র—সকলের অনুশাসনই সংমিশ্রিত হয়ে যেন কর্তব্য নির্ধারিত হয়। সর্বত্র না হলেও এই এই সংমিশ্রণ অধিকতর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে আমরা তার বিশেষ প্রমাণ পাই। এরূপ সমধিক সংমিশ্রণ অন্য কোনও মাঙ্গলিক তিথিকৃত্যে ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

প্রসিদ্ধি আছে, "গৌড়ে তন্ত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ"; কথাটায় অত্যুক্তি কিছুই নেই। তন্ত্রের শক্তিই বঙ্গ-দেশের প্রাণ—'কালিকা বঙ্গদেশে চ' আদ্যা-স্তোত্রের এ বাণীও তারই সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু গৌড় একটি বিচিত্র দেশ—সমগ্র ভারতের যেন প্রতিচ্ছবি বা 'মডেল'। সমগ্র ভারতের বিচিত্রতা একা গৌড় প্রকাশ করেছে। এখানে তন্ত্রের শক্তি, ভাগবতের কৃষ্ণ—মূলতঃ সব এক হয়ে গেছে। তাই দেখা যায়—এই গৌড়ে দীপাবলী উৎসবেও বেদ, পুরাণ, তন্ত্র—এ তিনেরই সমন্বয় ঘটেছে। ঋগ্বেদের রাত্রি-সূক্ত এবং দেবীসূক্তের সঙ্গে জননীর পূজার্চনা কখনো সম্পর্কহীন ব'লে আমরা ভাবতে পারি না। জননীর আবির্ভাবে কৃষ্ণ এবং গৌর দুটি বর্ণেরই

ইতিহাস রয়েছে। যেমন শারদীয় দুর্গোৎসবে "তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীম্"—এই গৌরোজ্জ্বলা জননীকে আমরা আহ্বান করি, তেমনি দীপাবলীর উৎসবে মায়ের আদিরূপে কৃষ্ণবর্ণোজ্জ্বলাকেও আমরা পূজা নিবেদন করে থাকি।

দীপান্বিতা কার্ত্তিকী অমাবস্যা। এই কার্ত্তিক মাসটি গৃহীত হ'ল কেন। তা'তে আমরা পুরাণকে মান্য করেছি। ব্রহ্মপুরাণ বলেছেন:

"ন কার্ত্তিক-সমো মাসো ন কৃতেন সমং যুগম্।
ন বেদসদৃশং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্॥

কার্ত্তিক মাস শ্রেষ্ঠ হ'লেও উপাস্যদেবতা যে কালিকা, পুরাণ কি তা বলেছেন?—এর উত্তর দেখা যায়, তন্ত্র আশ্রয় করা হয়েছে। কালী-সদ্ভাব-তন্ত্রে বলা হয়েছে:

"দীপোৎসর্গশ্চতুর্দশ্যা সংমিশ্রা যা কুহূঃ স্থিতা।
তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে কালরাত্রিকা।
তস্যাং পূজা প্রকর্তব্যা কালী তারা প্রিয়ঙ্করী॥"

স্মৃতিসার-সংগ্রহ এবং ব্যোমকেশ-তন্ত্রেও কালীর অর্চনাই বিহিত হয়েছে। আবার ব্রহ্মপুরাণের দীপমালা প্রদানের আদেশটিও গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণ বলেছেন:

"দীপমালাশ্চ কর্তব্যা শক্ত্যা দেবগৃহেষু চ।
রথ্যাপণশ্মশানেষু নদীপর্বতসানুষু॥"

বাংলাদেশ দীপমালা প্রদান ক'রে দীপান্বিতা নামের সার্থকতা দ্বারা বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি প্রমাণ-বলে কালিকা পূজার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—এ কথা বলা যায়। আসাম-প্রদেশেও কামাখ্যা-মায়ের প্রসাদে শক্তি-প্রাধান্য দ্বারা কালিকাপূজাই প্রচলিত হয়েছে। পশ্চিম ভারতের গুজরাট, বোম্বাই, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশেও শক্তিপূজারই প্রচলন রয়েছে। সেখানে কালভৈরবী ও কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মিথিলায় কিয়দংশে কালীপূজা এবং অপরাংশে লক্ষ্মীপূজা। উত্তর ও মধ্যভারতে লক্ষ্মী ও গণেশপূজা বিহিত। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মহীশূর, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও সঙ্গে হোলিকা ঐ দীপান্বিতা-দিনে বিহিত। দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ অঞ্চলে ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও বলিরাজের পূজা প্রচলিত।

বাংলা দেশের ন্যায় অন্যান্য দেশের আচরণেও তন্ত্রের ন্যায় বেদমূল পুরাণাদির প্রভাবই এই বিভিন্নতার হেতু মনে হয়। ব্রহ্মপুরাণ সংবাদ দিচ্ছেন—

"অমাবস্যাং যদা দেবাঃ কার্ত্তিকে মাসি কেশবাৎ।
অভয়ং প্রাপ্য সুপ্তাশ্চ ক্ষীরোদার্ণব সানুষু।
লক্ষ্মীর্দৈত্যভয় মুক্তা সুখং সুপ্তাহম্বুজোদরে॥
প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং পূজয়িত্বা যথাক্রমম্।
দীপবৃক্ষাস্তথা কার্য্যা শক্ত্যা দেবগৃহেষ্বপি॥"

এ থেকে নিঃসংশয়ে নারায়ণ ও লক্ষ্মীর পূজা ঐ অমাবস্যাতে বিহিত রয়েছে বলা যেতে পারে। দেবতারা অভয় পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রিত হয়েছিলেন—অসুরের ভয়ে অনিদ্রায় জাগরণে যে মহাকষ্ট অনুভব ক'রে চলেছিলেন ঐ দিনে তা থেকে অব্যাহতি মিলেছিল। তাই ঐ দিনটি স্মরণীয় ও পূজানুষ্ঠানের দিন এবং দুঃখনিশার অবসানের প্রতীকরূপে দীপবৃক্ষও প্রজ্বলিত হয়।

এই সমুদয় বেদ, তন্ত্র, পুরাণাদির প্রমাণসংকলিত শাস্ত্রবাক্য ব্যতীত ও প্রচলিত পূজা ও আচরণের মূলে তদ্দেশীয় নানাবিধ কিংবদন্তীও প্রভাব বিস্তার করেছে; যেমন এতে বলিরাজা অসুরের পূজা। এ যেন শারদীয়া পূজায় মহিষাসুরের পূজার ন্যায়। এর মূলে সেখানকার কিংবদন্তী অনুসারে বলিরাজার অবদান স্বীকৃত হয়েছে বলা যায়।

প্রচলিত কাহিনী হ'ল, ভগবান বিষ্ণু যখন বামনরূপ ধারণ ক'রে বলিকে ছলনা ক'রে তিন পায়ে ত্রিভুবন অধিকার ক'রে নিয়েছিলেন, তখন বলিরাজ ভগবানকে বলেছিলেন, পাতালে বাস তাঁর অনিবার্য, কিন্তু তিন দিন আরো যেন তিনি পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পারেন। ভগবান তাঁকে যে সময় দিয়েছিলেন—তা ঐ তিনটি দিন চতুর্দশী

থেকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। তাই দীপান্বিতার তিনদিন-ব্যাপী উৎসবে শ্রীকৃষ্ণ ও বলিরাজের পূজা। দীপদানের নির্দেশও—ভগবানের যা আদেশ ছিল বলিরাজের প্রতি—এ তারই অনুসরণ।

দীপদানের প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, দীপদান-বিধিটি কার্তিক মাসে প্রশস্ততম—একথা বহু শাস্ত্রে ব্যক্ত হয়েছে। কার্তিক মাসের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমরা ব্রহ্মপুরাণের উক্তি উল্লেখ করেছি। এজন্য ভারতের সর্বত্র এই কার্তিক মাসেই আকাশপ্রদীপ জ্বালানোর রীতি প্রতিপালিত হয়। ধর্মনিষ্ঠ ভক্তিপ্রাণ ভারতবাসী এই আকাশদীপ প্রজ্বালন অতিশয় পবিত্র কর্ম বলেই মনে করেন। এটি যেন হোমকর্ম। হোমের আহুতিই দীপদান। এই হোমকর্মে পূর্ণাহুতির দিন এই অমাবস্যা তিথি। অনাসক্ত মানবের কর্মেতেই অধিকার। এই কর্মযজ্ঞের পরিসমাপ্তির নির্দিষ্ট দিনটি তাই এত পবিত্র ও প্রতিপালনীয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এ কর্মের আবশ্যকতাও ফলপ্রশংসার অবসরে সুন্দরভাবেই ব্যক্ত করেছেন :

"তুলাং তিলতৈলেন সায়ংসন্ধ্যা সমাগমে।
আকাশদীপং যো দদ্যান্মাসমেকং নিরন্তরম্॥
লক্ষ্ম্যা সহ শ্রীপতয়ে স শ্রীমান্ ভুবি জায়তে॥"

এই ফল বর্ণনা করে মন্ত্রটিও প্রকাশ ক'রে বলেছেন :

"দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥"

আবো বলেছেন :

"বিষ্ণুবেশ্মনি যো দদ্যাৎ কার্তিকে মাসি দীপকম্।
অগ্নিষ্টোমসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি নারদ॥"

শাস্ত্রপ্রমাণ এ বিষয়ে অনেক। অসংখ্য শাস্ত্র এ কথা বলেছেন—কার্তিকমাসে দীপদানের মত পুণ্য আর নেই। অমাবস্যায় শতসহস্র আলো জ্বালিয়ে এর পূর্ণাহুতি দেওয়া হয়। ভগবান্ বিষ্ণু ও তাঁর প্রিয়া লক্ষ্মী হচ্ছেন এর ফলদাতা; এবং এই কারণে গণেশের পূজাটিও অনিবার্যরূপে এসে পড়েছে। পূজান্তে গণেশের পূজা সর্বাগ্রে।

কর্মের দিক থেকে যজ্ঞরূপতা এতে আরোপিত ক'রে দীপদানের সার্থকতার কথা আমরা বলেছি। জ্ঞানের দিক থেকেও এর মূল্য অপরিমেয়। বেদোপনিষদের শিক্ষায় আমরা পাই উপাসনায় ভাবনা বা দৃষ্টিবিচারই উত্তরণের কৌশল। যেমন শিলাতে বিষ্ণুত্ব-বুদ্ধি। যে মাত্র শিলা—তার কি প্রাণসত্তা আছে? তা তো সকলেরই পরিজ্ঞাত; তথাপি তার মহিমা সকলেরই বিদিত বিষয়। তেমনি ভগবান্ সর্বত্র বিরাজমান থাকলেও হৃদয়-দেশে অনুধ্যানের ফল সর্বাতীত। তেমনি এই দীপটি অন্ধকার বিনাশী। এটিকে লৌকিক দীপমাত্র ভাবনা না ক'রে জ্ঞানদীপের প্রতীকরূপে ভাবনাই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, জ্ঞানদীপ এরই মত সমুদয় মোহান্ধকার দূর ক'রে দেবে। এমনি ক'রে চতুর্দিকে যখন সহস্র শিখায় জ্ঞানদীপ জ্বলে উঠবে তখন সাধকের মনের সমুদয় অজ্ঞানান্ধকার নির্মূল হয়ে যাবে, জ্ঞানপ্রতিষ্ঠা তখনই সিদ্ধ হবে। তাই সকল দীপজ্যোতি অপেক্ষা এ জ্ঞান-জ্যোতি শ্রেষ্ঠ। এই দীপদানের মন্ত্রটি ব্রহ্মপুরাণ ব্যক্ত করেছেন :

"অগ্নির্জ্যোতীরবির্জ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ।
উত্তমঃ সর্বজ্যোতিষাং দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥"

অর্থাৎ অগ্নিও জ্যোতিঃ, রবিও জ্যোতিঃ, চন্দ্রও জ্যোতিঃ, এরা সবই জ্যোতি নিশ্চয়, কিন্তু সর্বজ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি হচ্ছে আমার প্রদত্ত এই 'দীপ'—তা তুমি গ্রহণ কর।

'দীপান্বিতা' নামের প্রাধান্য অনুসারে দীপদানের মাহাত্ম্য কীর্তিত হলেও তদুপলক্ষে পূজার্চনাটিও কখনো গৌণ নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে উৎসবের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে প্রতি দেশের ভক্তদের প্রিয় দেবতাকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। এতে স্ব স্ব প্রিয় আরাধ্যকে উপচার নিবেদনের যে পরিচয় দেখতে পাই, তাতে সাধকের

মনোগত ভাবের বিভিন্নতার প্রমাণ মিলে। কারণ দেবতারা বিভিন্ন হলেও মূল কর্ম দীপযজ্ঞের কোন বিচ্যুতি নেই। আরাধ্যদেবতার যে কোন নির্দিষ্ট রূপ বা প্রকৃতি নেই, একথা ভারতীয় সভ্যতার মূল শিক্ষা, কিন্তু সাধকের চিত্তগত ভাব-শক্তি-সামর্থ্যানুসারে সাধনার বস্তু নির্ধারণ ক'রে নিতে হয়। এজন্য যে মূর্তি যে ভাব তার চিত্তে স্বকীয় স্বভাবানুসারে প্রসন্নতা, আনন্দ উৎপাদন করে—সেই তার ইষ্টমূর্তি আরাধ্য দেবতা, সে যা-ই হোক্ তা ভগবানের রূপ। একই পরমেশ্বরের বিভিন্নরূপ। তাই ভারতবাসী জানে কালীপূজা বা কৃষ্ণপূজা—যা-ই বিহিত হোক্ তা তার প্রিয়েরই পূজা। কালী আর কালাচাঁদের পার্থক্য এদেশে নেই। তার কারণ ভারতবর্ষ উপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই এই ভেদবাহুল্যে তাদের কোন দ্বন্দ্ব নেই। সৃষ্ট্যাদি কার্যনির্বাহের জন্যই ভগবানের মূর্তিধারণ নানা-ভাবে। প্রথমে তাই তিনি প্রকৃতি আর পুরুষ। "যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভুব সঃ" সুতরাং একই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ, "অথ ভক্তানুরোধাদ্ বা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা" অর্থাৎ ভক্তের প্রয়োজনে এই যেখানে তত্ত্ব, সেখানে মহামায়া আর মহা-মায়াবীতে পার্থক্য কোথায়, সুতরাং এ তত্ত্বে অজ্ঞান দৃষ্টিতেই হয়েছে একেরই বহুরূপতা স্ত্রী-পুরুষভেদে। বস্তুতঃ স্ত্রীপুংভেদ বলে কিছু নেই; মানুষের জন্য তাঁকে ভক্তদের মনোভাব অনুসরণ ক'রে হতে হয়েছে, কোথায়ও স্ত্রী—কোথায়ও পুরুষ। তাই শাস্ত্র বলেছেন :

"অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে।"

এ থেকে দীপান্বিতায় আমরা আরো একটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই, তা হ'ল পূর্বোক্ত কর্মযজ্ঞ আর উপাসনা। দীপদানে মহাযজ্ঞের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে পূজার্চনারূপ উপাসনা মিশ্রিত হয়ে এ উৎসবটিকে কর্ম ও উপাসনার একটি মিলনক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এর মূল্য অপরিমেয়। কারণ শাস্ত্র বলেছেন দেহাভিমান থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানবিদ্ না হওয়া পর্যন্ত কর্ম অবশ্য করণীয়। কিন্তু কর্ম যদি উপাসনা বর্জিত হয়—বন্ধনের হেতু হতে পারে। উপাসনাসহ অনুষ্ঠিত সূর্যদ্বারে সত্যলোকে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। তা হ'ল অমৃতের দ্বার, কারণ—আর দুঃখকর জন্মের আবর্তে পতিত হতে হবে না। বিশেষতঃ অনাত্মজ্ঞ মানবের এ হ'ল শ্রেষ্ঠ ফল এবং শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। দীপান্বিতা মহাতিথি এ অমূল্য সুযোগ দান করেছেন মর্ত্যবাসীদের, তাই এই মহিমান্বিতা দীপান্বিতার অধিষ্ঠাতৃদেবতার চরণে প্রার্থনা—"অভয়ং নঃ করোতু—"।

প্রতীক্ষা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মন্দির দ্বারে তব দণ্ডায়মান,
খোলো দ্বার খোলো দ্বার
ডাকি মোরা বার বার
ভক্তেরে কব দেব দর্শন দান॥
কাঠের কঠোর দ্বারে মন্দির-পাষাণে
মাথা কুটে মরি মোরা অস্থির পরাণে;
আসিয়াছি বহুদূর
আঁখি বড় তৃষাতুর
খোলো দ্বার করি অই রূপ-সুধা পান।

উবে যায় মৃগমদ, নিভে যায় দেউটি
কোথা হায় পুরোহিত শুনিবে না কেউ কি।
চন্দন হ'লো ধূলি পুড়ে যায় ধূপগুলি
পুষ্প তুলসী ডালি ঝলসিয়া প্রাণ॥
ক্রমেই বাড়িছে ভিড় তাই ভাবনা,
দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু ভিতরে কি পাব না?
কেহ যদি নাই আসে দয়া তবে করো দাসে
নিজেই দুয়ার তুমি খোলো ভগবান।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী তেজসানন্দ

সঙ্ঘের আদর্শ

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা। ঐ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া, যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—সর্বপ্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার অসাধুতার প্রতিবাদ করিতেছে; তাহাদিগকে যেন বলিতেছে,—সাবধান! ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে।......প্রাচীনকালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনও এই ত্যাগই আবার ভারতকে জয় করিবে। এই ত্যাগ এখনও ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ।" ভারতের বেদান্ত শিক্ষা দেয় ব্রহ্ম হইতে কীটপরমাণু সর্বভূতে পরমপ্রেমস্বরূপ এক ঈশ্বর বিদ্যমান। বৈচিত্র্যবহুল বিশ্বচরাচর সেই পরমাত্মা রূপী ঈশ্বরেরই বিবিধ প্রকাশ। জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তাহা দয়া, প্রেম নহে; আর আত্মবুদ্ধিতে জীবের যে সেবা করা হয় তাহাই প্রেম। এই আত্মাই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাই স্বামীজী পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বরবুদ্ধিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর।... তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই।......উহা তোমার পূজাস্বরূপ। আমি কতকগুলি দরিদ্রব্যক্তিকে দেখিতেছি, আমার নিজ মুক্তির জন্য আমি তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের পূজা করিব; ঈশ্বর সেখানে রহিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভুগিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতি-রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি।.. ...তোমার আমার জীবনের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই সকল বিভিন্নরূপে সেবা করিতে পারি। কাহারও কল্যাণ করিতে পার এ ধারণা ছাড়িয়া দাও।..... তোমাদিগকে শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে এবং যে কেহ তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে পরের সেবা শুভ কর্ম। এই সৎকর্ম-বলে চিত্তশুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন।" এই ত্যাগ ও সেবাধর্মই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াও সকলে এই মহান সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী নিজেদের জীবনে এই সেবাদর্শ জীবন্ত করিয়া তুলিয়া যুগ প্রয়োজনে বনের বেদান্ত ঘরে আনিয়াছেন। বৈষ্ণব- ও বেদান্তধর্মের চরম পরিণতি এই সেবাধর্মে হিংসা-দ্বেষের অবকাশ নাই—উচ্চাবচ ভাবের প্রসারতা নাই; আছে শুধু সমদর্শনাত্মক অনাবিল প্রীতি-ধারার সাবলীল গতি ও ছন্দ। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ এই সমুন্নত ত্যাগ ও সেবাধর্মেরই মূর্ত প্রতীক। বিভিন্ন ধর্মের ন্যায় যোগ ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম এই চতুর্বিধ সাধনপদ্ধতিও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অতি সুন্দরভাবে সমন্বিত হইয়াছে। স্বামীজি তৎপরিকল্পিত শিল-মোহরে (monogram-এ) রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এই আদর্শকে অঙ্কিত করিয়া তাহার

ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তির পরিচায়ক। আর চিত্র-মধ্যস্থ হংস-প্রতিকৃতিটির অর্থ—পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটি, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মা লাভ হয়—ইহাই চিত্রের অর্থ।" প্রাচ্য ও প্রতীচ্য স্থাপত্যশিল্পের সমবায়ে নির্মিত বেলুড়-মঠস্থ সুবৃহৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির পুরোভাগে সঙ্ঘের আদর্শের এই অর্থপূর্ণ প্রতীকটি বহন করিয়া রামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্ম ও সর্বযোগের সমন্বয়ের প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। সর্বধর্মের তথা সর্বতীর্থের সমাবেশে বেলুড়মঠ পরম পবিত্র সর্বজনীন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এমন কোন শাস্ত্র-সম্মত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাই যাহা এখানে সমাদৃত না হয়; বিশ্বের এমন কোন অবতারকল্প মহাপুরুষ বা ধর্মাচার্য নাই যাঁহারা এখানে পূজা ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত না হন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের এই উদার আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া দেশদেশান্তর হইতে আগত অগণিত নরনারী দিনের পর দিন ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যুগে যুগে যেখানেই কোন সন্ন্যাসিসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানেই জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বালিত হইয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার-সমূহ এক সময়ে জ্ঞান-চর্চার অদ্বিতীয় আবাসভূমি ছিল। ইওরোপখণ্ডের অন্ধকার-যুগে ক্যাথলিক সন্ন্যাসিগণই গ্রীক সাহিত্য ও প্রাচীন প্রতীচ্য সভ্যতা রক্ষা করিয়া জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্তমান যুগেও রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তিস্বরূপ বেদবেদান্তাদি সংস্কৃতশাস্ত্রাবলম্বনে ভারতের মর্মবাণী কালোপযোগী করিয়া দেশদেশান্তরে বহন করিতেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, স্বাধীন ভারতের এই নবজাগরণের দিনে স্বকীয় সংস্কৃতির মূল উৎসের সঙ্গে ভারতবাসীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিলে, সাম-গান-মুখরিত প্রাচীন ভারতের সর্বজনীন আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রতি কুটীরে আবার নূতন করিয়া ঝঙ্কার তুলিবে, নূতনকে পুরাতনের পুণ্যস্পর্শে সার্থক করিয়া ভারতকে অধিকতর গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে।

নব্যভারত-গঠনে বিবেকানন্দ

মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ চিন্তাধারা সুপ্তিমগ্ন ভারতবাসীর শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া নবীন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। তাহার ফলে দেখিতে পাই ভারতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নবজাগরণের সাড়া এবং ভারত-ভাগ্যগঠনে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবিধ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। তাঁহারই প্রেরণায় ভারতের পরাধীনতার যুগে সহস্র নিঃস্বার্থ যুবক স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিপুল উৎসাহে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। শুধু ইহাই নহে, তাঁহারই সৃজনীপ্রতিভা-প্রভাবে লুপ্তপ্রায় ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, ললিতকলা, সঙ্গীত প্রভৃতিও পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। বিদ্যুদাধারে সঞ্চিত তড়িৎশক্তি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া যেমন সহসা চারিদিক আলোকিত করে, বিবেকানন্দের কর্মময় জীবন ও শক্তিময়ী বাণী যুগসঞ্চিত তামসিকতা বিদূরিত করিয়া তেমনই জাতির সুপ্তচেতনা জাগ্রত করিয়া তুলিল। সমাজনীতিক, রাষ্ট্রনীতিক, আর্থনীতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে আজ তাঁহারই বিপ্লবী চিন্তার চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ভারতের এই বহুমুখী জাগরণের মূলে বিবেকানন্দের অমূল্য অবদানকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অপরাপর পুরোহিতগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর অন্তর্ধানের পর শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন, "ভারতের বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করা যায়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ—

নরকেশরী বিবেকানন্দ। আবার দেখিতেছি তাঁহার প্রভাব ভারতাত্মাকে আলোড়িত করিয়াছে। আমরা বলিব বিবেকানন্দ এখনও বাঁচিয়া আছেন তাঁহার দেশবাসীর আত্মায়, দেশজননীর সন্তানদের আত্মায়।" বাঙ্গালী বীর নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার 'Indian Pilgrim' (ভারত-পথিক) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রতিকৃতি ও উপদেশ উভয়ের পরিপূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে সমস্যাসমূহ আমার মনকে অনিশ্চিতভাবে আলোড়ন করিতেছিল এবং যেগুলি সম্বন্ধে পরে আমি অবহিত হই, উহাদের সন্তোষজনক সমাধান তাঁহার মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম।" বর্তমান ভারতের জনপ্রিয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুও বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া কিছুদিন পূর্বে বলিয়াছেন, "সাধারণ অর্থে রাজনীতিজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) তাহা ছিলেন না বটে, তথাপি আমি মনে করি তিনি ভারতের বর্তমান জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম মহান প্রবর্তক ছিলেন। পরবর্তীকালে যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি এই আন্দোলনে কমবেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আধুনিক ভারতকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করিয়াছেন।"

আজ আর্থনীতিক সাম্যকে ভিত্তি করিয়া যে সমাজতন্ত্রবাদ ভারতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং যে আদর্শে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনে দেশনায়কগণ তৎপর হইয়াছেন, তাহারও উজ্জ্বল চিত্র স্বামীজীর মানসপটে বহুপূর্বেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তবে স্বামীজী নিজেকে 'সমাজতন্ত্রবাদী' বলিয়া ঘোষণা করিলেও তাঁহার পরিকল্পনা বর্তমান জড়বাদীর নিরীশ্বর সাম্যবাদ হইতে মূলতঃ পৃথক। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন,—একমাত্র বেদান্তই সমাজতন্ত্রবাদের যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি হইবার উপযুক্ত। তিনি বলিয়াছেন, "মানবসমাজের উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ, অন্ততঃ তাঁহাদের পরিচালকগণ, বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তাঁহাদের ধনসাম্যাত্মক ও সমানাধিকারমূলক মতবাদসমূহের একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকা সঙ্গত এবং একমাত্র বেদান্তই এই ভিত্তি হইবার যোগ্য।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন, "কি সামাজিক, কি রাজনীতিক, কি আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রেই—যথার্থ মঙ্গল স্থাপনের একটি মাত্র সূত্র বিদ্যমান—যে সূত্র হইতেছে এইটুকু জানা যে, 'আমি ও আমার ভাই এক'। সর্বদেশে সর্বকালে সর্বজাতির পক্ষে এই মহাসত্য সমভাবে প্রযোজ্য।" তিনি বেদান্তের আত্মিক একত্বমূলক সাম্যকে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এখন কর্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর উহাকে 'রহস্য' রাখিলে চলিবে না। এখন আর উহা হিমালয়ের গুহায় বন-জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট থাকিবে না; লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রাসাদে, সাধু-সন্ন্যাসীর গুহায়, দরিদ্রের কুটীরে, সর্বত্র—এমনকি রাস্তার ভিখারী দ্বারাও উহা কার্যে পরিণত হইতে পারে।"

তিনি এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্রগঠনের কল্পনা করিয়াছিলেন যাহাতে ব্রাহ্মণ-যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্য-আদর্শ সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে অথচ ইহাদের দোষরাশি থাকিবে না। তিনি বলিতেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যুগের প্রাধান্যের অবসান ঘটিয়াছে; এবার শূদ্রযুগের আবির্ভাব হইবে; উহা কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। তাই তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণকে সম্বোধন করিয়া মর্মস্পর্শী ভাষায় বলিয়াছেন, "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক! বেরুক লাঙ্গল ধরে

চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে।" আজ ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনে ইহারই প্রতিফলন দেখিতে পাই না কি? তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক মহামহিমান্বিত ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছেন।" অর্থাৎ বৈদান্তিক যেরূপ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল নরনারীকে একই ব্রহ্ম বা আত্ম-স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন, ইসলামধর্মিগণ সমাজের দিক দিয়া তাহাদের ধর্মাবলম্বিগণকে সেইরূপ ভ্রাতৃ-ভাবে দেখিয়া থাকেন এবং তাহাদের সঙ্গে তদনুরূপ ব্যবহার করেন। বলাবাহুল্য, বেদান্তের এই আত্মিক ঐক্য ও অভেদত্বমূলক সাম্য-মৈত্রী ও সমদর্শন এবং ইসলামের সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সমদর্শিতা মিলিত হইয়া এক পূর্ণাঙ্গ ভারত গড়িয়া তুলিবে। সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম-ধর্ম সাধনার পূর্ণ সার্থকতাও ইহারই মধ্যে সুস্পষ্ট সূচিত হইতেছে। ভারতে যে ধর্মনিরপেক্ষ ঐহিক (secular) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে যেখানে সকল ধর্মই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া অবস্থান করিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বধর্ম-সমন্বয়েরই রাষ্ট্রিক রূপায়ণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

সমাজের প্রকৃত সংস্কার ও উন্নতির পন্থা নির্দেশ করিয়া বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহা সকল সমাজসংস্কারকগণেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। ভারত ধর্মমুখী বা অন্তর্মুখী, পাশ্চাত্ত্য বহির্মুখী। পাশ্চাত্ত্যদেশ ধর্মের এতটুকু উন্নতি করিতে হইলে সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে চায়: আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তিলাভ করিতে হইলে তাহা ধর্মের মধ্য দিয়া লাভ করিতে চায়। .... আধুনিক সংস্কারকগণ প্রথমেই ভারতের ধর্মকে নষ্ট না করিয়া সংস্কারের কোন উপায় দেখিতে পান না। তাঁহারা উহার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন—আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্মের প্রসূতিকে' বুঝিবার জন্য যে সাধনা প্রয়োজন সেই সাধনার মধ্য দিয়া যান নাই। আমি বলি, হিন্দু সমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই এবং হিন্দুর ধর্ম প্রাচীন রীতিনীতি ও আচারপদ্ধতি প্রভৃতি সমর্থন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া যে সমাজের এই অবস্থা তাহা নহে; কিন্তু ধর্মকে সামাজিক ব্যাপারে যে ভাবে লাগানো উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা।...... ঋষিচরিত্র, সত্যকার জীবন, যাহা শক্তির কেন্দ্র এবং দেবমানবত্বের মিলনভূমি—তাহাই পথ দেখাইবে। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই বিভিন্ন উপাদানসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ হইবে এবং পরে প্রচণ্ড তরঙ্গের মত সমাজের উপর পতিত হইয়া সব কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইবে,—সমস্ত অপবিত্রতা দূর হইবে।......এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।...... সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্বোচ্চ সত্য কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে; ইহাই আমার মত।" বলা বাহুল্য বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ স্বামীজীর এই উদার আদর্শ ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী

করিয়া তুলিবার জন্য নানা বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁহারই পতাকা দৃঢ়হস্তে বহন করিয়া চলিয়াছে।

সঙ্ঘের প্রসার

ভারতীয় নর-নারীর মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন শিক্ষার প্রবর্তন এবং প্রাচীন যুগের নালন্দা, তক্ষশিলা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলার আদর্শে বর্তমানকালোপযোগী করিয়া একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোলাও স্বামীজী এই সঙ্ঘের ব্যাপক কর্মসূচীর অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আনুকূল্যে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্যে দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন স্তরের আধুনিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, শিল্পমন্দির, সংস্কৃত শিক্ষায়তন, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, সংস্কৃতি-ভবন, পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশন, সাহায্যকেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয় সেবাভবন প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণের তত্ত্বাবধানে উহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

এস্থলে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পিত নারীশিক্ষার আদর্শকে ভারতে প্রথম রূপায়িত করিয়া তুলিলেন এক বিদেশী মহিলা,—স্বামীজীর মানসদুহিতা 'ভগিনী নিবেদিতা' (Miss Margaret Noble)। তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও এবং ইংলণ্ডের পৌর পরিবেশে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলেও স্বামী বিবেকানন্দের পূতসংস্পর্শ ও শিক্ষাপ্রভাবে ভারতমাতার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বামীজী-প্রদত্ত 'নিবেদিতা' নাম সার্থক করিয়া গিয়াছেন। বিপুল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি উত্তর কলিকাতার বাগবাজারে এক জনাকীর্ণ পল্লীতে ১৯০২ সালে একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যাহা কালে 'রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়' নামে সুপরিচিত হইয়াছে। ক্রমে ভগিনী ক্রিষ্টীন (স্বামীজীর জনৈকা মার্কিন শিষ্যা—(Miss Greenstidel) এবং শ্রীমতী সুধীরা দেবীও এই বিদ্যায়তনের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে নিবেদিতাকে নানা প্রকারে সাহায্য করেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ে 'সারদা-মন্দির' স্থাপনা করিয়া ব্রতধারিণী নারীগণেরও থাকিবার ও শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। ইহার পর হইতে ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন স্থানেও রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আনুকূল্যে ও আদর্শে নারীশিক্ষামূলক বিবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে নারীজাতির ভবিষ্যৎ জাগরণকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী দৃঢকণ্ঠে বলিয়াছেন, "শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হইবে না……মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাইতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মিবে।" তিনি আবার বলিয়াছেন, "স্ত্রী-জাতির অভ্যুদয় না হইলে ভারতের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু-গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাবে সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার, সেই জন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ।" স্বামীজীর শেষোক্ত পরিকল্পনাটি ১৯৫৪ সালে সঙ্ঘজননী শ্রীসারদাদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের আনুকূল্যে উক্ত সালের ২রা ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের অনতিদূরে ভাগীরথী-তীরে "শ্রীসারদা মঠ" নামে একটি স্বতন্ত্র নারী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর যুগ্মজীবনের ত্যাগোজ্জ্বল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেক উচ্চশিক্ষিতা নারী ইতোমধ্যে উক্ত 'সারদা-মঠে' যোগদান করিয়াছেন। এই সকল ব্রতধারিণীগণের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে বর্তমানে পূর্বোল্লিখিত নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়টি সুষ্ঠুভাবে

পরিচালিত হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহাদের ব্যাপক কর্মসূচী দেশবাসীকে আশান্বিত ও উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছে।

বর্তমানে ভারতে ও ভারতেতর দেশে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ১১৫টি কর্মকেন্দ্র বিদ্যমান। তন্মধ্যে ভারতে ৮৪টি এবং বিদেশে * ৩১টি। এই সকল মঠ ও মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে একদিকে যেমন মনুষ্য-সমাজের উন্নতিবিধায়ক বিবিধ কার্য সম্পাদিত হইতেছে অপর দিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সংযোগ-সেতু স্থাপন করিয়া সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দ ভারতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শ প্রচার-পূর্বক মানবের চিন্তাজগতেও এক বিপুল পরিবর্তন আনিয়া বিশ্ব-শান্তির পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। আমেরিকার দক্ষিণ কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ অধ্যাপক Mr. Floyd H. Ross কয়েক বৎসর পূর্বে ভারত-ভ্রমণকালে অমৃতবাজার পত্রিকায় 'Vedanta and the West'-শীর্ষক এক সুচিন্তিত প্রবন্ধে ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছিলেন,

"One of the most vital contemporary religious and educational movements in India today is the Ramakrishna Movement Under the leadership of men trained in the spirit of Ramakrishna and Vivekananda, the Ramakrishna Centres are living examples of how the timeless truths of the past have value when they are continuously re-lived and re-interpreted in the present These Ramakrishna Centres in the West are playing their own part quietly in helping to prepare the way for the united pilgrimage of mankind towards self-understanding and peace."

অর্থাৎ বর্তমান ভারতে শিক্ষা ও ধর্মসম্বন্ধীয় যে সকল সঙ্ঘের উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘই সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত সন্ন্যাসিগণের নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রসমূহ প্রমাণ করিতেছে যাহা চিরন্তন সত্য তাহা তখনই কার্যকরী ও কল্যাণপ্রসূ হয় যখন উহা মনুষ্যজীবনে সদানিয়ত উদ্‌যাপিত হইয়া মানব-সমাজে যুগোপযোগী করিয়া পরিবেশিত হয়। প্রতীচ্যখণ্ডে অবস্থিত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কেন্দ্রসমূহ মানব-জাতির মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপনের পথ সুগম করিয়া এক মহান দায়িত্ব সম্পাদন করিতেছে।

বেদান্ত ও বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ ভূমিকা

আজ প্রতীচ্য বিজ্ঞান এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যাহা মানবের অশেষ কল্যাণাস্পদ তাহাই আজ বিশ্ব-ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্ব-শান্তির অজুহাতে কতিপয় হিংসোন্মত্ত শক্তিশালী জাতি আণবিক-অস্ত্রহস্তে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। প্রশ্ন জাগিয়াছে—ইহাই কি প্রকৃত শান্তির পন্থা? বৈদিক যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সর্ব-দেশের ও সর্বযুগের ত্রিকালদর্শী মহামানবগণ মুক্তকণ্ঠে বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন, হিংসার দ্বারা কখনও হিংসার নিবৃত্তি হয় না। প্রেমাবতার ভগবান বুদ্ধ জগৎকে সনাতন শান্তির বাণী শুনাইয়া বলিয়াছেন, "ন বেরেণ বেরাণি সমন্তীধ কুদাচন। অবেরেণ হি সমন্তীধ এষ ধর্ম্ম সনন্তন।"—বৈরীভাব দ্বারা বৈরীভাব বিদূরিত হয় না। অবৈরীভাব দ্বারাই উহা (মৈত্রী) সাধিত হয়—ইহাই সনাতন ধর্ম। ভক্তকুলতিলক ভগবান যীশুর প্রধান শিষ্য পিটার প্রভুর (যীশুর) রক্ষার্থে অসি উত্তোলন করিলে তিনি তাহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন, "প্রতি-হিংসার উদ্দেশ্যে যে অসি উত্তোলন করে তাহাকে সেই অসির আঘাতেই প্রাণ হারাইতে হয়।" বিখ্যাত ঐতিহাসিক A. J. Toynbee ইহারই

* পাকিস্তানে—১১, রেঙ্গুনে—২, সিঙ্গাপুর, সিংহল, মরিসস, ফিজি, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে এক একটি, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—১১ ও দক্ষিণ আমেরিকায়—১।

প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'Study of History'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"The sword which has once drunk blood cannot be permanently restrained from drinking blood again any more than a tiger which has once tasted human flesh can be prevented from becoming a man-eater doomed to death. . Even if the tiger could foresee his doom, he would probably be unable to subdue his devouring appetite, so, it is with a society which has once sought salvation through the the sword."

যে অসি একবার কোষমুক্ত হইয়া শোণিতের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহাকে আর কোষবদ্ধ করা সম্ভব নহে ; যেমন, যে ব্যাঘ্র মনুষ্যরক্তের আস্বাদ পাইয়াছে সে শুধু মনুষ্যই ভক্ষণ করিবে ; (শিকারীর হস্তে) তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়াও সে তাহার দুর্জয় মনুষ্য-রক্তপিপাসা নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। মানব-সমাজের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। হিংসা ও অস্ত্রের সাহায্যে মুক্তি ও শান্তির সন্ধান যাহারা করে, তাহাদের পরিণাম এই মনুষ্যরক্তলোলুপ হিংস্র ব্যাঘ্রেরই মত। ইহা সর্বজন-বিদিত যে, বিশ্বধ্বংসে যে হস্ত উদ্যত হয়, মানবের অন্তরের প্রসুপ্ত দেবত্ব জাগ্রত হইলে সেই হস্তই আবার বিশ্বমঙ্গলে নিয়োজিত হয়। প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি চিরদিনই পাশবিক শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক শক্তিতে আস্থাবান শান্তিপ্রিয় কতিপয় দেশের রাষ্ট্রনায়কের কণ্ঠেও প্রাচীন পঞ্চশীল, অহিংসা ও সাম্যমৈত্রীর বাণী আজ উদ্‌গীত হইতেছে, যাহা ভীতিবিহ্বল মানবচিত্তে আশার সুবর্ণদীপ পুনঃপ্রজ্বালিত করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণান্তে তাঁহার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া সকলকে বলিয়াছেন, "যাঁহারা চক্ষু খুলিয়া আছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য জগতের বিভিন্ন জাতির মনের গতি বুঝেন, যাঁহারা চিন্তাশীল এবং বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহারা দেখিবেন ভারতীয় চিন্তার এই ধীর অবিরাম প্রবাহের দ্বারা জগতের এই ভাব, গতি, চালচলন এবং সাহিত্যের কি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তবে ভারতীয় প্রচারের একটি বিশেষত্ব আছে, ...আমরা কখনও বন্দুক বা তরবারির সাহায্যে কোন ভাব প্রচার করি নাই।...... লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত—অশ্রুত অথচ মহাফলপ্রসূ উষাকালীন ধীর শিশির-সম্পাতের ন্যায় এই শান্ত সহিষ্ণু 'সর্বংসহ' ধর্মপ্রাণ জাতি চিন্তাজগতে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে।"

আনন্দের বিষয়, সুদীর্ঘ সাধনার ফলে প্রতীচ্য জড়বিজ্ঞান স্থূল বহির্জগতের একত্ব সম্পাদন করিয়া ভারতীয় বেদান্তের সঙ্গে আজ হাত মিলাইতেছে। বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত ও অবদান সম্বন্ধে স্বামীজীও বলিয়াছেন,—আধুনিক জড়বাদী বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন—তুমি, আমি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এক অনন্ত জড়সমষ্টি-সাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ। বেদান্ত আরও অগ্রসর হইয়া বহুশতাব্দী পূর্বে ঘোষণা করিয়াছে এই জড়সমষ্টির পশ্চাতে বিশ্বব্যাপী এক অদ্বিতীয় চেতনসত্তা বিদ্যমান যাহাকে আমরা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। বস্তুতঃ জড় চেতনেরই নামান্তর মাত্র। নাম-রূপ সংযুক্ত হইয়া একই জল যেমন ফেন-বুদ্বুদ-তরঙ্গাকারে প্রতিভাত হয়, তেমনি সেই এক অনাদি চিন্ময় সত্তা (সচ্চিদানন্দ) নামরূপের মাধ্যমে বৈচিত্র্যবহুল বিশ্বজগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরূপতঃ জড় ও চৈতন্যে কোন প্রভেদ নাই। বেদান্ত ও বিজ্ঞান বিভিন্ন দিক হইতে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আজ এমন এক মিলন-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছে যেখানে সমগ্র বিশ্ব এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সত্তারই বিবিধ বিকাশরূপে স্বীকৃত হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিসহায়ে দেখিয়াছিলেন—প্রাচ্যের বেদান্ত ও প্রতীচ্যের বিজ্ঞানের সমবায়ে

অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি মহতী সংস্কৃতির উদ্ভব হইবে যাহা বিবিধ ধর্ম ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া একত্বের ভিত্তিতে অনন্ত বিস্তারের পথ উন্মুক্ত রাখিবে; যাহা পারস্পরিক হিংসা ও ধ্বংসাত্মক স্বার্থসংঘাত সৃষ্টি না করিয়া মানবজাতিকে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত করিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে। এই অভেদজ্ঞান বা একত্বানুভূতিই অনন্তপ্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও নৈতিকধর্মের মূল উৎস। শান্তিপ্রিয় মানব বেদান্তের এই উদার গম্ভীর অভয়বাণী শ্রবণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। বেদান্ত ও বিজ্ঞানের বিবাদ আজ তিরোহিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে শ্রীভগবানের কণ্ঠে একদিন যেমন সাম্যমৈত্রীর বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল, আজ এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বিশ্ববাসীকে বেদান্ত-বিজ্ঞান-সমন্বয়প্রসূত একত্বের তথা শান্তির বাণী সেইভাবে শুনাইতে হইবে। ভারতবাসীকে সেই সুমহান দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্তস্বরে বলিয়াছেন, "অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের সংস্কারকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎকে বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিকতার বন্যায় ভাসাইয়াছেন। এখান হইতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোকসর্বস্ব সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপর-দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্বাণ করিতে যে অমৃত-সলিলের প্রয়োজন, তাহা এখানেই বর্তমান। বন্ধুগণ! বিশ্বাস করুন, ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে। তিনি আবার বলিতেছেন, "জাগো ভারত, জাগো; তোমার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎকে জয় কর। তোমার নব জাগরণ ও জাতীয় জীবনের দায়িত্ব তখনই চরিতার্থতা লাভ করিবে, যখন তুমি তোমার যুগ-যুগ-সঞ্চিত আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা বিশ্বজয় করিতে পারিবে।"

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ অতি ক্ষুদ্রাকারে বাংলার বুকে একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর অফুরন্ত স্নেহ-পীযূষধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া যাহা বর্ধিত হইয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ ও তদীয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দের অক্লান্ত উদ্যম ও সাধনায় যাহা কালে একটি মহাশক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে, তাহাই আজ দেশদেশান্তরে বিপুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং সমগ্র মানবজাতির ঐহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ-সাধনোদ্দেশ্যে এবং ভারতের শাশ্বত শান্তির বাণী অনাড়ম্বরভাবে দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া চলিয়াছে।

কোথায়?

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

প্রচণ্ড সংশয়, অনন্ত সংঘাত,
অনিত্য সংসারে অনৃতের উদ্ভব;
অসহ্য বন্ধন, উল্কার উৎপাত,
বজ্রের গর্জন ভৈরব উৎসব।

রুদ্রের ধ্বংসের দাবাগ্নি-স্ফুলিঙ্গ
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে উদগ্র জীবন্ত,
সাম্রাজ্য-গৌরবে বিলক্ষ্য তুরঙ্গ;
সুবর্ণ সায়াহ্ন মুমূর্ষু পড়ন্ত।

কোথায় হে স্রষ্টা অনাদি অনন্ত!
সম্ভূত সঙ্কটে করো প্রাণবন্ত?

প্রতিমাপূজার প্রয়োজন

শ্রীমতী স্নেহলতা দাশগুপ্তা

প্রতিমাপূজাকে কেহ কেহ পুতুলপূজা বলিয়াছেন। কথাটা যে নিছক মিথ্যা, তাহা নহে। পুতুলখেলার মধ্যে মনীষীরা জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ প্রভৃতির ছায়া দেখিতে পান, পুতুলখেলাকে তাঁহারা জীবনের প্রস্তুতি বলিয়াই বিবেচনা করেন। কাজেই ইহার পশ্চাতে কাজ করে যে আদর্শ তাহা অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্জাত নহে। যাহা সহজাত অথবা যাহা জীবনের প্রেরণাস্বরূপ সেই আদর্শ এবং যে আদর্শ প্রথমে থাকে মাত্র 'লাঞ্ছিত'*রূপে, তাহা জীবনের অভিজ্ঞতার সহিত ধীরে ধীরে রূপ লয়। কাজেই পুতুলখেলা উপেক্ষার বস্তু নহে। পুতুলখেলা সাংসারিক আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখ লইয়া গঠিত। কিন্তু যাহা কিছু জীবনের মহান্ আদর্শ, যাহা কিছু অলৌকিক, যাহা কিছু হিতকর এবং দৈব—প্রতিমা তাহারই প্রতীক। তাই ইহার নাম প্রতিমা।

পুতুল যেমন জীবনের উৎস হইতে আসিয়াছে প্রতিমাও সেইরূপ। যতদূর বুঝা যায় প্রতিমার আকর্ষণ মনোবুদ্ধির অগোচর সংস্কার হইতে সঞ্জাত। সাধকের শুভমুহূর্তে ইহা সহসা আবির্ভূত হয়। তাই শাস্ত্র বলেন, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"—সাধকের হিতের জন্যই ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু এ কল্পনা কার? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ইহাতে মানুষের মনোবুদ্ধির হাত নাই। ৺শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মই নিজের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এই উত্তরে পরমহংসদেব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

তবে রূপকল্পনার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা দেখিতে পাই সাধারণ মানুষ কেবল গুণমাত্রের কল্পনা করিতে পারে না। এই গুণকে বুঝিতে হইলে একটা আধার না হইলে তাহার বুদ্ধি প্রতিহত হয়। ব্যক্তিগত বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, আদর্শ প্রভৃতি যাহা বিমূর্ত—তাহারও একটা রূপ আছে। কাজেই রুচিরও বৈচিত্র্য আছে। সেইজন্য একই গুণপদার্থ সম্বন্ধে সকলের এক ধারণা নাই, অথবা শুধু বীরত্বের আধার বা ঐরূপ যে কোনও গুণের আধার সম্বন্ধে বহুলোকের মত লইতে গেলে তারতম্য দেখা যায়। একই ব্যক্তিকে বা আদর্শকে সকলে একই চক্ষুতে দেখে না; সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের সাধকের নিকট নির্দিষ্ট ধ্যেয়স্বরূপ প্রতিমা এবং তদনুযায়ী মন্ত্র ও ধ্যান থাকে। বলা বাহুল্য এখান হইতেই সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি। তথাপি আমরা বলিব এই একাগ্র বুদ্ধিই সিদ্ধির সোপান। ইহা ব্যতীত সাধন অসম্ভব। এই ভূমি হইতে যাঁহারা আর একটু ঊর্ধ্বে অবস্থিত তাঁহাদের ইষ্টমূর্তি একটি থাকিলেও তাঁহারা নিজ ইষ্টকে বহুমূর্তির মধ্যে দেখিতে পান এবং গোঁড়ামি বর্জন করিয়া সর্বজনীনতার দিকে অগ্রসর হন। ইহার ঊর্ধ্বে যাঁহারা অবস্থিত তাঁহারা আর প্রতিমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না—কেবলমাত্র গুণবস্তুকে বা শক্তিকে বা জগদাধারকে অবধারণ করিয়া জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছিয়া যান। এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যাও যেমন বিরল তেমনি ইঁহারা জগদ্‌বরেণ্যও হন—তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহাদের যে আত্মগত বাসনা থাকে না—তাহা বলাই বাহুল্য। ইঁহারাই লোকসংগ্রহ-কার্যের উপযুক্ত। কিন্তু সাধারণ জীবের কি গতি হইবে?

* চিত্রকর চিত্রাঙ্কনের পূর্বে পত্রে বা বস্ত্রে লাইন বা দাগ কাটেন। তাহা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বা অপর ব্যক্তি বুঝিতে না পারিলেও চিত্রকরের কাছে উহা ভাবী চিত্রের আভাষ, পরে তাহা তুলিকার ও বর্ণের সাহায্যে রূপ পরিগ্রহ করে।

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করিলাম তাহা কেবলমাত্র দীক্ষিত ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু জগতে দীক্ষিত ব্যক্তি কয়জন? বহুলোক আছেন যাঁহাদের দেবভক্তি আছে, কিন্তু উপাসনার সুযোগ নাই—সাময়িক কর্মের মধ্যে তাঁহারা উৎসাহ দেখাইতে পারেন। আবার আরও লোক আছেন যাঁহাদের উৎসাহ নাই, কিন্তু জানেন দেবভক্তি প্রয়োজন। অপর এক শ্রেণী আছেন যাঁহারা দেবোপাসনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হয় উদাসীন, না হয় সন্দিহান।

গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন :

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥"

অর্থাৎ যদি আমাতে (শ্রীভগবানে) স্থিরভাবে চিত্ত সমাহিত করিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে পাইবার জন্য ইচ্ছা কর। আর যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তাহা হইলে আমার সেবারূপ কর্ম কর। আমার সেবারূপ কর্ম করিতে করিতে তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে, অর্থাৎ আমাকে পাইবে।

আমাদের মনে হয় সাধন-মার্গের ইহাই চরম উপদেশ। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁহাদের চিত্ত প্রথমই হইতেই ধ্যেয়-স্বরূপে স্থির-ভাবে সমাহিত হয়। তন্নিম্নস্থ ব্যক্তিবর্গ দীক্ষালাভ করিয়া স্ব স্ব গুরূপদেশ-অনুসারে অভ্যাসযোগে রত হন। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে কর্মযোগই বিধেয়। এই কর্মযোগের বা বহিরঙ্গ-সাধনের মধ্যে প্রতিমাপূজার স্থান সর্বোচ্চ। অবশ্য ইহা বলাই বাহুল্য যে জীবন্মুক্ত পুরুষের পক্ষে যে কর্মযোগ তাহা "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা সে কর্মযোগের কথা বলিতেছি না। সাধনার প্রথম ভিত্তি যে কর্মযোগ তাহারই কথা বলিতেছি—তাহা হইতেছে প্রতিমাপূজা।

প্রতিমাপূজার বিষয়ে কতকগুলি প্রণিধানযোগ্য বিষয় আছে। ঠিক ঠিক প্রতিমাপূজা কে করিতে পারে? ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির মন্ত্র হইতে আমরা দেখিতে পাই সমাধিসিদ্ধ মহাপুরুষ ব্যতীত প্রকৃত প্রতিমা-পূজাও অসম্ভব। 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ' এই বাক্যটি সর্বদা প্রণিধান করা প্রয়োজন। ধ্যানের বিধিতে আমরা দেখিতে পাই প্রথমে পূজক আত্মপ্রাণ হইতে দেবতাকে প্রতিমায় আনয়ন করিয়া ধ্যান করিবেন। পূজা আরম্ভ করিবার পূর্বে ভূতশুদ্ধির সময়ে আত্মশোধন করিয়া দেবসাযুজ্য লাভ করিবার বিধি আছে।

প্রত্যেক প্রতিমার—বিশেষতঃ সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, শাক্ত এবং শৈব উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট যে প্রতিমা তাঁহার একটি না একটি বাহন বা আধার নির্দিষ্ট আছে। প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে তাহা হয় জীবস্বরূপ আর না হয় ব্রহ্মস্বরূপের প্রতীক—হংস, সিংহ প্রভৃতি জীব-স্বরূপের এবং শবাদি সম্ভবতঃ ব্রহ্মস্বরূপের প্রতীক।

প্রতিমাপূজায় যে উপচারদান-বিধি আছে তাহা সম্পূর্ণ মনুষ্য জনোপযোগী অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে যেমন একদিকে অভেদভাবের আরোপ করে তেমনি অপর দিকে আমাদের যাহা কিছু কাম্য সুখপ্রদ ও শ্রেষ্ঠ উপাদান (অবশ্য সামর্থ্যোপযোগী) তাহাই প্রতিমাতে আরোপিত দেবতাকে উপহার দেওয়ার মধ্যে ত্যাগ, ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি শিক্ষা দেয়। সাধারণ মানুষ যাহারা দেবতার প্রীতির জন্য প্রতিমাপূজার ব্যবস্থা করে, তাঁহার সেবারূপ কর্ম করে এবং এই প্রতিমাপূজার ফল যাহাতে বহুজনে লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিয়া ক্রমশঃ জীবনের—তথা সমাজের আদর্শের দিকে পৌঁছিতে থাকে। ক্রমে সাধনা সার্থক হয়। কাজেই প্রতিমাপূজার বৈশিষ্ট্য হইতেছে সম্মিলিত শুভবুদ্ধির সাহায্যে সমাজ-জীবনের উৎকর্ষ-লাভ।

শক্তির উৎস

রেজাউল করিম

শক্তি-মদে জগৎ আজ উন্মত্ত। যে যে-ভাবে পারিতেছে কেবলই শক্তিবৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। এই শক্তিবৃদ্ধির বিরাম নাই। "শক্তি চাই, শক্তি চাই" ইহাই প্রত্যেক জাতির প্রধান শ্লোগান। রাষ্ট্রনায়কগণ শক্তিবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক দেশে নূতন নূতন মারণাস্ত্র নির্মিত হইতেছে। দুই দুইটা বিশ্বসমরে শক্তিপ্রয়োগের পরিণতি দেখিয়াও কেহই কোন শিক্ষালাভ করিতেছে না।

শক্তির মূল উৎস কি, শক্তির প্রয়োজনীয়তাই বা কি—এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সঠিক ধারণা নাই। শক্তি চাই, এ কথা সত্য। কিন্তু কোন্ শক্তি চাই, কোন্ দেবকার্যে শক্তি নিয়োজিত হইবে, শক্তির দ্বারা পৃথিবীর কি উপকার হইতে পারে, এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। জগদ্বাসীর জানা উচিত যে মানুষকে হত্যা করিবার জন্য, পরদেশ অধিকার বা লুণ্ঠন করিবার জন্য যে শক্তি, তাহা হইতেছে নিছক পশুশক্তি।

পৃথিবীতে ধ্বংসের মাধ্যমেও সৃষ্টিলীলাই চলিতেছে অহরহ। গ্রীষ্মের খরতাপে পৃথিবী যখন উত্তপ্ত হইয়া উঠে, যখন চারিদিকে জীর্ণ পাতা ঝরিয়া পড়ে তখনও দেখা যায় সেই উত্তপ্ত মাটি ভেদ করিয়া গজাইয়া উঠিতেছে নূতন গাছের চারা—চতুর্দিকে দেখি সবুজের কি অপূর্ব সমাহার। —প্রকৃতি ফুলে ফলে সুশোভিত। প্রত্যেক ঋতুতেই দেখি সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব সৃষ্টিলীলা।

শক্তিমদে মত্ত জাতির জানা উচিত যে, সমস্ত শক্তির উৎস হইতেছেন স্বয়ং ভগবান্। শক্তির গোপন রহস্য নিহিত আছে—ঈশ্বরের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক রাখার মধ্যে। যে ঈশ্বর নীরবে সমস্ত পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, সমস্ত কার্য করিয়া যাইতেছেন—সেই ঈশ্বরের সঙ্গে যতটুকু সম্পর্ক রাখিবার যোগ্যতা অর্জন করিব ততটুকুই আমরা সীমার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিব, ততটুকুই প্রকৃত শক্তি লাভ করিতে পারিব।

কেন তবে শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য মানুষ পাগলের মত চতুর্দিক তোলপাড় করিতেছে? যেখানে মূল শক্তি নাই, আত্মাকে সবল করিয়া তুলিতে পারে তেমন শক্তি যেখানে নাই, কেন মানুষ সেইখানেই শক্তির সন্ধান করিতেছে? দেহের শক্তি অপেক্ষা আত্মার শক্তি বড়। এই আত্মার শক্তির সন্ধান না করিয়া কেন মানুষ কেবল দেহের শক্তি—তথা পশুশক্তি বৃদ্ধির জন্য, মারণাস্ত্র নির্মাণের জন্য এত সাধনা করিতেছে? জগতের মহামানবগণ এই আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়াছেন। আত্মাকে বাদ দিয়া কেহ কি শক্তিশালী হইতে পারে?

পৃথিবীতে বহু হিংস্র জীব আছে, মানুষের সাধ্য কি যে তাহাদের পরাভূত করে। কিন্তু আত্মিক ও মানসিক শক্তির প্রভাবে মহামানবগণ ইহাদের উপরও কর্তৃত্ব করিতে পারেন। যদি প্রত্যেক মানুষ আত্মার বলে বলীয়ান হইত তবে এ যুগেও তাহা সম্ভব হইত। একটা কথা বলা হয় যে, মহাপুরুষগণ অলৌকিক শক্তি বলে অলৌকিক কাজ করিয়াছেন। আর সেই জন্যই তাঁহারা পশুকেও বশীভূত করিয়াছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা Miracle বা অলৌকিক কার্য করেন তাঁহারা অতিমানুষ হইলেও মানুষ। তাঁহারা সাধনা-বলে অন্তরের পাশবিক বৃত্তিকে বশীভূত করিয়াছেন বলিয়া সৎ ও মহৎ হইতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের কাজকে আমরা বলি Miracle বা অলৌকিক। কিন্তু এই সব "মিরাক্‌ল্" মহৎ জীবনের অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে মানুষ সত্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন

তিনিই শক্তির উৎস লাভ করিয়াছেন। আমরা সাধারণ লোক যে উচ্চতর জ্ঞান ও সিদ্ধি অর্জন করিতে পারি নাই, মহামানবগণ সাধনা-বলে সেই জ্ঞান ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই জ্ঞান, সেই সত্য ও সেই শক্তির আধারের সঙ্গে একীভূত হইয়া যাওয়ারই অপর নাম "মিরাক্‌ল্"। যে কেহ সেই ভাবে সাধনা করিবে সেই শক্তির সন্ধান পাইবে। মহামানবগণ অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন সাধনালব্ধ শক্তি, সেই শক্তির তুলনায় আণবিক বোমা কিছুই নহে। আত্মার সেই শক্তি সাধনার দ্বারা লাভ করা যায়। আজ সেই আত্মশক্তির সন্ধান করিতে হইবে তবেই জগতের কল্যাণ। মানুষের বৈজ্ঞানিক মন "মিরাক্‌ল্" বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা বলে যে উহা প্রকৃতির নিয়মের বহির্ভূত কাজ। তাহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? সত্যই মহাপুরুষদের নামের সহিত বহু অদ্ভুত ও অবাস্তব ঘটনা জড়িত থাকে। ইহার অনেকগুলি সত্য নহে, এবং অনেকগুলি সাধারণ অবস্থায় মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। মিরাক্‌ল্ এই অর্থে Supernatural বা অতি-প্রাকৃতিক যে ইহা অনেক সময় স্বাভাবিক (Natural) অবস্থার উর্ধ্বে, সাধারণ মানুষ তাহার সাধারণ জ্ঞানদ্বারা যাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, মহাপুরুষগণ সাধনার দ্বারা এরূপ জ্ঞান লাভ করেন, যাহা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থার কিছুটা উর্ধ্বে থাকেন বলিয়া মহাপুরুষের কাজকে মিরাক্‌ল্ বলা হয়। যিনি নিজের সত্তার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং সর্বব্যাপী শক্তি ও জ্ঞানের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছেন তিনি সাধারণ মানুষের জ্ঞানের উপরে উঠিতে পারেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন। ইহারই নাম মিরাক্‌ল্। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যাঁহারা এই ধরণের কার্য করেন তাঁহারা কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কিছু করেন না। সাধারণ মানুষ এইসব মহাপুরুষদের অলৌকিক কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইয়া ভাবে, কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল? কার্যকারণের সম্পর্ক বুঝিতে পারে না বলিয়া ইহাকে অলৌকিক বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে বহু মিরাক্‌ল্ প্রচলিত আছে। একটির কথা উল্লেখ করি। একদিন তিনি হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিল। দেখা গেল সত্যই তাঁহার পৃষ্ঠে পাঁচ আঙুলের দাগ আছে। অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল দূরে একজন মাঝি অপর এক মাঝির পৃষ্ঠে সত্যই চপেটাঘাত করিয়াছিল। ঠাকুর সকলের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিলেন, তাই সেই চপেটাঘাত তাঁহার অঙ্গে আসিয়া লাগিল। যিনি সাধনশক্তি-বলে সকলের সঙ্গে এক হইয়া যান, তাঁহার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। আর ইহা এমন কোন অবাস্তব ব্যাপার নহে, যাহা বিজ্ঞান-বিরোধী। মহাপুরুষগণের বোধশক্তি প্রখর। তাঁহারা অপরের ব্যথা-বেদনাকে নিজের করিয়া লইতে পারেন। সেইজন্য সাধারণ মানুষের জ্ঞানের সীমা ভেদ করিয়া তাঁহারা উর্ধ্বে উঠিতে পারেন। একজনের পক্ষে যাহা সম্ভব, অপরের পক্ষেও তাহা সম্ভব। তবে চাই উপযুক্ত সাধনা। উপযুক্ত সাধনার বলে মানুষ অসম্ভব শক্তির অধিকারী হইতে পারে। সেই শক্তির তুলনায় আণবিক শক্তি অকিঞ্চিৎকর।

মানুষের জীবন ও চরিত্রগঠনে Environments বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা প্রায় বলা হইয়া থাকে। মহাপুরুষগণ তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে যে কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারেন। তাঁহারাই সাধনা-বলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার শর্তাবলী সৃষ্টি করেন। তাঁহারা পুরাতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নূতন অবস্থা সৃষ্টি করেন এবং জগতে নব

যুগের প্রবর্তন করেন। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, হজরত-মহম্মদ—ইঁহারা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে লালিত হইয়াছেন তাহা সাধারণতঃ মহাপুরুষ সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু সাধনা-বলে তাঁহারা এত অসম্ভব শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা পুরাতন অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া নব যুগের প্রবর্তন করিলেন। পশুশক্তির প্রভাবে কেহ ঐরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে কি?

পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, বংশগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। হয়ত মানুষের ব্যক্তিত্ব-গঠনে বংশগত বৈশিষ্ট্য কিছুটা কার্যকরী হয়, কিন্তু সবটা নহে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে বংশগত প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য কি অতিক্রম করা যায়? উত্তরে বলিব, নিশ্চয় পারা যায়। মানুষ যে মুহূর্তে তাহার আসল সত্তা (true self) বুঝিতে পারিবে, তাহার আত্মার অসীম শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে সেই মুহূর্তে তাহার বংশগত বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব কমিতে থাকিবে। তাহার আত্মার শক্তি সম্বন্ধে তাহার বোধ ও চেতনা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে সেই পরিমাণ বংশগত প্রভাবও কমিতে থাকিবে। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে যদি বংশগত বৈশিষ্ট্যই আসল বস্তু হয়, তবে বহু মানুষের ভাল হইবার উপায় থাকিবে না। মানুষের স্বভাব-চরিত্রের উপর যে সব ক্ষতিকর বংশগত প্রভাব বিদ্যমান থাকে সেইগুলি দূর করিবার সাধনা তো মস্ত বড় সাধনা। এই সকল ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে যখন চেতনা জাগিবে, তখন হইতেই সেগুলি দূর হইতে থাকিবে। এমন কোন পাপ নাই যাহা মানুষ সাধনার দ্বারা অতিক্রম করিতে না পারে। সুতরাং একথা বলা ঠিক হইবে না যে, আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ স্বভাবগুলি বংশগত। জন্মগত কোন বৈশিষ্ট্য আমার সমস্ত জীবনকে ন　 করিয়া দিয়াছে এবং আমাকে অন্যায়ভাবে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে—একথা বলার মত কাপুরুষতা আর কিছুই নাই।

ঈশ্বরের নিরাপদ আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। কবি ব্রাউনিং ঠিকই বলিয়াছেন, "উপরে ঈশ্বর আছেন, সুতরাং পৃথিবীতে সব ঠিক আছে।" এই একান্ত ঈশ্বর-নির্ভরশীলতা মনে যে শক্তি সৃষ্টি করে তাহাই প্রকৃত শক্তি। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা মানুষের আত্মার শক্তির সম্মুখীন হইতে পারে, মানুষ ঈশ্বর-রূপ অনন্ত উৎসের অংশ। সেই মানুষের তেজের (Spirit) নিকট কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। মানুষকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি পৃথিবীতে শক্তি অর্জন করিতে চাও? তাহা হইলে কৃত্রিম শক্তির উপর নির্ভর করিও না। আপনাকে চেন। আপনার আত্মার উপর বিশ্বাস কর। নিজেকে ক্ষুদ্র ও নগণ্য ভাবিও না। ক্ষুদ্র আদর্শকে অনুসরণ করিও না। তোমার মধ্যে যে উচ্চতম আত্মা আছে তাহাতে বিশ্বাসী হও। প্রথা, দেশাচার অথবা মানুষের তৈরী স্বেচ্ছাচারমূলক বিধি-ব্যবস্থার দাস হইও না। দেখিবে তোমার আত্মা ভিতর হইতে শক্তি পাইবে—আর সেই শক্তি সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও তোমাকে রক্ষা করিবে। আত্মার শক্তি পাইতে হইলে নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করিতে হইবে। ব্যক্তিত্ব হইতেছে শক্তির প্রধান কর্মকর্তা। এই ব্যক্তিত্বকে ক্ষুদ্র কাজে নিযুক্ত করিলে চলিবে না। যাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বের সন্ধান পায় নাই, তাহারাই প্রথা ও দেশাচারকে বড় মনে করে, এবং সেই গুলিকেই সার সত্য মনে করে। প্রথা ও দেশাচারের নিকট আত্মসমর্পণ করার অর্থ আত্মহত্যা। নিজের কাছে সত্য হইতে হইবে,—তাহা হইলে মানুষ কাহারও নিকট মিথ্যা হইবে না। নিজের কাছে সত্য হওয়াটাই শক্তির সুদৃঢ় ভিত্তি।

আমরা যখন সুমহান্ ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করি, তখন আমাদের জীবন একটা মহৎ আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়। তখন আমরা ভয়, বা জনমতের দ্বারা পরিচালিত হই না। "তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে"—এই বোধ জাগিলে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করেন। ঈশ্বর ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির মর্জিমত চলিবার জন্য মানুষের জন্ম হয় নাই। তুমি আর তোমার ঈশ্বর এই দুয়ের মধ্যে যদি অন্য কোন প্রভাব আসিয়া পড়ে তবে, তুমি অবিলম্বে পথ-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। ঈশ্বরে অকুণ্ঠ বিশ্বাস হইতে যে শক্তি জাগ্রত হয় সেই শক্তির সাধনা করিতে হইবে।

এই যে ভিতরের শক্তি তাহাই হইতেছে ঈশ্বরের শক্তি। সেই শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। যে মানুষ এই শক্তিকে জাগাইতে পারিয়াছে সেই মানুষ সংসারের সকল অবস্থার মধ্যে উন্নত হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। সেই মানুষই প্রকৃত শক্তির অধিকারী।

ঈশ্বর আনন্দময় ও শক্তিময়। ঈশ্বরের এই অনন্তশক্তির কিয়দংশ প্রত্যেক মানুষের আত্মার মধ্যে বিদ্যমান। আত্মার মধ্যে যে অনন্ত শক্তির অংশ আছে সেইটাই হইতেছে মানুষের শক্তির উৎস। সেই শক্তিকে বহির্জগতে বিবিধ কর্মের দ্বারা প্রকাশ করাই হইল মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। চিত্রকর, গায়ক, কবি, লেখক—সকলের জন্যই ইহা দরকার। ভিতরের এই শক্তির উদ্বোধন হইলে জীবন সার্থক হয়। সে শক্তির অপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ হইলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং জীবনব্যাপী সাধনা করিতে হইবে সেই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য।

লেখক বা কবিকে স্মরণ করিতে হইবে যে, হৃদয় হইতে ভাব না জাগিলে কোন লেখাই সার্থক হয় না। লেখক, যদি তুমি সার্থক লেখা লিখিতে চাও তবে হৃদয়ের দিকে তাকাও! নিজের কাছে সত্য হও, নির্ভীক হও! নিজের আত্মার নির্দেশ মানিয়া চল! তুমি নিজে যাহা, তাহা হইতে বেশী কিছু হইতে পারিবে না। তোমার ভাণ্ডারে যাহা আছে, তাহা হইতে বেশী কিছু দিতেও পারিবে না। যদি বেশী কিছু দিতে চাও, তবে তোমাকে আরও বড় হইতে হইবে—আরও কিছু অর্জন করিতে হইবে। সার্থক কবি নিজেই একটি আধ্যাত্মিক কবিতা—তাহা এক পাঠক হইতে অপর পাঠকের অন্তরে প্রবেশ করে। লেখকের শক্তি আসে অন্তরের প্রেরণা হইতে। লেখক সেই শক্তি পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। লেখক পাঠকের মধ্যে সৃষ্টি করেন প্রাণপূর্ণ শক্তি; হৃদয়কে প্রসারিত করেন, মধুর করেন, জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করেন, উচ্চতর শক্তি ও মহত্তর আনন্দ দেন। পৃথিবীতে এমন বহু রচনা আছে যাহা একটা মৃতপ্রায় জাতিকে নূতনভাবে জাগাইয়া দিয়াছে। ফ্রান্সে 'লা মার্সাই' সঙ্গীত, আমাদের দেশে 'বন্দে-মাতরম্' সঙ্গীত সেই প্রকার সার্থক রচনা, যাহা মানুষের প্রাণে তেজ শক্তি ও আনন্দ উজ্জীবিত করিয়াছে। এই যে ভিতরের শক্তি, এই শক্তিকে জাগ্রত করিলে তবেই মানুষের, তথা জাতির মুক্তি। আমাদের এই শক্তির সাধনাই করিতে হইবে।

প্রকৃতির দ্বার দেশে আঘাত করিতে জানিলে প্রকৃতি তাহার রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেন, এবং সেই আঘাতের শক্তি ও তেজ, একাগ্রতা হইতেই আসে। মনুষ্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই, উহা যতই একাগ্র হয়, ততই উহার শক্তি এক লক্ষ্যের উপর আসে এবং ইহাই রহস্য।

—স্বামী বিবেকানন্দ

জাগ্রত জাপান

ডক্টর শ্রীসচ্চিদানন্দ ধর

প্রাচ্য জগতের বিস্ময় জাপান। নব-জাগ্রত এশিয়ার জাতি-সমূহ জাপানের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া নিজেদের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা করে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এশিয়ার অন্যান্য জাতি যখন পাশ্চাত্ত্য-সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত—জাপান তখন নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া যে কোন পাশ্চাত্ত্য শক্তিশালী জাতির ন্যায় নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য উদ্যত। বিগত মহাযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত জাপানের এই জাগরণ ও প্রসারকে সাম্রাজ্যবাদেরই রূপান্তর বলা যায়। সাম্রাজ্যবাদকে—বৃহত্তর শক্তিশালী জাতি কর্তৃক দুর্বল জাতির পীড়ন ও শাসনকে—সকল দেশের, সকল কালের সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন। সেই হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের শক্তিপ্রকাশকে আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই, এবং এখনও উৎপীড়ক যে কোন জাতির প্রতি ভারতবর্ষ স্পষ্ট ভাষায় তাহার ঘৃণা প্রকাশ করে ও অন্যায়ের প্রতিবাদ জানায়। জাপানের এই দানবীয় সাম্রাজ্য-লালসাকে বাদ দিয়া যদি তাহার জাতি ও ব্যক্তিজীবনের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে দেখি—এই জাতি হইতে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় আছে।

ভূমি-প্রকৃতি ও জন-সংখ্যা

লোকসংখ্যার অনুপাতে জাপানের আয়তন অতি ক্ষুদ্র। দ্বীপময় ও পর্বতবহুল জাপানের পক্ষে প্রায় নয় কোটি অধিবাসীর ভরণপোষণ করা একরূপ অসম্ভব। প্রকৃতির দানের কার্পণ্য জাপানী জাতিকে অধিকতর কর্মঠ ও অভিযান-প্রিয় করিয়াছে। দেশের সমগ্র ভূমির প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ কৃষিকার্যের উপযোগী। বাকি সব পর্বতময় অথবা শুধুমাত্র পশুচারণযোগ্য—বিশেষতঃ হোকাইডোর অনেকাংশ। জাপানী চাষ-প্রথা আমাদের দেশের তুলনায় খুবই উন্নত। এশিয়ার অনেক দেশই "জাপানী প্রথায়" চাষের প্রবর্তন ও জাপানী কৃষি-বিশেষজ্ঞকে আহ্বান করিয়া নিজেদের দেশের চাষের উন্নতি করিবার প্রচেষ্টা করিতেছে। কিন্তু জাপানী চাষীর আপ্রাণ চেষ্টার পরও জাপান খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশের কোথাও এতটুকু জমিও পতিত নাই। ধানের ক্ষেতের আলের উপর পর্যন্ত কোন না কোন সবজির বা ফুলের চাষ। রেলের রাস্তার পাশে যেখানে কয়েক ইঞ্চিমাত্র ভূমি ফাঁক আছে সেখানেও অন্তত ২।৩টা পেঁয়াজের গাছ পোঁতা আছে দেখিতে পাওয়া যায়! পাহাড়ের কয়েক হাজার ফুট উপর পর্যন্ত সবজি বা ফলের চাষ। বছরের কোনও সময় জমিকে পতিত দেখা যায় না, তবু খাদ্যে জাপান স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য জাপানীরা শুধু মাত্র ভূমির উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইয়াছে। মৎস্য-চাষ ও সামুদ্রিক মৎস্য-শিকারে জাপানীরা পৃথিবীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। নিজেদের দেশের সমুদ্র-উপকূলকে বাদ দিয়াও, আন্তর্জাতিক জলপ্রদেশের এমন স্থান নাই যেখানে জাপানী মৎস্য শিকারীরা মাছ ধরিতে না যায়। উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু, প্রশান্ত হইতে আটলান্টিক—সর্বত্রই ইহাদের গতি। টোকিও শহরে বসিয়া বঙ্গোপসাগরের মাছ খাওয়া যায়—জাপানী জেলেদের কল্যাণে। জাপানের মৎস্যচাষ ও মৎস্য-সংরক্ষণ প্রণালী শিক্ষার জন্য দেশবিদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা

এখানে আসে। ক্ষুধার্ত জাপানীরা খাদ্যদ্রব্যের বিচার-সম্পর্কে খুবই উদার—তিমি হইতে আরম্ভ করিয়া শামুক, কাঁকড়া, ঝিনুক, অক্টোপাশ প্রভৃতি যে কোন জল-জন্তুই ইহাদের উপাদেয়। স্থলচর প্রাণীর মধ্যেও খুব কমই বাদ যায়। মাংস অপেক্ষাকৃত দুর্মূল্য—তবে সর্বত্রই পাওয়া যায়। জনসংখ্যার সঙ্গে খাদ্যের অনুপাত ঠিক রাখার জন্য জাপানী বিজ্ঞানীরা শস্য মৎস্য ও মাংস উৎপাদনের মাত্রাকে বাড়াইবার জন্য গবেষণা-রত। বিদেশের বিনিময় বাণিজ্যের উপর নির্ভর না করিয়া খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা যুদ্ধোত্তর জাপানের প্রধানতম লক্ষ্য বলা যাইতে পারে।

কর্মক্ষমতা ও শ্রমের মর্যাদাবোধ

জাপানীদের কর্মক্ষমতা যে কোন জাতি অপেক্ষা বেশী। জাপানী শ্রমিক বা যন্ত্রশিল্পী একঘণ্টায় যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তেমন পারে না। ভারতীয় একজন শিক্ষার্থী বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্‌ সংক্রান্ত ব্যাপারে এখানে শিক্ষালাভ করিতে আসেন। তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিয়াছেন যে একই উপায় অবলম্বন করিয়া যেখানে ভারতীয় শ্রমিক একদিনে ১ শতটি দ্রব্যের নির্মাণ শেষ করিতে পারে সেই উপায়েই একজন জাপানী শ্রমিক ৫ শতের উপর দ্রব্য নির্মাণ করিতে পারে। উৎপাদনের এই দ্রুততা শ্রমিকের স্বভাবলব্ধ। জাহাজ-নির্মাণ-শিল্পে জাপান বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রতিবৎসর জাপান সমানসংখ্যক শ্রমিক ও অর্থ নিয়োগ করিয়া পৃথিবীর যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিক-সংখ্যক জাহাজ নির্মাণ করিতে পারে। রেল ও রেল-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতিতেও জাপানের দক্ষতা পৃথিবীখ্যাত। বস্ত্রশিল্পেও শ্রমিক-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীর যে কোন জাতি অপেক্ষা বেশী। আবহাওয়ার অনুকূলতা এবং উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতিতে জাপান অন্যদেশের সমকক্ষ হইয়াও যখন অন্যান্য দেশ অপেক্ষা মাথাপিছু বেশী উৎপাদন করিতে পারে তখন এই উৎপাদনের কৃতিত্ব শ্রমিকের ব্যক্তিগত গুণ ছাড়া আর কি?

জাপানী শ্রমিকের আর একটি গুণ ইহারা কাজে ফাঁকি দেয় না। যতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণ যন্ত্রবৎ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ইহা অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এখানে মজুর খাটাইবার সময় আর কাহাকেও তদারক বা খবরদারি করিতে হয় না। আমার বাসার পাশে একটা নতুন বাড়ী বেশ কিছুদিন যাবৎ তৈয়ারী হইতেছিল। শ্রমিকেরা ঘড়ি-বাঁধা একই সময়ে আসিয়া যে যাহার কাজে লাগিয়া যাইত। দুপুরে ১২টা হইতে ১টা পর্যন্ত ছুটি। ঠিক ১২টায় সবাই কাজ বন্ধ করিয়া নিজেদের সঙ্গে-আনা খাবার খাইতে বসিয়া গেল। ঠিক একটায় উঠিয়া আবার যে যাহার নির্দিষ্ট কাজে লাগিয়া যাইত। খোঁজ করিয়া জানিলাম ইহারা দিন-মজুর (চুক্তির মজুর নয়) এবং ইহাদের কাজের তদারকের জন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজন নাই। সততা ও কর্মনিষ্ঠা জাপানীদের জাতীয়তাবোধ হইতে উৎপন্ন। জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে ইহাদের দৃঢ়কর্মা ও সৎ হইতে হইবে—এইরূপ একটা স্বভাবজাত বিশ্বাস ইহাদের আছে। ইহাকেই জাতীয় চরিত্র বলা যায়। কাজের সময় আপন-পর বোধ নাই। কাজ কাজই, এবং যাহার উপর যাহা ন্যস্ত আছে সে তাহা করিবেই। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিলাম—ইহারা জাতীয় প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন। একজন সেলাই-কলের মজুরের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তাহার সঙ্গে আলাপে জানিলাম, যাহাতে জাপানী সেলাইকল পৃথিবীর মধ্যে সেরা হয় এবং উৎপাদন মূল্য সবচেয়ে কম হয়—সেই সম্বন্ধে প্রত্যেকটি

মজুর সচেতন। আমার মনে হয় সব শ্রমিকের মধ্যেই এই জাতীয়তাবোধ ক্রিয়া করে।

জাপানীদের শ্রমের মর্যাদাবোধ আমাদিগকে বিস্মিত করে, এখানে সবাই সব কাজ করে। সমগ্র জাপানের বড় বড় ৫০৭টি রেল বা ষ্টীমার স্টেশনে ব্যতীত মুটে নাই। এই মুটেরা বিশেষতঃ বিদেশীদের বা অন্য কারণে অপারগ যাত্রীর মাল বহন করে। মেথর বা ঝাড়ুদার বলিয়া বিশেষ কোন শ্রেণী বা জাতি নাই। অফিসে দপ্তরী বা "চতুর্থ শ্রেণীর" কর্মচারী বলিয়া বিশেষ কোন স্তরের কর্মী নাই। একজন গ্রাজুয়েট কেরানী প্রয়োজনবোধে ঝাড়ুদারের কাজ করে, ফাইল কাগজপত্র বহন করে, লেখার কাজও করে। রেল ষ্টেশনের একটি দৃশ্য বড়ই সুন্দর। "স্টেশন মাষ্টার" বা "ষ্টেশন ক্লার্ক" এই জাতীয় লাল-ছাপমারা ব্যাজ পরিয়া ও একটি লাল ঝাণ্ডা কোমরে গুঁজিয়া একজন লোককে পাটকর্ম ঝাড়ু দিতে প্রায়ই দেখা যায়। যেই গাড়ী স্টেশনে প্রবেশ করিল অমনি ঐ ঝাড়ুদার লোকটি লাল ঝাণ্ডা দেখাইয়া গাড়ী থামাইল, গার্ডের সঙ্গে একটু কাজ সারিয়া লইল, আবার ঝাণ্ডা তুলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া ঝাড়ু লইয়া পরিষ্কারের কাজে লাগিয়া গেল। ঐ ঝাড়ুদার ভদ্রলোকটি একজন গ্রাজুয়েট এবং পদ-মর্যাদায় কেরানী বা তদূর্ধ্ব। যিনি গাড়ীর গার্ড (অবশ্যই একজন গ্র্যাজুয়েট!) তাঁহার অন্যতম কর্ম হইল গাড়ী শেষ স্টেশনে গিয়া থামিলে গাড়ীর প্রত্যেকটি কোঠা ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করা। খুব ব্যস্ততার সময় হোটেলের মালিক আসিয়া নিজে টেবিল পরিষ্কার করিয়া অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করেন। সেই হোটেলের কর্মচারীর সংখ্যা ১০০ বা তদূর্ধ্ব—সুতরাং মালিকের গৌরব উপলব্ধ্য। টোকিও শহরে রাস্তা ঝাড়ু দিবার কোন লোক দেখি নাই, অথচ রাস্তায় একটুও কাগজের টুকরা বা ফলের খোসা বা কাগজের ঠোঙা দেখা যায় না। প্রত্যেক বাড়ীর গৃহিণী বা পরিচারিকারা নিজের বাড়ী ঘর ঝাড়িয়া সর্বশেষে নিজেদের বাড়ীর সামনেটাও ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে। এই দৃশ্য আমাদের খুবই আনন্দ ও উৎসাহ দেয়। টোকিও শহরে যে গৃহিণী ৪।৫ খানা বাড়ীর মালিক তিনিও এইরূপ সাধারণ রাস্তা প্রকাশ্যে ঝাড়ু দিতে লজ্জা বা সংকোচবোধ করেন না। এখানে ভিখারী দেখি নাই। ভিক্ষুক-জাতীয় ব্যক্তিকে সাহায্য করা অথবা কাহারও নিকট ঐরূপ সাহায্য প্রার্থনা করা—উভয়কেই ইহারা অগৌরবের বস্তু মনে করে; সুতরাং শ্রমশীলতাকে ইহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

শিক্ষা ও বেকার সমস্যা

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রির পঠন-পাঠন পর্যন্ত জাপানী ভাষার মাধ্যমে হওয়ায় জাপানে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৯৮। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে জাপানের শিক্ষাপদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং এখনও শিক্ষাসমস্যা লইয়া নানা গবেষণা ও পরিকল্পনা চলিতেছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ হওয়ায় এবং শিক্ষার ব্যয় সহজসাধ্য হওয়ায় কাহাকেও অশিক্ষার গ্লানি বহন করিতে হয় না। দিনমজুরকে যখন দুপুরের এক ঘণ্টা কাজের বিশ্রামের সময় পথের ধারে ঘাসের উপর শুইয়া পত্রিকা পড়িতে দেখি, তখন খুবই আনন্দ হয়। পত্রিকা ইহারা সকলেই পড়ে। রেলে বা বাসে খুব ভিড়ের মধ্যে ও সকাল-সন্ধ্যায় যাত্রীদের পত্রিকা-পাঠে নিবিষ্ট থাকিতে দেখা যায়। ছাত্রছাত্রীদের পোষাক একই রকম। হাই স্কুল পর্যন্ত পোষাকের সাম্য অবশ্য-পালনীয়। প্রত্যেক স্কুল এবং কলেজের আলাদা ব্যাজ আছে। ঐ ব্যাজ দ্বারাই ছাত্রছাত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষাকের সাদৃশ্যের প্রতি তেমন

জোর দেওয়া হয় না। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খুবই শৃঙ্খলাবোধ লক্ষিত হয়। গান গাওয়া ও চিত্রাঙ্কন প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ। সুতরাং প্রত্যেক জাপানীই গান গাহিতে ও ছবি আঁকিতে পারে।

হাই স্কুল পর্যন্ত পড়া শেষ করিয়া কেরানীর বা কারখানার কাজে প্রবেশ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় প্রত্যেক ছাত্রকে নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে হয়। এই নির্বাচনী পরীক্ষা খুবই কঠিন। শতকরা ৫০ জনেরও কম ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা নির্দিষ্ট। সুতরাং প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা হাই স্কুলে অনুত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা একবার প্রবেশ করিতে পারে তাহারা উত্তীর্ণ হইবেই ধরিয়া লওয়া যায়। পঠন-পাঠনের ও পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা এমনি যে, বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে কোন ছাত্রের অনুত্তীর্ণ হইবার আশঙ্কা থাকে না। আমাদের দেশে পরীক্ষায় শতকরা ৫০ জন উত্তীর্ণ হইলেও আমরা "ফল সন্তোষজনক" মনে করি। জাপানে যুব-শক্তির অপচয় নাই। প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গে বয়স প্রায় নির্দিষ্ট থাকে। সুতরাং একই বয়সে একসঙ্গে সকলে গ্রাজুয়েট বা 'পারজম' হইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বা হাইস্কুলের পাঠ শেষ করিবার পূর্ব হইতেই কোন কোন ছাত্রছাত্রী কাজে যোগ দেয়। আংশিক কাজ করিয়া নিজেদের পড়ার ব্যয় বহন করার মত ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে আছে। পত্রিকা বিলি করার কাজ ছাত্রদের; ১১।১২ বছরের ছাত্র হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পর্যন্ত সকাল বিকাল পাড়ায় পত্রিকা বিলি করিয়া দিয়া কিছু উপার্জন করে। বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশে ইহাদের কেহ কেহ কোন কোম্পানির জিনিসের প্রচার করিয়া বা কোন ইন্স্যুরেন্স্ কোম্পানির দালালি করিয়াও কিছু উপার্জন করে। কোন কোন ছাত্রছাত্রী বিকালে বা অন্য ছুটির দিনে দোকানে বিক্রেতার কাজ করে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে (আমাদের দেশের কলেজ) ছাত্রছাত্রী-পরিচালিত ক্যান্টিন ও ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান আছে। ইহার পরিচালনা ও ছাত্রছাত্রীরাই করিয়া থাকে।

বেকারসমস্যা জাপানেও আছে। তবে ইহা তেমন গুরুতর আকারে নয়। প্রত্যেক বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষার পূর্বে সম্ভাব্য স্নাতকদের পরিসংখ্যা ও সম্ভাব্য নিয়োগক্ষেত্রের পরিসংখ্যা গ্রহণ করিয়া সরকার প্রায় প্রত্যেকের জন্যই একটা ব্যবস্থা করেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের সময়ও প্রার্থীদের পরীক্ষা দিতে হয়। জাপানে এক জাতীয় কাজ হইতে অন্য জাতীয় কাজে যাওয়া কষ্টকর। আমাদের দেশে যেমন মাষ্টারি হইতে কেরানীগিরি বা অন্য কোন কাজে ইচ্ছামতো যাওয়া যায় এখানে তেমন নয়। জাপানে নারীও পুরুষের সমকক্ষ, তাহারা যে কোন কাজে যোগদান করে। তবে বাসের কণ্ডাক্টর, দোকানের বিক্রেতা, রেষ্টুরেণ্টের পরিচারিকা—প্রভৃতি কাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কেরানীর কাজেও নারীর সংখ্যা নগণ্য নয়। রেশমজাতীয় কারখানায়—যেখানে স্বয়ংক্রিয় মেশিন কাজ করে,—শুধুমাত্র একটু পর্যবেক্ষণের দরকার, সেখানে শুধুমাত্র নারী কর্মীই নিয়োগ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্যে নারী ও পুরুষ কর্মী সমানভাবেই কাজ করে। কৃষি-শ্রমিকরা প্রায়ই নিজের জমিতে কাজ করে। ভূমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যা খুবই অল্প। শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান খুব উন্নত বলা যায় না।

সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও শিল্পবোধ

জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। সমুদ্র

ও অত্যুচ্চ পর্বতশ্রেণী বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ঋতুভেদে গাছপালা নানা বর্ণ ও ফুল ধারণ করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জাপানী জাতিকে স্বাভাবিক শিল্পবোধ দিয়াছে। জাপানী "পুষ্পসজ্জা" একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ শিল্প। ফুল প্রতিদিনের গৃহস্থালির অপরিহার্য অঙ্গ। অতি সংক্ষিপ্ত সজ্জার মাধ্যমে জাপানীরা একটি শিল্পময় পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে। বাড়ীঘর সর্বদা তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। প্রত্যেকটি জিনিস অতি সুন্দরভাবে সাজানো। প্রত্যেকের বাড়ীর পাশে একটু বাগান—অন্ততঃ স্থানাভাবে টবে ২।১টি গাছ দেখা যায়। অতি সাধারণ জিনিসকেও সাজাইবার ভঙ্গীতে ইহারা শিল্পময় করিয়া তুলে। কচুগাছ, পেঁয়াজের ফুল, শুকনা গাছের ডাল, সরিষার ফুল প্রভৃতি যে কোন জিনিস হইতে ইহারা সজ্জার উপকরণ পায়।

জাপানের উদ্যানশিল্প পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। প্রস্তর ও গাছপালা দিয়া অতি সুন্দরভাবে বাগান ও পার্কগুলিকে সাজানো হয়। যে কোন বৃহৎ গাছকে বামন করিয়া রাখার কৌশল জাপানীদের বৈশিষ্ট্য। ছোট ছোট টবে এই জাতীয় "বামনবৃক্ষ" বিক্রয় হয়। পার্কে ও খোলা রাস্তার পার্শ্বে নানা জাতীয় ফুল ফুটে। জাপানী শিশুরা ফুল ছিঁড়িতে জানে না। সমগ্র জাপানের সমুদ্রের উপকূল ও পর্বতসমূহে সুন্দর সুন্দর "জাতীয় উদ্যান" (National Park) আছে। এই জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। বিদেশী ভ্রমণকারীদের নিকট এই জাতীয় পার্ক খুবই উপভোগ্য। পার্কের সৌন্দর্য-রক্ষায় সকলেই তৎপর।

মন্দির ও সমা[illegible] নীরবতা ও পবিত্রতার লীলাভূমি। [illegible] মন্দিরগুলি দারু-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কাঠের উপর এত সুন্দর কারুকার্য খুবই প্রশংসনীয়। মন্দিরগুলির চারিধারে সাধারণতঃ প্রশস্ত উদ্যান থাকে। সমাধিস্থানগুলিও সুরক্ষিত; ঐ সকল স্থানে গেলে মনে প্রশান্তি আসে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ সরোবর বা পর্বতের পার্শ্বে মন্দির অবশ্যই থাকিবে। এই সৌন্দর্যময় শান্ত পরিবেশ আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তার খুবই উপযোগী। জাপানের দর্শনীয় স্থানমাত্রেই এই জাতীয় মন্দির ও উদ্যানে পরিপূর্ণ। কিয়টো, নারা, নিক্কো, কামাকুরা, সেন্দাই প্রভৃতি সব স্থানই জাপানের জাতীয় চিন্তা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় দেয়।

আতিথ্য ও সততা

জাপানী জাতির সৌজন্য ও অতিথিপরায়ণতা যে কোন বিদেশীকে মুগ্ধ করে। জাপান সরকারের ও কয়েকটি বেসরকারী ভ্রমণ-নিয়ন্ত্রণ-প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে এখন জাপানের যে কোন সাধারণ স্থানেও সুন্দর ও উচ্চশ্রেণীর হোটেল বা বিশ্রামাগার আছে। হোটেলে পয়সা দিয়া থাকিতে হয়—সব দেশেই। কিন্তু জাপানের হোটেলে যেরূপ হৃদ্যতাপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ, সেবা যত্ন ও মনোযোগ পাওয়া যায়—অন্যত্র অর্থের বিনিময়েও তাহা দুর্লভ। হোটেলের মালিক হইতে পরিচারক পর্যন্ত সকলেই সাগ্রহে অতিথিদের সেবার প্রতি মন দেয়। ভারতে কামাখ্যার পাণ্ডা আর জাপানে হোটেলের কর্মচারীর ব্যবহার টাকা-পয়সার দেনাপাওনাকে বিস্মৃত করাইয়া একটা আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করে—যাহা দীর্ঘকাল মনে থাকে। বাসে, ট্রামে, রেলে কণ্ডাক্টর প্রভৃতিও যে কোন যাত্রীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। রাত্রির গাড়ীতে রেলের গার্ডের নিকট নিজের গন্তব্য ষ্টেশন জানাইয়া নিশ্চিন্তে ঘুমানো যায়। রাত্রির যে কোন সময় গার্ড আসিয়া যাত্রীকে জাগাইয়া তাহার নামার সাহায্য করিবে। এমনকি যাত্রীর মালপত্র নিজে প্ল্যাটফর্মে নামাইয়া দিয়া মাথার হ্যাট খুলিয়া "অশেষ ধন্যবাদ" বলিয়া হুইসেল বাজাইয়া গাড়ী

ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। বাজারে দ্রব্যমূল্য প্রায়ই নির্দিষ্ট। সর্বত্র সমান দাম। বিদেশীর পক্ষেও ঠকিবার কোন কারণ নাই। বিদেশী দেখিয়া গাড়ীওয়ালা বা দোকানদার কখনও বেশী পয়সা আদায় করিবে না। হোটেলে কোন জিনিস ভুলিয়া ফেলিয়া আসিলেও হারাইবার ভয় নাই। উহা হয়তো হোটেলের কর্তৃপক্ষ নিজের পয়সায় ডাকে মালিকের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবে অথবা অতি বিনয়ের সহিত উহা ফিরাইয়া লইয়া যাইতে অনুরোধ করিবে। উপযুক্ত টিকিট না কিনিয়া স্টেশনে নগদ পয়সা দিয়া বাহির হইয়া আসা যায়।

গৃহস্থ বাড়ীতে নিমন্ত্রণের অতিথি হিসাবে গেলে গৃহিণী দরজার সামনে আসিয়া নতজানু হইয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা জানান। ঘরের বাহিরে রাখা অতিথির জুতাগুলিকে গুছাইয়া ও পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়া রাখা হয়। অতিথির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার ভারতীয় "অতিথি-নারায়ণ" বোধকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। লৌকিকতার ঊর্ধ্বে যে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা আছে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

জিজ্ঞাসা ও আবিষ্কার

জাপানীদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রসারিত। আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারে জাপানীরা পৃথিবীর যে কোন অগ্রসর জাতির সমকক্ষ। মেরু-অভিযানে, পর্বত-অভিযানে, অলিম্পিকে জাপানীরা অগ্রগামীদের অন্যতম। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে ইহারা সুপটু। পৃথিবীর অন্যত্র যে কোন নূতন আবিষ্কার হয় জাপানী কৌশলীরা অল্প দিনের মধ্যেই তাহা নিজস্ব করিয়া লয়। দর্শন ও ধর্ম সংক্রান্ত চিন্তা ও গবেষণায়ও জাপানীরা পশ্চাৎপদ নয়। জাপানী পণ্ডিতগণ ভারতীয় ও চৈনিক দর্শন ও নানা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন জাপানী পণ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শন ও শাস্ত্রাদির এমন শাখা লইয়া চিন্তারত আমরাও যাহার খোঁজ রাখি না। জাপানী পণ্ডিতদের পারদর্শিতা ও তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থের পূর্ণতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, ও অভিযানে এইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম, জড় ও অধ্যাত্ম উন্নতির সমন্বয় জাপানী জাতিকে বিশিষ্টতা দিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জাতির বিজ্ঞানের উন্নতিকে সমভাবে গ্রহণ ও পরিপুষ্ট করিয়াও জাপানী জাতি নিজস্ব "জাপানী বৈশিষ্ট্য" পরিত্যাগ না করিয়া কিভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ইহাই এশিয়ার অন্য জাতির পক্ষে শিক্ষণীয়। স্বামীজী দীর্ঘকাল পূর্বে এই জাতির জাগরণ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া ইহাদের অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। জাপানী কর্মকৌশল ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিত হইলে ভারত একটি আদর্শ আধুনিক জাতিতে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই। ভারত-সম্পর্কে জাপানের জিজ্ঞাসা ও শ্রদ্ধা অপরিসীম। ভারতবর্ষ এই সুযোগ গ্রহণ করিলে উভয় জাতির পক্ষেই কল্যাণকর হইবে।

"...জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথার উদয় হচ্ছে, তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ ক'রে বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক্। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্য স্বরূপ।..."

[স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী হইতে]

শ্রীরামকৃষ্ণের বরাভয় মূর্তি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনন্ত ভাবময় মহাজীবন অভিনিবেশসহ পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় বিশেষ বিশেষ ক্ষণে ও স্থানে তাঁর মধ্যে বিশিষ্ট ভাব সমূহ প্রকটিত। শ্যামপুকুর-বাটীতে অবস্থান-কালে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৺শ্যামাপূজা-দিবসে তাঁর মধ্যে আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীকালীর অতুল মাধুর্যমণ্ডিত 'বরাভয়'-রূপের মহাপ্রকাশ ঘটে। অপূর্ব আধ্যাত্মিক রহস্যে পরিপূর্ণ এই অভিনব ঘটনাটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ (দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (তৃতীয় ভাগ) ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—এই তিনটি প্রামাণিক গ্রন্থেই সবিস্তার বর্ণিত রয়েছে।

চিকিৎসার্থ উত্তর কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীতে ৫৫এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীটের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবস্থান করছেন, ৺কালীপূজা সমাগতপ্রায় দেখে ভক্তবর দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ইচ্ছা হ'ল ঐ বাটীতে শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা করবেন। নিজ গৃহে প্রতিমায় কালীপূজা করার বাসনা পূর্বেও তাঁর হয়েছিল। কিন্তু এযাবৎ তাঁর ঐ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। তাই তিনি ভাবলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতিতে ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্যামপুকুর-বাটীতে ঐ পূজা করতে পারলে পরম আনন্দ হয়। কিন্তু উহাতে ভক্তগণ অমত করেন, কারণ ঐ বাটীতে পূজানুষ্ঠানাদি হ'লে গোলমালে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থতা আরও বৃদ্ধি পাবে। সকলের সিদ্ধান্তে দেবেন্দ্রনাথ নিরাশহৃদয়ে তাঁর শুভ বাসনা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু—

'কালীপূজা কাছে কাছে আসিয়াছে প্রায়।
ডাকাইয়া মাষ্টারেরে কহিলেন রায়॥
অমাবস্যা-যোগে কালী-পূজা প্রয়োজন।
যুক্তি-যুক্ত লয় মনে কর আয়োজন॥
মাষ্টার মহেন্দ্রনাথ পরম উল্লাসে।
সেই কথা বলিলেন কালীপদ ঘোষে॥' —পুঁথি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট দেবেন্দ্র তাঁর ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ না করলেও অন্তর্যামী প্রভুর তা জানতে বাকী রইল না। তিনি অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু। কত ভক্তের কত আশা-আকাঙ্ক্ষাই না তিনি অভাবনীয় উপায়ে পূর্ণ করেন। আশাতীত-রূপে ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই মনে হয় তিনি ৺কালীপূজা সমাগত-প্রায় দেখে শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয় প্রমুখ কতিপয় ভক্তকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজার্চনার উপকরণাদি সংক্ষেপে সংগ্রহ করতে বললেন। মাষ্টার মহাশয় পরম উল্লাসভরে ঐ সংবাদ ভক্তবর শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ (দানা কালী) মহাশয়কে জানালেন। অতি সন্নিকটেই শ্যামপুকুর স্ট্রীটে কালীপদ ঘোষের বাটী। সুতরাং সানন্দে তিনি পূজার উপকরণসমূহ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করলেন।

'তত্ত্বাবধায়ক কালী এখানে বাসায়।
প্রয়োজন যাহা হয় আনিয়া যোগায়॥
প্রভুদেব আখ্যা তাঁরে দিলা 'ম্যানেজার,'
নরেন্দ্র দিলেন পরে 'দানা' নাম তাঁর॥

* * *

আনন্দেতে কালীপদ আটখানা হ'য়ে।
পূজার যোগাড় করে দিনপানে চেয়ে॥' —পুঁথি

পূজা ষোড়শোপচারে, দশোপচারে না পঞ্চ-উপচারে হবে,—প্রতিমায়, পটে না ঘটে হবে—অন্নভোগ হবে কি হবে না—এ সমস্ত বিষয়ে ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হ'তে কোনো নির্দেশ পান নি। সুতরাং ঐ সকল বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু হ'ল। অবশেষে স্থির হ'ল, শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বলেছেন, 'সংক্ষেপে'—তাহলে আপাততঃ পঞ্চোপচারের পূজার জন্য গন্ধ পুষ্প

ধূপ দীপ এবং ফলমূলমিষ্টান্নাদির আয়োজন করা হোক, পরে তিনি যেরূপ নির্দেশ দিবেন বা আজ্ঞা করবেন সেইরূপ করা হবে।

ক্রমশঃ শ্রীশ্রীকালী-পূজাদিবস উপস্থিত হ'ল—৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। সকাল থেকেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীজগন্মাতার ভাবে ভাবস্থ, কখনও হঠাৎ চমকিত হচ্ছেন, আবার কখনও বা বাহ্যজ্ঞানশূন্য, একেবারে সমাধিস্থ। তিনি মাষ্টার মহাশয়কে বলেছিলেন, ঠনঠনের ৺সিদ্ধেশ্বরী কালী মাতাকে পুষ্প ডাব চিনি সন্দেশ দিয়ে সকালে পূজা দিতে। মাষ্টার মহাশয় অতিশয় শুদ্ধাচারে ৺মায়ের পূজা দিয়ে সকাল প্রায় নয়টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য প্রসাদ ও নির্মাল্য এনেছেন। মাষ্টার মহাশয় এসে দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব দ্বিতলে দক্ষিণের ঘরে সহাস্যবদনে ভাবস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র, ললাটে চন্দনের ফোঁটা এবং শ্রীপদে চটি জুতা। পাদুকা খুলে অতিশয় ভক্তিভরে তিনি ঐ প্রসাদ কিঞ্চিৎ নিজ মুখে এবং কিঞ্চিৎ মস্তকে ধারণ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশ মতো মাষ্টার মহাশয় রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গানের দুটি বইও কিনে এনেছেন। এই বই দুটির কয়েকটি গান শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে শুনাবেন।

আজ শ্রীশ্রীকালীপূজা; তাই বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৺জগন্মাতার ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে রয়েছেন। পূজ্যপাদ কথামৃতকার শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ তন্ময়তার বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখেছেন—"ঠাকুর হঠাৎ চমকিত হইতেছেন। অমনি পাদুকা খুলিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন; একেবারে সমাধিস্থ। আজ জগন্মাতার পূজা, তাই কি তিনি মুহুর্মুহুঃ চমকিত ও সমাধিস্থ! অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যেন অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন।"

তখন বেলা প্রায় দশটা। শ্রীশ্রীঠাকুর দ্বিতলে নিজ কক্ষে বিছানার উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে আছেন। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন, কালীপদ, রামচন্দ্র, মাষ্টার-মহাশয় প্রমুখ ভাগ্যবান ভক্তগণ ঐ ঘরে উপস্থিত রয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর মাষ্টার-মহাশয়কে বললেন—"আজ কালীপূজা, কিছু পূজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার ব'লে এস। পাঁকাটী এনেছে কি না, জিজ্ঞাসা কর দেখি।" মাষ্টার-মহাশয় বৈঠকখানায় গিয়ে ঠাকুরের আদেশ ভক্তগণকে জানালেন। শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ ও অন্যান্য ভক্তগণ পূজার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

"কাহারো আদতে এটি আসিল না মনে।
ঘট কিংবা পট কি প্রতিমা আনয়নে॥
অথচ সকলে জানে প্রভু গুণমণি।
কালীপূজা করিবেন আপনিই তিনি॥"—পুঁথি

পূজার আয়োজন কিরূপ হবে সে বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করার কোনো কথাই ভক্তগণের মনে এল না। বেলা প্রায় দুইটার সময় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখতে এসেছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল, নিরঞ্জন, লাটু, গিরিশ, কালীপদ, নীলমণি, মাষ্টার, মণীন্দ্র এবং আরও অনেকে উপস্থিত রয়েছেন। ডাক্তারের সঙ্গে অসুখ ও ঔষধ-পথ্যাদি বিষয়ে একটু কথাবার্তা হ'লে পর শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদনে ডাক্তারকে বলছেন—'তোমার জন্য এই বই এসেছে।' মাষ্টার মহাশয় ঐ বই দুটি ডাক্তারের হাতে দিলেন। ডাক্তার গান শুনতে চাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে মাষ্টার এবং আর একজন ভক্ত কয়েকটি রামপ্রসাদী গান গেয়ে শুনালেন। ডাক্তার কিয়ৎক্ষণ পরে বিদায় নিলেন।

ক্রমে সূর্যাস্ত হয়ে সন্ধ্যা হ'ল। সমস্ত বাটী দীপালোক-মালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এখন রাত্রি প্রায় সাতটা। শ্রীশ্রীঠাকুর স্থিরভাবে শয্যায় উপবিষ্ট রয়েছেন, শ্রীযুক্ত কালীপদ প্রমুখ ভক্তগণ তাঁর শয্যাপার্শ্বে পূর্বদিকে কিছুটা স্থান গঙ্গাজলে মার্জনা

করলেন এবং সেই স্থানে পূজার জন্য সংগৃহীত উপকরণগুলি এনে সাজিয়ে দিতে লাগলেন।

'ফুলুকা ফুলুকা লুচি সুজির পায়েস।
নূতন খেজুর গুড়ে গোল্লা সন্দেশ ॥
সাদা সন্দেশাদি আর মিষ্টান্ন বহুল।
বিল্বপত্র গঙ্গাজল ধূপ দীপ ফুল ॥
যাবতীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করি ঘরে।
শুভক্ষণে দিলা আনি প্রভুর গোচরে ॥
অপর দ্রব্যাদি কালী আনিলা আপনি।
সুজির পায়েস আনে তাঁহার গৃহিণী ॥'—পুঁথি

রক্তজবা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প, মাল্য, বিল্বপত্র, দূর্বা, চন্দন, ধূপ, দীপ, গঙ্গাজল, ভোগের নৈবেদ্য, ডাব, তাম্বূল প্রভৃতি এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে রাখা হ'ল। ধূনা আনা হয়নি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর ধূনা আনতে আজ্ঞা করলেন। ধূপ, দীপ, ধূনা, মোমবাতি প্রভৃতি প্রজ্বালিত হওয়ায় গৃহ সৌরভে আমোদিত ও আলোক-মালায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'দুইটি মোমের বাতি দিলা দুই পাশে।
আসনে শ্রীপ্রভুদেব বসিলেন শেষে ॥'—পুঁথি

স্থিরভাবে আসনে উপবিষ্ট হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীজগন্মাতার ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান রয়েছে অথচ বহুক্ষণ নিঃস্পন্দভাবে বসে রয়েছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, রাম, গিরিশ, কালীপদ, মাষ্টার (শ্রীম কথামৃত-কার), দেবেন্দ্র, ছোট নরেন, চুনীলাল, অক্ষয় (পুঁথিকার), বিহারী প্রমুখ প্রায় ত্রিশজনেরও অধিক ভক্ত ঐ গৃহে উপস্থিত। কিন্তু গৃহমধ্য এরূপ নিস্তব্ধ ও নীরব যে একেবারে জন শূন্য বলে বোধ হচ্ছে। ভক্তগণও জগন্মাতার চিন্তা করছেন।

'মহা রঙ্গ ঠাকুরের শুন মন দিয়ে।
আসনে বসিয়ে প্রভু স্থিরভাব হ'য়ে ॥
ভাবে মগ্ন নন বাহ্য চেঁঠাঙ* আছে পায়।
এইরূপে বহুক্ষণ গত হ'য়ে যায় ॥

* চেতনা

তখন গিরিশে কন রাম পেয়ে টের।
প্রভুর এ পূজা নয়, পূজা আমাদের ॥
আমাদের পূজা প্রভু লইবার তরে।
অপেক্ষায় উপবিষ্ট আসন-উপরে ॥'—পুঁথি

বাহ্য পূজাদি না ক'রে ঐভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুক্ষণ বসে আছেন দেখে কেহ কেহ ভাবলেন, তিনি হয়তো বা আজ আত্মপূজা করছেন। দক্ষিণেশ্বরে কখনও কখনও তিনি আপনাকে জগন্মাতার অভিন্ন বিগ্রহ-জ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্ম-পূজা করতেন। যাহোক, ভক্তবর রামচন্দ্র তখন গিরিশবাবুকে বললেন—'ঠাকুর আজ কৃপা ক'রে আমাদের পূজা গ্রহণ করবেন তাই বোধহয় অপেক্ষায় উপবিষ্ট রয়েছেন।' গিরিশ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভৈরবভক্ত। তাঁর "পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস", অর্থাৎ যোল আনার উপরে আরো চার পাঁচ আনা বেশী বিশ্বাস। রামবাবুর মুখে ঐ কথা শোনা মাত্র গিরিশচন্দ্র পরম উল্লাসে ও মহা বিশ্বাসে অধীর হয়ে উঠলেন।

'বল কি' বলিয়া শ্রীগিরিশ মহাবলী।
'জয় মা' বলিয়া দিলা পায়ে পুষ্পাঞ্জলি ॥
কালীর আবেশে মগ্ন তখনি গোঁসাই।
বরাভয় করদ্বয় অঙ্গে বাহ্য নাই ॥
ক্রমে পরে যাবতীয় মহাভাগ্যবান্।
পুষ্পাঞ্জলি শ্রীচরণে করিল প্রদান ॥
কেহ হাসে, কেহ নাচে উন্মত্ত হইযা।
বীর দম্ভে লম্ফে কেহ ছাদ কাঁপাইয়া ॥
আনন্দময়ীর ভাবে প্রভুদেব রায়।
মহা আনন্দের স্রোত ঘরে বয়ে যায় ॥—পুঁথি

গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পুষ্পপাত্র থেকে মাল্য নিয়ে 'জয় মা' 'জয় মা' ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের সমস্ত দেহ এক বিচিত্র আধ্যাত্মিক ভাবের আবেগে শিউরে উঠল এবং বাহ্যজ্ঞান-হারা হ'য়ে তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। শ্রীঅঙ্গে জগদম্বার

মহাবির্ভাবের আবেশে তাঁর শ্রীহস্তদ্বয় বরাভয় মুদ্রা ধারণ করল এবং দিব্য হাস্যফুল্ল মুখশ্রী অপূর্ব জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হ'ল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-কারের ভাষায়—'দেখিতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছেন। কি আশ্চর্য! ভক্তেরা অদ্ভুত রূপান্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল! দুই হস্তে বরাভয়। ঠাকুর নিস্পন্দ, বাহ্যশূন্য। উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। সাক্ষাৎ জগন্মাতা কি ঠাকুরের ভিতর আবির্ভূতা হইলেন। সকলে অবাক হইয়া এই অদ্ভুত বরাভয়দায়িনী জগন্মাতার মূর্তি দর্শন করিতেছেন।'

উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাঁর মধ্যে বরাভয়করা সর্বার্থ-সাধিকা সাক্ষাৎ জগন্মাতা শ্রীশ্রীকালিকাকে প্রত্যক্ষ ক'রে সকলে 'জয় মা' 'জয় মা' বলে পরম ভক্তি-ভরে তাঁর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগলেন। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন 'ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মময়ী' বলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রেখে পুনঃপুনঃ প্রণাম করছেন। সকলে সমস্বরে 'জয় মা' 'জয় মা' ধ্বনি দিচ্ছেন। কেহ কেহ ভক্তিভরে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে ৺জগদম্বার স্তব-স্তুতি আরম্ভ করলেন।

একজন দেবী-বিষয়ক সঙ্গীত গাইতে শুরু করেছেন। তখন সকলে সমস্বরে তাঁর সঙ্গে গাইতে লাগলেন। গিরিশ, বিহারী, মাষ্টার প্রভৃতি একে একে দেবীর মহিমা কীর্তন ক'রে গান গাইছেন। ঠাকুর ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হ'লে তিনি পর পর—দুটি গান গাইতে আদেশ করলেন। গান দুটি: 'কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী' এবং 'শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।'

'কিছুক্ষণ পরে হ'ল ভাব অবসান।
দশ বার আনা প্রায় অঙ্গে বাহ্যজ্ঞান॥
কোন ভক্ত দেখি তাঁর উন্মীলিত নেত্র।
শ্রীমুখে ধরিল তুলে পায়েসের পাত্র॥'—পুঁথি

এখন ক্রমশঃ ঐ ভাবের উপশম হ'তে লাগল। ধীরে ধীরে তাঁর প্রেমপূর্ণ উজ্জ্বল নেত্রদ্বয় উন্মীলিত হ'ল। তখন ভক্তগণ তাঁকে নানাবিধ ফল সন্দেশ পায়েস মিষ্টান্ন পানীয় তাম্বুল প্রভৃতি নিবেদন করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ নৈবেদ্য গ্রহণপূর্বক ভক্তগণকে প্রসাদ ক'রে দিলেন এবং তিনি তাঁদের ভক্তি-জ্ঞান-বিশ্বাসবৃদ্ধির জন্য শুভাশীর্বাদ করলেন। ভক্তগণ এখন পরম ভক্তিভরে সকলে তাঁর শ্রীচরণে প্রণত হলেন। তাঁরা বরাভয়মূর্তি ঠাকুরের ঐ পূজার নির্মাল্য আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করলেন কেহ বা আঁচলে অথবা রুমালে সযত্নে ঐ নির্মাল্য বেঁধে নিলেন। ভক্তগণ ভাবলেন, ঠাকুরের দেহ ও মনে শ্রীশ্রীজগন্মাতার আবির্ভাব হওয়ার ফলে তাঁর গলার ব্যথা সেরে গেছে। সুতরাং তাঁদের আনন্দের মাত্রা এতে আরও বৃদ্ধি পেল।

'আনন্দের স্রোতেতে আনন্দ বাড়াবাড়ি।
সকলে প্রসাদ লয়ে করে কাড়াকাড়ি॥
শ্রীপদে অঞ্জ'ল দেয়া কুসুমের হার।
কেহ উঠাইয়া গলে পরে আপনার॥
কেহ বা সঞ্চয় হেতু বাঁধিল বসনে।
কেহ বা গরব ভরে পরে দুই কানে॥
কেহ বা ঢলিয়া পড়ে অপরের গায়।
হৃদয়ে আনন্দ এত ধরে না তাহায়॥' —পুঁথি

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ঐ দিবসের ঘটনাবলী-বর্ণনার উপসংহারে লিখেছেন—"এইরূপে ভক্তগণ সেই বৎসর অভিনব প্রণালীতে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা করিয়া যে অভূতপূর্ব উল্লাস অনুভব করিয়াছিলেন তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাহাদিগের প্রাণে জাগরূক হইয়া রহিয়াছে এবং দুঃখ-দুর্দিন উপস্থিত হইয়া যখনই তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে তখনই ঠাকুরের সেই দিব্য হাস্যফুল্ল আনন ও বরাভয় যুক্ত করদ্বয় তাহাদিগের সম্মুখে উদিত হইয়া তাহাদিগের জীবন সর্বদা 'দেব-রক্ষিত'—এই কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।"

পুঁথির কথা দিয়াই এ পুণ্য প্রসঙ্গ শেষ করি:

'কেবা কালী, কেবা প্রভু, না পারি বুঝিতে।
কালীতে কেবল তিনি, মা কালী তাঁহাতে॥'

ইতিহাসের সরণী,—কালান্তর ও বর্তমান ভারত

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, এম্‌-এ

সমাজের যে পরিবর্তন হয়, এত বড় সত্যটাকে আমরা প্রায়ই অস্বীকার করিয়া বসি। অস্বীকার করি আবার 'সত্য, শিব ও সুন্দরের' নামে। আমাদের ধারণা 'সত্য, শিব ও সুন্দর' একমাত্র অতীতেই ধরা দিয়াছে। অথচ, সত্য কথা এই যে যুগে যুগে বিপুল পরিবর্তন সমাজ-জীবনের রূপান্তর সাধন করে—'সত্য, শিব ও সুন্দর' নূতনতর বিষয়-বস্তুর মধ্য দিয়া নব মাধুর্যের সম্বল লইয়া প্রকাশিত হয়।

বস্তুতঃ, গতির মধ্যেই আছে জীবন। জীবনের রহস্যকে করায়ত্ত করিতে হইলে ক্রমাগত পথ চলিতে হয়—বহু আয়াসে তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। আজ তাহা একরূপে অস্পষ্টভাবে ধরা দেয়, কাল তাহা পরিস্ফুট হয় অভাবনীয় সুন্দরভাবে। সেইজন্য, জীবনের অর্থ অনুসন্ধানে পথে পথে মানুষের অভিযান অনন্তকালের। সেই পথচলার মাধ্যম সমাজ। সমাজ-জীবন তাই মানুষের চলার সহিত সঙ্গতি রাখিতে—সেই প্রয়োজনের উপযোগী হইতে—ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনের কোথাও শেষ নাই। পথে পথে চলিতে মানুষের কোথাও থামিয়া পড়িবার উপায় নাই, থামিয়া পড়িলেই জীবনের জয় হইতে সে বঞ্চিত হইবে।

কিন্তু, আমরা ইহা দেখি না; কারণ দেখিতে চাহি না। একযুগে যাহা 'ভাল' বলিয়া মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে, আমরা তাহা চিরদিনের 'ভাল' বলিয়া জানিয়া বসিয়া আছি। স্রোতস্বতীর স্রোতোবেগ রুদ্ধ হইলেই যে পঙ্কিলতা তাহাকে অব্যবহার্য করিয়া তোলে, তাহা আমাদের প্রায়ই মনে থাকে না। সমাজ জীবনেও তাহার গতিবেগ প্রতিহত হইলে, উত্তরোত্তর নব নব ভাবধারা প্রবাহিত না হইলে রুদ্ধ স্রোতে নানা পঙ্কিলতার সৃষ্টি হয়। 'ভাল'র যে শেষ নাই, ক্রমাগতই যে তাহাকে নূতন ও নূতনতর রূপে অনুভব করা চলে এবং এইরূপ না করিলে যে চলে না, নানা শক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণে একযুগের 'ভাল' যে অপরযুগের 'মন্দ' হইয়া দাঁড়ায়—ইহা আমরা সহজে বুঝিতে চাহি না। আমাদের জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের ধারণা পরিবর্তিত হয়; পরিবর্তিত হয় জীবনের মূল্যবোধ এবং তৎসহ পরিবর্তিত হয় আর্থিক সংগঠন, রাষ্ট্র-গঠন, পরিবার, গোষ্ঠী, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা ও ধর্ম। আমরা তো শুধু হাত দিয়া সৃষ্টি করি না, করি মন দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, অনুভূতি দিয়া। হৃদয়ের নব নব অনুভূতি আমাদের জীবনযাত্রা-সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে নব নব পথের অনুসন্ধান দেয়। সেই সকল পথে না চলিয়া আমাদের উপায় নাই—থামিয়া থাকা মানে ধ্বংস হওয়া। কারণ, পরিবর্তনের ধারাই এইরূপ। একবার কোনও এক দিক দিয়া সে ভাঙন আরম্ভ হইলে তাহা দুর্নিবার বন্যার জলের মত ছুটিয়া চলে সকল বাধাবিঘ্ন প্রবল বেগে অতিক্রম করিয়া। তাহাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, প্রতিরোধের ফলও ভাল হয় না।

অতএব, পরিবর্তন সমাজের ধর্ম বলিয়া মানিয়া লওয়াই ভাল। অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই, এক যুগের নীতিশাস্ত্র সে যুগে যত সুফলপ্রদই হইয়া থাকুক না কেন, আর এক যুগে তাহা নানা দোষযুক্ত হয়। কোন এক সময়ে সমাজে একাধিক পতি গ্রহণ করিলে নারী নিন্দিত হইতেন না, কিন্তু, বর্তমানযুগে কে তাহা সমর্থন করিবে? জাতিভেদ-প্রথা যদি বা অতীতের ভারতবর্ষে জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া থাকে, আজ তাহা আমাদের উন্নতির পথে বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সন্দেহ নাই।

কিন্তু, এই সমাজ-পরিবর্তন আকস্মিকভাবে ঘটে না—একযুগের অভিজ্ঞতা আর এক যুগে একেবারে পরিত্যাজ্য হইয়া যায় না। যুগের পর যুগ, ধাপের পর ধাপ জুড়িয়া নির্দিষ্ট রীতি ও ক্রম অনুসারে সমাজের বিবর্তন অগ্রসর হয়। এক যুগের জীবন পূর্ববর্তী যুগের জীবনকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে নূতন ব্যাখ্যা দিয়া, নূতন মূল্য তাহার সহিত সংযোজিত করিয়া নবরূপ ধারণ করে। এ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত সমাজ-শাস্ত্রবিৎ লোয়ীর নিম্নোক্ত সুচিন্তিত অভিমত বিশেষ অনুধাবনযোগ্য :

"That Social phenomena have evolved i.e are derived from other social phenomena by a *process of manifestation* is a generally accepted proposition…… ··Our political institutions are the modified documents of British antecedents. Islamic matrimonial law evolved out of the Mahomedan custom, partly preserved and partly modified by the Prophet" (Lowie—Social Organisation—P. 33).

সাম্যবাদী বিপ্লব-নেতা লেনিনের একটি উক্তিও এ সম্পর্কে প্রভূত আলোকপাত করিবে। লেনিন বলিতেছেন, "Soviet culture is not the invention of experts, but a logical development of the culture of the past.

পূর্ববর্তী সমাজ-জীবনে প্রাপ্ত সত্যকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন নাই গতিধর্মে একান্ত আস্থাবান এই মানুষটি। এবং পূর্বতন ধনতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ হইতেও যে মূল্যবান সম্পদ সংগ্রহ করা উচিত—তাহাও উল্লেখ করিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এমনকি যাহারা এই সম্পদকে অগ্রাহ্য করিতে চাহিয়াছে, তাহাদের তিনি কঠোর ভাষায় নিন্দাও করিয়াছেন। তাঁহার এ বিষয়ে সুদৃঢ় মত V. Novikov এবং G. Silkin ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন :

"Lenin relentlessly frayed the so-called Proletkultists, who spurned the finest cultural creations of the past on the grounds that they were produced in a slave-owning, landlord or bourgeois society. He called them utopians, detached from real life and said that their queer 'ideas' were capable of doing irreparable damage to the Soviet state and people" (Soviet Literature-Vol 1, 1951)

অগ্রগতি অসম্ভব, যদি না সমগ্র অতীত অভিজ্ঞতাকে আয়ত্তাধীন করা যায়। অতীত অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করিয়া কে বর্তমানকে গড়িয়া তুলিতে পারে? কোনও সমাজ-সংগঠন-কারীই মানব-জীবনের এই সহজ সত্যকে অস্বীকার করিতে পারেন না। বহু সাধনায় যে সম্পদ লাভ করা গিয়াছে তাহা অস্বীকার করা বাতুলতা মাত্র।১

সমাজ-জীবনে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়ই পরিবর্তন চলিতেছে, কিন্তু বিভিন্ন শক্তির স্বকীয় পরিণতির মাধ্যমে মাঝে মাঝে তাহা একটি ভারসাম্য অবস্থায় (Equilibrium এ) উপস্থিত হয়। সামাজিক পরিবর্তনের এই রীতি বিশেষ লক্ষণীয়। কিন্তু, এই সাম্যাবস্থা সর্বতোভাবে আপেক্ষিক। সমাজ-জীবনে কোনও একটি অংশে পরিবর্তন শুরু হইলে পুরাতন সাম্যাবস্থা টিকিয়া থাকিতে পারে না। তখন নূতন অবস্থার সাম্য বা ইকুইলিব্রিয়ামের দিকে সমাজ অগ্রসর হয়। অর্থাৎ সমাজ-জীবনে সাম্যাবস্থার অবস্থান পরিবর্তনশীল (shifting)। এই সাম্যাবস্থার স্থায়িত্ব অবস্থাভেদে দীর্ঘকালীন বা স্বল্পকালীন। সাম্যাবস্থার স্থিতিকালে মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-প্রণালী (Social controls) এবং আদর্শ সমষ্টি (Social norms)

১ "A Society without a knowledge of the past which has made it, would be lacking in depth and dignity" University Commission's Report 1949,—P. 56.

গড়িয়া ওঠে। এবং এই স্থিতি যত দীর্ঘকালীন হয়, তত এই আদর্শ-সমষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠে দৃঢ়বদ্ধ প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজ জীবনে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে আর্থিক রাষ্ট্রিক প্রভৃতি শক্তির সংঘাতে আর কিছুটা ঘটে সচেতন প্রয়াসের দ্বারা। মানুষ মননশীল জীব ; সে তাহার অতীতকে বিশ্লেষণ করিতে পারে, ভবিষ্যতের কল্পনা করিতে পারে এবং সেইজন্য বর্তমানকেও নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়াস করিতে পারে। এইজন্য আমরা বিভিন্ন দেশের সমাজ-বিবর্তন ধারার মধ্যে পার্থক্য দেখি। সকল দেশে সমাজ বিবর্তন একই প্রথা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয় নাই। যথা ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুরূপ প্রথা পৃথিবীর অপর কোথায়ও সমাজ-জীবনে দেখা যায় নাই। আবার সামন্ততন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে —অনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রের পূর্ণ পরিণতির পূর্বেই সমাজ-তান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। সচেতন প্রয়াসের বিভিন্নতায় সমাজ-বিবর্তনের রূপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে।

আজ ভারতীয় সমাজ-জীবনে নানা পরিবর্তন অতি দ্রুত ঘটিতেছে। অনেকেই সেদিকে চক্ষু বুজিয়া 'স্বস্তি' অনুভব করিবার প্রয়াস পাইতেছি ; কেহ 'দেশ গেল,' 'ধর্ম গেল,' 'সব গেল' ভাবিয়া প্রাণপণ প্রতিরোধের প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু, পরিবর্তনের স্রোতোবেগ তাহাতে রুদ্ধ হইতেছে না, হইবেও না। আবার একদল পরিবর্তনের স্রোতোবেগে গা ভাসাইয়া দিয়াছে ; তাহার গতি-প্রকৃতি পরিচালনায় যে সচেতন প্রয়াসের কোনও মূল্য আছে, তাহাও স্বীকার করিতে চাহিতেছে না। কিন্তু, তাহাতে যে কল্যাণকর অনেক কিছুই হারাইয়া যাইতে পারে, এমনকি জাতীয়-ভাঙন (national disintegration) আরম্ভ হইতে পারে, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিতেছি না। অন্ধের মত পথ চলার কৃতিত্ব কি ? পথ হইতে বিপথে উত্তীর্ণ হইয়া ধ্বংসে মুখ হওয়ার সম্ভাবনাই তাহাতে প্রকট হইয়া উঠে না কি ?

পুরাতন ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনের ভিত্তি ছিল (১) বর্ণাশ্রম বিভাগ (২) যৌথ-পরিবার প্রথা (৩) স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম। ইংরেজ-আগমনের সঙ্গে, যখন হইতে শিল্প-প্রধান ধনতন্ত্রের প্রসার এদেশে আরম্ভ হয়, এ সকল ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। কৃষিকর্ম আজ commercialised অর্থাৎ বাণিজ্য-প্রধান হইয়াছে, তাহার ফলে গ্রামের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা বিনষ্ট হইয়াছে। বর্ণবৈষম্যের মধ্যে অর্থনৈতিক জীবনের যে মেরুদণ্ডটি স্থাপিত ছিল তাহাও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সুপণ্ডিত সমাজতত্ত্ববিদ্ শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয় তাঁহার 'হিন্দু সমাজের গড়ন' নামক পুস্তিকাতে ইহার একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ দিয়াছেন।[২] এখন আর জাতিভেদ কুলগত কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ইহা এখন একটি অর্থহীন জন্মগত প্রথায় পরিণত হইয়াছে। আহার-বিহারেও আজ আর উচ্চকোটি সমাজে ইহা নিয়ন্ত্রণশীল নহে। শুধু তাহাই নহে, আর্থিক জীবনে শ্রমিক-প্রবাহে বাধার (immobility) সৃষ্টি করিয়া ইহা বিষম অনিষ্ট সাধন করিতেছে। একই কারণে আজ যৌথ-পরিবার প্রথাও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। যৌথ-পরিবার প্রথা কৃষি-সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিল্প-প্রধান সমাজে ইহা অচল। পূর্বে জমির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত বলিয়া সকলে একত্র থাকিত, এবং একত্রীভূত জমিতে বৃহদায়তনে (large-scale) চাষ চলিত। কিন্তু, বর্তমানে একই পরিবারের কেহ বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলে, কেহ দিল্লীতে সরকারী দপ্তরে, কেহ আবার কলিকাতায় পাটের কলে চাকরি করে। এ অবস্থায় যৌথ-

২ শ্রীনির্মলকুমার বসু প্রণীত হিন্দু-সমাজের গড়ন—দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়।

পরিবার-প্রথা সংরক্ষণ সম্ভবও নয়, তাহা সংরক্ষণে সার্থকতাও কিছু নাই। ইহা ছাড়া, প্রত্যেকের কুলগত বৃত্তি নষ্ট হওয়ায় জীবিকারও স্থায়িত্ব নাই। এইজন্য একে অপরের দায়িত্ব লইতে একেবারে অক্ষম। গৃহলক্ষ্মী কন্যা-বধূদেরই ভার লইতে পরিবারস্থ পুরুষেরা আজ অক্ষম হইয়াছে, জীবিকা অন্বেষণে মেয়েদেরও গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। ইহাতে শুধু যৌথ পরিবার-প্রথাই নয়, পরিবার-প্রথারই মূলে আঘাত পড়িতেছে।

আজ যৌথ-পরিবার-প্রথার স্থলে একক পরিবার-প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজে বর্ণের ভিত্তিতে জাতিভেদের দৃঢ়মূল উচ্ছেদের পথে। অর্থের ভিত্তিতে শ্রেণী গড়িয়া উঠিতেছে। শ্রেণী-সংগ্রামও প্রকট হইয়া উঠিতেছে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে, স্বদেশ ও বিদেশের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস পাইতেছে। এই বিপুল পরিবর্তন আর্থিক জীবনের পরিবর্তনের মাধ্যমে আসিয়াছে। এবং এই পরিবর্তনের ফলে পূর্বের মূল্য-বোধ, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, সমাজ-নিয়ন্ত্রণ সকলই পরিবর্তিত হইতেছে। ভাবজগতে, জীবনাদর্শে, সাংস্কৃতিক জীবনেও তাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলে, সমগ্র দেশের মধ্যে এক বিপুল সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সহিত পূর্বতন সাংস্কৃতিক কর্মের বিরোধ ও সংঘর্ষ প্রকট হইয়া উঠে। এই সঙ্ঘাতে সচেতন হইয়া ওঠে জাতির চিত্ত। উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নব যুগের সাংস্কৃতিক রূপ-মণ্ডলে একটি সচেতন প্রয়াস স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়।

ইংরেজ-আগমনের আদিকালে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ বণিক-সমাজের সংস্পর্শে বাংলাদেশে এক অপূর্ব বস্তুর উদ্ভব হইয়াছিল। সাম্প্রতিক কালের খ্যাতিমান্ গবেষক শ্রীবিনয় ঘোষ তাহাকে কলকাতা 'কালচার' আখ্যা দিয়াছেন।* সে অপূর্ব বস্তু না ভারতীয় না ইওরোপীয়। কিন্তু, তাহাতে ভারতীয় সমাজের ও ইওরোপীয় সমাজের যা কিছু অপকৃষ্ট তাহার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এক কথায় তাহা ছিল অশিক্ষিত বর্বর শাসক-সম্প্রদায়ের ও আত্মবিশ্বাস লুপ্ত শাসিতদের নির্লজ্জ নীতিহীন জীবন ধারার এক বিচিত্র সংযুক্ত প্রবাহ। তাহার মধ্যে গর্ব করিবার মত, আজিকার দিনে মূল্যবান বলিয়া দাবি করিবার মত বস্তু যৎসামান্যই আছে। এই নীতিহীন সংস্কৃতির প্রত্যুত্তরেই সম্ভবতঃ উনিশ শতকে এক নূতন জাতীয়তার অভ্যুত্থান দেখা গেল। রামমোহনের আবির্ভাব ঘটিল। উন্নত জীবনের যে অমৃত-ফল ইওরোপখণ্ড লাভ করিয়াছিল, তিনি তাহা দুই হাত প্রসারিত করিয়া এ দেশের জন্য বরণ করিয়া নিলেন। বিচার ও বিশ্লেষণপূর্বক ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মূল্য নির্ধারণ করিয়া সেগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইলেন। এই প্রচেষ্টার ফলে এক প্রবল প্রবাহে দুর্নীতির পসরা ও অপকৃষ্টতার অনেক চিহ্ন ভাসিয়া গেল। 'কলকাতা কালচারের' এক নব রূপায়ণ আরম্ভ হইল। কিছুদিনের মধ্যেই সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে, শিক্ষা-প্রসারের ক্ষেত্রে এক যুগান্তরের পরিকল্পনা জ্ঞানদৃষ্টিতে লাভ করিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার সাধনায় নবযুগের রূপ-মণ্ডলের কাজ বহু দূর অগ্রসর হইল। ঠিক এই শুভ মুহূর্তে কোন অদৃশ্য ভাগ্যবিধাতার নির্দেশে আবির্ভূত হইলেন ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ ও নূতন যুগের পথিকৃৎ স্বামী বিবেকানন্দ। অতীত ভারতবর্ষের সমগ্র সাধনা ও ঐতিহ্য ঘনীভূত হইয়া মূর্ত হইল শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়ী, বিজ্ঞান-বিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই নূতন যুগের

* শ্রীবিনয় ঘোষ রচিত 'কলকাতা কালচার' পুস্তকের তথ্যপূর্ণ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

প্রতিনিধি। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করিলেন। পরে নূতন যুগের সকল জিজ্ঞাসার ও প্রয়োজনের কষ্টি পাথরে তিনি পুরাতন সমাজের ও জীবনাদর্শের ও মূল্য-সমষ্টির বিচার করিয়া যুগোপযোগী আদর্শ, মূল্য ও ভাবধারার রূপ-মণ্ডন করিলেন। তিনি যাহা সাধন করিলেন তাহাতে নূতন কালের সকল শক্তির সংহতি ঘটিল এক অপূর্ব নূতন চিন্তা পদ্ধতিতে; কিন্তু, তাহা সমগ্র অতীতকেও আত্মসাৎ করিয়া রূপ গ্রহণ করিয়াছে। নবীনের এই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির ফলে আমরা আমাদের সংস্কৃতি-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইলাম, নব সমাজ নূতন মূল্যমান লাভ করিল।

কিন্তু, তাহার সুদূর-প্রসারী, দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রভাব আজিও সমাজ দেহের সর্বত্র সমান ভাবে ব্যাপ্ত হয় নাই। আজিও অনেক অর্থহীন পুরাতন প্রথা আমাদের সমাজ-অঙ্গকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। আবার কোন কোন দিকে অপ্রতিহত-গতি অতি দ্রুত ভাঙন সর্বনাশকর হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমাদের যে সেজন্য বিশেষ *সচেতনতার প্রয়োজন আছে, তাহাই বারবার স্মরণ* করা প্রয়োজন।

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে আজও অর্থহীন, সার্থকতাহীন জাতিভেদ-প্রথা আমাদের জাতীয় জীবনে সম্প্রসারণশীলতায় বাধাস্বরূপ অবস্থান করিতেছে। আজিও জনসাধারণ—বিশেষ করিয়া পল্লী-অঞ্চলে অতি-মাত্রায় জাতি-সচেতন; এবং বৃত্তিগত সম্প্রসারণশীলতাও এই-জন্য বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণ-সন্তান যজন-যাজন-বৃত্তি দ্বারা জীবন-ধারণ না করিতে পারিলে কোনও প্রকার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, কিন্তু তবুও নিম্নতর বৃত্তি গ্রহণে সে সঙ্কুচিত। শহরাঞ্চলও এই মনোবৃত্তির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। অতি দুঃস্থ মধ্যবিত্ত ব্যক্তি শহরাঞ্চলেও কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ। সেখানেও 'আমি ভদ্রলোক, উচ্চবর্ণের সন্তান, এইরূপ ছোট কাজ কি করিয়া করি'—এইরূপ উক্তি প্রায়ই শোনা যায়। নাগরিক জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার আর হয়তো ব্রাহ্মণোচিত যজন-যাজন বৃত্তিতে স্পৃহা নাই। সেদিক হইতে তাহার মূল্য-বোধ পরিবর্তিত হইয়াছে; তাহার পরিবর্তে সে সামান্য বেতনে বুদ্ধিজীবীর যে কোনও বৃত্তি গ্রহণে উৎসুক, কিন্তু কায়িক পরিশ্রম তাহার পক্ষে পরম লজ্জার বস্তু বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ জাতি- ও বর্ণ-ভেদ সম্বন্ধে মূল্যবোধের যে পরিবর্তন আমাদের ঘটা উচিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণ ঘটে নাই। পরিবর্তনের ধারা এখানে কেমন করিয়া যেন পিছাইয়া গিয়াছে, অগ্রগতির ধারার সহিত তাল রাখিয়া সমাজ এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইংরেজীতে ইহাকে 'social lags' বা 'সামাজিক পিছিয়ে-পড়া' বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

অবশ্য, ইহার কারণ আমাদের শহর ও গ্রামের মধ্যে পরিবর্তনের পার্থক্য। শহরাঞ্চলে পরিবর্তন অতিশয় দ্রুত গতিতে ঘটিতেছে, গ্রামাজীবনে *শিল্পায়ন-ক্রিয়া না পৌঁছানোয়, তাহার পরিবর্তন* ধীরে ধীরে ঘটিতেছে। গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বহুলোক শহরাঞ্চলে কর্ম-সংস্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, গ্রাম হইতে যাহারা আসিতে পারে নাই, তাহাদের আর্থিক জীবনের দৃঢ় ভিত্তি দুর্বল হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি পুনর্গঠনের অভাবে সামাজিক জীবনে তাহারা এক অতি দূর অতীতের বিস্মৃত জীবনের রুদ্ধ কারাগারে আবদ্ধ হইয়া আছে। নূতন ভাবধারা, নূতন শিক্ষাদীক্ষা সেখানে প্রবেশ লাভ করে নাই, তাহারা সেই দূর অতীতের, আজিকার জীবনের অনুপযোগী সামাজিক নিয়ন্ত্রণনীতি (Social control) এবং আদর্শ ও মূল্য-সমষ্টি (Social norms) আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে পরিবর্তনের গতি অতি দ্রুত,

প্রতি দশ বৎসরে বোধহয় যুগান্তর ঘটিতেছে। ফলে শহর ও গ্রামের বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে। ইহা জাতীয় জীবনের পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে। গ্রামবাসীর কাছে শহরবাসীরা অদ্ভুত জীব, ও ভাবাদর্শ আচার-আচরণের পার্থক্যের দরুণ তাহারা নিদারুণ ঘৃণা এবং অবিশ্বাসের পাত্র। যে উন্নতির পরিকল্পনা আমরা অতি আগ্রহের সহিত একের পর এক করিয়া চলিতেছি, তাহার সহিত তাহাদের আত্মিক যোগ ও সহযোগিতা এইজন্য বাধা প্রাপ্ত হইতেছে।

গ্রামবাসীরা পুরাতন কুলগত বৃত্তিই শুধু হারায় নাই, তাহাদের কুলগত শিক্ষাও হারাইয়া গিয়াছে। গ্রামজীবনের এই একদিকে খুব ভাঙন লাগিয়াছে। নূতন কালের শিক্ষাও তাহাদের দ্বারে পৌঁছায় নাই। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইহার ফল বিষময় হইয়াছে। গ্রামের বহু শিল্পী-সম্প্রদায় শিল্প-কুশলতা ভুলিয়া গিয়াছে; বহু শিল্প লোপ পাইয়াছে। এই পশ্চিম বঙ্গেই সুদক্ষ 'পটুয়া'-শ্রেণী লুপ্তপ্রায়। গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ ও লোকশিক্ষার অঙ্গ এবং লোকশিক্ষার মাধ্যম যাত্রাগান, কথকতাও ক্রমশঃ অবনতি ও বিনষ্টির পথে চলিয়াছে। বহু লোক-উৎসব লুপ্ত হইয়াছে, বহু লোক-শিল্প ধ্বংস হইতেছে, বহু মূল্যবান ভাবধারা লুপ্তপ্রায়। গ্রাম-জীবনের এই ভাঙন রোধ না করিলে তাহা জাতীয় ভাঙনে পরিণত হইতে খুব বেশী সময় লাগিবে না। আমাদের শিল্পায়ন এত দ্রুতগতিতে সংসাধিত হইতেছে না যে, আমরা গ্রামকে আমাদের সমাজ-জীবন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারি। তাহা ছাড়া শিল্প-প্রসার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিলেও আমাদের আর্থিক জীবনে কৃষিকর্মের ও কাজেকাজেই গ্রাম-জীবনের স্থান থাকিবেই। সেক্ষেত্রে গ্রাম-জীবনের এই সর্বাঙ্গীণ অবনতি ভীতির কারণ সন্দেহ নাই।

ইহার প্রতিকার করিতে হইলে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন, শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকে পুনর্গঠন করিতে হইবে। পূর্বকালের ন্যায় বৃত্তি ও শিল্পগুলির দৃঢ় ভিত্তি চাই। আর চাই শিক্ষাপ্রসার, নূতন কালের নূতন আদর্শগত শিক্ষা। তবেই শহর ও গ্রামের এই বিষম অনৈক্য দূরীভূত হইবে ও গ্রাম-জীবনের ভাঙন প্রতিহত হইবে। শিল্প ও বৃত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায় সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনার মধ্যে কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। শহরকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের শিল্পজীবন যদি গড়িয়া উঠে, গ্রামগুলির আর্থিক দুর্গতির অবসান অসম্ভব হইবে না। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা অতি গুরুতর। কারণ গণশিক্ষার ভিত্তি জাতীয়তার উপর হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাতীয় শিক্ষা ব্যতীত অপর কোনও শিক্ষা জনগণের গ্রহণীয় নয়[৪]। বিদেশী ভাষা যতদিন শিক্ষা-পদ্ধতির মেরুদণ্ডস্বরূপ থাকিবে, ততদিন আমাদের শিক্ষা জাতীয় শিক্ষায় পরিণত হইতে পারে না, এবং বিদেশী শিক্ষার মাধ্যমে যতদিন শিক্ষা চলিবে, ততদিন শহর ও গ্রামের আত্মিক অনৈক্য কোনও মতেই যে ঘুচিবে না, ইহা সহজেই অনুমেয়। ইংরেজী ভাষার শিক্ষা মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রহণ করুক আপত্তি নাই, এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আদান-প্রদানের জন্য তাহার একান্ত প্রয়োজনও আছে। কিন্তু তাহা কখনও শিক্ষার মেরুদণ্ড হওয়া উচিত নহে। তাহার পরিণাম শিক্ষার অসদ্ভাব। এ অতি আশ্চর্য,

৪ "Teach the masses in the vernaculars. Give them ideas! They will get informations but something more will be necessary. Give them culture. Until you can give them that, there can be no permanence in the raised condition of the masses". Swami Vivekananda, 'Education' P 62 পূর্বে শিক্ষা মুষ্টিমেয় সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। আজ তাহা সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজী-ভাষাভিজ্ঞ জনকতক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। এ উভয় অবস্থার ফল একই।

যে একটি সমগ্র জাতির শিক্ষা একটি বিদেশী ভাষার উপর নির্ভর করিয়া আছে। পৃথিবীর অপর কোনও দেশে এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভবতঃ নাই। শহর ও গ্রামের শিক্ষার মান এক করিতে হইলে শিক্ষাকে মাতৃভাষার ভিত্তির উপর গড়িতে হইবে ও সর্বতোভাবে জাতীয় শিক্ষায় পরিণত করিতে হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন শহর গ্রামের আত্মিক ঐক্য সংসাধিত হইবে না।

আমাদের ভারতীয় জীবনের অপর এক দিকেও কম সঙ্কট দেখা দেয় নাই। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে আমাদের নাগরিক জীবন যান্ত্রিক সভ্যতার নিয়মানুযায়ী অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল হইয়া উঠিয়াছে। শুধু দুই দুইটা মহাযুদ্ধ বর্তমান শতাব্দীতে যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত করিয়াছে তাহা শত শত বৎসরেও হইত কি না কে জানে। এই অতি দ্রুত পরিবর্তনের পরিণামও অতীব ভয়াবহ। ইহার ফলে সামাজিক সাম্যাবস্থা বা স্থিতি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কোনও সাম্যাবস্থা বা ইকুইলিব্রিয়ামই সে অবস্থায় সম্ভব হয় না, সমাজ-জীবনে "a state of perpetual disequilibrium" বিরাজ করে। তখন অতি প্রবলভাবে ওলটপালট ঘটে, যাহার পরিণাম বিশৃঙ্খলা ও এক নিদারুণ নৈরাজ্যিক অবস্থা। এ অবস্থায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক আদর্শ কিছুই গড়িয়া উঠিতে পারে না; এবং আজিকার মূল্যায়ন, আজিকার আদর্শ কালই মহা ভ্রান্তিতে পরিণত হওয়ায়, ভাঙনের ছাপই মানুষের চিত্তে দৃঢ় হইয়া ওঠে। মানুষ কোনও আদর্শেই আর কোন আস্থা রাখিতে পারে না, কোনও কিছুতেই আর তাহার শ্রদ্ধা অর্পিত হয় না, অতীতের ঐতিহ্য তাহার কাছে উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। সামাজিক আদান প্রদানও বন্ধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। শুধু যে তাহার মূল্য মানে স্বার্থ ব্যতীত অপর কিছুই নাই—তাহা নহে, সমাজে পরিবারে কাহারও সহিত সম্প্রীতিও তাহার নাই। তা ছাড়া এই দ্রুত পরিবর্তনের তালে সকলে সমভাবে চলিতে পারে না। প্রত্যেকের বিশ্বাস, কর্ম, চিন্তা, ভাবধারা স্বতন্ত্র। সকলেই আপন অভিজ্ঞতার কোটরে আবদ্ধ, অন্য কাহারও সহিত তাহার অভিজ্ঞতার জগতে পরিচয়ও নাই। সেইজন্য সে বহুজনের মধ্যে থাকিয়াও একাকী, বহির্জগতে কোথাও তাহার আশ্রয় নাই। তখন তাহার একাকিত্ব ও নির্জনতা তাহাকে উন্মাদ করিয়া তোলে। এই একাকিত্বের অবসাদ তাহার সমগ্র জীবনে এমন ভয়াবহ ভার হইয়া ওঠে যে, তাহাকে এতটুকু বাঁচিবার সাধ বজায় রাখিবার জন্য ও এতটুকু আনন্দ সংগ্রহের জন্য বহু বিকৃত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যেখানে এইরূপ শুধু বাঁচিবার জন্য প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয়, সেখানে নানারূপ স্নায়বিক রোগও অতি স্বাভাবিক। এইরূপ অশান্তি-পরিপূর্ণ হতভাগ্য মানব-জীবনের অবসান—হয় আত্মহত্যায়, না হয় উন্মাদ-আলয়ে। এ অবস্থায় সামাজিক ভাঙন ধ্বংসে না পৌঁছাইয়া থামে না।[৫]

আমাদেরও নাগরিক জীবনে সামাজিক ভাঙনের উপরোক্ত লক্ষণগুলি কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। আমাদের প্রাচীন সমাজে সামাজিক দায় দায়িত্ব নিয়ন্ত্রিত ছিল। সেই সকলের অতি অল্পই আজ অবশিষ্ট। নূতন করিয়া তাহার স্থলে তেমন বিশেষ কিছুই গড়িয়া ওঠে নাই। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যা ছিল দুইটি মহাযুদ্ধ ও দেশবিভাগের আঘাতের ফলে তাহাও ধ্বংসপ্রায়। শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্লাটফর্মে ও ফুটপাথ যাহাদের আশ্রয়, যাহারা আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরিয়া যাযাবর জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের জীবনে সামাজিক

৫ 'নির্জন পৃথিবী ও নিরাকার বুদ্ধিজীবী' (শনিবারের চিঠি—বৈশাখ, ১৩৬৪) শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে শ্রী বিনয় ঘোষ অতি তথ্যবহুল ও মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন।

নিয়ন্ত্রণ কতটা টিকিতে পারে? বাস্তুহারা মানুষের মনোজগৎ সামাজিক আদর্শ-সংরক্ষণের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। আজ আমাদের সামাজিক জীবনে স্বার্থসিদ্ধি, আরাম ও মুহূর্তের উত্তেজনায় বাঁচা—এ ছাড়া অন্য আদর্শই বা কোথায়? সাংস্কৃতিক জীবনে ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সর্বাঙ্গীণ অপকৃষ্টতার মধ্যে সুস্পষ্ট। সাহিত্য আজ প্রধানতঃ সিনেমার উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, শিল্পের মধ্যেও সিনেমা-শিল্পই প্রধান। সিনেমার কোনও মূল্য সমাজজীবনে নাই, এ কথা বলা ভুল; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই শিল্পও যে অতিশয় অপকৃষ্টতা-দোষযুক্ত হইয়া দাঁড়াইযাছে। সাহিত্য ও শিল্প জগতে আজ সাধনা লুপ্ত, মৌলিকতাও তাই পলাতক। সৃজনী প্রতিভা দিন দিন লুপ্ত হইতেছে। সর্বত্র দুর্নীতি, সর্বাঙ্গীণ নিকৃষ্টতা ও সর্বত্র ধর্মহীন, শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, সাধনাহীন একদল মানুষের অবাধ বিচরণ আজ সমাজজীবনের সর্বত্র প্রকট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা যে শুভ লক্ষণ নহে তাহা বোধ করি ব্যাখ্যা করিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। পরিণামে দেশ যদি উন্মাদাগারে ছাইয়া না যায় তো সে অতি আশ্চর্যের কথা।

এ ভয়াবহ পরিণাম হইতে রক্ষা চাই, মানুষ মাত্রেরই এই প্রার্থনা। কাজটি দুঃসাধ্য। কিন্তু আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের ঐতিহ্য তো আছে; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের চিন্তা-সম্পদ তো আছে। অবশ্য এর মানে এই নয় যে অতীতের অভিমুখে ফিরিয়া যাইতে হইবে। 'ফিরে চল' বলিলেই ফিরিয়া চলা যায় না, এবং ফিরিয়া গিয়াই বা কি লাভ হইবে? পুরাতন জীবনে সবই যে ভাল ছিল তাহা নহে। অতএব সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য সচেতন প্রয়াস অবশ্যই করিতে হইবে। যে অভিজ্ঞতা-সম্পদ অতীতে লাভ করিয়াছি, তাহার সহায়ে অগ্রগামী জীবনকে ভূষিত করিয়া সংহত করিবার প্রয়াসের নামই তো সচেতন প্রয়াস। বিচারপূর্বক অগ্রসর হইলে মূল্যায়ন দণ্ড আমাদের হাত হইতে চ্যুত হইবে না। সচেতন প্রয়াসের অর্থ পরিবর্তনের গতিরোধ নয়, তাহার অর্থ নব জীবনের রূপ-মণ্ডনে ইতিহাস-জ্ঞান ও ঐতিহ্য সম্পদসহ সহায়তা করা।

আজ প্রতিটি অসহায় মানুষকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমেই সাধ্য। শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিত্তি হইবে সমাজের উপযোগী রীতি, নীতি ও আদর্শ। সামাজিক জীবন গঠন তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন যান্ত্রিক ব্যাপারে পরিণত। তাহাকে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার ভিত্তি 'মানবিকতা' ও 'সামাজিকতা'র উপর হওয়া উচিত। শিক্ষার দ্বারা মানুষের মূল্যবোধে সামাজিক আদান-প্রদানের প্রধান স্থান প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যে সামাজিকতা-বোধ হারাইয়া ফেলিয়া মানুষ মনুষ্যত্বহীন স্বার্থসর্বস্ব, আরাম-সর্বস্ব, আশ্রয়হীন সঙ্গিহীন অমননশীল একটি জীব পরিণত হইতেছে, সেই সমাজবোধই শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন হইলে অতীতের ঐতিহ্য স্মরণ করিতে হইবে। অতীতের জীবনে সামাজিক দায় দায়িত্ব অনুশীলন করিয়া তাহা হইতে যাহা কিছু গ্রহণযোগ্য, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত যে সকল শাশ্বত মূল্যের মধ্যে মানুষের সত্য পরিচয়, শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে তাহারা যেন স্থানচ্যুত না হয়—তাহাও দেখিতে হইবে। এ সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন্ কমিশন (University Education Commission) একটি অতি সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন—"When there is a great empty space in the souls of man, supersitions fill the void. Belief in absolute values seems to be a condition of life". এ বিষয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁহারা পুনর্গঠন-পরিকল্পনা-কার্যে ব্রতী, যাঁহারা শিক্ষাদানে রত তাঁহাদের সচেতনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাঁহারা কি এ বিষয়ে অবহিত?

দূর ও নিকট

'অনিরুদ্ধ'

দূর ও নিকট মানুষেরি মনে—প্রীতির বিধানে চলে,
শতেক যোজন ক্ষণে আসে কাছে গাঢ় অনুরাগ-বলে।
মানুষের মন যদি চায় তবে ত্রিভুবনে রাখে ধরি,
উদাসীন হলে অতি পরিচিত নিমেষেই যায় সরি।

কালের গর্ভে বিলুপ্ত যারা মানুষের মনে রহে,
মানুষের ডাকে মৃত্যুশয়ন হতে তারা কথা কহে।
যাহারা এখনো আসেনি ধরায়—আগামীকালের ছায়া—
মানুষের মনে তারাও নাচিয়া রচিছে নিবিড় মায়া।

কোন্ সে অতীতে গাওয়া এক গান কখনো অলস সাঁঝে
পৃথিবীর শত কলরব ছাপি সে কেন সহসা বাজে?
কোন্ পথপাশে কাহারে একদা লেগেছিল বড় ভালো
যুগ যুগ পরে কত ভিড় ঠেলি সে কেন আনে রে আলো?

যদি ভালবাসো, প্রিয়জন তব দূরে কভু নাহি যাবে,
দেশ ও কালের বাধা লঙ্ঘিয়া তোমারি হৃদয়ে পাবে।
যদি অবহেলা, তামস দম্ভ প্রীতির বাঁধন কাটে—
নিকটের জনে হারাবে চকিতে এই সংসার-হাটে।

নিকটই সত্য, দূর শুধু ভ্রম সবারে নিকটে ডাকো
যত পার তাই, অবিচারে ঠাঁই সবাকার তরে রাখো।
প্রেমেরই সূত্রে অখিল সৃষ্টি গাঁথেন জগৎ-স্বামী
বিশ্ববীণায় মিলনেরই গীতি ধ্বনিছে দিবসযামী।

হারানো সহজ, পাওয়াই ভাগ্য, রাখা—সুকঠিনতর,
স্বার্থগন্ধ যদি রে মিলায় তবেই রাখিতে পারো।
তবেই সকল সুদূর সদাই থাকিবে নিকট হয়ে,
ঘুচিবে অন্ধ মোহের কালিমা জিনিবে মৃত্যুভয়ে।

দেখিবে অসীম কালের নৃত্য প্রতি মুহূর্তমাঝে
দেখিবে নিখিল রূপের আকার একটি প্রকাশে রাজে।
নাহি কিছু কালো, সকলি স্বচ্ছ শুভ্র জ্যোতির্ময়।
বিগতদ্বন্দ্ব শুদ্ধমানসে আপন-সত্য রয়।

বৈদান্তিক যোগীর মহাপ্রয়াণ

[সাধু নিবৃত্তিনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী]

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথজীর অন্যতম ত্যাগী শিষ্য সাধু নিবৃত্তিনাথজী গত ১৬ই শ্রাবণ, ১লা অগষ্ট, বৃহস্পতিবার সায়ংকালে গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথ-মন্দিরে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। দেহে বার্ধক্যের কোন লক্ষণ ছিল না। নিজেকে তিনি ২৫ বৎসরের যুবক বলিয়া অনুভব করিতেন, এবং সেইভাবে চলাফেরা করিতেন। প্রতিদিন ৪ মাইল সবেগে হাঁটা তাঁহার নিয়মিত অভ্যাস ছিল। বাকী সময় তিনি বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলনে এবং ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ-রসপানে অতিবাহিত করিতেন উপযুক্ত জিজ্ঞাসু পাইলে বেদান্ত-বিজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। অধিকার-অনুসারে সাধনার প্রণালী অনেককে শিক্ষা দিয়াছেন।

দেহত্যাগের দুই দিন পূর্বে বুকে একটু অস্বস্তি বোধ করেন। এক ভক্ত ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক-ভাবে হইতেছে না, কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক। তিনি শুনিয়া যেন উল্লসিত হইলেন, সানন্দে আশ্রমের সব সাধুদের নিকট ঘোষণা করিয়া দিলেন, তাঁহার 'পূর্ণ বিশ্রামের' সময় উপস্থিত, গুরুজীর আহ্বান আসিয়াছে। দেহাসক্তি, ভোগাসক্তি ও কর্মাসক্তি হইতে তিনি অনেক কাল পূর্বেই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, মৃত্যুভয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

তিনি প্রসন্নচিত্তে আসনে বসিয়া গেলেন। অবিরাম ব্রহ্মাত্মবোধের নিবিড় অনুশীলন চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে উপনিষদ্, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতির মহাবাক্যসমূহ উচ্চারণ করেন, অধিকাংশ সময় আপনার ব্রহ্মস্বরূপচিন্তনে ডুবিয়া থাকেন। সামনে কাহারা বসিয়া আছে, কী কথাবার্তা বলিতেছে, সেদিকে কোন খেয়ালই নাই। অর্ধনিমীলিতনেত্রে আপনার ভিতরে আপনি ডুবিতে লাগিলেন। প্রসন্নবদনে আনন্দের আভাস।

দেহে প্রাণক্রিয়া নিরুদ্ধ হওয়ার পূর্বে মনকে সম্পূর্ণরূপে দেহ হইতে বিমুক্ত করিবার জন্যই যেন ধীর প্রযত্ন চলিতে লাগিল। এই ভাবে দুই দিন কাটিল। হৃৎপিণ্ড যেন ধীরে ধীরে দুর্বল হইতে লাগিল, মহাত্মার চিত্তও যেন তৎসঙ্গে চৈতন্যে বিলীন হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীনাথজীর সান্ধ্য আরতি দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া চলে। আরতি যে মুহূর্তে শেষ হইল, সেই মুহূর্তে এই যোগী পুরুষের প্রাণক্রিয়াও নিরুদ্ধ হইল। আসনে উপবিষ্ট অবস্থাতেই ছিলেন। মৃত্যুর মস্তকে পদক্ষেপ করিয়াই যেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর বৈদান্তিক যোগী ব্রহ্মস্বরূপে পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিলেন।

পরদিন বেলা ১০টায় ভূগর্ভে সমাহিত করিবার সময় পর্যন্ত দেহ আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই রাখা হইয়াছিল, কেবলমাত্র চিবুকের নীচে একটি যোগদণ্ড দ্বারা মস্তকটিকে সমুন্নত রাখিতে হইয়াছিল; দেহে মৃত্যুর কোন লক্ষণ প্রকটিত হয় নাই। মহাযোগী যেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। এইরূপই দর্শকবৃন্দের অনুভব হইতেছিল। বহু দর্শক সমবেত হইয়াছিল। সকলেই যোগীর অপূর্ব মহাপ্রয়াণ দেখিয়া নির্বাক বিস্ময়ে প্রণাম করিতে লাগিল। গুরুর সমাধি-মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে শিষ্যের দেহ সাম্প্রদায়িক রীতি-অনুসারে উপবিষ্ট ভাবেই সমাহিত করা হইল।

* * *

সাধু নিবৃত্তিনাথজীর পৈতৃক বাসভূমি ছিল পূর্ববঙ্গে ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরে; তাঁহার পিতা

৺শ্যামাচরণ গুহ ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন, বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ধনিপুত্র জিতেন্দ্রনাথ (তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম) যৌবনারম্ভে স্কুলে পড়িবার সময়ই তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় গৃহত্যাগী হন। তখন বাংলায় বিপ্লবের পথও তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। ধনদৌলত, ভোগবিলাস, লেখাপড়া, মানসম্ভ্রম, কিছুই তাঁহার আকর্ষণের বস্তু ছিল না। সব ছাড়িয়া ঈশ্বরলাভই তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় হইল। ১৫।১৬ বৎসর বয়সেই তিনি সংসারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

কোন উপায়ে গোপনে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া এবং কয়েকটি সমভাবাপন্ন বালককে সঙ্গী করিয়া তিনি সদ্‌গুরুর অন্বেষণে গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। নানা তীর্থস্থান ও সাধুদের তপস্থার স্থান ঘুরিয়া গোরক্ষপুর পৌঁছিলেন। সেখানে গোরক্ষনাথ-মন্দিরে যোগিরাজ গম্ভীরনাথজীর অলোকসামান্য দিব্য মূর্তি দেখিয়াই তিনি তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। বালকের উন্নত অধিকার দেখিয়া যোগিরাজ তাঁহাকে দীক্ষাপ্রদান করিলেন, এবং কয়েক বৎসর পিতামাতার সেবা করিয়া এবং পড়াশুনার সহিত সাধনভজন করিয়া নিজেকে সন্ন্যাসের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য উপদেশ দিলেন। গুরুর আদেশে বালক গৃহে ফিরিলেন। পিতামাতার সেবা, ধর্মগ্রন্থপাঠ, ইন্দ্রিয়-মনের সংযম এবং গুরুদত্ত মন্ত্রের জপধ্যান, ইহাই তাঁহার কার্যসূচী হইল। পিতৃগৃহসংলগ্ন বাগানে এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহাতেই বাস করিতেন। বিনা প্রয়োজনে পরিবারস্থ কাহারও সহিত কোন সংযোগ রাখিতেন না। শহরের সর্ব প্রকার আন্দোলন হইতে তিনি দূরে থাকিতেন; গৃহে থাকিয়াও গৃহত্যাগী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

বালকপুত্রের তপস্থাময় সুসংযত জীবন দেখিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার চিত্তেও আধ্যাত্মিক পিপাসা জাগ্রত হইল। পুত্র পিতামাতাকে গুরুসন্নিধানে উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদেরও গুরুকৃপালাভ হইল। পুত্রের মনে—ইহাই সর্বপ্রধান পিতৃমাতৃসেবা বলিয়া অনুভূত হইল। গুরুদেব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জিতেনকে বিবাহ করাইবে? অন্তর্যামীর প্রেরণায় স্নেহময় পিতা উত্তর করিলেন,—না, উহাকে আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম। সন্ন্যাস-গ্রহণে পিতার সাক্ষাৎ অনুমতিলাভ হইল। মাতাও তাহাতে সায় দিলেন। পিতামাতাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া, তাঁহাদের আদেশ লইয়া পুত্র সন্ন্যাস-গ্রহণের উদ্দেশ্যে আবার গুরুর নিকট উপনীত হইলেন। দীক্ষালাভের কয়েক বৎসর পরে সন্ন্যাস লাভ হইলে তাঁহার নাম হইল নিবৃত্তিনাথ। তদবধি তিনি সর্বতোভাবে নিবৃত্তিমার্গের সাধক হইলেন।

যোগিরাজের অন্যতম বাঙ্গালী শিষ্য শান্তিনাথজীর সন্ন্যাসলাভ কয়েক বৎসর পূর্বেই হইয়াছিল। নিবৃত্তিনাথজীর সন্ন্যাসজীবনের শিক্ষার ভার শান্তিনাথজীর উপর শ্রীগুরু-কর্তৃক অর্পিত হইল। ইহার অল্পকাল পরেই ১৯১৭ খৃঃ মার্চ মাসে শ্রীগুরুর অন্তর্ধান হয়। নিবৃত্তিনাথজী জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শান্তিনাথজীর শিক্ষাধীনে থাকিয়া বেদান্ত-শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বেদান্তদর্শনের সকল মুখ্য গ্রন্থ তিনি গভীর মননের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ' প্রভৃতি অনেক প্রকরণ-গ্রন্থের যুক্তিসমূহ তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। সন্ন্যাসজীবনে তাঁহার মেধা-শক্তির অপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল। ভারতীয় দর্শনসমূহে তো বটেই, পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই জ্ঞান-সাধনা ছিল তাঁহার সাধনার বহিরঙ্গ। তাঁহার সময় ও শক্তি মুখ্যতঃ নিয়োজিত হইয়াছিল অন্তরঙ্গ জ্ঞান-সাধনায়—নিবিড় ধারণা ধ্যান ও সমাধির অনুশীলনে। বহু বৎসর হৃষীকেশে ও হিমালয়ের অন্যান্য অনুকূল স্থানে লোকসঙ্গ পরিহারপূর্বক তিনি বৈদান্তিক ধ্যান-

যোগ-অভ্যাসে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আবু পাহাড়ে, নর্মদাতটে, সমুদ্রতীরে, নানা স্থানে তিনি সাধনা করিয়াছিলেন। একনিষ্ঠ সাধন দ্বারা তিনি তত্ত্বানুভূতির উচ্চস্তরে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত, ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে তিনি পরিব্রাজকভাবে পর্যটন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বেই গুরুর অনুমতি লইয়া তিনি শান্তিনাথজীর সহিত কৈলাস ও মানস-সরোবর গমন করিয়াছিলেন এবং অমরনাথ প্রভৃতি অনেক দুর্গম তীর্থও পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এই তেজস্বী সাধক যেমন অদম্য পুরুষকারের সহিত জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, সমাধি অভ্যাস করিয়াছেন, তেমনি তেজের সহিতই মৃত্যুকে জয় করিয়া ব্রহ্মলীন হইলেন।

আমার সুন্দর

শ্রীশান্তশীল দাশ

আমার সুন্দর আসে রাত্রি যবে নিস্তব্ধ নিঝুম,
কোথাও নেইকো সাড়া—নিদ্রামগ্ন শান্ত চারিধার।
আমি জেগে থাকি শুধু, আমার চোখেতে নেই ঘুম,
দু'টি চোখ ভরে দেখি সুবিশাল আকাশ অপার।

কী প্রসন্ন সুর ওঠে সুগভীর নৈঃশব্দের মাঝে:
প্রাত্যহিক জীবনের কোলাহল হতে বহু দূরে
নিয়ে যায় সেই সুর,-- একটানা অবিশ্রান্ত বাজে,
সর্ব-গ্লানি-মুক্ত মন অনাহত সে প্রসন্ন সুরে।

সে-নির্জনে চেয়ে দেখি, আমার সুন্দর সমাসীন—
সে-বিরাট দৃশ্যপটে—একাকী আপন গরিমায়;
চেয়ে থাকি সবিস্ময়ে নিরুচ্চার কণ্ঠ বাণীহীন;
অপলক আঁখি দু'টি, শিহরণ জাগে সারা গায়।

আমার সুন্দর হাসে—করুণার ঝরে প্রস্রবণ;
অজস্র অশ্রুর ভারে ভারাক্রান্ত আমার নয়ন।

দেবীপূজার ধারাবাহিকতা

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে দেবীপূজা বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং ঋগ্বেদের দেবী-সূক্তে (ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক, ১২৫ সূক্ত) দেবীপূজার বীজ নিহিত রহিয়াছে। এই সূক্তে ঋষিকন্যা বাক্ পরব্রহ্মময়ী আত্মাশক্তিকে উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন—'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী ...।' অর্থাৎ, আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধনপ্রদাত্রী দেবী ও পরব্রহ্মশক্তি। ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তে (ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক, ১২৭ সূক্ত) দেবী ওঁকারময়ী, আয়তী (সর্বত্র বিদ্যমানা), ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রী বলিয়া অভিহিতা হইয়াছেন। তিনি অমর্ত্যা, নিত্যা, অজ্ঞাননাশিনী, মোক্ষদাত্রী, পরমাত্মার কন্যা। রাতি (দদাতি) অভীষ্টং ইতি রাত্রিঃ, অর্থাৎ দেবী সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম রাত্রি। বৈদিক সাহিত্যে উমা, অম্বিকা, কাত্যায়নী, কন্যাকুমারী ও দুর্গার উল্লেখ দেখিয়া ভারতীয় পণ্ডিতগণ বৈদিক যুগ হইতে দেবীপূজার ধারাবাহিকতা প্রমাণ করেন। বাজসনেয়ী সংহিতা (৩।৫) ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১।৮।৬।৪) রুদ্রের ভগ্নীরূপে অম্বিকার, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১৮) উমার, এবং উমাপতি ও অম্বিকাপতিরূপে রুদ্রের উল্লেখ আছে। সামবেদীয় কেনোপনিষদে (৩।২৫) স্বয়ং ব্রহ্ম উমা-হৈমবতীর রূপ ধারণ করিয়া বায়ু, অগ্নি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের অহঙ্কার নাশ করিয়াছিলেন এবং এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে অগ্নি ও উহার দাহিকাশক্তি, সূর্য ও তাহার রশ্মি, দুগ্ধ ও উহার ধবলত্ব, মণি ও উহার জ্যোতি যেমনি অভেদ, ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি তেমনি অভেদ। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ-উপনিষদে 'দুর্গা' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।' অর্থাৎ, আমি সেই পরমাত্মা কর্তৃক দৃষ্ট, অগ্নিবর্ণা, নিজের তাপে শত্রুদগ্ধকারিণী, কর্মফলদাত্রী 'দুর্গা' দেবীর শরণাগত হই। যে সুতারিণি, সংসারত্রাণ-কারিণি দেবি, তোমাকে প্রণাম করি। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের যাজ্ঞিকা উপনিষদের দুর্গা-গায়ত্রীটিতে আছে—'কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।' বেদের ভাষ্যকার সায়ন বলেন, দুর্গি ও দুর্গা একই দেবী। দুর্গা শব্দের অর্থ—দুঃখেন (অষ্টাঙ্গযোগ-সর্বকর্মোপাসনারূপেণ ক্লেশেন) গম্যতে (প্রাপ্যতে) যা সা দুর্গা দুর্গমা দেবী ইতি। অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, শুদ্ধকর্ম ও উপাসনা প্রভৃতি তপস্যা দ্বারা যাঁহাকে লাভ করা যায় তিনি দুর্গা বা দুর্গমা দেবী।

বাল্মীকি-কৃত রামায়ণে দেবীপূজার কথা নাই। কিন্তু কবি কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণে আছে, রাম ও রাবণ উভয়েই দেবীর ভক্ত। রাবণ-বধের জন্য রাম শরৎকালে দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন।

দুর্গার উপাসনার প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ব্যাসকৃত মহাভারতের দুইটি দুর্গা-স্তোত্রে। এই স্তোত্র দুইটির একটি আছে বিরাট-পর্বে, আর অন্যটি ভীষ্মপর্বে। বিরাটপর্বের স্তোত্রে আছে—বিরাট নগরে প্রবেশ করিয়া যুধিষ্ঠির দেবী দুর্গাকে প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া দেবী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিয়া সাহায্য দ্বারা যুদ্ধে শত্রুবিনাশের এবং জয়লাভের আশ্বাস দিয়াছিলেন। এই স্তোত্রে বর্ণিত আছে—দেবী নন্দের

গৃহে যশোদার গর্ভে কংসবধের জন্ত জন্মিয়াছিলেন। জন্মের পর দুরাত্মা কংস তাঁহাকে প্রস্তরের উপরে নিক্ষেপ করিলে দেবী আকাশে অন্তর্হিতা হন। তিনি নারায়ণের প্রিয়া, কৃষ্ণের ভগ্নী এবং খড়্গ, খেটক, পাশ, ধনু ও চক্রধারিণী রণদেবী। তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, হাত চারিটি ও মুখ চারিটি। তিনি শিবা, মহাদেবী, সুরেশ্বরী, কালী, মহাকালী, ইত্যাদি নামে সম্বোধিতা হইয়াছেন। 'দুর্গাৎ তারয়সে দুর্গে তৎ ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ।'—হে দুর্গে, তুমি দুর্গ বা সঙ্কট হইতে ত্রাণ কর বলিয়া লোকসকল তোমাকে দুর্গা বলে। ভীষ্মপর্বে লিখিত স্তোত্রে আছে—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে শত্রুজয়ের ইচ্ছায় দেবী দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। দুর্গা প্রীতা হইয়া বলিলেন, 'পাণ্ডুপুত্র, তুমি শীঘ্রই শত্রু জয় করিবে, কারণ নারায়ণ তোমার সহায় এবং তুমি নরঋষির অবতার।' এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। দেবী নন্দগোপের গৃহে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ-পিঙ্গল। তিনি খড়্গ-খেটক-শূলধারিণী রণদেবী। স্তোত্রে দেবী দুর্গা, কাত্যায়নী, ভগবতী, উমা, মহানিদ্রা, বেদমাতা, শাকম্ভরী, স্কন্দমাতা, কালী, মহাকালী, ভদ্রকালী, চণ্ডী প্রভৃতি নামে সম্বোধিতা হইয়াছেন। মহাভারতের অন্যত্র শিবের পত্নীকে শঙ্করী, অম্বিকা, পার্বতী, গৌরী, উমা, মহেশ্বরী বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবী যোগমায়া ও বিষ্ণুমায়ারূপে উল্লিখিত। ব্রজাঙ্গনাগণ নন্দগোপপুত্র কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্ত দেবী কাত্যায়নীকে আরাধনা করিয়াছিলেন। কাত্যায়নীই মহামায়া দুর্গা। হরিবংশে দেবীকে দুর্গা বলা হয় নাই—তিনি যোগকন্যা। ইহাতে দেবীর স্তোত্রের নাম আর্যাস্তব। দেবীকে আর্যা, কাত্যায়নী, কৌষিকী, নারায়ণী, পার্বতী, ব্রহ্মবাদিনী, ব্রহ্মচারিণী বলা হইয়াছে; কালী, করালী, চণ্ডী, দুর্গার নাম নাই। মহিষাসুর বা অপর কোন অসুরবধের কথাও হরিবংশের স্তবে নাই, লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীরূপে দানববধের কথা আছে।

বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতে শক্তিবাদের কথা আছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন—হিন্দুদের কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার বর্ণনা বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। কালী, তারা, সরস্বতী, ভদ্রকালী, কামেশ্বরী প্রভৃতি দেবীর অষ্টরূপের মন্ত্রসকলও বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। জৈনদের মন্দিরে সরস্বতী ও অন্যান্য দেবীর মূর্তিসকল দেখা যায়—তাঁহারা সরস্বতীকে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও শাসনদেবীরূপে পূজা করেন।

শাক্ততন্ত্রে দেবীপূজার পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হয়। তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ স্যার জন উড্রফের মতে সমগ্র শাক্ততন্ত্র বীজাকারে দেবীসূক্তের মধ্যে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, বৃহদ্দেবতা হইতে বচন তুলিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, বৈদিক দেবী অদিতি, বাক্ ও সরস্বতী এবং পরবর্তী কালের দুর্গা অভিন্না।

পুরাণগুলিতে দেবীপূজার খুব সমৃদ্ধি দেখা যায়। কোন কোন পুরাণে দেবী ভারতী, গিরিজা, অম্বিকা, দুর্গা, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, উমা, লক্ষ্মী প্রভৃতি নামে বর্ণিতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে দুর্গার রণদেবীরূপের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায়। মহামায়া নিত্যা সনাতনী ও জন্মমৃত্যুরহিতা হইলেও দেবগণের কার্যসিদ্ধির অর্থাৎ দেবপীড়ক অসুরগণের বধের জন্ত আবির্ভূতা হইয়া 'উৎপন্না' বলিয়া কথিতা হন। চণ্ডীতে বর্ণিত আছে—শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের পর দেবতারা নারায়ণীর স্তব করিয়াছিলেন এবং দেবী প্রসন্না হইয়া বলিয়াছিলেন,

'তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরং।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥'

অর্থাৎ, আমি আবার দুর্গম নামক প্রকাণ্ড অসুরকে বধ করিব, তখন আমার 'দুর্গাদেবী' এই নাম বিখ্যাত হইবে। 'দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ।' 'দুর্গাসি দুর্গভবসাগর-

নৌরসজ্জা।'—দুর্গ বা সঙ্কট হইতে যিনি সকলকে রক্ষা করেন তিনি দুর্গা। চণ্ডীতে আছে, দুর্গা তিন রূপে প্রকাশিতা হইয়াছিলেন—মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীরূপে। মহামায়ার মহাশক্তিতে জগৎ মুগ্ধ; আবার তিনি উপাসকের আরাধনা দ্বারা প্রসন্না হইলে জীবকে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত করেন—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' 'সা বিদ্যা পরমা মুক্তে হের্তুভূতা সনাতনী। সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী।' তিনি আরাধনা দ্বারা প্রীতা হইলে জীবকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দান করেন।—'আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।' 'সাহযাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি।'

দেবীভাগবতেও আছে—মহামায়া অরূপা হইয়াও ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য রূপ ধারণ করেন—

'সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দদায়িনী।
রূপং বিভর্তি অরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে॥'

দেবী ও ব্রহ্ম এক, অভিন্ন—

'সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাহং অহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥

বেদ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির আলোচনা হইতে দেবীর বিভিন্ন রূপগ্রহণের কথা জানা যায়। দেবীসূক্তে দেবী সর্বব্যাপিনী বিশ্বের কারণীভূতা স্ত্রীদেবতা, কেনোপনিষদে ব্রহ্মের শক্তি উমা-হৈমবতী, মহাভারতে নন্দকুলোদ্ভবা বিন্ধ্যবাসিনী, চণ্ডীতে মহিষমর্দিনী পার্বতী ও দুর্গম-নামক অসুরমর্দিনী দুর্গা। কালিকা-পুরাণের মতে দেবীর মূল মূর্তি এক্ষণে অন্তর্হিত। মহিষাসুরবধের পর মহিষমর্দিনীরূপে দেবী পূজিতা হইতেছেন। ঋগ্বেদীয় দেবীর কল্পনা এবং মহাকাব্যের ও পৌরাণিক দেবীর কল্পনার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য বেশী নাই। পরবর্তী কালের কল্পনার মধ্যে নূতন কিছু উপাদান আসিয়াছে। পার্থক্য কেবল দেবীপূজার ধারার বিকাশের মধ্যে।

শ্রীশ্রীকালী

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু যখন নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি; যখন তিনি এই সব কার্য করেন—তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নামরূপ ভেদ। ···তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র সূর্য গ্রহ পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার—তখন কেবল মা—নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী, গৃহস্থবাড়ীতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি হয় তখন রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শব-শিবা ডাকিনী-যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন। ··সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

স্রষ্টা

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কণ্ঠে তোমার কখনো যে শুনি
ভৈরব-সঙ্গীত,
নৃত্যচপল চরণে জাগাও
অশিবের ইঙ্গিত।
বন্যাপ্লাবন-মহামারীরূপে
তব আগমনী গাহ চুপে চুপে,
জীবনশরণ-কর-পরশন
হরে প্রাণ-সম্বিৎ।

নয়নে তোমার সৃজন-সুষমা
তুমি চিরসুন্দর।
তাই পুরাতন দলিত জীর্ণ
বিদায়ী নিরন্তর।
যাহা যায় ঝরি' তোমার ভুবনে
আনো তাহা পুনঃ নব-রূপায়ণে,
ভাঙিবার ছলে করিছ নিত্য
সৃষ্টিরে মনোহর।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-বন্দনা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

ললিত—ত্রিতালী (প্রভাতী সুর)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ভুবন-মঙ্গল,
জয় মাতা শ্যামাসুতা অতি নিরমল।
জয় বিবেক-আনন্দ পরম দয়াল,
প্রভুর মানস-সুত জয় শ্রীরাখাল ॥
জয় প্রেমানন্দ প্রেমময় কলেবর,
জয় শিবানন্দ জয় লীলা-সহচর।
যোগী যোগানন্দ জয় নিত্যনিরঞ্জন,
জয় শশী গুরুপদে গত-তনুমন ॥
সেবাপর যোগিবর, অদ্ভুত-আনন্দ,
অভেদ-আনন্দ জয় গতমোহবন্ধ।
যোগরত ত্যাগ-ব্রত তুরীয় আখ্যাত,
শরত সুধীর শান্ত যেন গণনাথ ॥

*জীবে শিব-সেবাব্রত গঙ্গাধর বীর,
জয় শ্রীবিজ্ঞানানন্দ প্রশান্ত গম্ভীর।
প্রধান গোপাল মাতৃসেবা-পরায়ণ,
সারদা সারদা-পদে গতপ্রাণমন ॥
বালক-চরিত্র জয় সুবোধ সরল,
নাগবর ত্যাগ-বীর বিবেক-সম্বল।
কথামৃত-বরিষণ গৌর জলধর,
গিরিশ ভৈরব জয় বিশ্বাস-আকর ॥
রামকৃষ্ণদাস-দাস জয় সবাকার,
রামকৃষ্ণ লীলাস্থান জয় বার বার।
রামকৃষ্ণ-নাম জয় শ্রবণমঙ্গল,
ভকত-বাঞ্ছিত জয় চরণ-কমল ॥

[ভজনটি বহু পূর্বে রচিত এবং গীতাবলী, সঙ্গীত-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত। উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন ত্যাগী পার্ষদের নাম উল্লেখ ছিল না, তারকানাথায় স্তবকটি নূতন রচনা করিয়া লেখক এই বন্দনাটি সম্পূর্ণ করিলেন । উঃ সঃ]

সমালোচনা

গীতামাধুকরী—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ; ২০।১১, নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড, পোঃ রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা-৪০ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৬। মূল্য ১·২৫ টাকা। উৎকৃষ্ট পুরু কাগজে পাইকা টাইপে সুমুদ্রিত।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় যাহাতে অল্পশিক্ষিত সমাজেও গীতার মতবাদ প্রচারিত হয়—এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার সরল পদ্যে পয়ার-ছন্দে গীতার সারমর্ম "গীতামাধুকরী" নামে প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন—একথা অকুণ্ঠচিত্তে বলিতে পারা যায়। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে উক্ত হইয়াছে যে গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। গীতা পাঠ করিলেই সব শাস্ত্রপাঠের ফল লাভ হইয়া থাকে। গীতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সাধনা চাই।

গীতা সম্বন্ধে কাহারও কাহারও ভ্রান্ত ধারণা আছে যে গীতা শুধু কর্মের প্রেরণা যোগায়। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—ত্রিধারার সম্মিলন ঘটিয়াছে এই মহাগ্রন্থ গীতাতে। সুপণ্ডিত ও সাধক গ্রন্থকার নিম্নাধিকারিগণের জন্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় গীতাগ্রন্থ অবলম্বনে আত্মার অমরত্ব, মৃত্যুর অপরিহার্যতা, তপস্যা, দান, জ্ঞান, কর্ম, বুদ্ধি, সুখ, ত্রিবিধ ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, এবং যাঁহাদের জন্য করিয়াছেন তাঁহারা উহা হইতে যথেষ্ট লাভবান হইবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অমৃতলোকের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটি কী চমৎকার।

নাহি নিদ্রা অলসতা সেথা
মনে নাই নিদারুণ ব্যথা,
আছে চির বসন্ত মধুর
বায়ু গাহে আনন্দের সুর
কর মন অমৃত সন্ধান,
মতিমান, ওহে মতিমান!!

—শ্রীরাধাচরণ দাস, সাহিত্যরত্ন

ইউরোপের গান্ধী ডাঃ এ্যালবার্ট শুইৎজার—শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন বসুরায়; পৃষ্ঠা ৯২, মূল্য টাকাঃ ১·৫০ শৈবলিনী-কুটীর, যাদবপুর, কলিকাতা।

ডাঃ এ্যালবার্ট শুইৎজারের জীবনীকার শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন বসুরায় বাঙালী জাতির ধন্যবাদভাজন। সাম্প্রতিক কালে রাজনীতির দামামাধ্বনিতে সারা বিশ্বের যন্ত্রযুগ যখন মুহ্যমান, অর্থ ও শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষের স্বাভাবিক মূল্যবোধ যখন বিপর্যস্ত, এমনই সময়ে যে কয়েকটি মানুষের আবির্ভাবে আমরা মনুষ্যত্বের প্রতি আমাদের আস্থা ফিরে পেয়েছি, ডাঃ শুইৎজার তাঁদেরই একজন। ইওরোপের পণ্ডিত সমাজের অগ্রণী ডাঃ শুইৎজার কেমন ক'রে জীবনের সকল ঐশ্বর্য-সম্ভাবনা ত্যাগ ক'রে ভগবান যীশুর মানবপ্রেমের আদর্শে আফ্রিকার সুদূর প্রদেশে রোগার্তদের সেবায় ব্রতী হয়েছেন, সে কাহিনী দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে চিরদিনের সম্পদ হ'য়ে থাকবে। আশা করি সুধী পাঠকমণ্ডলীর সাগ্রহ দৃষ্টির অভিনন্দনে এ জীবনীটি সুপ্রচারিত হবে। লেখকের শ্রদ্ধানত চিত্তের স্পর্শে সংক্ষিপ্ত পরিসরেও জীবনীটি হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু একটি বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। একদা বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার 'স্কট', নবীনচন্দ্রকে 'বায়রণ' এবং রবীন্দ্রনাথকে 'শেলী' বলার ফ্যাশন এদেশে ছিল। এ জাতীয় নামকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, এই কারণে যে এতে ক'রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্মান কিছুমাত্র বাড়ে না। 'ইউরোপের গান্ধী' এই বিশেষণটি আমাদের পূর্বকালীন ফ্যাশনেরই বিপরীত অনুবর্তন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে গান্ধীজী ও শুইৎজারের আদর্শগত ঐক্য আমাদের আকৃষ্ট করে, তবু সে সম্বন্ধে জীবনীর মধ্যে আলোচনা

করলেই চলত, নামকরণ স্বতন্ত্রভাবে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পরিশেষে, ছাপা ও বাঁধাইয়ের সুরুচির জন্ম লেখক ও প্রকাশক ধন্যবাদার্হ।

শ্রীপ্রণব ঘোষ

পাথেয়—শ্রীস্নেহলতা দেবী ভারতী প্রণীত, শ্রীবিন্দ্যা পাবলিশিং হাউস, রঘুনাথপুর, পোঃ বড়িশা, কলিকাতা-৮ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৮; মূল্য তিন টাকা।

বর্তমানে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহু কবিতার বই আত্মপ্রকাশ করলেও 'পাথেয়' শিরোনামে নতুন বইটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হ'য়ে কাব্য-রসিকদের কাছে ৩৪টি কবিতার অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সব কয়টি কবিতাই রসোত্তীর্ণ না হলেও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে 'পান্থ', 'জীবন-রহস্য', 'ভরত', 'মনের আগুন', 'কোন আমি দামী', 'শবরী', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'নির্বাসিতা সীতা'—কবিতাগুলি ভাব, ভাষা ও ছন্দে অনবদ্য। 'চাষী ভাই', কবিতায় যে দরদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে কৃত্রিমতার ছোঁয়াচ নেই।

কবীর-বাণী — শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার, প্রকাশক: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য দেড় টাকা, পৃষ্ঠা ৮৫+(৮)।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কবীর-দোঁহা-সংগ্রহ হইতে এক শতটি নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'One Hundred Poems of Kabir' নামে প্রকাশিত করেন। বর্তমান কাব্যগ্রন্থটিতে তাহার একটি বাদে সবগুলি আছে।

সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ অনূদিত 'ঝুলন'টির বদলে বর্তমান লেখক অন্য একটির অনুবাদ দিয়া শত সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি অনুবাদের শীর্ষে মূলের প্রথম পঙক্তি লিখিত আছে। ভাব ও ভাষার দিক দিয়া অনুবাদ স্থানে স্থানে দার্শনিক কাব্যে পরিণত হইয়াছে এবং বহু পাঠক—যাঁহারা মূল 'কবীর' পড়িতে পারেন না—তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন। ইংরেজীতে সম্ভব না হইলেও মনে হয় বাংলায় মূল দোঁহাগুলির অনুকারী ছন্দে অনুবাদ সম্ভব, হয়তো তাহাতে ভাবের গম্ভীরত্ব ও যাথার্থ্য কথঞ্চিৎ ব্যাহত হয়।

A Practical Guide to Samadhi.—(Spiritual Teachings) by Swami Narayananda. Published by Messrs N. K. Prosad & Company, P. O. Rishikesh (U P) Price Rs 4/ Pages. 206+XII.

হৃষীকেশের স্বামী নারায়ণানন্দ আধ্যাত্মিক সাহিত্য-রচয়িতা হিসাবে ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও আজ সুপরিচিত। প্রাঞ্জল ইংরেজীতে লিখিত তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজি বহু সাধকের সাধনপথে সহায়তা করে। বর্তমান গ্রন্থে প্রার্থনা, ঈশ্বর, শেষ সত্য ও তাহার অনুভূতি—বিবেক, বৈরাগ্য, ইষ্টদেবতা, গুরুর প্রয়োজনীয়তা, সাধনা, শরণাগতি, মন্ত্র, জ্ঞানযোগ, সমাধি, জীবন্মুক্তি, তুরীয়াবস্থা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

পুস্তকের প্রথমে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তাঁহার সংগ্রাম ও সাধনা লিপিবদ্ধ। এরূপ একখানি পুস্তকে হস্তরেখা-বিচারক-কর্তৃক বিচারও লেখক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী নিতান্তই বিজ্ঞাপনের মতো লাগে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী-স্তবমালা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রণীত; ২৬বি, আর, জি, কর রোড কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৮৩+৮০; মূল্য দশ আনা।

শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় স্তব-পুস্তিকা-খানির প্রকাশ অতি সুন্দর ও সময়োচিত হইয়াছে। যাঁহারা সমগ্র চণ্ডীখানি পড়িবেন না বা পড়িতে পারিবেন না, তাঁহাদের পক্ষে চণ্ডীর অন্তর্গত

অত্যুৎকৃষ্ট স্তবচতুষ্টয়ের পাঠবিধি দেবীমাহাত্ম্যেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই দিক দিয়া বর্তমান সংকলক ব্রহ্মাকৃত-স্তুতি, শক্রাদি-স্তুতি, দেবগণকৃত-স্তুতি, নারায়ণী-স্তুতি অর্থসহ পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

স্তবগুলির পূর্বে অর্গলস্তোত্র, কীলকস্তব, দেবী-কবচ, এবং পরে দেবীসূক্ত, শ্রীশ্রীদুর্গাস্তবরাজ, ক্ষমা-ভিক্ষাস্তুতি প্রভৃতি সাজানোতে পুস্তকখানি একটি পঞ্চপুষ্পের সাজিতে পরিণত হইয়াছে।

দ্রুত প্রকাশনের জন্য কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে আশা করি এগুলি নিশ্চয় দূরীভূত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

A Man of God. (Glimpses into the life and works of Swami Shivananda, a great disciple of Sri Ramakrishna)—by Swami Vividishananda of Ramakrishna Vedanta Center Seattle, Washington, U.S.A. Published by Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras 4 Price Board Rs 3.; Cloth Rs 4. Pages 352 & Foreword by Christopher Isherwood.

সিয়েট্‌ল্‌ রামকৃষ্ণ বেদান্ত-কেন্দ্রের স্বামী বিবিদিষানন্দ-লিখিত গ্রন্থখানি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ) মহারাজের জীবন ও সাধন-কথা। এই মহাজীবনানুধ্যান বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত:

ব্যক্তিত্ব ও বাল্যজীবন, শ্রীগুরুর পদতলে, তপস্যা ও তীর্থপর্যটন, সেবায় আত্মনিয়োগ, মহাব্রতের পূর্বাভাষ, সংঘশীর্ষে, জাতীয়তার উপর সংঘের প্রভাব, গুরুরূপে, স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত জীবন, গৌরবময় অধ্যায় প্রভৃতি কয়টি বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া সরল সতেজ ভাষায় পুণ্যজীবনের আলেখ্য রচিত হইয়াছে।

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ—স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক সংকলিত; প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ, উত্তরপ্রদেশ। পৃষ্ঠা ১২০, মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ বা শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ সম্বন্ধে পূর্বে 'সৎকথা', লাটুমহারাজের স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান পুস্তকে আরও অনেক নূতন তথ্য ও কথাবার্তা সংগৃহীত। পুস্তকের প্রথমে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ লিখিত সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে লাটু মহারাজের জীবনকথা আলোচিত, দ্বিতীয় অংশে বিভিন্ন সমস্যা-বিষয়ক উপদেশাবলী ও শেষে বিবিধপ্রসঙ্গ সন্নিবেশিত।

চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস ও মৃত-যতিসংস্কার—স্বামী কৈবল্যানন্দ (পুরী) প্রণেতা, শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম বারাণসী হইতে প্রকাশিত; দক্ষিণা ৮০, পৃষ্ঠা ৪২।

সন্ন্যাসী অবধূত প্রভৃতি মোক্ষমার্গী চতুর্থাশ্রমি-গণের দেহান্তে তাঁহাদের ভক্ত ও শিষ্যগণের কখন কি করণীয়—শাস্ত্রবিধি ও প্রচলিত আচার-অনুযায়ী তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরিশেষে মঠাম্নায় ও সন্ন্যাসবিধি প্রভৃতি নিবদ্ধ, অল্পের মধ্যে পুস্তকখানি একটি মূল্যবান সংগ্রহ-গ্রন্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী দিব্যানন্দজীর দেহত্যাগ

আমরা গভীর বেদনার সহিত জানাইতেছি গত ১২ই অক্টোবর (২৫শে আশ্বিন) ভোর ৫-৩৫ মিঃ সময় কলিকাতা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে স্বামী দিব্যানন্দজী ৬৭ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ কাশী অদ্বৈত আশ্রমে তিনি ফুসফুসে ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিলেন; চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া উপরি-উক্ত হাসপাতালে ভরতি করা হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভরতি হওয়ার পরদিনই তাঁহার দেহান্ত ঘটিল। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ২৫ বৎসর বয়সে বেলুড়মঠে যোগদান করিয়া স্বামী দিব্যানন্দ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোর আশ্রমে কয়েক বৎসর পূজকের কাজ করার পর তপস্যার উদ্দেশ্যে ১৯২৮ খৃঃ কাশীবাস করিতে আসেন, এবং জীবনের শেষভাগ অবধি দীর্ঘদিন বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমেই কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে লীন হইয়াছে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

বেলুড়মঠে ঃ—যথাযোগ্য গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননীর উপাসনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আকাশ পরিষ্কার থাকায় তিন দিনই সংখ্যাতীত লোক সমাগম হইয়াছিল। মহাষ্টমীর দিন ৬,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান; এবং অন্য দুইদিন ১০,০০০ জনকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শাখাকেন্দ্রে ঃ—আসানসোল, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম, বোম্বাই, কাঁথি, ঢাকা, দিনাজপুর, জামসেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, মালদহ, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রহড়া, শিলং, শিলচর, সোনারগাঁ, বালিয়াটি ও শ্রীহট্টে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বোম্বাই আশ্রমের পূজায় অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ধর্মসম্মেলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডক্টর কে, এম, মুন্সীর সভাপতিত্বে বিভিন্নধর্মের একটি আলোচনা-সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

লণ্ডন কেন্দ্রেও দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ ভজন ও আনন্দের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

কার্য-বিবরণী

বোম্বাই ঃ রামকৃষ্ণ মিশন শাখা-কেন্দ্রের ১৯৫৫ ও '৫৬ খৃষ্টাব্দের সুমুদ্রিত কার্য-বিবরণী পাইয়াছি। ১৯২৩ খৃঃ প্রতিষ্ঠার সময় হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে শিক্ষা ও সেবামূলক কার্যের মধ্য দিয়া বেদান্তের সার্বভৌম ভাব বোম্বাই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই কেন্দ্র হইতে প্রচারিত হইতেছে। গত দুই বৎসরে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্গণ কর্তৃক গীতা, বেদান্ত দর্শন, উপনিষৎ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণী ও বিভিন্ন ধর্ম-বিষয়ে ২৭৫টি আলোচনা ও বক্তৃতাসভার ব্যবস্থা হয়। আশ্রমে ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী ১৪৮টি বক্তৃতা দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি এবং শারদীয়া দুর্গাপূজা পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় অনুষ্ঠিত ও উদ্‌যাপিত হয়।

শিবানন্দ গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা বর্ধিত করা হইয়াছে। প্রায় অর্ধশত দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত লওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রাবাসে ৭৪ ও ৮৬ জন বিদ্যার্থীকে ভরতি করা হইয়াছিল; পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ৩২ ও ৪১ জন, কয়েকটি ছাত্র বৃত্তি পায়।

আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক বিভাগে মোট ১৭৯, ৮৪৬ রোগী চিকিৎসালাভ করে।

বঙ্গ বিহার আসাম মহারাষ্ট্র কচ্ছ প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বন্যা দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প ও বাত্যায় দুর্গত নরনারীর সেবায় প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর বক্তৃতা-সফর

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ হইতে আমন্ত্রিত হইয়া বোম্বাই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ—এবারও প্রায় দুই মাস ধরিয়া বহুস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী এবং ধর্ম, ভারতকৃষ্টি, নারীজাতির আদর্শ, বেদান্ত ও বর্তমানের প্রয়োজন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন। আসানসোলকে কেন্দ্র করিয়া কুলটি, বার্নপুর, চিত্তরঞ্জন, মাইথান, রাণীগঞ্জ, অণ্ডাল প্রভৃতি স্থানের শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবে তিনি যোগ দিয়াছেন। জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে উৎসবের পর কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরেও তাঁহার দুইটি বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। পূর্বপাকিস্তানে কলমা সোনার-গাঁ, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বহু নরনারী বৎসরান্তে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। বিশেষতঃ ঢাকা জেলাবোর্ড হলের সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতা 'Where all religions meet' (সকল ধর্ম কোথায় মিশিয়াছে) শুনিবার জন্য বহু মন্ত্রী, অধ্যাপক, জজ, অন্যান্য উচ্চ রাজকর্মচারী এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাইকমিশনারও উপস্থিত ছিলেন।

মাদ্রাজ : পুনর্বাসন

মাদ্রাজ সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীএম. ভক্তবৎসলম্ সম্প্রতি বেদারণ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন হরিজন কলোনীর দ্বিতীয় ও শেষ দফায় ৭২টি গৃহের উদ্বোধন করিয়াছেন। সাত মাস পূর্বে মাদ্রাজের রাজ্যপাল প্রথম দফায় ১২৮টি গৃহের উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

দশ একর জমির উপর তিন লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়ে নির্মিত দুইশত পাকা ঘর বিশিষ্ট এই কলোনী রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ১৯৫৫ সালের ঝটিকায় পীড়িত হরিজনদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। এই কলোনী স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইহাতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, উপাসনা-গৃহ, শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির, শিশুদের পার্ক, রেডিও, ৯টি পাকা কুয়া, ৮টি নলকূপ এবং ৪২টি আধুনিক শৌচাগার আছে একটি সমবায় মৌমাছি-পালন-সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী চিদ্‌ভবানন্দ ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মাদ্রাজ মঠের স্বামী কৈলাসানন্দ সমবেত জনমণ্ডলীকে স্বাগত জানান। রিলিফের ভারপ্রাপ্ত স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ তাঞ্জোর ও রামনাদ জেলায় প্রলয়ঙ্কর ঝটিকার পর মিশনের আর্তত্রাণ ও পুনর্বসতি সম্পর্কিত কার্যকলাপের বিবরণে বলেন :

এই ঝটিকায় আর্তত্রাণকার্যে এক তাঞ্জোর জেলাতেই মিশন অন্নদান ও দুগ্ধবিতরণ ব্যতীত ৩২,০০০ জনকে নূতন বস্ত্র, প্রায় সহস্র শিশুকে জামা, প্লেটপেন্সিল, প্রায় ৭০০০ জনকে বাসনপত্র, ১৫০০ জনকে মাদুর, এবং ১২৮টি গৃহ নির্মাণের মালমশলা সরবরাহ করিয়া এবং বহু কারিগরকে যন্ত্রপাতিদ্বারা জীবিকার্জনের সহায়তা করিয়া পুনর্বাসন ত্বরান্বিত করিয়াছেন। কতকগুলি পুষ্করিণীরও সংস্কার করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণপুরম্ নামে অভিহিত কলোনীর জন্য মোট ৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে; তন্মধ্যে মিশন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন এবং বিভিন্ন সুবিধার জন্য প্রায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। মিশন বেদারণ্যম্ শহর হইতে কলোনী পর্যন্ত প্রায় ৭ ফার্লং দীর্ঘ একটি পাকা

রাস্তা নির্মাণ এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। হরিজনগণ এই সমস্ত গৃহে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে পারিবে, কিন্তু এই সমস্ত গৃহ বিক্রয় বা হস্তান্তরিত করিতে কিংবা বন্ধক দিতে পারিবে না।

মিশন রিলিফ কার্যে নগদে ও জিনিসপত্রে মোট প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিশনের জনসেবার প্রশংসা করেন। সরকারী ও বেসরকারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতাঃ শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান— এই সেবা-প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৬ খৃঃ পঞ্চবিংশ বর্ষের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ইহার উল্লেখযোগ্য পরিবিস্তার: ২৫টি শয্যাসমন্বিত ও অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থাযুক্ত পুরুষদের সাধারণ চিকিৎসালয় এবং ধাত্রীবিদ্যা-সহ সিনিয়র নার্সিং-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের উদ্বোধন। মাতৃসদনের প্রয়োজনীয়তা ও সন্তানপালনবিধি সম্বন্ধে জনসাধারণ যাহাতে অজ্ঞাত না থাকে এবং দেশে শিশুমৃত্যুর হার যাহাতে কমে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালিত হয়। সেবা ও পরিচ্ছন্নতাই প্রতিষ্ঠানটির আদর্শ।

নাম-পরিবর্তন

সাধারণ হাসপাতালে পরিণত হওয়ায় শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের নাম ১৫ই মে '৫৭ হইতে পরিবর্তিত হইয়াছে: রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠান। যে রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত সেই ল্যান্সডাউন রোড কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শরৎ বোস রোড নামে পরিবর্তিত হইয়াছে।

গত ২৫.৯.৫৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅনাথবন্ধু রায় পুরাতন শিশুমঙ্গল ভবনের পূর্ব দিকের এক তলাটি—'প্রতিমা সেন মেমোরিয়েল ওয়ার্ড' নামে উদ্বোধন করেন। কলিকাতার সুধী-সমাজে সুপরিচিত শ্রী জে. কে. বিশ্বাস প্রদত্ত তাঁহার কলিকাতা বাসভবনটির বিক্রয়লব্ধ লক্ষাধিক টাকা তাঁহার একমাত্র স্বর্গতা কন্যার স্মৃতিরক্ষায় নিয়োজিত হইল। এই উদ্বোধন-সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বলরাম-মন্দির (বাগবাজার, কলিকাতা) সাপ্তাহিক ধর্মসভায় আলোচিত বিষয়:

জুলাই: শ্রীরামকৃষ্ণ কথকতা, বাল্মীকি-রামায়ণ, গীতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির কথকতা।

অগষ্ট: শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা, শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম-প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথকতা।

সেপ্টেম্বর: বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বিশ্বসমস্যা, গীতা।

স্বামী পুণ্যানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, স্বামী সাধনানন্দ, বেতার-কথক সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, স্বামী ওঁকারানন্দ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী নির্জরানন্দ, অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী বিভিন্ন দিনে বলেন।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জ: ১৯৩৭ খৃঃ হইতেই রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় ফিজিতে ভারতীয় সন্মার্গ ঐক্য সংঘম্-এর কার্য পরিচালিত হইতেছিল। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে 'নাদি'তে স্থাপিত মিশনের কেন্দ্র ধর্ম ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়মিত কার্যভার গ্রহণ করিয়াছে।

ধর্মের ক্ষেত্রে—প্রার্থনা, ভজন, সাপ্তাহিক গীতা উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি প্রভৃতি উৎসব পালন এই কেন্দ্রের নিয়মিত কর্মসূচী।

শিক্ষার ক্ষেত্রে—সন্মার্গ ঐক্য সংঘম্ কর্তৃক আরব্ধ বিবেকানন্দ হাই স্কুল গত ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে মিশনের পরিচালনায় হস্তান্তরিত হয়, বর্তমানে এখানে ৩২৯ বিদ্যার্থী, তন্মধ্যে ৪৩ জন ছাত্রী; অধিকাংশই ভারতীয় বংশধর, ১২ জন ফিজিয়ান, একজন চীনা। ধর্ম-বিষয়ে ছাত্রেরা যাহাতে উদার ও বিশ্বজনীন ভাব গ্রহণ করিতে পারে তাহার

ব্যবস্থা আছে। 'স্কুল টাইমস্' সাপ্তাহিক পত্রিকায় হিন্দী, ইংরেজী, তামিল, তেলেগু, গুজরাতী, উর্দু ও ফিজিয়ান ভাষার বিভাগ আছে। খৃষ্টমাসের সময় বার্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। কয়েকটি ভারতীয় ও আমেরিকান প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কয়েকজন ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার জন্ম বিদেশে পাঠানো হইয়াছে। ফিজিতে মিশনের তত্ত্বাবধানে ছাত্রাবাস ও পৃথক ছাত্রীনিবাস আছে। ৪০০ সাময়িক পত্রিকা ও ৫০০০ পুস্তক-সম্বলিত একটি গ্রন্থাগার ছাত্রদিগের ও জনসাধারণের পাঠের ক্ষুধা মিটায়।

মিশনের আদর্শানুযায়ী সর্বাঙ্গীণ মানবসেবার উদ্দেশ্যে লাইলেভুর নিকট বিস্তীর্ণ জমি ইজারা লওয়া হইয়াছে। এখানে দুঃস্থ ও পঙ্গুদের সেবা-ভবন, মাতৃমঙ্গল-কেন্দ্র (শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী-স্মৃতিভবন) প্রভৃতি নির্মিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ

বিজ্ঞান: ভাইরাস্

সম্প্রতি ইনফ্লুএঞ্জা রোগ সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ইহার প্রতিষেধক নির্ণয়ে বহু বৈজ্ঞানিক রত। এ রোগের মূল কারণ এক অতি ক্ষুদ্র জীবাণু, যাহা সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় না,—যেমন দেখা যায় "ব্যাকটিরিয়া"। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "ভাইরাস"।

গলনালীর অসুখ, পলিও রোগ, বসন্ত, এমনকি এক প্রকার ক্যান্সার রোগও ভাইরাস্ হইতে জাত হয়। ভাইরাস গরুর মুখে ও পায়ে ক্ষত উৎপন্ন করে। উদ্ভিদের নানা প্রকার রোগও ভাইরাস হইতে হয়, পাতা বা কাণ্ডের বিচিত্র গঠনে তাহা বুঝা যায়; ইহার জন্ম কখন কখনও বহু বৃক্ষ ধ্বংস হয়। পোকা-মাকড় এমনকি "ব্যাকটিরিয়া"র ভিতরেও ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি হয়।

তামাক পাতায় এক প্রকার চাকা চাকা রোগের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়াই ৬০ বৎসর পূর্বে ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহারা অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না, বা সাধারণ পদার্থের সাহায্যে পুষ্টিলাভ বা বংশবৃদ্ধি করে না। সে জন্ম ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বিশ বৎসর পূর্বে ইহাকে স্ফটিকীকরণের জন্ম একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক নোবেল পুরস্কার পান।

বর্তমানে ইলেকট্রন মাইক্রসকোপ (ইহাতে আলোকরশ্মির পরিবর্তে ইলেকট্রন অর্থাৎ বিদ্যুৎকণা-রশ্মি ব্যবহার করা হয়) আবিষ্কারে এক সেন্টি-মিটারের এক কোটী ভাগের দুইভাগ পর্যন্ত দূরত্ব বিশ্লেষণ করা যায় ও ক্ষুদ্র বস্তুকে ৪০,০০০ গুণ বর্ধিত করিয়া দেখা যায়। এই যন্ত্রের ও এক্স্-রে যন্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়াছে যে ভাইরাস লাঠি, বল বা অন্ত কোনরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট হয় ও উহার মধ্যে সুতার মত সরু একটি পদার্থ আছে লাঠিগুলি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে প্রায় এক সেন্টিমিটারের এক কোটীভাগের ১৫ ও ৭ ভাগ, ও মধ্যের গর্তটি ৩ ভাগ। ভাইরাসের উপরিভাগ প্রোটিন দ্বারা গঠিত ও ভিতরের সুতার মত পদার্থটি nucleic acid (নিউক্লিক এসিড)।

ভাইরাসের সুতার মত পদার্থটি অন্ত কোন কোষের মধ্যে ঢুকিয়া প্রোটিন সংগ্রহ করে ও ঐ নূতন প্রোটিন আবার nucleic acid (এসিড) তৈরী করে, ফলে নূতন ভাইরাস সৃষ্টি হয়, এই ভাবে বংশবৃদ্ধি হয়। কিন্তু ঐ প্রতিপালক কোষটির তারতম্যে ভাইরাস প্রকৃতির সামান্ত পরিবর্তন প্রায়ই

লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যৎ বংশধরগুলি কখনও অতিমাত্রায় ক্ষতিকারক হয়, বর্তমান ইনফ্লুএঞ্জা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির ইহাই কারণ। আবার কখনও নূতন ভাইরাসগুলির ক্ষতি-প্রবণতা লোপ পায়।

ভাইরাস রোগের প্রতিষেধক অন্বেষণে ঐ দ্বিতীয় ধর্মই কাজ লাগানো হয়। Benzimidole নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ ইনফ্লুএঞ্জা ভাইরাসের ক্ষতিপ্রবণ বংশবৃদ্ধি বন্ধ করে বলিয়া জানা গিয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন ভাইরাস রোগের প্রতিষেধক নিরূপণ এখন আর সুদূর-পরাহত নহে।

(Science & Culture, July 1957)

রায়পুর (মধ্যপ্রদেশ)—জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ ছাত্রদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আচরিত উদার ধর্মনীতি প্রচারকল্পে গত ৩০শে জুন রায়পুর দাগা বিল্ডিংএ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে; প্রত্যহ প্রার্থনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কাজের সূত্রপাত হইয়াছে। সম্প্রতি ১৮, ১৯, ২০শে সেপ্টেম্বরে দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ইংরেজীতে ও নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী ব্যোমরূপানন্দজী হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী, শিক্ষার উদ্দেশ্য, উপনিষদ ও গীতার মর্মকথা—প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজে প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছেন। সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য স্বামীজীর বাল্যস্মৃতি-বিজড়িত রায়পুরে একটি আশ্রম স্থাপন করা। বিজ্ঞান কলেজের নিকটে নামমাত্র খাজনায় ৫।৬ একর সরকারী জমি পাইবার আশা আছে, সহৃদয় জনসাধারণকেও এতদুদ্দেশ্যে সাহায্য করিবার জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে।

আজমীর (রাজস্থান)—গত ১০ই আশ্বিন আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দের মর্মর-মূর্তির অনাবরণ-কার্য রাজস্থানের রাজ্যপাল শ্রীগুরুমুখ নিহাল সিংহ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গণ্যমান্য বহু ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। স্থানীয় সরকারী অন্ধ-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ভজন-গান করেন। আশ্রম-সেবক স্বামী আদিভবানন্দ তাঁহার 'স্বাগত' অভিভাষণে বলেন—আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ১৯৪৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজস্থানে সাধ্যমত স্বামীজীর ভাবপ্রচার ও সেবাকার্য করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী রাজ্যপাল মহোদয় তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় বলেন, জগৎ-সভায় ভারতের মানমর্যাদা স্বামীজীই রক্ষা করিয়াছেন। বিবেকানন্দ-সাহিত্য ভারতবাসীর অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

উদ্বোধন

মায়ের স্বরূপ

ভবানী ভাবনাগম্যা ভবারণ্য-কুঠারিকা।
ভদ্রপ্রিয়া ভদ্রমূর্তির্ভক্তসৌভাগ্যদায়িনী ॥

ভক্তিপ্রিয়া ভক্তিগম্যা ভক্তিবশ্যা ভয়াপহা।
শাম্ভবী শারদারাধ্যা শর্বাণী শর্মদায়িনী ॥

শাংকরী শ্রীকরী সাধ্বী শরচ্চন্দ্রনিভাননা।
শাতোদরী শান্তিমতী নিরাধারা নিরঞ্জনা ॥

নিত্যমুক্তা নির্বিকারা নিষ্প্রপঞ্চা নিরাশ্রয়া।
নিত্যশুদ্ধা নিত্যবুদ্ধা নিরবদ্যা নিরন্তরা ॥

(ললিতাসহস্রনাম, তৃতীয়া কলা, ১২।১৩।১৪।১৬)

সৃষ্টির আবির্ভূতা সনাতনী শক্তি ভবানী সুগভীর-ধ্যান-শুদ্ধ হৃদয়েই প্রতিফলিতা, সাধক-চিত্তে সংসার-বাসনার অরণ্য ছেদন করিতে তিনি জ্ঞান-কুঠারসদৃশা। সেই শিবপ্রিয়া দেবী মঙ্গলময়ী, মঙ্গলমূর্তি, প্রণত ভক্তের সর্বসৌভাগ্যদায়িনী ॥

ভক্তিই তাঁহার একান্ত প্রিয়, ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়, শরণাগত ভক্তের তিনি আয়ত্তাগতা, সর্বপ্রকার ভয় তাঁহার স্মরণে মননে বিদূরিত, শান্তস্বরূপ শিবের শক্তি সেই শারদা সকলের আরাধ্যা, স্থাণুভূত শর্বের শক্তি স্থিতিরূপা পালনপরায়ণা শর্বাণী আমাদের সুখদায়িনী ॥

তিনি শংকরের শক্তি, বিষ্ণুরও শক্তি—শান্তি ও সৌভাগ্যদায়িনী ; তিনি সতীশিরোমণি, শরচ্চন্দ্রের মতো কৌমুদীশুভ্র আননযুক্তা, সুখদুঃখের অতীতা তিনি শান্তা, শান্তিময়ী ; তিনি জগতের আধারস্বরূপা, তাঁহার আর কোন আধার নাই ; জগৎ তাঁহা হইতে ব্যক্ত হইয়াছে, তিনি অব্যক্তা—নিরঞ্জনা ॥

তাঁহাকে কখনও কোন কিছু বন্ধন করিতে পারে না, তিনি নিত্যমুক্তা ; সেই মহাপ্রকৃতির স্বরূপতঃ কোন বিকৃতি নাই ; জগৎপ্রপঞ্চ—সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের মতো—তাঁহারই আশ্রয়ে ভাসমান, কিন্তু তিনি নিরাশ্রয়া।. তিনি নিত্যশুদ্ধা, নিত্যবুদ্ধা,—অতুলনীয়া—সর্বব্যাপিনী ॥

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা

আধুনিক রাষ্ট্রনীতির অভিধানে 'ধর্ম' কথাটির অর্থ সাম্প্রদায়িকতা (Communalism)। এই প্রকার মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া জনৈক মনীষী বলিয়াছেন: ঐ অভিধানে 'সাহিত্যে'র অর্থ সাংবাদিকতা (Journalism), 'বিজ্ঞানে'র অর্থ যান্ত্রিকতা (Technology), 'কৃষ্টি'র অর্থ নৃত্যনাটক (Dance-drama)।

সত্যসত্যই চোখে পড়িল: একটি প্রসিদ্ধ প্রকাশক-প্রণীত 'সাধারণ জ্ঞানে'র পুস্তকে 'Facts about India' (ভারতবিষয়ক তথ্য)-অধ্যায়ে Indian culture (ভারতকৃষ্টি) শীর্ষকে প্রথমেই লিখিত—ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত, তারপর যন্ত্রসঙ্গীত; অতঃপর ভারতীয় নৃত্যকলা: ভারতনাটাম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী' ভারতীয় কৃষ্টি শেষ!!

কৃষ্টি যেখানে নৃত্যগীতে পর্যবসিত সেখানে যে বিজ্ঞান বলিতে যন্ত্রপাতি, সাহিত্য বলিতে সংবাদপত্র বুঝাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? আর সেখানে 'ধর্ম কি বা কেন?' —এত বুঝিবার সময় বা সামর্থ্য কোথায়? সেখানে ধর্মসম্মেলনের আলোচ্য বিষয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশ্বশান্তি, নিরামিষাহার, সমাজনীতি বা জাতিভেদ দূরীকরণের প্রস্তাব।

* * *

এরিষ্টটল বলিয়াছেন: মানুষ রাষ্ট্রনৈতিক প্রাণী! যুক্তি তাহার পথ-নির্ণায়ক। যুক্তির বাহিরে কিছু অনুসরণ করিলে তাহার অবনতি হইবে। যুক্তি-বিরোধী সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি যাহা মানুষের মনকে চালিত করে তাহা ধর্ম-বিশ্বাস!

রাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা ধর্মনীতিই আজ পর্যন্ত মানুষকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছে। মধ্যযুগীয় ইওরোপে ধর্মগুরু শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষাতেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। যুক্তিবাদীরা ইহা মানিতে পারে নাই বলিয়াই নবজাগরণের আন্দোলন (Renaissance), নূতন আধুনিক সমাজবোধের সূত্রপাত। তখন ধর্ম ছিল রাজনীতির অভিভাবক, এখন যুক্তি ও বিজ্ঞানপুষ্ট রাজনীতি সাবালক হইয়া ধর্মকে রাষ্ট্র হইতে নির্বাসনে পাঠাইতে প্রয়াসী।

যে কোন কারণেই হউক ধর্মকে যাঁহারা মানবজীবনে অনাবশ্যক বলিয়া, উন্নতি পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন—তাঁহাদেরও চিন্তার একটা ধারা আছে, হইতে পারে তাহা ভুল। তাঁহাদেরও যুক্তির একটা শৃঙ্খলা আছে, হইতে পারে তাহা দুর্বল। তাঁহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব ইহা গতিশীল মানুষের পায়ে নিগড়স্বরূপ, ইহা মানুষকে রক্ষণশীল করে, সর্বদা পিছনে তাকাইতে বলে। বর্তমান যুগ যুক্তির যুগ, মানব-মনের মুক্তির যুগ! প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল পশুপালক কৃষিজীবী কুটির-শিল্পী মানব একদিন সূর্যকে মেঘকে বায়ুকে দেবতা মনে করিয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের সে শৈশবত্ব ঘুচাইয়াছে, অতএব ঐ প্রকার আদিম বিশ্বাস এখন নিষ্প্রয়োজন। রাসেলের কথা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারা বলেন, 'শিল্প-শ্রমিকদের কল্যাণ—প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষের চেষ্টার উপরই বেশি নির্ভর করে, আদিম-প্রথানুসারী অন্যান্য ব্যক্তিদের কথা স্বতন্ত্র।'

আধুনিক রাষ্ট্র—শুধু বহু ধর্মে বিশ্বাসী মানবের বাসভূমিমাত্র নয়, বহু জাতি সমুদ্ভূত ব্যক্তিরও সমাহার। অতএব এরূপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের সংহতি ও কল্যাণের জন্য ধর্ম সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়। ধর্মসম্বন্ধে কথা তুলিলেই তাহা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে পরিণত হইবে। কোন ধর্ম-মতকেই অভ্রান্ত বা পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অতএব রাষ্ট্রের কর্তব্য

মানুষের নৈতিক জীবনের উন্নতির চেষ্টা করা; ব্যক্তিচরিত্রের উন্নতি দ্বারাই সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত মন প্রাচীন দেবতা-বাদে (Theology) বিশ্বাস করিয়া জীবন গঠন করিতে চায় না, সে চায় সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও সহযোগিতা। কর্মের স্বাধীনতা ও সুযোগের সমানতার উপর ভিত্তি করিয়া সে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিতে চায়; বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় অর্থনীতি-চেতন মানুষের সমস্যা-সমাধানে ধর্ম বিফল হইতে বাধ্য। অতএব দেশের জননায়কদের কর্তব্য—সাধু-সন্তের ও ধর্ম-দর্শনের অলস আলোচনায় সময় নষ্ট না করিয়া পূর্বোক্ত নীতি ও চরিত্র-গঠনের উপযোগী সাম্য ও স্বাধীনতা-মূলক সমাজব্যবস্থা-রচনায় মনোনিবেশ করা।

* * *

উপরি-উক্ত চিন্তাধারার সহিত অল্পবিস্তর আমরা সকলেই পরিচিত, যুক্তিবাদী মনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই আমরা ইহা নিঃশব্দে মানিয়া লইতে পারি না, সন্দেহ উত্থাপন করিব, কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরও আশা করিব।

প্রথম প্রশ্ন: মানুষ রাষ্ট্রনীতিক বা আর্থনীতিক প্রাণী—তাহার প্রমাণ কি? যখন রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতি ছিল না তখনও ত মানুষ ছিল, আদিম মানবও ত মানব। সে ক্রমবিকশিত অ্যামিবা, না দেবতাসম্ভব—এ কথার কি শেষ নিষ্পত্তি হইয়াছে?

দ্বিতীয়: 'যুক্তির বাহিরে' হইলেই যে 'যুক্তির বিরোধী' হইবে—ইহা কি অনুভবসিদ্ধ? এমন ত কত সিদ্ধান্তে আমরা সহসা উপনীত হই, পরে যাহা যুক্তি দিয়া বুঝি।

তৃতীয়: মধ্যযুগীয় ইওরোপের ধর্ম এবং যুগে যুগে আচরিত ভারত চীন বা আরবের ধর্ম কি একই প্রকৃতির? একথা কি সত্য নয় যে, ইওরোপ এশিয়া হইতে ধর্ম লইয়াছে এবং এশিয়া ইওরোপ হইতে রাজনীতি ও বিজ্ঞান শিখিতেছে? একে অপরের জিনিসটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই বলিয়াই পরবর্তী কালের বিপর্যয় এবং আধুনিক কালে কৃষ্টির এই সঙ্কট। আমাদের মতে এই সঙ্কট হইতে ত্রাণের উপায়, স্বীয় ভাবের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া অপরের ভাবের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা। এই আদান-প্রদানের সাফল্যের উপরই নির্ভর করিতেছে আগামী যুগের সভ্যতা।

আমরা ভারতের অবস্থা অনুধ্যান করিয়া যদি ভারতের ভূমিতে সাফল্যের নিদর্শন দেখাইতে পারি—তবে তাহাই হইবে বর্তমান যুগের সমগ্র মানবজাতির দিগ্‌দর্শন।

বর্তমান ভারতেও যে কৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা শূন্যতা অনেকের চোখে পড়িতেছে—তাহা সত্য না হইলেও প্রতীয়মান। প্রকৃতপক্ষে ইহা নানাভাব-তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ ভারতীয় মনের স্বধর্মচ্যুতি! আধুনিক বিবিধ পরস্পরবিরোধী মতবাদের ঘূর্ণাবর্তে প্রাচীন ধারাবাহিকতা নষ্ট হইয়াছে। বহুধা-বিভক্ত ভারতের চিন্তাধারায় আজ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সন্দেহই বেশী, প্রাচীন আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিকতা—সাধারণভাবে শ্রদ্ধার বস্তু হইলেও শিক্ষিত ব্যক্তিদের তাহাতে আস্থা নাই। তাহারাই দেশবিদেশে কৃষ্টি-প্রতিনিধিরূপে নিজ নিজ ভাব প্রচার দ্বারা ভারত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতেছে; তাহারা পাশ্চাত্ত্যে ভারতের প্রতিনিধি নয়, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ভারতেই পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির প্রতিধ্বনি!

বর্তমান ভারতে অনবরত যে ভাবের ও কৃষ্টির সংঘর্ষ ঘটিতেছে তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন, ইওরোপ গত চারশত বৎসরে যে পথ অতিক্রম করিয়াছে, ভারত চল্লিশ বৎসরে তাহা অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। সামন্ততন্ত্র (feudal) ও মরমিয়াবাদের (mysticism) সহিত গণতন্ত্র ও যুক্তিবাদ একই রঙ্গমঞ্চে একই

দৃশ্যে আবির্ভূত হইয়া পারস্পরিক সংলাপ দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অধিকাংশ নেতারই বক্তৃতা মাইকের মাধ্যমে জনগণের কানে প্রবেশ করিলেও প্রাণে পঁহুছায় নাই! বিভিন্ন দল ও মতের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা তাহারা বুঝে নাই, আর্থনীতিক উন্নতির প্রতিশ্রুতি তাহাদের ক্ষুধা মিটায় নাই। আধ্যাত্মিকতার হাল ধরিবার কেহ নাই, অর্থনীতির দাঁড়ও সমতালে চলিতেছে না। ভারতের সমস্যা জটিল সন্দেহ নাই, তাহা সমাধানের উপায় ভারতের জনগণের মনের ধারা-বাহিকতাকে উপেক্ষা করিয়া নহে; বহিরাগত জড়বাদ ভিত্তিক কোন মতবাদ সহায়ে নহে—ভারতের মৃত্তিকাজাত আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিক প্রতিভা সহায়ে জনগণের উন্নয়নে যদি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আগাইয়া আসেন—তবেই জাগ্রত জনগণ বর্ধিত গতিবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

এই প্রসঙ্গে শেষ প্রশ্ন: ধর্ম ও আধ্যাত্মিক আদর্শ ব্যতীত কি নৈতিক বা চারিত্রিক উন্নতি সম্ভব? ধর্মকে বাদ দিয়া নৈতিক উন্নতির কথা কল্পনা করার অর্থ শকুন্তলাকে বাদ দিয়া 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নয় কি? ধর্ম বলিতে কি বুঝায়?—কতকগুলি প্রথা? কতকগুলি রীতি? কতকগুলি কথায় বিশ্বাস? ধর্মের এ সংজ্ঞা কে কবে দিল?

আজকাল আর একটি নবতম মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে: 'খৃষ্ট বা বুদ্ধের ধর্ম জানিবার বা মানিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদের নীতি ও মানবতার জন্যই তাঁহাদের মূল্য।' এরূপ মূল্য নিরূপণ মন্দের ভাল, তবে তাঁহাদের ঐ নীতি ও মানবতাই যে ধর্মের ভিত্তি, এইটুকু বুঝিলেই মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন ধর্ম কি করিয়া আসিতেছে? বন্য বর্বর পশু-মানবকে ধর্ম সামাজিক মানবে পরিণত করিয়াছে! মানবের ক্রমবিকাশের প্রধান শক্তি হিসাবে ধর্ম অনস্বীকার্য এক ঐতিহাসিক সত্য। কে বলিয়াছে যে এই মহাশক্তির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে?

ধর্ম ব্যতীত মানুষের বর্তমান সমস্যার সমাধান করিবার শক্তি আর কোন কিছুরই নাই, কারণ ধর্মই মানুষের মনুষ্যত্বের, তথা সমাজের কর্তব্য-বোধের ধারক ও চালক;—মানুষের শরীর মন ও আত্মার—সমগ্র সত্তার স্বাস্থ্য, শক্তি ও শান্তির উৎস এবং আধার। ধর্ম জীবনের ক্রমবিকাশের বিজ্ঞান, এবং প্রকৃত জীবন যাপনের কৌশল। এই বিজ্ঞান ও কৌশলই বংশপরম্পরা বা শিষ্যপরম্পরা আচরিত হইয়া কতকগুলি রীতি ও নীতির আকার ধারণ করিয়া থাকে। পরবর্তীকালে যখন কেহ এগুলি লইয়া তর্ক বিচার করে না, তখন এগুলি প্রথায় পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির মধ্যে উদ্ভূত এই রীতিনীতি বিভিন্ন ধর্মনামে আচরিত হয়, এবং কখনও কোন শক্তিশালী মহাপুরুষ বা সাধকের আবির্ভাব হইলে ঐ ধর্ম নূতন শক্তিলাভ করিয়া বহু মানবকে প্রভাবিত করে এবং দূর দূরান্তরে প্রচারিত হয়। ঐ সাধকের জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র করিয়া যে শক্তি সঞ্চিত হয়—তাহারই আকর্ষণে যাঁহারা আকৃষ্ট হন—তাঁহারাই পরবর্তী-কালে নিজেদের সংঘবদ্ধ করিয়া সেই ধর্ম প্রচার করেন—এই ভাবেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি! সম্প্রদায় বলিতেই আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি সংকীর্ণতা মনে করেন, বস্তুতঃ 'সম্প্রদায়' শব্দের অর্থ গুরুপরম্পরা আগত সদুপদিষ্ট ব্যক্তিসমূহ।

কালক্রমে সাধনবিহীন সম্প্রদায়ে ধর্মান্ধতা, মতবাদের মোহ, 'আমার ধর্মই সত্য, আর সব মিথ্যা' এই সকল সংকীর্ণতা আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজনীতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইবার উদ্দেশ্যে ছলে বলে কৌশলে অপর-ধর্মাবলম্বীকে ধর্মান্তরিত করিয়া স্বীয় দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তিই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জননী,

ইহা কখনই ধর্ম নহে, ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিকৃত অবস্থা! পর্যুষিত পরমান্ন দেখিয়া পরমান্নের প্রকৃত আস্বাদ নির্ণয় করা যায় না।

সাম্প্রদায়িকতা দোষের জন্য ধর্মকে দায়ী করা চলে না, বরং বলা চলে ধর্মের এই বিকৃতির জন্য অসাম্যমূলক সমাজ ও রাজনীতিই দায়ী। বিকৃতি সম্ভব বলিয়া ধর্মকে পরিত্যাগ করা আর পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইবে ভাবিয়া খাদ্যদ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া একই কথা।

ধর্মের উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য সম্প্রদায় প্রয়োজন, কিন্তু তাহাকে সাম্প্রদায়িকতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে ধর্মবিজ্ঞান-লব্ধ কৌশলে। বেদান্তই ধর্মের সেই বিজ্ঞান, যাহার শিক্ষায় আমরা জানিতে পারি 'এক সত্য বহুরূপে প্রতিভাত'— যাহার সহায়ে আমরা বুঝিতে পারি—বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব রহিয়াছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়নিচয় প্রতিটি বিচিত্র—কিন্তু এক প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত! বৈচিত্র্য হইলেই যে সংঘাত অনিবার্য তাহা তো নয়—বিচিত্র সুরের সামঞ্জস্যেই সঙ্গীতের সার্থকতা, বিচিত্র বর্ণের সুষমায় প্রকৃতির সৌন্দর্য, বিচিত্র মানুষের বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়ে—মানব-কৃষ্টির নিত্য নব রূপায়ণ!

অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়

বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় এবং একমাত্র এতেই যে মানুষকে পরিত্রাণ করতে পারে, এই পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার একমত; কিন্তু এতে আবার গোঁড়ামি আসবার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে।

জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু এতে আশঙ্কা এই—পাছে শুষ্ক পাণ্ডিত্যে দাঁড়ায়। ভক্তিও খুব বড় জিনিস, কিন্তু এতে নিরর্থক ভাবপ্রবণতা এসে আসল জিনিসটাই নষ্ট হবার যথেষ্ট ভয় আছে।

এই সবগুলির সামঞ্জস্যই দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এরূপ সমন্বয়পূর্ণ ছিল। কিন্তু এরূপ মহাপুরুষ কালে ভদ্রে জগতে এসে থাকেন, তবে তাঁর জীবন ও উপদেশ আদর্শস্বরূপ সামনে রেখে আমরা এগোতে পারি।

আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে সেই আদর্শে পূর্ণতা লাভ করতে না পারে, তবু আমরা এক একজন জীবনে এক এক ভাবের বিকাশ ক'রে এমন ক'রে তুলতে পারি, যাতে একঘেয়ে ভাবটা দূর হয়, যেন সবগুলি মিলে একটি পূর্ণ জীবন, একজনের যেটা অভাব, যেন অপরের জীবনের দ্বারা তা পূর্ণ হচ্ছে। এতে প্রত্যেকের জীবনে সমন্বয়ভাবের প্রকাশ হ'ল না বটে, কিন্তু এতে কতকগুলি লোকের মধ্যে একটি সমন্বয় হ'ল; আর সেটি অন্যান্য প্রচলিত ধর্মমত হ'তে সুনিশ্চিত উন্নতি সোপানে প্রতিষ্ঠিত,—তাতে সন্দেহ নেই।

কোন ধর্ম যদি মানুষের বা সমাজের জীবনে কিছু কাজ করতে চায়, তাহ'লে তাই নিয়ে একেবারে মেতে যাওয়া দরকার, একথা ঠিক;—কিন্তু যেন উহাতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব না আসে, এটি লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা এই জন্যে একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় হ'তে চাই। সম্প্রদায়ের যে সকল উপকারিতা তাও তাতে পাব, আবার তাতে সার্বভৌম ধর্মের উদার ভাবও থাকবে।

* * *

যাতে উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে—তাই পাপ বা অধর্ম, আর যাতে আদর্শের মত হবার সাহায্য করে, তাই ধর্ম।

—পত্রাংশ, স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাকার্য

রামনাথপুরম্, মাদ্রাজ

আবেদন

জনসাধারণ দুঃখের সহিত অবগত আছেন যে, গত সেপ্টেম্বরের শেষার্ধে মাদ্রাজের রামনাথপুরম্ জেলায় শোচনীয় দাঙ্গার ফলে বহুলোকের প্রাণহানি, বহু গৃহ ও সম্পত্তি দগ্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য ঐ জেলায় কয়েকটি তালুকে জনগণ অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছে।

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের দুইজন সন্ন্যাসী দাঙ্গাবিধ্বস্ত স্থানগুলি পরিদর্শনান্তে দুর্গতসেবার প্রয়োজনবোধে ইতোমধ্যেই মনমাদুরাই নামক স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি সাময়িক কেন্দ্র খুলিয়া সেবাকার্য চালাইতেছেন। যত শীঘ্র সম্ভব অপর বিধ্বস্ত স্থানসমূহেও এই সেবাকার্য বিস্তৃত করা হইবে।

যে সব বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে সেইগুলি পুনরায় তৈয়ারী করিবার জন্য সরঞ্জাম সর্বাগ্রে আবশ্যক। অনেক কাঁচা দেওয়ালের বাড়ী ঠিকই আছে, কিন্তু চাল বা ছাদ সত্বর নির্মিত না হইলে আগতপ্রায় শীতঋতুর বৃষ্টিতে সমস্ত পড়িয়া যাইবে। চালা তৈয়ারীর জন্য যে সমস্ত মালমশলার প্রয়োজন সেগুলি এখনই সরবরাহ করা দরকার। যেখানে গৃহগুলি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে সেখানে সেগুলি পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে প্রয়োজন। উপরন্তু যাহারা সর্বহারা হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে চাল, বস্ত্র ও জীবনধারণোপযোগী অন্যান্য দ্রব্যও দিতে হইবে।

বলা বাহুল্য মিশন-কর্তৃক এই আরব্ধ সেবাকার্যে উপযুক্ত অর্থ আবশ্যক। রিলিফকার্য যত শীঘ্র সম্পাদিত হইবে জনসাধারণের দুর্গতি লাঘব করা ততই সহজ হইবে। আমরা সেই কারণে এই দুর্গত জনগণের নামে সহৃদয় ও বদান্য দেশবাসীর নিকট এই সেবাকার্যে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য আবেদন জানাইতেছি।

যাঁহারা দান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ম্যানেজার, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ-৪, এই ঠিকানায় টাকা পাঠাইলে ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ ও প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, এখানে আমরা কোন জিনিসপত্রের জন্য আবেদন করিতেছি না, উপদ্রুত অঞ্চলের নিকটেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র শীঘ্র ক্রয়ার্থে কেবলমাত্র অর্থ-সাহায্যের জন্যই আবেদন করা হইতেছে।

৭.১০.৫৭
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ-৪
ফোন: ৭১২৩১

নিবেদক—
স্বামী কৈলাসানন্দ
সভাপতি
মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি ২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার।

জেগেছ জগন্মাতা !

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী

পুণ্য তিথির মধুর লগ্নে জেগেছ জগন্মাতা,
লক্ষ কণ্ঠে হতেছে ধ্বনিত তোমার স্তোত্র-গাথা !
শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল-ধ্বনি
পূর্ণ করিছে নিখিল অবনী,
ভক্ত তোমার যাচিছে শরণ, চরণে নোয়ায়ে মাথা !
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, জেগেছ জগন্মাতা !

স্থল-জল-নভ ব্যাপ্ত কবিয়া, জুড়ি' বহিরন্তর,
নামিয়া এসেছ তুমি মা ভদ্রা, বিশ্ব-আঙিনা 'পর !
সব দিকে মাগো, তোমাব প্রকাশ,
আজি চিন্ময় আকাশ-বাতাস,
ঊর্ধ্ব হইতে ঝ'বে ঝ'রে পড়ে অমৃতের নির্ঝর !
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, জুড়ি' বহিরন্তব !

জেগেছ তুমি মা ভূভাব-হাবিণি, আর্ত্তি-নাশিনি শিবে,
করুণা তোমার বিলায়ে দিতেছ নিখিল আর্ত্ত-জীবে !
নিঃস্ব কাঙাল আছে যে যেথায়,
সবারে ডাকিছ—"আয় আয় আয়",
স্নেহ-স্তন্য বক্ষে এনেছ—অধরে ঢালিয়া দিবে !
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, আর্ত্তি-নাশিনি শিবে !

জেগেছ সারদা, বরদা, জ্ঞানদা, শান্তি-শুভংকরি,
তব সুস্মিত-পদ্ম-আননে আনন্দ পড়ে ঝরি !
ছড়ায়ে তোমার অঙ্গের দ্যুতি,
বিশ্বে ভরেছ দিব্য বিভূতি,
অন্তরীক্ষে তোমার চেতনা-দীপ্তি গিয়াছে ভরি' !
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, শান্তি-শুভংকরি !

জেগেছ অপার মমতাময়ি গো, সন্তান-গত-হিয়া,
সুপ্তি-জড়িত তিমির টুটিছ জ্ঞানের আলোক দিয়া!
ব্যাকুল প্রাণের শুনি' ক্রন্দন,
উথলি' উঠিল তোমার বেদন,
এসেছ তাই গো ত্রস্ত-চরণ, দুই বাহু প্রসারিয়া!
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, সন্তান-গত-হিয়া!

জেগেছ ব্রহ্ম-শক্তি-রূপিণি, করুণা-মূর্তিমতি,
সচ্চিদ্-ঘন—আনন্দময়ি, বোধ-নির্মল-জ্যোতি!
সন্তানে দিতে পূত-পদ-ছায়া,
জেগেছ জননি, তুমি মহামায়া,
মানবীর বেশে এসেছ শিবানি, সনাতনি, ভগবতি!
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, করুণা-মূর্তিমতি!

জেগেছ কালিকা, হুতাশ-ভালিকা, শাণিত খড়্গ-পাণি,
জেগেছ বগলা, বলোন্মত্তা, বিদ্যাশক্তি—বাণি!
জেগেছ তুমি মা বিপত্তারিণি,
দুঃখ-বেদনা-বিঘ্ন-বারিণি,
জেগেছ অভয়া, সতত-সদয়া, রাজ-রাজেন্দ্রাণি!
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, পরমা প্রকৃতি, বাণি!

* * *

নবযুগে নবোদ্যমে সনাতনী শক্তি আবার জাগরিতা! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ত্যাগ-তপস্যা ও নিরন্তর সপ্রেমাহ্বানে ইনি প্রবুদ্ধা হইয়াছেন এবং নরদেব শ্রীবিবেকানন্দের গুরুগত-প্রাণতায় প্রসন্ন হইয়া পরমকল্যাণে নিযুক্তা হইয়াছেন!

অতএব সমগ্র ভারত এবং কালে সমগ্র পৃথিবীও যে ইঁহার পবিত্র স্পর্শে নবভাবে পূর্ণা হইয়া একদিন কৃতার্থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ব্রহ্মসত্তাবে ব্রহ্মশক্তি সর্বদা অমোঘ, অবিনাশী,—সর্বান্তর্নিহিত থাকিয়া সর্বদা সকলের নিয়মনকারী।

আবার জগতে নবপ্রবোধিতা শক্তির পূজা প্রসারিত হইবে! আবার ভারত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সনাতনী ব্রহ্মশক্তির পূজা করিয়া নিজে ধন্য হইবে এবং অপরকে ধন্য করিবে!

—স্বামী সারদানন্দ

শান্তির উপায়*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

'মন ধোবাঘরের কাপড়—যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙে ছুপবে।'

একটা ঘটনা বলি। নিজের জীবনের কথা, বয়স তখন বছর বার। স্কুলের ছুটি। পূজায় শহর ছেড়ে বাড়ী এসেছি। বাড়ীতে মার পূজা। বিজয়ার দিন প্রতিমার সঙ্গে চলেছি, সমবয়সী বহু ছেলেও যাচ্ছে। পাড়াগাঁর রাস্তা একে সরু, তার ওপর জল কাদা, কাজেই সব খালি পা। হঠাৎ পায়ে কি একটা কামড় দিলে। জ্বালাও খুব শুরু হ'ল। মশালধারী একজনকে ডাকলাম। আলোতে দেখি রক্ত বেরুচ্ছে একটু একটু। এমনি মন—ধারণা হ'ল, নিশ্চয় সাপে কামড়েছে। পরক্ষণে মনে হ'ল, ওটা নিশ্চয় বিষাক্ত সাপই হবে। মনের ক্রিয়া আরম্ভ হ'য়ে গেল। মনটা ক্ষততেই পড়ে রইল। যত ভাবি, ততই দেহ অবসন্ন হয়। ঐ তো অবস্থা। সঙ্গের লোকজনদের কিন্তু কিছু বললাম না—আনন্দের ভেতর তাদের নিরানন্দ করতে চাইলাম না। এক বন্ধুর গায়ে ভর দিয়ে অবসন্ন মনে দেহকে কোনও রকমে নিয়ে তুললাম গাঁয়ের একমাত্র রোজার কাছে। মনে হ'তে লাগল চৌদ্দ আনা শক্তি অন্তর্হিত—অন্তিমকাল আসন্ন। রোজা তখন ঘুমোচ্ছে—ডেকে তোলা হ'ল। সে এসে দাওয়ায় আঁকজোক এবং মন্তর টন্তর শুরু ক'রে দিলে। যেটুকু জ্ঞান আছে, তাতে সবই দেখছি ও শুনছি। একটা থমথমে ভাব। ক্ষতের কারণ রোজা কি বলে, সেই দিকেই সবার মন। সে শুনে বললে,—'কৈ সাপের কামড় ব'লে তো মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, আবার ভাল ক'রে দেখি।' আবার আরো কত আঁকজোক এবং মন্তর টন্তর পড়া চললো। আমিও আশা-ভয়মিশ্রিত ক্ষীণ আনন্দে দেখছি ও শুনে চলেছি। কিছুক্ষণ পরে দেখি অজান্তে কখন একটু উঠে বসেছি, খানিকটা বলও যেন শরীরে এসেছে। মনে হচ্ছে ওটা তো পোকা-মাকড় হ'তে পারে? রোজা কাজ শেষ ক'রে বললে, 'না, ওটা সাপের কামড় মোটেই নয়—অন্য কোন পোকা-মাকড়ের কামড়ই হবে। ও কিচ্ছু না।' ওর কথা শুনে মন খুশিতে ভরে গেল এবং ফেলে-আসা দলের সঙ্গে মেশার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। উঠে পড়লাম। আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম—একেবারে পাড়ি দিলাম পুকুরধারে মার প্রতিমা বিসর্জনের আনন্দ আস্বাদন করতে।

দেখ দেখি—কতকগুলি প্রতিকূল চিন্তা মনটায় এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করলে যে দেহের মধ্যে স্নায়বিক নিষ্ক্রিয়তা এনে দিলে এবং দেহকে ধরাশায়ী ক'রে দিলে। পরক্ষণে চিন্তাধারা বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে এমন এক অনুকূল আব-হাওয়ার সৃষ্টি হ'ল যে, দেহের স্নায়ুগুলি সজীব ও সতেজ হ'য়ে উঠল—দেহ সুস্থ ও সবল ক'রে দিলে। এই চিন্তাধারাগুলিই তো রঙ—যে রঙে যেমনি ভাবে মন রাঙাও।

মনটাই তো সব। মনেতেই সব। ত্যাগও মনে, গ্রহণও মনে। ঠাকুর বলতেন, জনক রাজা একসঙ্গে দুখানা তরবারি ঘুরাতেন। সংসারী হয়েও ত্যাগী ছিলেন তিনি। সংসারে সব কাজ করবে, কিন্তু মনটা রাখবে আড়ায়—কচ্ছপের মত।

কত উপদেশই না ঠাকুর দিয়েছেন! তেল

* রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ২০-৮-৫৭ তারিখে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত, ধর্মপ্রসঙ্গ শ্রীশচীন্দ্র নাথ শীল কর্তৃক অনুলিখিত।

মেখে কাঁঠাল ভাঙতে বলেছেন। তাঁর দিকে মন রেখে সংসার করলে সংসারে আসক্তিরূপ আঠা লাগবে না।

সংসারের অবস্থা কি দেখ। পাওয়ার জন্য কত চেষ্টা। মান, যশ, ঐশ্বর্য—আরও কত কিছুর পেছনে কি ছুটোছুটি। দেখছ না, লোকে কি এক নিবিষ্ট মন দেয় মাছ ধরার সময় ফাতনার দিকে। পাশ দিয়ে হয়তো একটা বাজনা বাদ্দি ক'রে বর গেল, হয়তো বা কেউ এসে কত প্রশ্ন ক'রে নিরুত্তর দেখে চলে গেল। সে জানতেও পারলে না এ সব। কী একাগ্রতা! এই একাগ্রতা তো বহু জিনিসের ওপর দিচ্ছে লোকে। এটা তো বিরল নয়। যে মনটাকে বিক্ষিপ্ত ক'রে বহু জিনিসে রেখেছ সেই মনটাকেই তো নিবিষ্ট করছ বিশেষ একটা বস্তু লাভের জন্য। একাগ্রতার ফল আছেই। ঐ ফল লাভেই কত আনন্দ। এ আনন্দ কত দিনের জন্য? এ পাওয়া তো ক্ষণিকের পাওয়া।

মনটাকে বাহিরের জিনিস থেকে কুড়িয়ে ভেতরে আনো দেখি? হৃদয়ে যিনি চিরবিরাজমান, সেই দেবতাকে নিবিষ্টভাবে চিন্তা কর দেখি। ঐ দিকে মনকে একাগ্র কর দেখি। মনকে এই ভাবে ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত করাই যোগ।

'ত্যাগ' কথাটির তাৎপর্য কি? 'গ্রহণ' কথার সঙ্গে 'ত্যাগ' কথাটি না নিলে 'ত্যাগ' কথার অর্থ ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা যাবে না। একদিকে গ্রহণ, আর একদিকে ত্যাগ। পূব দিকে যত এগোবে, পশ্চিম দিক ততটা পিছিয়ে যাবে।

জীবনে ত্যাগ তো সব সময়েই করতে হচ্ছে। ছোটকে ত্যাগ ক'রে বড়কে গ্রহণ তো করছ-ই। দুঃখকে ত্যাগ ক'রে সুখকে গ্রহণ করার চেষ্টা তো প্রতিনিয়ত চলছে। পরম সুখ চাও তো মিথ্যাকে ত্যাগ কর, সত্যকে গ্রহণ কর। পাপকে ত্যাগ কর, পুণ্যকে গ্রহণ কর। মন্দকে ত্যাগ কর, ভালোকে গ্রহণ কর। অসৎকে ত্যাগ কর, সৎকে গ্রহণ কর। তবে সাবধান। ঘৃণার পাত্র যেন কেউ না হয়। ঘৃণা কাকে করবে? তুমি তার কতটুকু জান? তার কোটী কোটী পূর্ব জন্মের হিসাব কি তোমার জানা আছে? জগাই-মাধাইকে মহাপ্রভু কি ক'রে গেলেন? বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণির কথা ভাব—তার কথা তার প্রেমাস্পদকে কি ভাবে ফেরাল। মা বলতেন—কীটপতঙ্গকে পর্যন্ত ঘৃণা করতে নেই। কি তাঁর শিক্ষা! তুলসীদাসের কথা ভাব দেখি! পত্নীর প্রতি কী তার আকর্ষণ। কিন্তু যখন পত্নীর মুখ দিয়ে ভর্ৎসনা-বাক্য বেরিয়ে এল, তখন তুলসীদাসের মনে ধিক্কার এল—জীবনের মোড় ফিরে গেল। পত্নী তার গুরুর কাজ করলে। তুলসীদাস তাঁর প্রেমের ভাণ্ডার উজাড় ক'রে দিলে পরম প্রেমময়ের শ্রীচরণে।

মন বড় চঞ্চল। মনের ধর্মই ছুটোছুটি করা। 'জরু, জমি ও টাকা'—এ সবে তো মনকে বন্ধক দিয়েছ। ও সব থেকে মনকে ওঠানো কি সহজ ব্যাপার? ঠাকুরের পাদপদ্ম পেতে হ'লে—আনন্দের খনিতে যেতে হ'লে তা করতেই হবে। কিভাবে হবে? গীতা বলেছেন, 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।' সৎ-অসৎ বিচার ক'রে তম ও রজ পার হ'তে হবে। যত অভ্যাস করবে তত এগোবে। ক্রমশঃ সত্ত্ব, শুদ্ধ সত্ত্ব এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বের অবস্থায় আসবে। এই তপস্যা।

তপস্যা কি? উপোস করাই কি তপস্যা? শুধু দেহের নিগ্রহই কি তপস্যা? তপস্যা ওকে বলে না। বুদ্ধদেব এমনই অনশন আরম্ভ করেছিলেন যে, তাঁকে অস্থিচর্মসার হ'তে হয়েছিল। এত দুর্বল হ'য়ে পড়েছিলেন যে একদিন চলতে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি ভুল পথে চলেছেন। তখন তিনি পরিমিত আহার শুরু করলেন। বীণার তার পরিমিতভাবে বাঁধা থাকলেই শ্রুতিমধুর সুর ঝঙ্কৃত

হয়। বেশী আলগা হলেও বেসুরো, বেশী টান হলেও বেসুরো। গীতায় বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ :

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

সব কিছু পরিমিত চাই। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ করার অভ্যাসই তপস্যা।

গীতা, চণ্ডী, উপনিষৎ প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থপাঠ, সাধুসঙ্গ, সাধুমুখে উপদেশ শ্রবণ—সবই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের সহায়ক। শুধু পাণ্ডিত্যে হবে না।

একটা গল্প বলি। ষড়দর্শনে বিশারদ এক পণ্ডিত ছিলেন। সব জানা সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না। শান্তি না পেয়ে এক সাধুর উপদেশপ্রার্থী হলেন। সাধুজী তাঁকে আশ্রম-সংলগ্ন পুকুরে স্নান ক'রে আসতে বললেন। স্নানের পূর্বে তিনি একটি বড় মাছকে পুকুরে ভাসতে দেখলেন। মাছ পণ্ডিতজীকে বললে—'শুনেছি তুমি বড় পণ্ডিত—বলতে পার কি, কিসে আমার পিপাসা দূর হয়?' পণ্ডিতজী দুই কারণে আশ্চর্যান্বিত হলেন। প্রথমতঃ তাঁর মনে হ'ল মাছ কি ক'রে কথা বলছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি আরও বিস্মিত হলেন এই ভেবে—মাছ সর্বদা জলে বাস করে, তবুও তার পিপাসা মেটে না কেন? কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে তিনি কারণ বুঝতে পারলেন এবং মাছকে বললেন, 'তুমি যদিও জলেই বাস কর এবং সতত জলপান কর, কিন্তু তবু সব জল তোমার মুখ দিয়ে ঢুকে কানের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। এবার তুমি জল মুখে নিয়েই উলটে যাও। তাহ'লে তোমার পিপাসার নিবৃত্তি হবে। সব জল বেরিয়ে যায় বলেই তোমার পিপাসা দূর হয় না।' মাছটি তখন পণ্ডিতকে বললে, 'আমারও তোমার প্রতি এই উপদেশ। তুমিও উলটু (উলটে) যাও।' ফিরে এসে পণ্ডিতজী সাধুকে সব ঘটনা বললেন। সাধুজী মৃদুহাস্যে বললেন, 'আমি মৎস্যরূপে তোমায় ঐ উপদেশ দিয়েছি। যদিও তুমি বই-পড়া জ্ঞানের সাগরে ডুবে আছ, তথাপি তোমার তৃষ্ণার নিবারণ হচ্ছে না। মনে শান্তি পাচ্ছ না, তার কারণ তোমার বিদ্যা পরিপক্ব হয় নাই। সব যদি বের হয়েই যায়, তবে কাজ হবে কিরূপে? ভিতরে গ্রহণ ক'রে অনবরত মনন করতে হয়, মনন ব্যতীত ধারণা হয় না। তাছাড়া, অধিক বিদ্যালাভ হওয়ায় তোমার মনে অহঙ্কার জন্মেছে। আত্মম্ভরিতা ও মমত্ববুদ্ধি—এই দুইটি আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ অন্তরায়। এই দুটিই তোমার অশান্তির কারণ। সুতরাং এদের ত্যাগ করা প্রয়োজন। এই কারণেই তোমাকে আমার উপদেশ—'তুমি উলটু (উল্‌টে) যাও'।

তাই বলি একবার উলটে যাও দেখি! কত বই পড়েছ, কত উপদেশ শুনছ ও শুনেছ। মনে মনে শ্রুত এবং অধীত বিষয়ের চিন্তা কর। একেই বলে মনন। মনন না হ'লে ধ্যান কি ক'রে হবে? রসে না ডুবলে 'রসো বৈ সঃ'-কে কেমন ক'রে পাবে? তাই বলি রসস্বরূপকে পেতে হ'লে তুমি রসপিপাসু হও।

এ জন্মে যা কিছু করছ তা পুরুষকার; পূর্ব পূর্ব জন্মে যা করেছ, তা তোমাদের সংস্কার। এ জন্মের সুখ ও দুঃখ পূর্ব জন্মের সংস্কারের ফল। শুধু পুরুষকার ও সুসংস্কার দিয়েই তাঁকে পাবে না। শুভ কর্মের অনুষ্ঠান ক'রে শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। মনটাকে শুচিশুভ্র ক'রে না তুললে মনোমন্দিরে মাধব অধিষ্ঠিত হবেন না। শাঁখ বাজিয়ে শুধু গোল বাঁধানই সার হবে।

তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন কর। মহাপুরুষ ও অবতারপুরুষগণ তো পথ দেখানোর জন্যই আবির্ভূত হন।

তাই বলি, প্রীতি দিয়ে তাঁর পূজা কর। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাক—কেঁদে ভাসিয়ে দাও। নামে মাতো, আর মাতাও। তাঁর কৃপা হবেই হবে। বিশ্বাস কর। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে ঝাঁপ দাও। শুভ্র জ্যোতির্ময় তাঁর মূর্তি হৃদয়ে উদ্ভাসিত দেখতে পাবে।

মা সারদা

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সারদামণি, সারদামণি, সারদামণি মা।
গৃহিণী, তবু সন্ন্যাসিনী, নাহি যে উপমা।
জ্ঞানদা, জ্ঞান-বিভূতি জ্যোতি,
মূরতিমতী সাধ্বী সতী,
ভকতি-ধারে গঙ্গা তুমি,
প্রেমেরি যমুনা।
সারদামণি মা।

গোলোকে কি মা লক্ষ্মী ছিলে?
ত্রেতাতে সীতা রূপটি নিলে,
দ্বাপরে হ'লে শ্রীরাধা তুমি
গোপেরি ললনা।
সারদামণি মা।

কলিতে হ'লে বিষ্ণুপ্রিয়া নদীয়া ধামেতে,
এবারে তুমি এলে কি মাগো সারদা নামেতে?
আঁখি যার আছে চিনেছে তোমা,
লক্ষ্মী তুমি হ্লাদিনী গো মা,
কত যে রূপে, কত যে সাজে
করিছ করুণা,
সারদামণি মা।

বিভব সব লুকায়ে মা গো নিজেরি মাঝেতে
জগতে তুমি শিক্ষা দিলে যোগিনী সাজেতে।
শিখালে সংযমের সাথে
বাঁধিতে সব কঠোর হাতে,
শিখালে তুমি নারীতে আছে
কি মহাচেতনা।
সারদামণি মা।

শিখালে তুমি জগতজনে আপন করিতে,
শিখালে তুমি সবার হৃদি প্রেমেতে ভরিতে।
যাওনি কভু সুখের পাছে,
দেখালে দুখে কি সোনা আছে,
চাওনি তুমি 'মায়ের' কাছে
লঘিমা, অণিমা!
সারদামণি মা।

তোমারে নমি ভকতি-খনি, সারদামণি মা
নমি মা নারী-মুকুট-মণি লক্ষ্মী-স্বরূপা।
গৃহিণী-রূপা সন্ন্যাসিনী,
স্নিগ্ধ-স্নেহ-মন্দাকিনী
বহালে তুমি জগতজনে
করিতে করুণা।
সারদামণি মা।

নমি মা মহাশক্তি, মহাভক্তি-স্বরূপা।
নমি মা স্নেহ-পয়োধি-ঘন-মূর্তি অরূপা।
তোমারি পূত চরণ-পাতে
লভিল ধরা আশিস্ মাথে
দুঃখী-দীন-শরণ তুমি
করুণাখনি মা,
সারদামণি মা।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতি

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর

স্মরণের মণিমঞ্জুষায় মাত্র গুটিকত রত্ন সযত্নে রক্ষিত ছিল। ক্লান্ত দিনের শেষে কুলাযে ফিরে আসা মন নিয়ে নিভৃত মন্দিরে ব'সে তাই দেখছিলাম—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পবিত্র গুটিকত স্মৃতিকথা, অল্প কযেক দিনের পরিচযে যা আমার জীবনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছিল।

প্রথম যেদিন গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই আমার নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে, সে কি আগ্রহ—সে কি উদ্বেগ নিয়ে সেদিন বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম, ভাষাতীত সে অনুভূতি! দেখলাম যেন হিমাচলেরই নিভৃত এক অংশে স্থিত প্রশান্ত গম্ভীর এক বিরাট মূর্তি। ঘরে গিয়ে প্রণাম করতে তিনি বললেন, 'বসুন'। বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে আমরা তাঁর দিকে চেয়ে বসে রইলাম। কোন কথা মুখে এল না।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথা থেকে আসছেন?' বললাম, 'বালিগঞ্জ থেকে।' তারপর কিছুক্ষণ সবাই চুপ। মনের মধ্যে কি এক অভূতপূর্ব পবিত্র নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল।

আমাদের মনের ইচ্ছার কথা বোধহয় আগেই শুনেছিলেন, কিংবা বুঝতে পেরেছিলেন; আমাদের আগ্রহান্বিত অবস্থা দেখে সহসা নিজেই বললেন, 'শুধু মন্তোর নিলে হবে না, সেই রকম কাজ করতে হবে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'পবিত্র হতে হবে।'

আবার নিস্তব্ধ হ'য়ে আমরা ব'সে আছি। তিনি সেই ঘরে তাঁর সেবককে বললেন, 'এঁরা কবে আসবেন একটা দিন বলে দাও।'

সেবক দিন স্থির ক'রে সেই তারিখ আমাদের বলে দিলেন। আমরা আবার প্রণাম ক'রে উঠছি, এমন সময় আবার বললেন, 'সাবধান হ'য়ে আসবেন যেন, অতদূর থেকে আসবেন।'

সেবক বললেন, 'আজকাল আসবার কিছু অসুবিধা নেই, সোজা বাস হয়েছে।' তখন বালিগঞ্জ থেকে হাওড়া পর্যন্ত প্রথম বাস চলাচল আরম্ভ হয়েছিল।

গুরুদেব তখনি উত্তর দিলেন, 'বাস হলেই তো হয় না, অতদূর থেকে আসা, একবার ওঠা, একবার নামা।'

অভিভূত মনে আমরা ঘর থেকে বিদায় নিলাম। জানা নেই, চেনা নেই, আলাপ নেই তাদেরই প্রতি এই অহেতুকী দরদ,—উদয়াস্ত নিজের কথা-ভাবা মানুষ আমরা ভাবতে পারিনে। কোন লোককে কাজে পাঠিয়েছি, ফিরে আসতে তার দেরি হ'লে বিরক্ত হ'য়ে কত কটূক্তি করি। মনে আসে না, তার কিছু অসুবিধা হয়েছিল কি না। আর আমাদেরই প্রয়োজনে আমরা যাব, তাতে তাঁর চিন্তা হচ্ছিল, ব্যাকুল মন নিয়ে ভাবছিলেন, অতদূর থেকে যেতে বাসে একবার ওঠা, একবার নামা, কোন দুর্ঘটনা না ঘটে—বললেন, 'সাবধানে আসবেন'। সেই দিনই ধারণা হ'য়ে গেল ওই হিমাচল-সদৃশ বহিঃকঠোর মূর্তির মধ্যে কি পরিমাণ স্নেহপ্রেমের মন্দাকিনী ব'য়ে চলেছে।

জানি এই অপরের কথা ভাববার স্বতঃস্ফূর্ত কল্যাণ-প্রেরণা থেকেই বিশ্বসৃষ্টির আদিম কাল থেকে জীবকুল পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে, মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত হয়েছে। তবু সম্যক ধারণা করতে পারলাম কি? যাঁর অংশ-প্রসূত এই বিরাট হৃদয়াধার, সমগ্র হিমালয়রূপী সেই বিশাল মহামানবটি কেমন ছিলেন। কি এক অপূর্ব পুলকের আবেগে চোখে জল এসে গেল।

আগুনের তাপে ফুটন্ত জলের ময়লা উপরে ভেসে ওঠে। গুরুদেবের সান্নিধ্যে যাওয়া আসা

করি, আর চঞ্চল মনে কত দ্বন্দ্ব, কত প্রশ্ন বিগত দিনের জানা-অজানা কত ভুল ত্রুটির বেদনা সমস্ত চিত্ত জুড়ে আলোড়িত হ'তে থাকে। মনে হয় মন উজাড় ক'রে সব কথা বলি, প্রশ্ন করি। যখন যাই, তখন প্রশান্ত গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে যাই, কিছু আর বলা হয় না। তা-ছাড়া বেলুড় মঠে তখন অসম্ভব ভিড় হ'ত গুরুদেবকে দর্শনের জন্ম। কথা বলবার সময়ও পাওয়া যেত না। শুধু অভূতপূর্ব এক ভাব-সম্ভারে মন পরিপূর্ণ ক'রে ফিরে আসতাম।

একদিন ঐ কথাই ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণ মন নিয়ে বেলুড় মঠে গিয়েছি। ঠাকুর প্রণাম শেষ ক'রে সবুজ মাঠটা পার হ'তে হ'তে ভাবছি এই সব মহাপুরুষের দেহত্যাগের পর তাঁদের প্রতিকৃতি নিয়ে কত উৎসবের আয়োজন। আর তাঁরা সশরীরে থাকতে তাঁদের দেখতে পাওয়া, একটু মুখের উপদেশ শোনা এত দুর্লভ,—এ কেমন কথা?

পৌঁছে যখন ঘরের মধ্যে গেলাম, সেদিন দেখি ঘর ফাঁকা, সুস্মিত মুখে গুরুদেব বসে আছেন। আমি প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—"কি, উপদেশ?" একটু থেমে বললেন, "সহ্য ক'রবে। প্রথম ভাগে দেখছো না তিনটে 'স' আছে, শ, ষ, স। সহ্য করবে।"

আবেগের সঙ্গেই বলে ফেললাম, "শুধু সহ্যই ক'রবো, কোন সার্থকতা আসবে না?"

গুরুদেব গম্ভীর অন্তর্মুখ ভাবে বললেন, "সার্থকতা, ভগবান লাভ হ'লে।"

আবার একদিন গুরুদেব এসেছেন শুনে মঠে গেলাম। প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলাম, পুজোটুজো কি রকম ভাবে করব? উত্তরে বললেন, যখন যে ভাবে ইচ্ছে।

বললাম—কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ সব দেবতার পূজাই ক'রব কি?

ব'ললেন—হ্যাঁ, তা করবে বৈ কি।

পূজা-আরাধনার কোন জ্ঞানই তো ছিল না। মনে হ'ত ঠাকুরের মধ্যেই যদি সব দেবতা আছেন, তবে আর তাঁদের ভিন্ন নামে ডাকা কেন? এক ঠাকুরের নামে ডাকলেই তো হয়। বললাম—অন্য দেবতাদের কি ঠাকুরের নামেই ডাকব, না তাঁদের নামে ডাকব?

গুরুদেব বললেন, যাঁর যে নাম, তাঁকে সেই নামে ডাকাই তো ভালো। যার নাম হ'ল রাম, তাকে শ্যাম ব'লে ডাকলে সে সাড়া দেবে কেন?

এমন সহজ কথাটা ভাবি নি। যেমন লজ্জিত হলাম, তেমনি আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে ফিরে এলাম সেদিন।

কিসে ধর্ম লাভ হবে প্রশ্ন করায় আর একদিন বলেছিলেন,—সত্যকে আঁট ক'রে ধরবে। একেবারে ঠিক ঠিক চলা। যা মুখে বলা, তাই কাজে করা। ঠাকুর সত্যস্বরূপ।

কিসে আনন্দ পাব, প্রশ্ন করায় বলেছিলেন, আনন্দ তো রয়েছেই, দেখে নিতে পারলেই হয়।

আর এক দিন মঠে গিয়ে দেখি, গুরুদেব সহাস্যে বসে আছেন। ঘরের এক পাশে স্তূপাকার মিষ্টি ছিল। সেবক বললেন, এগুলি সব এঁদের দিয়ে দাও। আমার ছোট্ট ছেলেকে নিজ হাতেই মিষ্টি দিলেন।

তাঁর এলাহাবাদ ফিরে যাবার সময় হয়েছিল, বললাম, আপনাকে চিঠি দেব।

তিনি সহাস্যে বললেন,—হ্যাঁ, আমি কিন্তু জবাব দেব না।

—যদি কিছু দরকার হয়।

—দরকার হ'লে দেবো।

শুনেছিলাম, তিনি প্রায় চিঠির জবাব দিতেন না। আমাদের সাধারণ মানুষের মন, প্রথম দিকে কেমন আশাহত হ'ত। পরে তাঁর বিষয়ে বিশেষ ভাবে জেনে বুঝেছিলাম, তিনি সর্ববিষয়ে কি কঠোর সংযমী ও তপস্বী ছিলেন। লোকালয়ে

এসে সরল শিশুর মত অকপট সান্নিধ্য সকলকে দান করলেও—যখন তিনি এলাহাবাদে তাঁর নিজের সাধনপীঠে ফিরে যেতেন, তখন কিরূপ নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনায় সমাহিত হ'য়ে থাকতেন। ভক্ত শিষ্য প্রমুখ জগতের যাবতীয় মানবের কল্যাণ-কামনা ও আশীর্বাদ সে সাধনাপ্রবাহের সঙ্গে মিশে শ্রাবণের ধারার মতই নিয়ত বর্ষিত হ'ত। চিঠি লেখা বা তার উত্তর দেবার তাঁর প্রয়োজন কোথায়? তবে বিশেষ প্রয়োজন ও ইচ্ছাবশে কখনও ব্যতিক্রম করতেন। আমাদের একবার মাত্র তাঁর চিঠি পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।

যাঁরা সব সময় তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন তাঁদের কাছে শুনেছি, সময়ে সময়ে তিনি কি অপূর্ব কৌতুকপূর্ণ বাক্যালাপে সকলকে আনন্দরসে ভাসিয়ে দিতেন।

এর পর একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-পূজায় মঠে গিয়েছি। সন্ধ্যার দিকে একজন সেবক গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ ক'রে দিলেন। ঘরের মধ্যে মৃদু আলো জ্বালা। আধ-অন্ধকারে তিনি দক্ষিণ দিককার জানালাটি ধ'রে উৎসবের জনতার দৃশ্য দেখছেন। উন্নত দেহে জানালার সবটুকুই প্রায় ঢেকে গিয়েছে। বইয়ে পড়েছি স্বামী বিবেকানন্দ এমনই ভাবে ওই দক্ষিণের জানলা ধ'রে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের জন্মোৎসবের দৃশ্য দেখেছিলেন।

ভিতরে গিয়ে প্রণাম করতে কুশল প্রশ্ন করলেন, কিছুক্ষণ পরেই বললেন,—সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, এখন এসো।

পরের বারের দর্শন বড়ই বিষাদের। গুরুদেবের শরীর খারাপ। খবর দেওয়াতে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শুয়ে ছিলেন, ঘরে যেতে উঠে বসলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কি শরীর খারাপ?

বললেন, হ্যাঁ, আমার শরীর খারাপ।

আর কিছু কথা বলা উচিত মনে করলাম না। নীরবে মাটিতে প্রণাম ক'রে চলে এলাম।

তিনি একটু সুস্থ হ'য়ে আবার এসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নবনির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়। তিনদিনব্যাপী উৎসবের মধ্যেই আর একদিন গিয়ে দেখি গুরুদেবকে দর্শন ও প্রণামের জন্য ভীষণ ভিড় হয়েছে ঘরে। শরীর খারাপ, সেবক পায়ে হাত দিতে দিচ্ছেন না; তাড়াতাড়ি পায়ে মোজা পরিয়ে দিলেন। আমিও প্রথমে পায়ে হাত দিতে গিয়ে বারণ করাতে হাত সরিয়ে নিলাম। ঠিক তখনই গুরুদেব তাঁর বড় বড় চোখের চাহনিতে আমার দুঃখ-ম্লান চোখের দিকে তাকালেন।

সেই শেষ দর্শন। এলাহাবাদে তাঁর দেহ রক্ষার সংবাদ পাওয়ার পর অবলম্বন-শূন্যের মত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। একজন পূজনীয় মহারাজ সান্ত্বনা দিলেন, "ওরা কি কখনো ছেড়ে যান? দেহ যাবার পর ওঁদের সত্তা আরও ব্যাপক ভাবে অবস্থান করে। তাই শক্তি আরো বেশী হয়। ওঁদের আরো বেশী নিকটে পাওয়া যায়। ওঁদের জন্য শোক বা দুঃখ করার কারণ নেই।"

সেই সান্ত্বনা নিয়ে আর গুরুদেবের পদচিহ্ন বুকে ধারণ ক'রে বাড়ী ফিরে এলাম। জীবনের আকাশে যখন দুঃখের ঘোর ঘনঘটা ঘনিয়ে আসে—অন্ধকারে ছেয়ে যায় হৃদয়াকাশ, তখন মনে পড়ে শ্রীমুখের সেই সব কথাগুলি, আর শেষ দিনের সেই বড় বড় চোখের কৃপা-ঘন দৃষ্টি সেখানে ধ্রুব তারার মতই জ্বলতে থাকে—অমৃতবর্ষী, অচপল।

গৌতম বুদ্ধের সাধনা

[তাঁহার সম্বোধিলাভে সুজাতার সহায়তা]

(আশ্বিন-সংখ্যার পর)

ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক

পূর্বে বর্ণিত অবস্থাভেদে যজ্ঞ ও তপস্যাদিতে দোষদর্শী হইয়াও গতানুগতিক রীতি অবলম্বন করিয়া বোধিসত্ত্ব গৌতম অতি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হইতে অভিলাষী হইলেন। নিজ সংকল্প স্থির রাখিয়া তিনি গয়া নগরীর আশ্রমের নিকটে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে কৌণ্ডিন্যপ্রমুখ পাঁচ প্রব্রজিত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগদ্বারা সংপূজ্যমান হইয়া জন্ম ও মৃত্যুর অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে —'কোটিপ্পত্তং দুক্করকারিকং করিস্সামীতি' (নিদানকথা)—শেষসীমায় উপগত দুষ্কর (তপস্যাদি) ক্রিয়া সম্পাদন করিব—বলিয়া ধার্য করিলেন। তৎপর তিনি এমন ভাবে আহারচ্ছেদ আরম্ভ করিলেন যে, একটি তিল বা একটি তণ্ডুলমাত্র গ্রহণ করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। অনশনাদি দ্বারা তাঁহার ছয় বৎসর চলিয়া গেল। একদিন এমনও হইল যে, তিনি প্রাণবায়ুরোধকারক তপস্যা-কালে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ায় কাষ্ঠবৎ আসীন হইলে লোকেরা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়াছিল। শমপ্রত্যাশী বোধিসত্ত্ব উপবাসাদি আচরণ করিয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়িলেন—তাঁহার সুবর্ণবর্ণ দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার শরীরস্থ দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ-লক্ষণ অদৃশ্য হইতে লাগিল। অপার-পার সংসারের পারপ্রাপ্তি তাঁহার ঘটিল না। তাঁহার শরীরের মেদ, মাংস ও রক্ত শুকাইয়া গেল। ত্বগস্থিশেষ হইয়া তিনি ভাবিলেন :

"নায়ং ধর্মো বিরাগায় ন বোধায় ন মুক্তয়ে।
জম্বুমূলে ময়া প্রাপ্তো যস্তদা স বিধির্ধ্রুবঃ॥"
(বুদ্ধচরিত)

—(কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা আচরিত) এই ধর্ম বৈরাগ্য, সম্যগ্‌জ্ঞান বা মুক্তি—কোনটাই আনিতে পারিবে না। (পূর্বে পিতার রম্যোদ্যানে) জম্বুবৃক্ষমূলে আমি যে (ধ্যান) বিধি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাই ধ্রুব বা ঠিক বিধি।—এই কঠোর তপস্যাসাধনকে অমার্গ মনে করিয়া তিনি উত্তম উত্তম আহার্য বস্তু গ্রহণে মতি স্থির করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীর হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া আসিয়া অল্পমাত্র খাদ্যের জন্য উরুবিল্বা গ্রামে যাইয়া (মহাবস্তুর মতে) গ্রামিকের কন্যা সুজাতার (বুদ্ধচরিতের মতে গোপ-কন্যা নন্দবালার) প্রদত্ত মধু-পায়স গ্রহণ করিয়া সন্তর্পিত-ষড়িন্দ্রিয় হইয়া ক্রমশঃ বোধিপ্রাপ্তির সামর্থ্য লাভ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বকে দুষ্করচর্যা দ্বারা সর্বজ্ঞতালাভের চেষ্টায় বিরত দেখিয়া এবং পুনরায় সুখাদ্য গ্রহণে প্রবৃত্ত লক্ষ্য করিয়া সেই ভিক্ষুপঞ্চক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বিরক্তিসহকারে দূরবর্তী কাশীরাজ্যের ঋষিপত্তনে (মৃগদাবে) চলিয়া গেলেন। তৎপর যিনি অরাড ও উদ্রক ঋষির ধর্মমতবাদে অপরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি আজ পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের নিষেবিত এই গয়াপ্রদেশে যাইয়া বোধিলাভের উদ্দেশ্যে কৃতনিশ্চয় হইয়া অশ্বত্থমূলে সমাসীন হইয়া এই এক দুর্জয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই আসনে বসিয়া তাঁহার শরীর শুষ্ক হইয়া যায় যাউক, তাঁহার ত্বক্, অস্থি ও মাংস লুপ্ত হয় হউক, কিন্তু, বহুকল্পেও দুর্লভ বোধি বা প্রজ্ঞা পারমিতা লাভ না করিয়া তিনি নিজ শরীর এই আসন হইতে চালিত করিবেন না। পাঠক জানেন যে, তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা ফলমণ্ডিত হইয়াছিল এবং

এই বোধিবৃক্ষমূলে সেই আসনে বসিয়াই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি 'সম্যক্‌সম্বুদ্ধ' হইয়াছিলেন।

অতঃপর অতিসংক্ষেপে মধুপায়সদাত্রী সুজাতার আখ্যানবস্তু 'নিদানকথা' ও 'মহাবস্তু' হইতে চয়ন করিয়া নিম্নে প্রদান করিতেছি। নিদানকথাতে বর্ণিত আছে যে, শ্রীবুদ্ধের উরুবিল্বায় ছয়-বৎসর-ব্যাপী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে ব্যাপৃত থাকাসময়ে সেই সেনানী-নিগমে সেনানী কুটুম্বীর গৃহে সুজাতা-নাম্নী বয়ঃপ্রাপ্তা এক দুহিতা বাস করিত। সে এক ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে বৃক্ষদেবতার নিকট এই প্রার্থনা করিতে গেল যে, যদি সমজাতিক কুলঘরে বিবাহিত হইবার পর প্রথম-গর্ভে সে পুত্র লাভ করে, তবে প্রতিবৎসর শতসহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া বৃক্ষদেবতার জন্য বলিকর্ম সম্পাদন করিবে। যখন বোধিসত্ত্ব গৌতম তদীয় দুষ্কর তপস্যার ষষ্ঠ বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন, তখন বৈশাখী পূর্ণিমা আগত হইয়াছে। সুজাতা বৃক্ষদেবতার উদ্দেশ্যে সেই দিনই বলিকর্ম সম্পাদন করিতে অভিলাষ করিল এবং প্রাতঃকালে নবভাজনে (পাত্রে) ধেনুদিগের স্তনমূল হইতে স্বতঃপ্রস্রুত অপর্যাপ্ত দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিল। আশ্চর্যের বিষয় যে সেই দুগ্ধ সুজাতা স্বয়ং জ্বাল দিবার সময়ে দেখিল যে একবিন্দু দুগ্ধও পাকের সময় উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়া গেল না। এরূপ আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করিয়া সে তাহার পূর্ণা-নামক দাসীকে ডাকিয়া বলিল যে, নিশ্চিতই তাহাদের দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন এবং তাহাকে ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে দ্রুত যাইয়া দেবতাস্থান পরিষ্কৃত রাখিতে বলিল। বোধিসত্ত্ব গৌতমও পূর্বরাত্রিকালে পঞ্চস্বপ্নদর্শনে জানিয়াছিলেন যে, আগামী রাত্রিতেই তিনি নিঃসংশয়ে 'বুদ্ধ' হইবেন। তাই তিনি সেই রাত্রি প্রভাত হইলে পর সেই বৃক্ষমূলে যাইয়া আসীন হইয়া চারিদিক নিজ শরীরপ্রভায় উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। সুজাতার দাসী পূর্ণা বোধিসত্ত্ব গৌতমের প্রভায় সেই বৃক্ষকে সুবর্ণবর্ণ দেখিয়া মনে করিল যে, তাহাদের বৃক্ষদেবতা প্রসন্ন হইয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া স্বহস্তেই সুজাতার বলিকর্ম স্বীকার করিবেন। পূর্ণা বেগে যাইয়া সুজাতাকে এই সংবাদ জানাইল। তখন সুজাতা তাহার নিজহস্তে প্রস্তুত মধুপায়স সুবর্ণপাত্রে ঢালিয়া লইয়া সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে দেখিয়াই তাঁহাকে বৃক্ষদেবতা বলিয়া জ্ঞান করিল। সুজাতা পাত্রসহ পায়স সেই মহাপুরুষ গৌতমের হস্তে প্রদান করিল এবং বলিল,--"আপনি ইহা লইয়া যথারুচি চলিয়া যাউন—যেমন আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, তেমন আপনার অভীষ্টও সিদ্ধ হউক"। সেই পায়স লইয়া বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনানদীর তীরে গেলেন এবং তাহা ঘাটের সোপানে রাখিয়া নদীতে স্নান করিয়া প্রথমতঃ সেই মধুপায়স ঊনপঞ্চাশ ভাগে ভাগ করিয়া একভাগ আহার করিলেন। বোধিলাভের পর এই পায়স তিনি সাত সপ্তাহ-কাল পরিভোগ করিয়াছিলেন, অন্য কোন আহার গ্রহণ করেন নাই।

উপরি-বর্ণিত 'নিদানকথা'য় উল্লিখিত এই আখ্যান হইতে খানিকটা পৃথগ্‌ভাবে বর্ণিত 'মহাবস্তু-অবদানে' উল্লিখিত আখ্যানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ :

অরাড় কালাম ও উদ্রক ঋষির উপদিষ্ট তত্ত্ব-কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া বোধিসত্ত্ব গৌতম উরু-বিল্বায় চলিয়া আসিলেন। সেখানে গ্রামিকের (গ্রামপতির) সুজাতা-নাম্নী বিদুষী কন্যা রাজ-পুত্রকে দেখিয়া প্রীতিবেগে কাঁপিতে লাগিল; অশ্রুপাত করিয়া তাঁহাকে বলিল,—"হে নরবর! তুমি আজ এই নিগম (ক্রয়বিক্রয়ের নগর) হইতে ফিরিয়া যাইও না। তোমাকে দেখিয়া আমার নয়নদ্বয় অতৃপ্ত রহিয়াছে; তুমি চলিয়া গেলে আমার হৃদয় সর্বতোভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে"। সেই সময়ে সুজাতা দেববাণী শুনিল—"এই ব্যক্তি কিন্তু কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের শ্রেষ্ঠ পুত্র"।

সে ভাবিল—কেমন করিয়া এই বরপুরুষ বান্ধবদিগকে ছাড়িয়া বনবাস করিতেছেন। তৎপর কুমারকে পুনরায় বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সুজাতা রোদন-সহকারে বোধিসত্ত্বের অনুগমন করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিল—"তোমার কমলদলসদৃশ কোমল চরণদ্বারা তৃণকুশাদিময় দুর্গম ভূমির উপর দিয়া তুমি কিরূপে চলিবে? মিষ্টান্ন ও অন্যান্য রসময় দ্রব্যদ্বারা বর্দ্ধিতদেহ তুমি কেমন করিয়া বনের ফলমূলাদি ভক্ষণ করিবে? পুষ্পাকীর্ণ শয্যায় শুইতে অভ্যস্ত তুমি কি প্রকারে তৃণকুশাদি-সংস্কৃত তলভূমিতে শয়ন করিবে? রাজভবনে পটহাদির সঙ্গীত শুনিয়া এখানে তুমি কি প্রকারে রুষ্ট শ্বাপদ জন্তুদিগের গর্জন শুনিবে? হে বনেচর সন্ন্যাসী। তুমি যেন তৃষ্ণায় ও ক্ষুধায় কাতর না হও। দেবশিশুর ন্যায় তোমার শরীরটিকে যেন দেবযোনিরা রক্ষা করেন"। বোধিসত্ত্ব গৌতম এইরূপে সেই ভয়ঙ্কর বনমধ্যে তপস্যায় নিরত রহিলেন। ইহাও বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে সত্ত্বসার তপস্বী গৌতম যেরূপ নিজের জন্য, তদপেক্ষা অধিকভাবে জগতের সর্ব সত্ত্বের জন্য, হিত কামনা করিতেছেন। তাঁহার মনে এই প্রকার উদার ভাব উদিত হইল—(এইরূপ ভাব পরবর্তী কালে মহাযানী বৌদ্ধদিগের মতসম্মত):

একৈকসত্ত্বমোক্ষণে যদি কল্পসংখ্যাং সর্বসত্ত্বানাং।
দুঃখমনুভোমি তাবেচ্ছং সর্বসত্ত্বানাং ব্যবসিতমিদম্॥

(মহাবস্তু)

'এক একটি সত্ত্ব বা জীবের মোক্ষের জন্য যদি আমি অসংখ্য কল্পে সর্ব সত্ত্বের দুঃখ অনুভব করি, তথাপি আমি সর্ব সত্ত্বের উদ্ধার সাধন করিব—ইহাই আমার ক্রিয়াসঙ্কল্প'। কর্মক্ষয়ের জন্য ছয় বৎসর ব্যাপিয়া বনমধ্যে দুষ্কর তপস্যাদির আচরণ করিবার পর বোধিসত্ত্বের এই জ্ঞান লব্ধ হইল—"যত্র পথাস্মি গতো নায়ং মার্গো মোক্ষায়"—'আমি যে পথে গমন করিয়াছি তাহা মোক্ষের মার্গ নহে'। বরং শাক্যরাজের উদ্যানে বহুপূর্বে জম্বুবৃক্ষমূলে বসিয়া আমি যে প্রথম ধ্যান সম্পাদন করিয়াছিলাম—"স ভবিষ্যতি বোধয়ে মার্গো"—'সেই ধ্যানমার্গই বোধি বা সম্যকপ্রজ্ঞার মার্গ হইবে'। যে ব্যক্তি দুর্বল ও কৃশ এবং যাহার রুধির ও মাংস পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে বোধিলাভ সম্ভবপর নহে; তাই আমি পুনরায় আহার্য বস্তু ভক্ষণ করিব"। এই সময়ে এক দেবতা তাঁহাকে আহার্য গ্রহণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"তুমি পুনরায় আহার করিও না, তোমার যশঃ পরিহীন হইবে—আমরাই তোমার গাত্রে বল সঞ্চার করিব।" গৌতমের বিশ্বাস, এই বচন সত্য হইতে পারে না, তাই তিনি ভীতভাবে দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া নিন্দা করিলেন—"তোমাদের সেই চেষ্টায় আমার কোন প্রয়োজন নাই।" ইহার পরেই তিনি মুদ্গ (মুগ) ও অন্যান্য কলায় ও গুড়মিশ্রিত যূষ ভোজন করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমশঃ শরীরে শক্তি ও বল অনুভব করিতে লাগিলেন এবং আহার অন্বেষণে উরুবিল্বাগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে পূর্ব কোন জন্মে তাঁহার জনয়িত্রী (জননী) সেই সুজাতা-নাম্নী উচ্চকুলসম্ভূতা ও পণ্ডিতা নারী ন্যগ্রোধ-বৃক্ষমূলে মধুপায়স গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গৌতমকে সেই পায়স দান করিয়া সে তাঁহার গুণকীর্তন করিতে লাগিল। তিনি সুজাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিমর্থমেতং দদাসি দানম্"—তুমি কি কারণে আমাকে এই (পায়স) দান দিতেছ? গৌতমের শত শত জন্মের জননী সুজাতা উত্তরে বলিলেন—"তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহা গ্রহণ কর। শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের পুত্র ভয়ঙ্কর বনে ছয় বৎসর ঘুরিয়া তপস্যা-দ্বারা যাহা অন্বেষণ করিতেছেন সেই উদ্দেশ্য যেন পূর্ণতা লাভ করে। আমিও তাঁহার পথেই যাইতে চাই।" অন্তরীক্ষ হইতে তখন এক অমানুষী বাণী প্রাদুর্ভূত হইল:

'সুজাতে এষো সো ধীরো শাক্যরাজকুলোদিতো'—হে সুজাতে! এই ব্যক্তিই সেই শাক্যরাজকুলে উদিত ধীর বা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। এই ব্যক্তি নিজের শোণিত ও মাংস শুষ্ক করিয়াও তপোবনে দুষ্কর ও রোমহর্ষণ তপস্যা করিয়াছেন। তাহা নিরর্থক বলিয়া ত্যাগ করিয়া তিনি এখন ন্যগ্রোধমূলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—যেখানে অতীত সংবুদ্ধগণও উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপর সুজাতা আনন্দে অশ্রুপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই নরশ্রেষ্ঠকে বলিতে লাগিলেন—হে কমললোচন মহাপুরুষ। আমি তোমাকে উগ্র তপস্যা হইতে উত্থিত হইতে দেখিয়াছি, এখন আমার শোকমথিত হৃদয় প্রীতি অনুভব করিতেছে। বিগত ছয় বৎসর আমি নিজে যে সুখশয্যাসমূহে ঘুমাইয়াছি, সে সব আমার কোন সুখই উৎপাদন করিতে পারে নাই—কারণ, আমি তোমার কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের কথায় শোকশরের আঘাত-তাপে ক্লিষ্ট হইয়া সর্বদা চিন্তা করিয়াছি। এখন তোমাকে চিনিতে পারিয়া এই বলিতেছি যে, তোমার সেই রাজ্য ও প্রজারা, তোমার পিতা ও স্নেহকাতরা মাতৃষ্বসা (গৌতমী) তোমার সেইরূপ কঠিন তপস্যার অবসানের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন। কপিলবস্তুর নরনারীরা এখন হাস্যপূর্ণবদনে আনন্দে প্রমুদিত হইয়া উঠিবে। আমার প্রদত্ত মধুপায়স উপভোগ করিয়া পূর্বজন্মের আকাঙ্ক্ষাসমূহের নির্ঘাতক বা নাশকারী হও এবং এই দ্রুমরাজমূলস্থ ভূমিখণ্ডে বসিয়া—"অমৃতমধিগন্তো পদমশোকম্"—শোকাতীত অমৃতপদ (নির্বাণ) প্রাপ্ত হও। তখন বোধিসত্ত্ব গৌতম ব্যক্ত করিলেন—পাঁচ শত জন্মে তুমি আমার জননী ছিলে। ভবিষ্যৎকালে তুমি জৈনব্রত ধারণপূর্বক প্রত্যেক বুদ্ধপদ লাভ করিতে পারিবে (অর্থাৎ স্বয়ংই বুদ্ধত্বলাভের অধিকারিণী হইতে পারিবে)।

ইহাই সুজাতা-সম্বন্ধীয় আখ্যান-বস্তু। জননী-সদৃশা সুজাতার প্রদত্ত পায়স আহার করিয়া নিরর্থক কঠোর তপস্যার অন্তে বোধিসত্ত্ব গৌতম সম্যক্ সংবোধিলাভের চেষ্টায় কৃতকৃত্য হইতে পারিয়াছিলেন। পাঠক জানেন যে, সংবুদ্ধ হইয়া গৌতম ঋষিপত্তনে ধর্মচক্র প্রবর্তন সময়ে ভিক্ষুগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে, প্রব্রজিতের পক্ষে দুইটি 'কোটি' বা অন্ত পরিত্যাজ্য—(১) সংসারের কামসুখভোগে আত্মসমর্পণ ও (২) কঠোর তপস্যায় নিরত হইয়া আত্মক্লেশভোগ। তাই তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামক মধ্যম প্রতিপদা বা মধ্যমপথের আবিষ্কার করিয়া জনগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই পথই সম্বোধি ও নির্বাণের পথ। জ্ঞান, শান্তি, অভিজ্ঞা প্রভৃতি এই পথেই পাওয়া যায়।

কবীর-বাণী

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

("আজ মেরে প্রীতম্ ঘর আয়ে" বাণীর অনুবাদ)

প্রিয়তম মোর এসেছেন গৃহে
আনন্দ আজ নাহি ধরে,
গৃহ অঙ্গন করিনু মুক্ত
মুক্তাধারায় অশ্রু ঝরে!
প্রেমের সলিলে প্রভুর চরণ
করিব ধৌত পরাণভরে,
সফল হইবে জীবন আমার
পাইব প্রভুরে নূতন ক'রে।

পঞ্চ সখীরা সকলে মিলিয়া
গাহিছে নিত্য নূতন গীতি,
তাহাদের সাথে অন্তর মোর
মিলায় তাহার চরম প্রীতি!
প্রেমের অর্ঘ্যে আরতি করিব
করিব আরতি পরাণ ভরি,
আপনারে বলি দিব বার বার
কিছুতেই আর নাহি ডরি!
কহিছে কবীর ধন্য আমি যে
পরম পুরুষ হৃদয়ে ধরি!

শঙ্কর-দর্শনে "মিথ্যা"

(আশ্বিন-সংখ্যার পর)

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

পূর্ব প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা ক'রে দেখান হয়েছে যে, শঙ্করের মতে, বিশ্ব-সংসার পারমার্থিক দিক থেকে 'মিথ্যা' হ'লেও, সম্পূর্ণ 'তুচ্ছ' বা 'অসৎ' নয়। বস্তুতঃ, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, পরিশেষে পরিত্যাজ্য হ'লেও প্রারম্ভে এই জগৎই মোক্ষের প্রথম সোপান।

ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি কর্মবাদ, তদনুসারে জাগতিক ক্ষেত্রে যেরূপ প্রত্যেক কারণেরই একটী বিশেষ কার্য এবং প্রত্যেক কার্যেরই একটী বিশেষ কারণ থাকে—সেরূপ মানসিক ক্ষেত্রেও, নীতির ক্ষেত্রেও প্রত্যেক কার্যেরই একটী বিশেষ ফল থাকে। পুনরায়, সেই কর্মটী যদি কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় এবং বুদ্ধিবিচার-পূর্বক সম্পাদন করেন, তা হ'লে তিনি হবেন তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। সেজন্য সেই কর্মের ন্যায্য ফলটীও—ভালই হোক আর মন্দই হোক, আজই হোক আর কালই হোক—তাঁকে ভোগ করতেই হবে। এই তো ন্যায়ের অমোঘ বিধান—যেমন কর্ম, তার তেমনি ফল; তার তেমনি ভোগ কর্মের কর্তা-কর্তৃক। স্বেচ্ছায় ও যথোচিত চিন্তা-আলোচনার পরে, কর্ম ক'রেও যদি আমরা তার ফল ভোগ না করি, তা হ'লে তা ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত কোনোটাই নয়—এই হ'ল ভারতের ঋষিদের সুদৃঢ় অভিমত।

কিন্তু এক্ষেত্রে, একটী সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হ'তে হয়। এই জন্মে, বর্তমান পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি সাধারণতঃ অসংখ্য কর্মে লিপ্ত হন, যার প্রত্যেকটীর ফলভোগ করবার তাঁর সময়-সুযোগ সুবিধা হয় না। নানা কারণে, প্রত্যেকটী কর্মই তার ন্যায্য, যথোপযুক্ত ফল প্রসব করতে পারে না বর্তমান জীবনেই। এরূপ কর্মের ফলভোগ হবে কি উপায়ে?

এই সমস্যার সমাধানরূপে ভারতীয় দার্শনিকগণ অবতারণা করেছেন—ভারতীয় দর্শনের আরেকটী মূলীভূত ভিত্তি—'জন্মান্তরবাদের'। ন্যায়ের অমোঘ বিধানানুসারেই যখন প্রত্যেক কর্মের ফলভোগ অনিবার্য, তখন এ জন্মে না হ'লেও পরজন্মে সেই সকল অভুক্ত কর্মের ফলভোগ কর্মকর্তাকে করতেই হবে। এরূপে, সেই নূতন সৃষ্টিতে, জীব প্রাক্তন কর্মানুসারে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করে, প্রাক্তন কর্মের ফলভোগ করে। সেজন্য 'কর্মবাদ' ও 'জন্মান্তরবাদ' একই কেন্দ্রীভূত দার্শনিক তত্ত্বের দুটী দিক মাত্র।

কিন্তু সকল সমস্যার সমাধান তো এক্ষেত্রেও হ'ল না। কারণ, এই নূতন জন্মে জীব যে কেবল প্রাক্তন কর্মের যথোপযুক্ত ফলভোগ করে, তা-ই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই সে নানাবিধ নূতন কর্মেও প্রবৃত্ত হয়, যে সকল কর্মের ফলও সেই একই জন্মে ভোগ করা সম্ভবপর হয় না।

এর উত্তর হ'ল এই যে, পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে, জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে অভুক্ত কর্মের ফলোপভোগের জন্য। সেই নূতন জন্মেও সে নূতন কর্মে রত হবে। যার জন্য তাকে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করতে হবে। এই ভাবে, জন্ম→কর্ম→জন্ম→কর্ম এই প্রণালীতে তাকে নিরন্তর বিঘূর্ণিত হতে হবে। এরই নাম 'অনাদি সংসারচক্র।' এই হ'ল জীবের শোকদুঃখপূর্ণ 'বদ্ধাবস্থা।'

কিন্তু এই সংসার-চক্র থেকে মুক্তির উপায়

কি? মুক্তির উপায় নিষ্কাম-কর্ম-সাধন। কর্ম দুই প্রকার: সকাম ও নিষ্কাম। সকাম কর্ম বা ভোগেচ্ছাজনিত কর্মের ফল-ভোগ স্বভাবতই কর্মকর্তাকে করতেই হয়, এবং সেজন্য পূর্বোক্ত রীতিতে জন্মজন্মান্তর বা সংসার চক্রে বিঘূর্ণন তার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম, বা শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম সম্পূর্ণ কামনাশূন্য, ভোগেচ্ছা-বিহীন ভাবে পর-সেবার্থে সম্পাদন করলে, সেই কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না, এবং সেজন্য কর্ম-কর্তাকে জন্মান্তর-ভাগীও হ'তে হয় না। এরূপে একটী নূতন জন্মে, প্রাক্তন সকাম কর্মের ফলভোগমাত্র ক'রে, নূতন কর্ম সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে সম্পাদন ক'রে, চিত্তশুদ্ধি লাভ ক'রে মুমুক্ষু অন্যান্য সাধনাবলম্বনে মুক্তি লাভ করেন।

সেজন্য নীতির দিক থেকে, মুক্তির দিক থেকে এই যে সংসারের প্রয়োজনও অল্প নয়। প্রথমত: নীতির দিক থেকে, সকাম কর্মের ফল-ভোগ অনিবার্য, এবং একমাত্র সংসারেই এরূপ ফলভোগ সম্ভব হ'তে পারে। দ্বিতীয়ত: মুক্তির দিক থেকে, সকল কর্মের ক্ষয় অত্যাবশ্যক, এবং কর্মফল ক্ষয় হয় কেবলমাত্র কর্মফলোপভোগের দ্বারাই, অভুক্ত কর্মের ফল পূর্বোক্ত প্রকারে সঞ্চিত হ'য়ে ন্যায়ের অমোঘ বিধানানুসারেই জীবকে জন্মান্তর-ভাগী ও সংসারবদ্ধ করে। এরূপে, কর্ম→ফলভোগ→কর্মফলক্ষয়—এই হ'ল মোক্ষের প্রণালী। সংসারে এইভাবে কর্মফল-ভোগ সমাপ্ত হ'লে, কর্ম-বিমুক্ত হ'য়ে সাধক অবশেষে সাধনাভ্যাস-দ্বারা মুক্তিলাভে ধন্য হন।

সুতরাং, জীবের বদ্ধাবস্থার কারণ-স্বরূপ সংসার তার মোক্ষাবস্থারও প্রথম সোপান. যেহেতু সকামকর্ম যেরূপ করা হয় এই সংসারে, তাদের ফলভোগও সেরূপ করা হয় এই সংসারেই; পুনরায়, নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান, ভক্তিপ্রমুখ বিভিন্ন সাধনের অনুশীলনও সেরূপ করা হয় এই সংসারেই—অন্যত্র কোথাও নয়। সেজন্য, ভারতীয় দর্শন মতে, সংসার পরিশেষে পরিত্যাজ্য হলেও, প্রারম্ভে অবশ্য প্রয়োজনীয়—এই সংসার থেকে নিষ্কৃতির উপায় এই সংসারই আমাদের ক'রে দিতে পারে,—অন্য কিছু নয়।

এই কারণ, অদ্বৈতবাদী শঙ্করও সংসারের পারমার্থিক সত্তা অস্বীকার করলেও, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তার ব্যবহারিক সত্তা স্পষ্টতমভাবে স্বীকার করেছেন।

যথা: ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে (২।১।১৪), শঙ্কর এ বিষয়ে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন। পূর্বপক্ষীয় প্রতিবাদী এস্থলে একটী অতি স্বাভাবিক আপত্তি উত্থাপন ক'রে বলছেন যে, বিধিপ্রতিষেধ-শাস্ত্র ভেদসাপেক্ষ; ভেদ না থাকলে তার ব্যাঘাত হয়; সমভাবে, মোক্ষশাস্ত্রও ভেদমূলক—গুরু-শিষ্যপ্রমুখ নানাবিধ ভেদ এতে আছে। সেজন্য, অদ্বৈতবাদ-অনুসারে যদি একমাত্র অভেদকেই সত্য ব'লে গ্রহণ করা হয়, তাহলে মোক্ষশাস্ত্রও অসত্য হ'য়ে যাবে, এবং এরূপ অসত্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট একাত্মবাদও অসত্য হবে। এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন:

"অত্রোচ্যতে—নৈষ দোষঃ। সর্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ স্বপ্ন-ব্যবহারস্যেব প্রাক্ প্রবোধাৎ। যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্ব-প্রতিপত্তিঃ, তাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়-ফল-লক্ষণেষু ব্যবহারেষ্বনৃতবুদ্ধির্ন কস্যচিদুৎপদ্যতে। বিকারানেব ত্বহং মমেত্যবিদ্যয়াত্মাত্মীয়-ভাবেন সর্বো জন্তুঃ প্রতি-পদ্যতে, স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা। তস্মাৎ প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতা-প্রবোধাদুপপন্নঃ সর্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ। যথা, সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য জনস্য স্বপ্ন উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্যতো নিশ্চিতমেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি—প্রাক্ প্রবোধাৎ, ন চ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায়স্তৎকালে ভবতি, তদ্বৎ।"

অর্থাৎ, অপরের আপত্তি এক্ষেত্রে উত্থাপিত করা চলে না; যেহেতু, ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের পূর্বে সমস্ত

ব্যবহারাদি বা পার্থিব জীবনযাত্রা-প্রণালীকে সত্য-রূপে গ্রহণ করলে, দোষের হয় না; যেরূপ স্বাপ্ন-ব্যবহারও জাগরণের পূর্বে সত্যরূপেই গৃহীত হয়। বস্তুতঃ, যতদিন না পর্যন্ত অদ্বয়ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, ততদিন কোনো ব্যক্তিই প্রমাণ-প্রমেয়, ফলাদিপ্রমুখ সকল ব্যবহারিক বা জাগতিক বিষয়কে মিথ্যারূপে গ্রহণ করে না। সেই সময়ে, সকলেই নিজেদের স্বরূপগত ও স্বাভাবিক ব্রহ্মত্ব উপেক্ষা করে; অবিদ্যার বশীভূত হ'য়ে 'অহং মম'-ভাবের দাস হ'য়ে পড়ে। সেজন্য ব্রহ্মাত্মতাবোধের পূর্ব পর্যন্ত সকল লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। যেমন নিদ্রিত সংসারী ব্যক্তি জাগরণের পূর্ব পর্যন্ত স্বপ্নদৃষ্ট বিবিধ পদার্থ, ভাব, ব্যবহার প্রভৃতিকে সত্য ব'লেই নিশ্চিন্তে গ্রহণ করে, সে সময় সে ঐ সকলকে অসত্য ব'লে উপলব্ধি করতেই পারে না—এক্ষেত্রেও ঠিক তাই।

এই একই সূত্রের ভাষ্যে অন্যত্রও তিনি বলেছেন :

"প্রাক্ চাত্মৈকত্বাবগতেরব্যাহতঃ সর্বঃ সত্যানৃত-ব্যবহারো লৌকিকো বৈদিকশ্চেত্যবোচাম।"

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের অপর এক স্থলেও শঙ্কর এই একই কথা বলেছেন।

এক্ষেত্রেও সেই একই আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, ব্রহ্মই যদি একমাত্র তত্ত্ব হন, অভেদই যদি একমাত্র সত্য বস্তু হয়, তা হ'লে উপাসনা ও উপাসকের মধ্যে ভেদও বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে; এবং ভক্তি শাস্ত্রোপদিষ্ট ভক্তি,, উপাসনা প্রভৃতি অসম্ভব হ'য়ে পড়বে। উত্তরে একই ভাবে শঙ্কর বলছেন :

"প্রাক্ প্রবোধাৎ সংসারিত্বাভ্যুপগমাৎ, তদ্বিষয়ত্বাচ্চ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্য।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৪।১।৩)—অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম ও জীবজগতের একত্ব ও অভিন্নত্ব উপলব্ধি করবার পূর্বে, জীবের সংসারিত্ব বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকে—সে কথা স্বীকারে বাধা নেই। সেই অবস্থায় সাধারণ প্রত্যক্ষাদি মূলক ব্যবহারাদিও সত্যরূপেই গৃহীত হয়।

ব্রহ্মের তুলনায় মিথ্যা হ'লেও, স্বাপ্ন জগতের তুলনায় যে বিশ্ব-জগৎ পারমার্থিক—এ কথাও শঙ্কর স্পষ্টভাবে বলেছেন—

"পারমার্থিকস্তু নায়ং সন্ধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাদি-সর্গবদিত্যেতাবৎ প্রতিপাদ্যতে। ন চ বিয়দাদি-সর্গস্যাপ্যাত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তি। প্রতিপাদিতং হি তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বম্। প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মদর্শনাৎ বিয়দাদি প্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি, সন্ধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ, প্রতিদিনং বাধ্যতে—ইত্যতো বৈশেষিকমিদং সন্ধ্যস্য মায়ামাত্রত্বমুদিতম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩।২।৪)।

অর্থাৎ স্বাপ্ন সৃষ্টি আকাশাদি-সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক সত্য নয়। অবশ্য আকাশাদি-সৃষ্টিরও আত্যন্তিক বা শাশ্বত সত্যতা নেই। সমগ্র বিশ্ব-প্রপঞ্চই যে মায়ামাত্র—এ কথা প্রতিপাদিত করাই হয়েছে। ব্রহ্মাত্মদর্শনের পূর্বে, আকাশাদি-প্রপঞ্চ যথাযথরূপেই বিরাজ করে, কিন্তু স্বাপ্ন প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত হ'য়ে যায়—এই হল স্বাপ্ন জগৎ ও জাগ্রৎ জগতের মধ্যে প্রভেদ। সেই জন্যই স্বাপ্ন জগৎকে মায়ামাত্র বলা হয়েছে।

এই সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা পরে করা হবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

দক্ষিণেশ্বর সর্বধর্মের সর্বপ্রকার সাধনার মহাতীর্থ। এরই তীর্থদেবতা মহাশক্তি—শ্রীশ্রীমা সারদামণি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মর্তলীলা পরিক্রমার স্তরে স্তরে যে সব তত্ত্ব অধ্যাত্মসাধনার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রূপদান করেছিলেন, সে সব তত্ত্বের অন্তর্নিহিত বহিঃপ্রকাশ শ্রীশ্রীমা। যে ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে তমসার পারে সর্বশক্তিমান পুরুষ এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, সেই ইচ্ছাশক্তিই আদ্যাশক্তি ও মহামায়া। এই মহামায়াই মর্ত্যকায়া গ্রহণ ক'রে মহাযোগীশ্বর পরমপুরুষ পরমহংসদেবের লীলা-সঙ্গিনী হয়েছিলেন। মাতৃ-ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় ভগবানের অবতরণ হয়েছিল এই বঙ্গভূমিতে। এবারে তিনি এসেছিলেন মহাশক্তিকে পূর্ণভাবে প্রকাশ ক'রে তাঁরই মহিমার বাণী বিশ্ববাসীকে শোনাতে,—তিনি এসেছিলেন মানুষের অন্তর্লোকের সকল দ্বন্দ্ব সংশয় দূর করতে, সকল জটিল সমস্যার সমাধান ক'রে দিয়ে মানুষকে ঠিক পথে চলবার নির্দেশ দিতে।

মূর্তিমতী মহাশক্তি শ্রীশ্রীমা সারদার সঙ্গে তিনি ছিলেন অভিন্ন ও একাত্মা। দক্ষিণেশ্বরে এঁদের অবস্থানকালে বহু সাধনার বহু সাধকের ধারা যুগল চরণ স্পর্শ ক'রে গেছে। তাই এঁদের তপোভূমি দক্ষিণেশ্বর শুধু আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র নয়—নবতম মহাপীঠস্থান। আজও এখানে দেবতাদের বিহার হয়—কোন কোন ভাগ্যবান তা দেখে থাকে।

ভারতীয় দর্শনের মূলকথা ঈশ্বরদর্শন পরমার্থ-সত্যজ্ঞান বা সত্য বস্তুর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও দিব্যানুভূতি। বিশ্বোত্তীর্ণ বস্তুর ধারণা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে নেই বললেই চলে—বস্তুবিশ্বকে কেন্দ্র ক'রে তার মননের পরিক্রমা। মন ও বুদ্ধির ওপর পাশ্চাত্ত্যদর্শন বোধির স্থান নির্ণয় করেছে বটে, কিন্তু বুদ্ধির সীমা পেরিয়ে 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' ব্রহ্মবিহারের রসঘন স্তরে পৌঁছুতে পারেনি। ব্যক্তি মনের চিন্তা, ধারণা, রুচি ও উপলব্ধির সঙ্গে বিশ্বমনের কোথায় যোগসূত্র, এর সন্ধান দিয়েছে ভারতীয় দর্শন। এই দর্শনের মূর্তবিগ্রহ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ও আদ্যাশক্তির অবতাররূপিণী শ্রীশ্রীমা সারদা। দক্ষিণেশ্বরে যে প্রদীপ জ্বেলে পরমহংসদেব নীরাজন করেছিলেন, সে প্রদীপে ছিল মায়েরই আলোক শিখা, যে আসন তিনি পেতে নির্জনতার মন্দির থেকে এনে দিয়েছিলেন সত্যধন, সে আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন শ্রীশ্রীমা। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার দিব্যলীলা অচিন্ত্যরহস্যময়। পূর্ব অবতার-পুরুষগণের জীবন কাব্যে এরূপ ছন্দের কোন পরিচিতি নেই—এইটেই হচ্ছে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা গরিষ্ঠতা।

শ্রীশ্রীমা সারদাসুন্দরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন জয়রামবাটীতে ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ। ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ তাঁর তিরোভাব। সাতষট্টি বৎসর ধরে তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন দেহের ভিতর আত্মার মতো। তাঁরই জন্মস্থান থেকে অনধিক দুই ক্রোশ দূরে প্রভু গদাধরের জন্ম হয়—দুইটি জেলার মিলনের মোহানায় প্রকৃতি ও পুরুষের লীলা-কেন্দ্র।

মায়ের আবির্ভাবের পশ্চাতে আছে তাঁর সঙ্কেত ও বাণী—এখানে সেটি বলার প্রয়োজন আছে। একদা বসন্তের গোধূলি-নির্ঝরে যে সময়ে মায়ামৃগ স্নান করছিল, সে সময়ে আমোদরের তীরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করলেন জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টি হঠাৎ কেন্দ্রীভূত হ'য়ে গেল দিক্‌চক্রবালের দিকে।

ব্রাহ্মণ দেখলেন চক্রবালের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে বিরাটকায় একটি সিংহ, পৃষ্ঠে তার আরূঢ়া জ্যোতির্ময়ী যজ্ঞোপবীতধারিণী মহাশক্তি দেবী জগদ্ধাত্রী। সিংহবাহিনীকে তিনি প্রণাম করলেন।

রামচন্দ্র স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় বিস্মিত হ'য়ে দেখেন দ্বিভূজা মানবী রূপ ধারণ ক'রে প্রসন্নবদনা মা মধুরহাস্যে তাঁকে বললেন—'বাবা, এবার হেমন্ত শেষে তোমার বাড়ী যাব', ব্রাহ্মণ পুলকিত হলেন।

শ্রীশ্রীমা অতি সাধারণের মধ্যেই দীন ব্রাহ্মণ পরিবারের পর্ণকুটীরে জন্ম নিয়েছিলেন, কিন্তু শৈশবেই তিনি দেখিয়েছেন নিজের অসাধারণত্ব তাঁর পল্লীবাসীকে। সকলে লক্ষ্য করেছে শৈশবেই তাঁর ধ্যান-তন্ময়তা, জননী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে তাঁকেও পূজায় বিভোর হ'তে অনেকেই দেখেছে।

জগদ্ধাত্রী পূজার সময় হলদে পুকুরের রামহৃদয় ঘোষাল পূজো দেখতে এসেছিলেন দেবীকে প্রণাম করতেই সম্মুখে দেখতে পেলেন প্রতিমার সম্মুখে সারদামণি ধ্যান করছিলেন। খানিকক্ষণ এক পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ বালিকা সারদার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন - শেষে ভয় পেয়ে চলে এলেন, বললেন—কে সারদা, কে জগদ্ধাত্রী—কিছু ঠাহর ক'রতে পারলাম না।

শৈশব থেকে তিরোভাবের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা সরলভাবে সকল জীবের সেবা ক'রে গেছেন মহাজীবনের করুণার প্রস্রবণ-ধারায় প্রাণিমাত্রকেই নিষ্ণাত ক'রে আর জগৎকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন এই কথাই ব'লে—'যত্র জীব, তত্র শিব।' এই উপলব্ধি বাল্যে তাঁর পক্ষে কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল এটা ভেবে দেখবার বিষয় নয় কি?

ছেলেবেলায় তাঁকে গলা-সমান জলে নেমে গাভীর জন্যে দলঘাস কাটতে হয়েছে। ধানের ক্ষেতে কখনও রৌদ্রদগ্ধা—কখনও বারিস্নাতা হ'য়ে গিয়েছেন তিনি 'মুনিষদের' জন্যে মুড়ি নিয়ে, শেষে পঙ্গপালে ধান নষ্ট করছে দেখে তিনি ছুটে গিয়ে ক্ষেতে ক্ষেতে ধান সংগ্রহ করেছেন। মা সারদার পর শ্যামাসুন্দরীর পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে হ'য়েছিল—ছেলেবেলায় ভাইবোনদের লালন পালন করতে মাকে তিনি সাহায্য করতেন। পশুপালনও ছিল তাঁর দৈনন্দিন কার্য। তাঁর গুণে খেলার সঙ্গিনীরা মুগ্ধ হ'ত। বাল্যকালে শ্রীশ্রীমার প্রধান খেলা ছিল কালী বা লক্ষ্মী মূর্তি গড়ে পূজা করা—পূজা করতে করতে তিনি ভাবে বিভোর হ'য়ে যেতেন। শান্ত সরলতার সঙ্গে গাম্ভীর্যভাব, সচরাচর বালিকাদের মধ্যে দুর্লভ। আমাদের গদাধর যাঁর সঙ্গে তাঁর মর্ত্যলীলা প্রকট হয়েছিল, তিনিও শৈশবে শ্রীকৃষ্ণ ও নিমাই-এর মতো দুরন্ত ছিলেন; অবশ্য চঞ্চলতার মধ্যেও তাঁর প্রকৃতিতে পরিস্ফুট হ'ত নির্জনতা-প্রীতি, একাগ্রতা ও ভাবতন্ময়তা।

মা দুঃখের বেশ ধরে দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে জন্ম নিয়েছিলেন, তাই তাঁর মা শ্যামাসুন্দরীর সকল প্রকার সংসারের কাজে তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করতে হয়েছে,—চরকায় সুতো পর্যন্ত কেটেছেন। ছয় বছরের মেয়ে যখন বিবাহের পর কামারপুকুরে পতিগৃহে যাত্রা করলেন তখন শ্যামাসুন্দরী তাঁর নয়নের মণি সারদার অভাবে সংসারের সকল দিকে অন্ধকার দেখেছিলেন—তাঁর মৌনম্লান মুখে হাসি ফুটতে বেশ বিলম্বই হয়েছিল।

পাঁচ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমার বিবাহ হ'ল দক্ষিণেশ্বরের ভাবোন্মাদ পূজারী ঠাকুরের সঙ্গে। পাত্রের বয়স যখন চব্বিশ তখন পাত্রী হ্লাদিনী শক্তির জীবন্ত বিগ্রহরূপিণী মা সারদা ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করেছেন। ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে এই দুইটি হৃদয়ের পার্থিব লীলাঘর রচনা করবার জন্যে শুভ বিবাহের দিন নির্ধারিত হ'ল। বিবাহ-রাত্রেই গদাধরের হাতের মাঙ্গলিক সূত্র বরণ-ডালার প্রদীপ-শিখায় দগ্ধ হ'য়ে যায়। অপ্রসন্না পুরনারীদের তীব্র মন্তব্য ও সর্বপ্রকার অমঙ্গলের

দুঃশ্চিন্তা দূর ক'রে তাঁদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন সুকণ্ঠ গদাধর সুমধুর শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে।

বাসর-কক্ষ থেকেই শ্রীশ্রীমার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাতীত আত্মিক সম্বন্ধ—এইখান থেকেই মায়ের আজীবন মহাব্রতের সূত্রপাত। তার পর পতিগৃহে এসে চন্দ্রমণির লক্ষ্মীর ঝাঁপি মাথায় ক'রে নিয়ে শ্রীশ্রীমা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করলেন। গদাধর দ্বিতীয়বার শ্বশুরালয়ে গেলে বালিকাবধূ স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে স্বামীর চরণ ধৌত ক'রে স্বহস্তে পাখার বাতাস দিয়ে তাঁর শ্রান্তি দূর করেছিলেন। মায়ের বুদ্ধিমত্তা, প্রীতির নিদর্শন ও পতি-ভক্তি, যা শৈশবে প্রকাশ পেয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে পরম বিস্ময়।

শ্বশুরালয়ে কয়েক দিন থেকে গদাধর নববধূকে নিয়ে কামারপুকুরে ফিরে গেলেন। মাতৃভক্ত গদাধর জননীর ইচ্ছানুসারে কিছু কাল কামারপুকুরে ছিলেন ; আর পারলেন না, তাঁর সাধনভূমি দক্ষিণেশ্বর তাঁকে ডাক দিল। এর পর থেকে বিরহিণী বধূকে কখন পতিগৃহে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাছে, কখনও বা পিত্রালয়ে অবস্থান করতে হ'ত।

মা ছেলেবেলায় কয়েকদিন মাত্র পাঠশালায় গিয়েছেন, শ্বশুরালয়ে অবসর-সময়ে পাঠাভ্যাস করতেন, এতেও তাঁকে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে, তবু তাঁর উৎসাহ হ্রাস পায় নি। পরবর্তীকালে মা অল্প স্বল্প পড়তে পারতেন এবং আবৃত্তি ক'রে শুনিয়েছেন কত সঙ্গীত ও ছড়া ; আর আমরা পেয়েছি তাঁর বহু অমূল্য বাণী।

তন্ত্র ও বেদান্ত সাধনার শেষে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে এলে জয়রামবাটী থেকে লোক পাঠিয়ে শ্রীশ্রীমাকে আনা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আনয়নের ব্যাপারে আপত্তি করেন নি, উল্লসিতও হন নি ; কিন্তু ভৈরবী ব্রাহ্মণী চিন্তিত হয়ে ছলেন। দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থেকে ব্রাহ্মণী তাঁকে অবতার-পুরুষ জেনেও মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত হয়েছিলেন, কিন্তু তোতাপুরী নিঃশঙ্ক ছিলেন—তিনি বলেছিলেন, 'বিয়ে হয়েছে তো কি হয়েছে, যার আত্মসংযম আর আত্মজ্ঞান পাকা, তার মন টলাতে কেউ পারে না'—মনে যে গেরুয়া পরেছে, তারই তো হয়েছে আসল সন্ন্যাস—ব্রাহ্মণী হয়তো ভেবেছিলেন এই দম্পতীর সংযমের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। যা হোক ব্রাহ্মণী ভৈরবীর দুশ্চিন্তাও উদ্বেগ অচিরে অপসারিত হ'য়ে গেল। ব্রাহ্মণীর অন্তরে যে চিন্তার আলোড়ন উঠেছিল, শ্রীশ্রীমা তা অনুমান করেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণীর এ রকম আচরণ সম্পর্কে তিনি নীরব ছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীমুখ থেকে ব্যক্ত হয়েছে—'বামনী-ঠাকরুণের আচরণ প্রথম প্রথম কেমন খাপছাড়া মনে হ'ত, কিন্তু তাতে আমার মনে কোন ক্ষোভ হয় নি। তিনি যে ঠাকুরের গুরু-মা গো। আমি তাঁকে নিজের মা আর শাশুড়ী ঠাকরুণের মতই ভক্তি করতুম।'......সন্তানের মঙ্গলের জন্যেই গুরুজনেরা সময় সময় কঠোর আচরণ করেন। গুরুজনের কোন কাজেই দোষ দেখতে নেই।

তাঁহার অক্লান্ত সেবা-যত্ন পেয়ে ঠাকুরের ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হ'লে মা বলেছেন—'ঠাকুরের সঙ্গে কামারপুকুরে এই কয়মাস নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে কেটেছে ; কত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, কত রঙ্গরসের কথা হ'ত, দিনরাত যে কোন্ পথে চলে গেছে তা বুঝবারও অবসর পাওয়া যেত না।

কামারপুকুরে ছয় সাত মাস এমনি ভাবে কাটিয়ে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন। মা সারদাও জয়রামবাটীতে ফিরে গেলেন। তাঁর চিত্ত স্বামীর ধ্যানে মগ্ন থাকত ; তিনি অনুভব করতেন 'হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণ ঘট' পূর্বের মতই রয়েছে। পিত্রালয়ে তাঁকে গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকতে দেখা যেত—তাঁর মন ছিল নির্লিপ্ত, দিব্যভাবে মগ্ন।

এমনিভাবে দু'বছর চলে গেল। মথুরবাবু ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এদিকে যখন মায়ের

কানে এসে পৌঁছল—ছোট ভটচায পাগলের মতো হয়েছে, কোমরে কাপড় থাকে না, কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন বেহুঁশ থাকে, কখনও কথা বলে না, তখন তিনি চঞ্চল হ'যে উঠলেন—ধীরা স্থিরা অচঞ্চলা কিশোরীর মন দিব্য পুরুষের জন্য ব্যাকুল হ'ল—এই ভেবে যে, কে তাঁর সেবা করছে, আর কেই বা তাঁকে দেখছে। পল্লীমেয়েরা তাঁর কাছে আসতে লাগল পাগলা স্বামীর জন্যে সমবেদনা জানাতে, মা গম্ভীর হ'য়ে থাকতেন।

১২৭৮ সাল, দোল-পূর্ণিমা আগতপ্রায়। এই উপলক্ষে শ্রীসারদামণির কয়েকজন দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া গঙ্গাস্নানের জন্যে কলকাতায় যাত্রা করছেন শুনে মা তাঁদের সঙ্গী হবার অভিপ্রায় জানাতে, রামচন্দ্র স্বয়ং তাঁকে নিয়ে কলকাতার দিকে রওনা হলেন, পথ প্রায় ত্রিশ ক্রোশ। পায়ে চলা পথ ধ'রে সকলে দলবদ্ধ হ'যে তারকেশ্বরের পথে যাত্রা করলেন। পদব্রজে দুই ক্রোশের অধিক পথ মা সারদা কখন অতিক্রম করেন নি। দুদিন চলবার পর তিনি দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। এই অবস্থায় তাঁর দিব্যদর্শন হয়েছিল। গভীর রাত্রে তিনি এক শ্যামাঙ্গী নারীর স্নেহশীতল স্পর্শ অনুভব করলেন। মা বলেছেন—'বসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিযে দিতে লাগল—এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে গেল। বললে, আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।' ঠাকুরের দর্শনলাভের ব্যাকুলতা প্রকাশ ক'রে যখন শ্রীশ্রীমা জ্বরে পীড়িতা হওয়ার জন্যে আক্ষেপোক্তি করলেন, তখন সান্ত্বনা দিয়ে সেই নারী বললেন—'সেকি, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি, ভালো হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে, তোমার জন্যেই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি'।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সেই নারী বললেন—'আমি তোমার বোন হই'। এই সব শুনতে শুনতে মা ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন মেয়েকে সুস্থ দেখে রামচন্দ্র আবার যাত্রা আরম্ভ করলেন আর মেয়েকে পালকিতে তুললেন। যথা সময়ে শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বর এলেন। ঠাকুর তাঁকে সাদরে আহ্বান ক'রে ব'লে উঠলেন—'এতদিন পরে এলে? আর কি সেজো বাবু আছে যে, তোমার যত্ন হবে' সেজো বাবু মথুরানাথের অকাল বিয়োগে ঠাকুর কাতর হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সহৃদয় দাক্ষিণ্য পেয়ে পরম প্রীতি লাভ করলেন। ঠাকুরের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ও ঔষধ-পথ্যাদিতে মা আরোগ্যলাভ করলেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে নিজের ঘরেই পৃথক শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন,—কখন কখন উভয়ে এক শয্যাতেও শয়ন করতেন। ঠাকুর প্রায়ই দিব্যভাবে মগ্ন হতেন। এসময়কার রাত্রির কথায় শ্রীশ্রীমা বলেছেন—'সে কি অপূর্ব দিব্যভাব। কখনও ভাবের ঘোরে কথা, কখনও হাসি, কখনও কান্না, কখনও একেবারে সমাধিতে স্থির—এই রকম সমস্ত রাত। দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপত, আর ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে'।

শ্রীশ্রীমার সঙ্গে এক ঘরে এক শয্যায় শুয়েও দৈহিক সম্পর্কশূন্যতা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন, 'ও যদি এত ভালো না হ'ত, তবে দেহবুদ্ধি আসত কিনা—কে বলতে পারে?'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদামণির অতীন্দ্রিয় দাম্পত্য জীবন-লীলার অনুরূপ ছবি ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি। আহারের সময় ঠাকুর শিশুর ন্যায় আবদার-আপত্তি জানাতেন, পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করতেন না। মা তাঁকে অতিশয় যত্নের সঙ্গে এবং অনেক অনুরোধ ও কৌশলের দ্বারা ভোজন করাতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একদা রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন—'আমার মতো লোকের স্ত্রী কেন প্রয়োজন? এই দেখছ না, পেটে যা সয়, এমন সব খাবার ইনি না থাকলে এমন যত্ন ক'রে কে রেঁধে খাওয়াত? কে এই দেহের যত্ন করত?—নহবতখানার ক্ষুদ্র কক্ষে শ্রীমাকে কত অসুবিধার

মধ্যেই না থাকতে হয়েছে? তার মধ্যেই বিছানাপত্র, চালডাল, তরিতরকারি, থালাবাটি ইত্যাদি সংসারের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস রাখতে মেঝেতে স্থান হ'ত না বলে দড়ির শিকাতে মাথার ওপরও নানা জিনিস ঝুলিয়ে রাখতেন শ্রীমা। একটু অসতর্ক হ'লেই মাথায় আঘাত লাগবার সম্ভাবনা ছিল, কখন মাথায় লেগে কষ্টে সংগৃহীত জিনিষপত্র মাটিতে পড়ে যেত। এই অপ্রশস্ত ঘরে ও অবস্থা-বিশেষে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির নীচেও রান্না হ'ত। আহারাদির পর আবার ধুয়ে মুছে এই ঘরের মধ্যেই শয়নের ব্যবস্থা—এত কষ্ট মা সহ্য করেছেন! এখানেই আশ্রয় পেত আত্মীয় অনাত্মীয় ভক্ত নারীরা। ছোট সঙ্কীর্ণ ঘরেই মাকে পূজা জপ-তপ করতে হয়েছে। আবার রাত্রি তিনটার সময় শৌচস্নানাদি অন্ধকারে সমাপ্ত করতে হ'ত। শ্রীশ্রীমা নিজেই বলেছেন—'রাত চারটায় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত—তাইতে চুল শুকাতুম তখন মাথায় অনেক চুল। একটুখানি ঘর, তা আবার জিনিষপত্রে ভরা। উপরে সব শিকে ঝুলছে। রাত্রে শুয়েছি মাথার উপরে মাছের হাঁড়ি কলকল করছে, ঠাকুরের জন্তে সিঙ্গিমাছের ঝোল হ'ত কিনা। তবু আর কোন কষ্ট জানিনে—কেবল যা শৌচে যাবার কষ্ট। দিনের বেলায় দরকার হ'লে রাত্রে যেতে হ'ত। কেবল বলতুম, হরি হরি।' বোধহয় অশোকবনে সীতাদেবীরও এরূপ কষ্ট ছিল না। কখনও কখনও দু'মাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতেন না। মনকে বোঝাতেন, 'মন তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি?'

শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবী অনেক সময়ে মায়ের সঙ্গে নহবতখানায় বাস করতেন ও মাকে কাজে-কর্মে সাহায্য করতেন। গৌরীমা বহু তীর্থে তপস্তার পর দক্ষিণেশ্বরে আসলে ঠাকুর তাঁকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—'ওগো ব্রহ্মময়ী, সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও একজন সঙ্গিনী এলো—'। বয়সে গৌরীমার অপেক্ষা শ্রীশ্রীমা চার বছরের বড় ছিলেন। মা অত্যন্ত লজ্জাশীলা; তাঁকে অবগুণ্ঠনবতী দেখা যেত—কোন পুরুষ মানুষের, এমনকি অন্তরঙ্গ সন্তানদের সামনেও বাহির হ'তে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতেন। একটি সঙ্গিনী পেয়ে শ্রীশ্রীমার নানা প্রকার সুবিধা হ'ল—বাইরের কাজে সংবাদ আদান-প্রদানে, ঠাকুরের পরিবেশনে মা-ঠাকরুণ গৌরীমার সাহচর্য পেয়েছিলেন। গোপালের মা, কৃষ্ণভাবিনী, গোলাপ-মা প্রভৃতিও মাঝে মাঝে এসে মায়ের কাছে থাকতেন।

শেষদিকে লোকজনের আনাগোনা এত বেড়ে গেল যে, তাঁর পক্ষে একটিবার ঠাকুরের দেখা পাওয়াই দুর্ঘট হ'য়ে উঠত। মা বলেছেন, 'অনেক দিন দেখাই পেতুম না, একবার দেখা পেলে ভাবতুম—আহা, আবার দর্শন পাবো তো?'

'কোন দিন ঠাকুরের ঘর একটু ফাঁকা দেখলেই গোপালের মা ছুটে এসে বলতেন,— ও বৌমা, শিগ্‌গির চলো, গোপালকে একটু দেখা দিয়ে এসো; তোমাদের একত্তর না দেখতে পেলে মনে আমার তৃপ্তি হয় না। ওঠ, শিগ্‌গির চলো, আবার কে কখন এসে পড়বে।—আমার আনন্দের জন্তে তাঁর মনে এত ভালোবাসা জমা ছিল।'

লক্ষ্মীমণি একদা বেলতলায় দেখেছিলেন—ঠাকুর শিবের মত যোগাসনে বসে আছেন, তাঁর বাম পাশে বসে মাতাঠাকুরাণী হাসছেন। তিনি ভাবতে লাগলেন—'একি হ'ল?' এইমাত্র খুড়িমাকে নবতে দেখে এলাম, দিনের বেলায় খুড়িমা এখানে এলেন কি করে? বিস্ময়াবিষ্টা হ'য়ে লক্ষ্মীমণি নহবত-খানায় ছুটে গিয়ে তাঁর খুড়িমাকে দেখলেন রন্ধনের আয়োজন করতে, পরনে সেই রকমই একখানা শাড়ী। তাঁকে কিছু না বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছু'টে গিয়ে তিনি বেলতলায় সেই দৃশ্যই দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন।

একবার জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসবার সময়ে তারকেশ্বরের পথে তেলোভেলো মাঠের কাছে অতি বিস্তীর্ণ নির্জন প্রান্তরে সন্ধ্যার পর মা-ঠাকুরাণী ডাকাতের সম্মুখে পড়েছিলেন। এই সব ডাকাত শুধু যাত্রীদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিত না, সময়ে সময়ে খুনও ক'রত—কালীর সম্মুখে নরবলিও দিত। মা ডাকাতকে যাদুমন্ত্রে যেন করায়ত্ত করেছিলেন। ভীতিবিহ্বল প্রান্তরের মধ্যে একাকিনী শ্রীশ্রীমাকে ডাকাতগৃহিণী আশ্বস্ত ক'রে, আদর-আপ্যায়নের দ্বারা চটির কুটীরে বেখে দিয়ে পরদিন তারকেশ্বরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। পরবর্তীকালে এই ডাকাত-দম্পতী দক্ষিণেশ্বরে তাদের কন্যা ও জামাতার জন্যে ফল মিষ্টান্ন এনেছে—আর এনেছে তাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ডাকাতের পিতাপুত্রী সম্বন্ধ হয়েছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী সেবার উদ্দেশ্যে দশ হাজার টাকা ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত করলে ঠাকুর সে টাকা মাকে নিতে বলেছিলেন। মা উত্তরে বলেছিলেন—'সে কি হয়? আমি নিলেও তোমার নেওয়া হবে, সে টাকা তোমার সেবাতেই খরচ হবে। তুমি যে-টাকা নেবে না, আমি তা কি ক'রে নেব? ও টাকা আমাদের চাইনে'।

পরমহংসদেব বলতেন—'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই, যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন তখন শক্তি বলি, কিন্তু একই বস্তু। অগ্নি বললে অগ্নি দাহিকাশক্তি বুঝায়, দাহিকাশক্তি বললে, অগ্নিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে অন্যটাকে চিন্তা করবার যো নেই'— এই কথারই তিনি রূপ দিয়ে গেছেন শ্রীশ্রীমার সঙ্গে তাঁর জীবন-লীলার মধ্য দিয়ে। মাতৃতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। বাইরের মানুষ দেখেছে তাঁকে অবগুণ্ঠনবতী, তাঁকে চিনতে পারে নি, তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারে নি, তাঁর রূপের বিভূতিকে প্রত্যক্ষ করেনি। মাতৃশক্তি দ্বার না খুলে দিলে পরমপুরুষের কৃপা কেমন ক'রে হবে? আর কেমন ক'রেই বা জ্ঞান-প্রজ্ঞানের ভেতর প্রবেশ করবার অধিকার পাওয়া যাবে। এ কথা ক'জনই বা বুঝেছে, আর ক'জনই বা ভেবেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিভ্রান্ত বিশ্ববাসীকে সত্য উপলব্ধি করাবার জন্যে আত্মতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের মূল সূত্রটি দেখিয়ে দেবার জন্যে আর বিশ্বের সমগ্র নারীজাতিকে শ্রেষ্ঠস্থানে বসিয়ে পৃথিবীর পূজা অর্পণ করবার জন্যে আজীবন মাতৃসাধনা ক'রে গেছেন, আর মাতৃপূজায় পূর্ণাহুতি দিয়েছেন ষোড়শী-পূজায়। জগতের কল্যাণ কামনা ক'রে তিনি শ্রীশ্রীমাকে আত্মপ্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—'হে মহাশক্তি, তুমি প্রকাশিত হও।'

তাঁর পূজা বন্দনা ব্যর্থ হয় নি। তাঁর পূজিতা অবগুণ্ঠনবতী সহধর্মিণী আবরণ উন্মোচন ক'রে ধীরে ধীরে নিজেকে বিশ্বকল্যাণের জন্যে জগজ্জননীরূপে প্রকাশ করেছিলেন। ভাবীযুগের জনক-জননীর রূপ ধারণ ক'রে ভিন্ন দেহে মহাশক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে ভাবে দক্ষিণেশ্বরে লীলা ক'রে গেছেন তা কোন যুগে হয়নি, কখনও হবে কি না জানিনে। পার্থিব-সম্পর্কভাব-বিবর্জিত দেহাত্মবোধ-বিস্মৃত এক অতীন্দ্রিয় লোকের রহস্যঘন আবরণে আবৃত ব্রাহ্মণদম্পতী দেখার অতীতরূপে আপনাদের মর্ত্যলীলা দেখিয়ে গেছেন। ভবতারিণী মন্দিরের অনতিদূরে প্রাঙ্গণসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীফলহারিণীর পূজার দিন শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণীকে পূজা ক'রে বারংবার প্রণত হয়েছিলেন এবং তাঁর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি ও নানা উপচার নিবেদনের পর সাধনার জপমালা অর্পণ ক'রে বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করেছিলেন। পূজা-সমাপনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর উভয়েই সমাধিমগ্ন—এ চিত্র সম্পূর্ণ অভিনব! সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও এরূপ মহিমময় ঘটনার অবতারণা হয় নি।

শ্রীশ্রীমা একদিকে ঠাকুরের সহধর্মিণী, সেবিকা, শিষ্যা ও অনুগতা উপাসিকা, অপরদিকে তাঁর

উপাস্য ইষ্টমূর্তি , ব্যবহারিক জীবনে বরণীয়া শ্রদ্ধেয়া গৃহিণী আর পারমার্থিক সাধনায় জাগ্রতা কুলকুণ্ডলিনী। ঠাকুরের ভাবাবস্থায় সারদামণি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'বল দেখি আমি কে ?'—ঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন—'যে মা ঐ নহবতখানায় আছেন—যিনি এই দেহের জন্ম দিয়ে'ছন, যে মা ঐ মন্দিরে জগজ্জননীর প্রতিমারূপে রয়েছেন—সেই মা এইরূপে এখানে সেবা করছেন'।

শ্রীশ্রীমাও স্বামীর মধ্যে জগন্মাতার দিব্যলীলা দর্শন করতেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট ঠাকুর মহাসমাধিমগ্ন হ'লে তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—'মা কালী গো, কোথায় গেলে গো ?' ঠাকুরের মহাপ্রস্থানের পর শ্রীশ্রীমাই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রাণশক্তিদাত্রীরূপে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন—তাঁর সন্তানেরা মাতৃস্নেহে পুষ্টিলাভ ক'রে বিশ্বজগতে রামকৃষ্ণ-মহিমা প্রচার-দ্বারা ভারতের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেছেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা বহুতীর্থে গিয়েছেন, কিন্তু বৃন্দাবনেই তাঁর মন খুব বসেছিল। এখানে প্রায়ই তাঁর সমাধি হ'ত, বার বার সমাধি হওয়ায় অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন, মাও বুঝি মর্ত্যলীলা সংবরণ করতে উদ্যতা।

মাতাঠাকুরাণী যে সময়ে বেলুড়ের কাছে ঘুষুড়ির এক বাড়ীতে বাস করছিলেন, সে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রব্রজ্যায় যাত্রার পূর্বে এই স্থানে এসে সর্বার্থসাধিকা মায়ের চরণ বন্দনা ক'রে প্রার্থনা করেছিলেন—ঠাকুরের নাম যেন সারা পৃথিবীতে জয়যুক্ত হয়।

বরপুত্রকে শ্রীশ্রীমা প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীমাকে 'জ্যান্ত দুর্গা' -রূপে দেখতেন। বাবুরাম মহারাজের মা দুর্গা-পূজা করবেন শুনে তিনি লিখেছিলেন—'বাবুরামের মার কি ভীমরতি হয়েছে, জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির প্রতিমা পুজো করতে যাচ্ছে।' গিরিশচন্দ্র ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর বাড়ীতে দুর্গাপূজা করবার সময়ে শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাটী থেকে এনেছিলেন। শ্রীশ্রীমা বলরামবাবুর বাড়ীতে এসে অবস্থান করতে লাগলেন। মহাষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার কিছু আগে গিরিশচন্দ্র শুনতে পেলেন যে, মা আসতে পারবেন না—জ্বর হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের অন্তর ভেঙে পড়ল। বললেন—মা না এলে কার পূজা হবে ? সন্ধিপূজার সময় হ'য়ে এল, গিরিশচন্দ্রকে উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকবেন না ব'লেই ঠিক করেছিলেন, এমন সময়ে শুনতে পেলেন—'ও গিরিশ, মা এসেছেন, শিগগির এসো।' আনন্দে দৌড়ে নীচে গিয়ে গিরিশচন্দ্র দেখলেন—মা প্রতিমার সম্মুখে। গভীর রাত্রিতে ছিল সন্ধিপূজা। বলরামবাবুদের বাড়ীর পাশের গলি দিয়ে মা হেঁ'টে এসেছিলেন আর গিরিশচন্দ্রের বাড়ীর পিছনের দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে করাঘাত ক'রে ডেকেছিলেন, 'ওগো, আমি এসেছি, দরজা খোলো।' ঠিক সেই সময়ে সন্ধিপূজা শুরু হয়েছে।

জীবনের নানা বিচিত্র সত্যকে মা গভীর-ভাবে উপলব্ধি করেছেন—প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাঁর অন্তরে কত ভাবই না ফুটিয়ে তুলত। শ্রী ও হ্রীর পরিপূর্ণতাই লক্ষ্য করা গেছে মায়ের মধ্যে।

শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে শ্রীশ্রীমা রামলালদাদার পত্নীকে বলেছিলেন—'ওর কি কম দুঃখু বৌমা ! ব্যথায় ওর বুকটা যে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। দেবতা আর অসুরে মিলে যে যার লভ্যগণ্ডার জন্যে সমুদ্দুরকে মন্থন করলে, ওর অতলগর্ভে লুকিয়ে রাখা ধনরত্ন, অমৃত, কত কি লুটে নিলে, শেষে কিনা ওর প্রাণাধিক কন্যা কমলাকেও কেড়ে নিলে ! পিতার এ বুক-চেরা দুঃখু কি কম গা ? মেয়েকে একবারটি ফিরিয়ে পাবার জন্যে সমুদ্দুরের এত আর্তনাদ।' এরূপ মৌলিক চিন্তাধারাই বা কজনের মধ্যে পাওয়া গেছে !

১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীশ্রীমা গোপাল

চন্দ্র নিয়োগী লেনে (বর্তমান ১নং উদ্বোধন লেনে) আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহপ্রবেশ করেন। এই দেবী-পীঠেই জ্ঞানভক্তির যুগল ধারায় নিত্য নিষ্ণাত হ'য়ে 'উদ্বোধন' এ যুগের শক্তি-উপাসনায় আত্মসমাহিত। এখানে বসেই শ্রীশ্রীমা দিয়ে গেছেন ভাবী মানুষের পথনির্দেশ; এখানেই তাঁর অর্চনা ক'রে গেছেন সিষ্টার নিবেদিতা, সিষ্টার ক্রিশ্চিয়ানা, ধীরামাতা, দেবমাতা প্রভৃতি সাগরপারের জ্ঞানগরিষ্ঠা মহিলারা, মাতৃরূপে এখানেই মা অধিকাংশ থেকেছেন, দীক্ষা ও উপদেশ দিয়েছেন ও স্নেহাঞ্চল পেতে সন্তানদের আশ্রয় দিয়ে ভাবস্তন্য পান করিয়েছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য মহিলাদের ও ভাবের আদানপ্রদান চলত। এ প্রসঙ্গে কালা-বৌ জিজ্ঞাসা করেছিল—'হ্যাঁ মা, আপনি তো ইংরেজী জানেন না, তবে দেবমাতাকে বোঝাচ্ছেন কি ক'রে?' মা হেসে বলেছিলেন—'প্রাণের একটা আলাদা ভাষা আছে কিনা, তাই প্রাণে প্রাণে সব বোঝা যায়!' পাশ্চাত্ত্য মহিলারা রামকৃষ্ণ-সাধনায় তন্ময় হ'য়ে থাকতেন, আর মায়ের কাছে তাঁরা জপ ধ্যান পূজা প্রভৃতির ক্রিয়াপদ্ধতি শিখতেন।

মা বলতেন—'খুব জপ করবে। সংসারের কাজের শেষ নেই, কাজ করতে করতে জপ করবে।' 'জপাৎ সিদ্ধি', জপ হ'তেই সিদ্ধি আসে······ নারীর সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'কন্যারূপে, পত্নী-রূপে, মাতৃরূপে সকলরূপে সেবা করাই নারীর ধর্ম। মেয়েমানুষের পবিত্র থাকা কি কম জিনিস। সতী-মেয়েমানুষেরসা মনে মুনি ঋষি দেবতা গন্ধর্ব হাত জোড় ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।'—মেয়েদের বিদ্যাবুদ্ধি বড় কথা নয়, রূপ-গুণও বড় কথা নয়, মেয়েরা মঙ্গলঘট—পবিত্রতার। জামা সেমিজ সাজসজ্জায় কিছুতে শুচিতা রক্ষা হয় না—নারী শুদ্ধ থাকে যদি তার দেহ মন শুদ্ধ থাকে।

মা আরও বলেছেন—'স্বামীর ভালোমন্দর প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন স্ত্রীর কর্তব্য, তেমনি স্ত্রীর ধর্ম রক্ষা করাও স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। সংসারে নানা অশান্তির কারণ আছে, মনকে যতটা তাঁর ওপর রেখে থাকতে পারো ততই প্রাণে সুখ ও শান্তি, না হ'লে অশান্তি; যে কদিন সংসারে থাক কেবল ভগবানকে ডাক। ভালবাসাতেই ভক্তি হয়। কোন জিনিসকে নাড়াচাড়া করতে করতে—ভালবাসা আসে, কালো কুচ্ছিৎ একটা ছেলেকেও নাড়তে চাড়তে আরম্ভ করলে আস্তে আস্তে তার ওপর টান আসে, ভালোবাসা আসে।

বহু সন্তানের অসঙ্গত আবদার তাঁকে রাখতে হয়েছে, অনেকের অবিবেচনার জন্যে তাঁকে অনেক অসুবিধাও ভোগ করতে হয়েছে। তিনি বলেছেন—'আমার কাছে এসে যে মা ব'লে দাঁড়ায়, তাকে যে আমি ফেরাতে পারিনে।' এই তো মায়ের প্রকৃত-মহিমা, বৃহত্তম পরিবার পেতে মা প্রত্যেক সন্তানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। প্রত্যেকেই তাঁর স্নেহের ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছে। আত্মকেন্দ্রিকতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি।

১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ঘনিয়ে আসবার কয়েকদিন আগে যখন শ্রীমার জীবন-সূর্য অস্ত-দিগন্তের কোলে আত্মগোপন করবার জন্যে উদ্যত হ'ল, তখন তিনি করুণার্দ্র-কণ্ঠে বললেন—'যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানকেই জানিয়ে দিও মা—আমার ভালোবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে'।

তারপর এল সেই বিদায়ের মহালগ্ন। শ্রাবণের রাত্রে বাদলের ধারার মত ব'য়ে গেল চতুর্দিকে অবিশ্রান্তবেগে অশ্রুধারা। বিদায়ের ক্ষণেই কি এল মিলনের পরম মুহূর্ত। প্রকৃতিও প্রণতা হ'য়ে রইল। পূর্ণাহুতির শেষে শুরু হ'ল বর্ষণমুখর শ্রাবণের আর্তনাদ—মাতৃহারা সন্তানেরা কাতর হ'য়ে ডেকে উঠল—'মা, মা—'!

মা এসেছিলেন কল্যাণী কৌমারী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে, আর দেবীত্বকে জাগ্রত করতে নারীর

মধ্যে, সে কাজ সম্পূর্ণ ক'রে রূপের ঘর থেকে বিদায় নিলেন—আমাদের হৃদয়ের আসনে বসে রইলেন শ্রীশ্রীমা সারদেশ্বরী হ'য়ে, জাতিধর্ম ও দেশকালের অতীতলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা সারদার করুণা আজও বর্ষিত হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পর যতবারই শ্রীশ্রীমা বৈধব্যের বেশ ধারণ করতে গেছেন লৌকিক আচারের মর্যাদা দিতে, ততবারই ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে নিষেধ করেছেন, তাঁর পক্ষে সধবার বেশ ত্যাগ করা কোন দিনই হয়নি। এজন্তে অজ্ঞ গ্রামবাসীরা বক্রোক্তি করেছে, শেষে যখন তারা বুঝতে পারল তখন সমালোচনা থেকে বিরত হ'ল।

প্রথমে যে দিন শ্রীশ্রীমা সোনার বালা খুলছিলেন, ঠাকুর তাঁর হাত ধ'রে বলেছিলেন—'আমি কি মরেছি যে, বিধবার বেশ ধরবে? গৌরীকে জিজ্ঞাসা করো, সে ও-সব শাস্ত্র জানে।' ঠাকুর অদৃশ্য হওয়ায় মনে তাঁর দৃঢ় ধারণা হ'ল— না না, তিনি আছেন, আজও আছেন, আমার কাছেই আছেন।

আমাদের মনে অনুরূপভাবে দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে শ্রীশ্রীমা আছেন, আজও আছেন, আমাদের কাছেই আছেন। আজ যদি এসে থাকে বিশ্ব-মন্দিরে আমাদের প্রদীপ তুলে ধরার পরম ক্ষণ, তাহ'লে সে প্রদীপে যেন জ্বলে জনক জননী রামকৃষ্ণ সারদার আলোকবর্তিকা। আজ যদি এসে থাকে আমাদের ফসল তোলার দিন, তা হ'লে সে দিনকে সুন্দর ক'রে তুলতে যেন আমরা সন্ধান করি কোন্ সে ক্ষেত্রে কোন্ বর্ষণমুখর ক্ষণে অমৃতের বীজ বপন করা হয়েছিল—যার ফলে প্রত্যক্ষ হয়েছে দিকে দিকে ছায়াশীতল মেঘচুম্বী বনস্পতি, আর দিগন্তবিস্তৃত ফলভারে নুয়ে-পড়া সুরম্য বীথি-বিতান।

পূর্ববর্তী অবতার পুরুষদের জীবন-কাব্যে উপেক্ষিতা হ'য়ে রয়েছেন তাঁদের সহধর্মিণীরা। নিজেদের স্বামীর ব্যক্তিত্বের অন্তরালে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্বকে নিঃশব্দে লুকিয়ে রেখে আত্মবিলোপের সাধনা ক'রে গেছেন—কত নিদ্রাবিহীন রাত্রি গেছে তাঁদের প্রতীক্ষায় কেটে, পদধ্বনি শুনবার আশায় কত মুহূর্তই না তাঁদের কেটে গেছে উৎকণ্ঠায়, কত দুষ্কর তপস্যাই না তাঁরা ক'রে গেছেন স্বামী দেবতার চিত্র বুকে ক'রে—কত ত্যাগ, কত মায়ামমতার অভিব্যক্তি, কত আত্মনিবেদন ব্যথাবেদনার ইতিহাস, কত নিঃশব্দে ধ্যান-মৌনা তপস্বিনীর মত জীবনযাপনই না তাঁদের ভেতরে অনুক্ত রয়ে গেছে—কে তার সংখ্যা করবে, আর কে-ই বা করবে সন্ধান!

কিন্তু রামকৃষ্ণ-অবতারে তার ব্যতিক্রম। শ্রীশ্রীমাকে তিনি কাছে রেখে রূপায়িত ক'রে গেছেন স্বচ্ছ মধ্যদিনের মত। তাঁর বিচিত্র সাধনার চৈতন্য-শক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী, নিত্যলীলাসঙ্গিনী, সহচরী, সেবিকা—মায়ের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন ভবতারিণীকে। এই ব্রহ্মময়ী সারদাসুন্দরী মানব-সভ্যতার ইতিহাসের এক অপূর্ব বিচিত্র অভিব্যক্তি—বিশ্বের অনন্যসাধারণা শ্রেষ্ঠা মহীয়সী নারী। তাঁরই লীলার ভাষ্য করেছেন পার্থিব ও আধ্যাত্মিক লোকের বিশিষ্ট কৃতী পুরুষগণ।

শ্রীশ্রীমা যে সত্যধন আমাদের জন্যে রেখে গেছেন, নিজেদের সাধনার দ্বারা সেই ধনের যেন গৌরব ও মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখে যেতে পারি, আর যুক্তিবাদীদের ব'লে যেতে পারি, বস্তুবিশ্বের অন্তরালে বহু রহস্যই প্রতিভাত হ'য়ে থাকে, যা মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর, সেখানে যুক্তিতর্ক মূক ও নাস্তিকতা নীরব।

শরণাগতি

স্বামী জীবানন্দ

ধর্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণ সখা অর্জুনকে জ্ঞান ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মের কত উপদেশ দিলেন—উপনিষৎ-অরণ্য থেকে শ্রেষ্ঠ পুষ্পগুলি চয়ন ক'রে মালা গেঁথে সখার গলায় পরালেন, তবু তো অর্জুনের বিষণ্ণতা গেল না—তাই সর্বশেষে অতি গুহ্য কথা তাঁর শ্রীমুখ থেকে উদ্গত হ'ল :

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—এই অভয়বাণী অর্জুনের প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করল—তিনি পরম নিশ্চিন্ততায় শ্রীভগবানের শরণাগত হ'লেন।

সাধকের অমূল্য সম্পদ 'শরণাগতি' গীতার শেষ কথা : হে জীব, সব কিছু ছেড়ে একমাত্র ভগবানকেই আশ্রয় করো। শরণাগতি-লাভের উপায় কি? উপায়—ঈশ্বরলাভের পক্ষে অনুকূল কর্ম করা এবং প্রতিকূল অর্থাৎ ঈশ্বরলাভের পথে বিঘ্নকর কর্ম না করা, সকল অবস্থায় শ্রীভগবানকেই একমাত্র সহায়, আশ্রয় ও রক্ষাকর্তা ভাবা।

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন, সাধনের অভ্যাসের তারতম্যবশতঃ শরণাগতির তিন প্রকার ভূমিকাভেদ হয় : 'ঈশ্বরের আমি', 'ঈশ্বর আমার' এবং 'আমিই ঈশ্বর'।

তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।

ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ॥

শরণাগতির প্রথম ভূমিতে বোধ হয় 'আমি তাঁহার' —এখানে শরণাগতি মৃদু। উদাহরণ :

সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।

সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ।

—শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত-ষট্পদী

"হে নাথ, ভেদ চ'লে গেলেও চিরকাল 'আমি তোমার', 'তুমি যে আমার' ইহা কখনও নয়। সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ না থাকলেও সকলেই বলে 'সমুদ্রের তরঙ্গ', 'তরঙ্গের সমুদ্র' কেউ তো বলে না।"

ভক্ত ও ভগবান স্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু শরণাগতির প্রথম অবস্থায় ভক্ত নিজেকে ভগবানের অংশ ছাড়া চিন্তা করতে পারেন না। নিজের যা কিছু সব ঈশ্বরের উপর সমর্পণ ক'রেই তাঁর আনন্দ। তাঁর ইহকাল পরকাল, সুখদুঃখ, ভালমন্দ, ধর্ম অধর্ম ভগবানের উপর দিয়ে—ভগবান যখন যেভাবে রাখেন, সেইভাবেই থাকতে চান তিনি—যেন 'ঝড়ের এঁটো পাতা' হ'য়ে!

শরণাগতির প্রাথমিক ভাবটি ঘনীভূত হ'য়ে পরিপক্বতা লাভ করলে সাধক দ্বিতীয় ভূমিতে আরোহণ করেন। এখানে শরণাগতি মধ্যবলযুক্ত—বোধ হয় 'ভগবান আমার'। উদাহরণ :

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্।

হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ৩।৯৭

"হে কৃষ্ণ! জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছ, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? আমার হৃদয় থেকে যদি চলে যেতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝতে পারি।"

অন্ধ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের পথে নিঃসঙ্গ হ'য়ে চলেছেন, লীলাময় শ্রীভগবান খেলাচ্ছলে বালকবেশে তাঁকে পথের নির্দেশ দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বড়ই ইচ্ছা বালকবেশী কৃষ্ণের সুকোমল শ্রীহস্তখানি একটি বার স্পর্শ করেন। কোন রকমে একদিন হাত

ধ'রে ফেললেন—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল ; কিন্তু লীলাময় সম্পূর্ণরূপে ধরা দিলেন না, সবলে হাত ছিনিয়ে নিয়ে লুকোচুরি খেলতে লাগলেন।

ভক্তের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে। 'আমি তোমার'—এই ভাবটি অন্তর্হিত ; তার স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছে 'তুমি আমার' এই ভাব—তুমি আমার অন্তরের অন্তস্তলে। হৃদয়ের মধ্যে যে তোমাকে পুরে রেখে দ্বার রুদ্ধ ক'রে দিয়েছি—পালাবে কোথায়, কেমন ক'রে? প্রথম স্তর থেকে আরও নৈকট্যবোধ—অধিকতর আত্মীয়তা! পূর্বের অবস্থায় ছিল ঈশ্বরের উপর নিজেকে ছেড়ে দেওয়া—তাঁর উপরে জোর করা চলেনি—'এইটি করতে হবে' ব'লে। দ্বিতীয় স্তরে ভগবানের উপর জোর চলে—ভক্তের চিত্ত কুসুম অনুরাগের রঙে রঞ্জিত হ'য়ে ওঠে,—ভক্ত ভগবানের অপূর্ব লীলা আস্বাদন ক'রে ধন্য হন।

শরণাগতির তৃতীয় ভূমিতে অধিমাত্র অর্থাৎ শরণাগতির অবধি—সর্বোত্তম অবস্থা। এখানে সাধকের অদ্বৈতানুভূতি হয়—বোধ হয় 'আমিই তিনি'। উদাহরণ :

সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ,
পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে,
হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ॥

—বিষ্ণুপুরাণ যমগীতা, ৩।৭।৩২

"স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ ও আমি এবং বাসুদেব-স্বরূপ পরমপুরুষ একই, অদ্বিতীয়—এই প্রকার স্থিরনিশ্চয়ভাব যাঁদের হৃদয়ে সদা বিদ্যমান, হে দূত! তাঁদের কাছে তুমি কখনও যেও না। ব্রহ্মদৃষ্টি সম্পন্ন তত্ত্ববেত্তাদের দূর থেকে পরিত্যাগ ক'রে চলে যেও।" (দূতের প্রতি যমের উক্তি)

তৃতীয় স্তরে সাধকের যে উপলব্ধি তা অবাঙ্-মনসোগোচর—বোধে বোধমাত্র। যিনি সকল বস্তুর অন্তরাত্মস্বরূপ, সকলের সার ও আনন্দস্বরূপ, নিত্যমুক্ত ও নিত্যসত্তাস্বরূপ তিনিই সাধকের অন্তরে বাহিরে এবং সর্বত্র।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ প্রথমে শ্রীভগবানের স্তব আরম্ভ করলেন :

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে সর্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

কিন্তু এইভাবে স্তব করতে করতে তন্ময় হ'য়ে অবশেষে একেবারে তাদাত্ম্য লাভ ক'রে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলতে লাগলেন :

সর্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্বমহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

—সেই অনন্ত সর্বগত, তিনিই আমি। আমার থেকে সমস্ত উৎপন্ন, আমিই সমস্ত, আমাতেই সমস্ত, আমিই অক্ষর, নিত্য, পরমাত্মা, ব্রহ্ম ; সৃষ্টির পূর্বেও আমি, পরেও আমি। এখানে ভক্তের 'তিনি' জ্ঞানীর 'আমি'তে পরিণত হ'য়ে গেল—দ্বৈত অদ্বৈত, জ্ঞান ভক্তি, বেদান্ত ভাগবত—সব একত্ব লাভ করল।

শরণাগতির মূল উৎস ভালবাসা। জীবের অভয় আশ্রয় ভগবানকে ঐকান্তিকভাবে ভালবাসতে না পারলে আত্মসমর্পণ সম্ভব হয় না—সে যেমন তেমন ভালবাসা নয়, 'ভালবাসি ব'লে ভালবাসি, কেন ভালবাসি জানি না'—এইভাবের ভালবাসা!

শরণাগতির মূলে অনুরাগ হ'লেও ইহা যে ঈশ্বর-কৃপা সাপেক্ষ, তা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গিরিশচন্দ্রের 'বকলমা' দেওয়ার ঘটনাটি থেকে বেশ বোঝা যায় :

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর গিরিশচন্দ্র নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ চাইলে ঠাকুর তাঁকে সকাল সন্ধ্যায় ভগবানকে স্মরণ করতে

বললেন। গিরিশবাবু কোন নিয়ম-কানুনেরই ধার ধারেন না—স্নানাগারেরও কোন নিয়ম নেই তাঁর, কেমন ক'রে গুরুবাক্য পালন করবেন! নিরুত্তর রইলেন তিনি—উপদেশ-পালনে অসমর্থ হবেন কিনা কিছুই বলতে পারলেন না। করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শোবার আগে শুধু একটিবার মাত্র ভগবৎস্মরণের নির্দেশ দিলেন। গিরিশচন্দ্রের পক্ষে তাও সম্ভব নয় যে! চিন্তা ভয় নৈরাশ্যে তাঁর চিত্ত ব্যাকুল। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের অর্ধবাহ্যদশা, মধুরহাস্যে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত; তিনি ভাবমুখে বললেন, "তুই বলবি, 'তাও যদি না পারি'—আচ্ছা, তবে আমায় বকল্‌মা দে।"

'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাসের অধিকারী গিরিশবাবু মনে প্রাণে অনুভব করলেন, করুণার বিগ্রহ নররূপী নারায়ণ তাঁর ইহপরকালের সব ভার নিলেন,—আর ভাবনা কি? এখন থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। আনন্দে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হ'যে উঠল।

গিরিশচন্দ্র এখন নিশ্চিন্ত, কিন্তু শয়ন ভোজন উপবেশন সমস্ত কর্মের মধ্যেই ঐ এক চিন্তা 'শ্রীরামকৃষ্ণ আমার ভার নিয়েছেন,—কী অপার করুণা তাঁর!' নিয়মের বন্ধন এড়াতে গিয়ে ভালবাসার কঠিন বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন। "সাধন-ভজন-জপ-তপ-রূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত আছে, কিন্তু যে বকল্‌মা দিয়েছে তার কাজের অন্ত নেই—তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় ভগবানের উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটি করলে?"—গিরিশবাবুর এই ধরনের উক্তি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে কি ভাবে শরণাগতি বা ভগবানে আত্মসমর্পণের ভাবটি দিয়ে তন্ময় ক'রে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের হাত ধরে-ছিলেন; পিতা যেমন পুত্রের হাত ধ'রে থাকলে তার পতনের ভয় থাকে না—তেমনি গিরিশচন্দ্রেরও আর পদস্খলনের ভয় ছিল না।

সহস্র প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন কৃতকার্যতার আভাস দৃষ্টিগোচর হয় না, সব দিকেই শুধু ব্যর্থতার পরিহাস ও পুরুষকারের অক্ষমতার পরিচয়,—তখন শরণাগতি অবলম্বন ছাড়া কোন উপায়ই থাকে না! অনন্যোপায় অবস্থাতেই যে অনন্যশরণের আশ্রয়গ্রহণ! মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা (Free will)-র শক্তি আর কতটুকু। অসহায় অবস্থাতেই মানুষ আপন ক্ষুদ্র মনের ক্ষুদ্র ইচ্ছাটিকে ঈশ্বরের বিরাট মনের বিরাট ইচ্ছার সঙ্গে এক তানে মিলিয়ে দিতে চায় আর তার অন্তর-বীণায় যেন এই বাণী ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে:

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥

—যিনি আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করার পর তাঁকে বেদ প্রদান করেছিলেন, মুক্তির ইচ্ছায় (সুখ-দুঃখের পারে যাবার জন্যে) সেই আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক দেবতার শরণ নিলাম।

মহাপুরুষ-বাণী

'নাহং, নাহং; তুঁহু, তুঁহু, শরণাগত, শরণাগত'
এ কথাগুলি ঠাকুরের উচ্চারিত,—মহাবাক্য
জপ করলে সিদ্ধি হয়।

দুনিয়ার নরনারী—যা দেখে এলাম

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

ভ্রাম্যমাণের জীবনে সব চেয়ে বড় লাভ—আত্মীয়তার বোধ—যে বোধে দূর নিকট হয়, পর আপন হয়। দুই দুই বার নানা জাতির ও নানা ভাষাভাষীর সংস্পর্শে এসেছি—তার থেকে এই কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি বর্ণের বৈষম্য, ভাষার অন্তরাল, আহার ও বেশভূষা বিভিন্নতা মানুষকে দূর করে না; সব মানুষের অন্তরে রয়েছে এক সরল ও সহজ মানবতার বোধ যা সমস্ত ব্যবধান ও সমস্ত আড়ালকে অতিক্রম ক'রে পথিককে বুঝিয়ে দেয়:

'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।'

কিছুদিন পূর্বে বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষদে এক তদন্ত সভা বসেছিল—সেই সংসদে বড় বড় বৈজ্ঞানিক, নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক প্রভৃতি ছিলেন। তাঁদের গবেষণার ফল সিদ্ধান্ত হয়েছে—জগতে মানুষের সমস্ত বৈষম্যসত্ত্বেও মানুষ এক জাতি। ককেশাস, নিগ্রো, মঙ্গল প্রভৃতি নাম দিয়ে এই সাধারণ মানবত্বকে অস্বীকার করা মূঢ়তা।

আমি পণ্ডিত নই—হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছি—দেশে দেশে মানুষে মানুষে রয়েছে যে এক অখণ্ড সত্তার যোগ। নানা দেশের, নানা মানুষের মধ্যে আমরা পাই এক সর্বব্যাপী আত্মার স্পর্শ—যে আত্মা প্রিয়, সুন্দর, প্রেমপূর্ণ।

এটি বোঝাতে একটি গল্প বলি—গল্প নয়, সত্য ঘটনা। ইস্তানবুলের স্বপ্নময় প্রাসাদের পাশ দিয়ে নেমে চলেছি—'গোল্ডেন হর্ন' জাহাজ-ঘাটের দিকে—যাব এশিয়ার উপকূলে একটি শহরে—বসফোরাস প্রণালী পার হ'য়ে। এক জায়গায় কতকগুলি তুর্কী বসে চা পান করছিলেন। তাঁদের সম্বোধন ক'রে প্রশ্ন করলাম, আপনারা কেউ কি ইংরেজী জানেন?

একজন মলিন-বেশ বৃদ্ধ তুর্কী উঠে বললেন—অল্প অল্প জানি, আপনার কি প্রয়োজন?

বললাম, জাহাজ-ঘাটের রাস্তাটি বাতলে দেন যদি, বড়ই সুখী হই।

বৃদ্ধ হয়তো জাহাজের শ্রমিক, নয়তো ঐ ধরনের কোনও কাজ করেন—পানপাত্র সরিয়ে রেখে বললেন, চলুন, আপনাকে পথ দেখিয়ে দেব।

এই ব'লে বৃদ্ধ এগিয়ে চললেন।

সেখান থেকে জাহাজ-ঘাট দু' ফার্লং হবে। বৃদ্ধের সাথে সাথে চললাম—তিনি তুর্কীতে অন্য এক জনকে প্রশ্ন ক'রে টিকিট-ঘর জেনে নিলেন; তারপর টিকিট দিতে বললেন, আমি পকেট থেকে পয়সা বার করছি—বৃদ্ধ বললেন, রাখুন, আমিই টিকিট কাটছি।

তারপর তিনি আমাকে জাহাজে নিয়ে একটি সুন্দর আসনে বসিয়ে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। টিকিটের দাম নিলেন না—আমিও জোর ক'রে তা দিতে পারলাম না।

পথে চলতে চলতে বৃদ্ধ জেনে নিয়েছিলেন—আমি ভারতীয় হিন্দু—তাঁর পরিচয়ে বলেছিলেন তিনি তুর্কী মোসলেম। এ স্বজাতীয় বা স্বধর্মীর প্রতি আতিথেয়তা নয়। এখানে দেখে এলাম—মানুষের মহান্ দেবতাকে, যাঁর মহানুভবতা দেশোত্তর ও কালোত্তর।

তাই ভারতবর্ষের প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণতার মধ্যে রোজই শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিই এই নাম-পরিচয়-হীন ক্ষণিকের পথপ্রদর্শককে, আর স্মরণ করি কবিগুরুর কবিতা:

পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,

নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে কথা যে ভুলে যাই।

এখানেই তো দেখা পাই সেই বিশ্বদেবের—যিনি মানুষের জীবনে মহামহিমময় দীপ্তি পান।

ভারতবর্ষের বাহিরে যে জিনিসটি সব চেয়ে চোখে পড়ে সেটি হ'ল মানুষের জীবনের প্রতি প্রীতি। বহু শতাব্দীর দারিদ্র্য, পরাধীনতা ও অশিক্ষা আমাদের দেশের মানুষের স্বাভাবিক স্ফূর্তিকে নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে,—এখানে মানুষ যেন বাঁচতে চায় না—কোনও প্রকারে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে বৈতরণীর শেষ খেয়া পার হওয়ার জন্য সে ব্যগ্র। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ বলছে—তারস্বরে বলছে :

মরিতে চাহিনা আমি, সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

তাইতো তাদের কাজের অন্ত নেই, চেষ্টার সীমা নেই।

মরুকে তারা মরু ব'লে মানতে চায় না—তাকে করবে শস্য শ্যামল। দুরারোহ গিরিকে তারা সমীহ করবে না—তাকে করবে আরাম নিকেতন। প্রকৃতির সমস্ত বিরূপতা তারা সুশ্রী, শোভন ও সুন্দর ক'রে তুলতে চাইছে।

এই জীবন প্রীতি আছে ব'লেই তারা কেবলই কাজ করছে—তাদের কাছে অসময় নেই। নিউ ইয়র্কের একটি কলেজে আমি 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেখানকার সকল ছাত্রছাত্রীই পরিণতবয়স্ক। প্রথমে মনে করেছিলাম—তারা শুধু সেদিনের শ্রোতা। কিন্তু যে অধ্যাপকের শ্রেণী, তিনি আমার ভুল ভেঙে দিয়ে বললেন, তারা সবাই পড়ছে।

আমি আশ্চর্য হ'য়ে এই সব বয়স্ক নরনারীর আগ্রহ ও প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করি। প্রথম জীবনে দেবী সরস্বতীর যে কৃপা লাভ হয় নি, পর জীবনে সেটা তারা সংশোধন ক'রে নিচ্ছে। বৈদিক ঋষি প্রার্থনা করেছিলেন—জীবনে এক শত বৎসর বাঁচবেন; কিন্তু সে বাঁচা আমাদের মতো জীবন্মৃতের বাঁচা নয়—বাঁচার মতো বাঁচা, আয়ুর পূর্ণতাকে তাঁরা পরিপূর্ণ করবেন প্রাত্যহিক সাধনায়, রোজই নূতন নূতন কিছু জানবেন—নূতন নূতন কিছু শিখবেন। এটা আমেরিকার নরনারীর জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি।

এই জীবন-প্রীতির ফলে কর্মের প্রতি দেখেছি এদের অফুরন্ত অনুরাগ—সানফ্রান্সিসকো বিমান-ঘাঁটিতে আমায় নিতে এসেছিলেন—মহাবিদ্যা-ভবনের একজন পি. এইচ-ডির ছাত্র—অথচ তিনি অবলীলাক্রমে কুলির মত আমার সমস্ত জিনিস ব'য়ে মোটরে তুললেন। এটা কোনও বিজ্ঞাপনী দৃষ্টান্ত নয়—এটা তাঁর স্বাভাবিক নিত্যকৃত্যের অঙ্গ।

পরে দেখেছি নিকট ও নিবিড় সাহচর্যে—এই সুন্দর তরুণটি কেমন সহজে বিদ্যাভবনে কত রকমের তথাকথিত ছোট কাজগুলি করেন—এর জন্য অর্থ নেন না। শুধু সেবাব্রতের খাতিরে তিনি সেই বিদ্যামন্দিরের ঘর ঝাঁট দেওয়া, ধোওয়া-মোছা, আসবাবপত্র ঠিক করা, রান্না করা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করেন।

আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয়—তপস্যার তন্ময়তা। তপস্যার আদর্শটি আমাদের দেশের; আমাদের সুধীরা বলেছেন, সত্য এবং তপস্যায় বিশ্বের সৃষ্টি—তপস্যার ফলে মানুষ যা চায়, তাই পেতে পারে। কিন্তু এ ভাবনা এ দেশে আজ আর নেই। ভাব তন্ময় হ'য়ে আদর্শের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করবার যে সাধনা—সে সাধনা দেখে এলাম আমেরিকায়।

একটি মাত্র লোকের কথাই বলি। তার নাম গেনস্বরো—তিনি সানফ্রান্সিসকো সহরে American Academy for Asian Studies (এশিয়া গবেষণা-পরিষদ) প্রতিষ্ঠা করেছেন একক অধ্যবসায়ে, নিষ্ঠায় ও বিশ্বজিৎ যাজ্ঞিকের ত্যাগব্রতে। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী; কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ

তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করল—তিনি তাই তাঁর সর্বস্ব দিয়ে এই মহাবিদ্যাভবন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আতিথেয়তার কথা একটু বলি। একদিন অবশ্য ভারতবর্ষে এমন অবস্থা ছিল, যখন বিনা সম্বলে হিমালয় হ'তে কুমারিকা পরিভ্রমণ সম্ভব ছিল, কিন্তু আজ আমাদের হৃদয় ছোট হ'য়ে গেছে। ক্ষুদ্রত্বের চাপে আমরা অতিথি-সেবার আদর্শকে এক প্রকার ভু'লই গেছি। সানফ্রানিসকো থেকে যখন চিকাগো যাই তখন ওখানকার এক ভদ্রলোককে চিঠি লিখি, আমি চিকাগোয় সাত দিন থাকব তাঁর বাড়ীতে, যদি তিনি আমায় স্থান দিতে পারেন—তবে পত্রপাঠ যেন আমায় জানান।

পত্রোত্তর পাই নি। চিকাগোয় কোনও হোটেলে থাকব এই ঠিক ক'রে চলেছি। আমার প্লেন নামলে বিমান-অফিসের লোক বলল: ডক্টর দাশ, আপনার একটি সংবাদ আছে।

বিদেশ-বিভূঁই—কে দেবে সংবাদ। উৎসুক বিস্ময়ে তার দিকে চাইলাম। বক্তা বললেন, 'মহিলার নাম মিসেস উইলসন, তাঁর ফোন নম্বর—'

বললাম, আপনি তাঁকে ডেকে দিন না।

ভদ্রলোক ফোন করলেন। আমি ফোন ধ'রে বললাম, আমি ডক্টর দাশ কথা কইছি। ওপার থেকে ভেসে এল প্রীতি-সরস কণ্ঠস্বর—ডক্টর দাশ, পৌঁছেছেন—?

হাঁ।

দেখুন, আপনার চিঠি দেরিতে আসায় উত্তর দেওয়া হয় নি—আপনি আমাদের অতিথি।

আপনাদের বাসায় কি ক'রে পৌঁছাব?

ভদ্রমহিলা বললেন—আমরা দুঃখিত, বিমান-ঘাঁটিতে আসতে পারছি না, আপনি ওদের এয়ার-টার্মিনাসে আসুন, সেখানে আমরা আসছি;—আপনাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসব সেখান থেকে।

সমস্যার সমাধান হ'ল—তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। তারপর সাত দিন ধ'রে আমার জন্য তাঁরা কত ভাবে শ্রম করলেন—এই আন্তরিকতা, এই মাধুর্য কখনই ভুলব না।

ওদেশের সব চেয়ে বড় জিনিস প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্যক্তিত্বহীন, তারা ভাবে না, তারা বোঝে না—তারা গতানুগতিক পথে চলে।

কিন্তু ওদেশে প্রতিটি মানুষ আত্ম-বিকাশের কথা ভাবছে। শুধু ভাবছে তা নয়,—সেই ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুরণের জন্য কত চেষ্টা, কত সাধনা!

নিউইয়র্কের থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতার শেষে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে আলাপ করল, বলল—এমন মর্মস্পর্শী কথা বহুদিন শুনি নি। আমার নাম এলিন—আসুন না একদিন আমার ওখানে···

বললাম—চেষ্টা করব। দুঃখের বিষয় সেখানে যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি।

মেয়েটি একটি চিঠি দিয়েছিল আমার হাতে। সে গায়িকা—গানের প্রতি তার রয়েছে দরদ; শুধু দরদ নয়—ভক্তি। সেই ভক্তির উচ্ছ্বাসে সে পরিচয়-পত্রে লিখেছে:

Music has ever been the link between the universal harmony and the harmony of the individual. To promote harmony and to establish love is to heal. Singing is a spiritual experience, we sing with the mind through the body; skill in singing is a form of self-control Learn the principles of singing and diligently discipline your body to the music of the spheres.

মেয়েটির আনন্দ-ভাস্বর মুখের কথা মনে পড়ে,—তার লিখিত এই কথাগুলি তার অন্তরের উপলব্ধ সত্য মনে হয়।

সেই তরুণী সঙ্গীতকে আধ্যাত্মিক সাধনা ব'লেই

মেনে নিয়েছে—জগতের পরম আনন্দের সাথে মানুষের মনকে মেশাতে পারে—সঙ্গীত। সেই সুষমার সাধনায় সে সুষমাময়ী; তাই তার গান না শুনলেও একথা বিশ্বাস করি—সেই তপস্বিনী গান করে হৃদয় দিয়ে, তার কণ্ঠসাধনা অধ্যাত্মসাধনা।

আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল: ধর্ম করে নিরাময়, প্রশমিত করে সমস্ত অকল্যাণ, দূর করে সকল ব্যাধি। তার উপরে সে দিয়েছিল এই চিঠি।

আজ দূরে ব'সে সেই কল্যাণময়ীর তপস্যার কথা শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

যারা স্বাধীন, যারা দৃপ্ত, তাদের কাছে সৌজন্য স্বাভাবিক—সৌজন্য সেখানে অন্তরেই ফোটে—তাই মানুষের কাজে লাগবার জন্য সেটা স্বাভাবিক।

নিউইয়র্কের National Manufacturers' Association একটি বই বিনামূল্যে দেবে ব'লে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল—আমি সেই পুস্তিকাটি আনতে গিয়েছিলাম। পুস্তিকাটির নাম: 'তোমার ভবিষ্যৎ তুমি গড়তে পার'।

আমেরিকা সত্যই গণতন্ত্রের দেশ, সেখানে মানুষ আপনার জীবন আপনি গড়ে তোলে। তাই এরা আশায় ও আনন্দে লেখে:

'As a people, our future is bright with promise. By making the most of your opportunities now, in school, and by planning your own future carefully, with the help of your teachers and parents, you will be able to play your part in building a better America.'

একটি বয়স্কা মহিলার উপর বিতরণের ভার ছিল। তিনি একান্ত সমাদরে আমায় অভ্যর্থনা করলেন। আমি বললাম, আপনাদের বিতরিত অন্যান্য বইগুলিও আমি চাই।

সেগুলি তো এখন আমার কাছে নেই—বসুন আমি ব্যবস্থা করছি।

তখনই মেয়েটি ফোন করলেন—খানিক পরে বই এল। বই দিয়ে মেয়েটি বললেন, আপনি আমাদের বিষয় যদি আরও জানতে চান—তবে আমাদের সম্পাদকের সাথে দেখা করতে পারেন।

আমি সাগ্রহে স্বীকৃতি জানলাম।

সম্পাদকও একজন নারী; মিস হার্নের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছিল—ভারতবর্ষ থেকে চারজন ছাত্রকে তাঁদের আওতায় ডেকে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই তাঁকে। তিনি বলেছিলেন, আপনি আমার সাথে চিঠিপত্র লিখবেন।

* * *

স্পেনের পথ দিয়ে চলছি—সেদিন রবিবার। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি ইংরেজী জানেন।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—হাঁ, কি চান বলুন।

আমি আমার জ্ঞাতব্য প্রশ্ন বললাম। ভদ্রলোক শুনে জানালেন—তিনি হাঙ্গেরীয়ান, ভারতের প্রতি তাঁর একান্ত শ্রদ্ধা, তারপর—তিনি ভারত সম্বন্ধে শুনতে চান।

দুজনে তখন নিকটবর্তী উদ্যানে গিয়ে বসলাম। ভদ্রলোক গান্ধী ও নেহেরুর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বললেন, 'জাতিভেদ নিশ্চয়ই এতদিনে উঠিয়ে দিয়েছেন!'

এ কথার জবাব দেওয়া মুস্কিল। বিদেশে দুটি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে—জাতিভেদ আর শিক্ষা। আমরা কাগজে কলমে যতই বড়াই করি না কেন, স্বাধীন ভারতবর্ষেও দুইটি বৃহৎ কলঙ্ক—জাতিভেদ আর অশিক্ষা। আর তার চেয়ে বড় কথা—এই দুই কলঙ্ক অপনোদনের জন্য সত্যকার চেষ্টা আমরা করছি না। কিন্তু তাঁকে বললাম,—'আইনের চোখে ভারতবর্ষে আজ সবাই সমান।'

ভদ্রলোকের অসীম কৌতূহল। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা—দারিদ্র্য, শিক্ষা, জনসেবা প্রভৃতি বিষয়ে খুঁটিনাটি অনেক প্রশ্ন করলেন; তারপর

আমাকে সঙ্গে ক'রে মাদ্রিদের পশুশালার দ্বারে পৌঁছে দিলেন।

* * *

এথেন্স শহরে যখন 'ভারত-ধর্মের সঞ্জীবত্তা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিই তখন বক্তৃতা-শেষে এক ভদ্রলোক দেওয়ালে বিলম্বিত একজন গ্রীকের ছবি দেখিয়ে বলেন—ইনি ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী হ'য়ে বাস করেন, পরে দেশে ফিরে মহাভারত এবং অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন। তখন এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বললেন, আমি ভগবদ্গীতার গ্রীক অনুবাদ করেছি—আপনাকে একখণ্ড দেব।

আমি বললাম—গ্রীক ভাষা আমার নিকট 'গ্রীক'—তবে যদি দেন, সে দান গ্রীসের প্রীতির স্পর্শ ব'লে মাথায় নেব।

ভদ্রলোক তার গৃহে যেতে বললেন—পরদিন। কিন্তু আমার সময় ছিল না তাই বললেন, পাঠিয়ে দেব ডাকে।

এই ধরনের মিষ্টি কথা ভাবাবেগে বলি আমরা, কিন্তু হয়তো পরক্ষণেই ভুলে যাই। হঠাৎ সেদিন পেলাম ডাকে সেই ভগবদ্গীতা; পড়তে পারি না, কিন্তু তবু গ্রীক বন্ধুর প্রেমের প্রতীক হিসাবে সেটা রেখে দিয়েছি পরম কৃতজ্ঞতায়।

* * *

আমেরিকার আন্তর্জাতিক ছাত্রভবনে কয়েকদিন থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। টিউবে করে যখন আসি—তখন আমার স্যুটকেশ প্রভৃতি একা একা বইতে পারছিলাম না, এক ভদ্রলোক যিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছিলেন সেই অপরিচিত মহাত্মা অবলীলাক্রমে আমার স্যুটকেশ বহন করলেন। এই মহানুভবতার সাথে আমাদের দেশের ব্যবহার তুলনা করলে বেদনা পাই। এই আন্তর্জাতিক ভবন থেকে এক কোয়েকার দম্পতীর গৃহে অতিথি হই। যাওয়ার সময় এক ভারতীয় অধ্যাপক—যিনি কলম্বিয়ায় Ph. D.র জন্য পড়ছেন; তাকে বলেছিলাম, আমার একটি স্যুটকেশ রেখে যাই আপনার ঘরে, দুদিন পরে নিয়ে যাব। প্রথমে তিনি রাজি হ'তে চান নি।

* * *

করাচীতে Y. M. C. A. হোটেলে উঠি। যাওয়ামাত্র একজন মুসলমান যুবক সঙ্গে ক'রে নিয়ে সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ঘরে নিয়ে গিয়ে বেয়ারা বলল, 'হুজুর, এহি আপকা হ্যায়'। সেখানে কোনও বিছানা ছিল না; বললাম, 'বিস্তারা কাঁহা?' সে বলল, 'বিস্তারা নেহি মিলেগা।'

পাশে যে পাঠান যুবকটি ছিল—অযাচিতভাবে সে আপনার ঘরে গেল, নিজের বালিশ বিছানা চাদর ও কম্বল এনে দিল। আমার ঘরের পাঞ্জাবী মুসলমান যুবক দিল আর একটি কম্বল।

তারপর ফিরবার পথে ভারতীয় একটি প্রতিষ্ঠানে কয়দিন ছিলাম। যিনি প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক তাঁকে বললাম, 'ভারতসংস্কৃতি' প্রচার করতে দুনিয়া ঘুরে এলাম, সঙ্গে বিছানা নেই, যদি একটু ব্যবস্থা করেন। প্রথম দুদিন একটি সতরঞ্চি এসেছিল, তৃতীয় দিন সেটা চলে গেল, কাজেই শুধু খবরের কাগজ পেতে ও ওভারকোট গায়ে দিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয়েছিল। একজন পরিচিত পদস্থ বন্ধুকে এই দুরবস্থার কথা জানিয়েছিলাম, তিনি সে দিকে উচ্চবাচ্য না ক'রে অন্য গল্পের মিষ্টালাপে আপ্যায়িত করেছিলেন।

দুনিয়ায় জীবন্ত ও প্রাণবন্ত নরনারীর পাশে দাঁড়ালেই আমরা যেন মলিন হ'য়ে পড়ি। সব দেশে ভাল মন্দ আছে, এ কথা সত্য; কিন্তু আমাদের দেশে প্রাণের অভাব দেখা দিয়েছে। আমরা যেন জাগ্রত জাতিগুলির সমকক্ষ হ'য়ে উঠতে পারছি না।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—স্বাধীনতা যেন আমাদের বলিষ্ঠ ক'রে তোলে। আমরা যেন প্রেমদৃঢ় কর্মী, আশিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ মানুষে পরিণত হই।

সমাজ-জীবনে গীতা

স্বামী মহানন্দ

'গীতা পড়েছ কিনা?'—এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলে থাকেন, 'আমি ত ধর্মজীবন যাপন করতে চাই না; আমি চাই,—এই সংসারে সমাজে সুন্দররূপে বাঁচতে।' তার উত্তরে বলা যায়, ভারতের প্রায় সব ধর্মই সর্বাঙ্গীণ; সমগ্র জীবনেরই পথিকৃৎ, তাই প্রায় সকল ধর্ম গ্রন্থেই ঐ সুন্দররূপে বাঁচার উপায় বলে দেওয়া রয়েছে, গীতাতেও তাই আছে। সন্দিগ্ধচিত্ত আবার প্রশ্ন করে, 'আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সহায়ক হবে—এমন কথাও কি গীতায় আছে?' ছোট বয়স থেকেই আমরা শুনে আসছি: বৃদ্ধবয়সে শুধু গীতা পড়তে হয়, মুমূর্ষুকে গীতা পড়ে শোনাতে হয়, আর শ্রাদ্ধবাসরে গীতা দান করতে হয়। সেই গীতায় আবার কি ক'রে দৈনন্দিন জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর, তথা জীবনের সর্বাবস্থায় চলার নির্দেশ থাকবে? শতকরা আশীভাগ লোকেরই এই ধারণা!

কিন্তু গীতার উৎসমুখেই দেখছি অর্জুন যুদ্ধ করতে চলেছেন; তিনি রাজত্ব ফিরে পেতে চান। তপোবনের একান্তে ধ্যানে-বসা ঋষি তিনি নন, সংসারত্যাগী হিমালয়পথের যাত্রীও নন তিনি। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, সমরক্ষেত্রে তিনি এক যোদ্ধা। জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিনব্রত যুদ্ধের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন; কে মরবে, কে বাঁচবে, কে জয়ী হবে—কিছুই জানা নেই। অথচ ঐ তীব্র পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে—যখন তিনি বিচলিত, যখন তিনি কর্মকুণ্ঠ, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন; বলছেন, 'যুদ্ধ কর'; বলছেন:

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

—হে অর্জুন, ক্লীব হ'য়ে যেও না। এই কাতরতা তোমার শোভা পায় না। হৃদয়ের ঐ ক্ষুদ্র দুর্বলতা ছেড়ে, হে শত্রুদমন, ওঠ, যুদ্ধ কর। এই ভাবেই নানা উপদেশ দিয়ে শেষে সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে নিযুক্ত করলেন; বনে পাঠালেন না। কর্ম ও সমস্যাবহুল জীবন-প্রশ্নের সমাধানকারী উপদেশ সংগ্রহ ক'রেই গীতার সৃষ্টি হ'ল;— অথচ তার মধ্যে জীবনযাত্রার কথা থাকবে না, এ কি ক'রে হ'তে পারে? একটু অবহিত হ'য়ে পাঠ করলেই, কেবলমাত্র বৃহত্তর জীবনের নয়, সাধারণ জীবনযাত্রার ইঙ্গিতও গীতায় পাওয়া যায়।

জগতের দিকে দিকে আজ যে কথাটাকে সবচেয়ে বেশী বার লোকে উচ্চারণ করছে, সেটি হচ্ছে—শান্তি, সর্বপ্রকার বিদ্বেষ বর্জন করার কথা। বারে বারে প্রশ্ন উঠছে—'কি করলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ থাকবে না? জাতিতে জাতিতে বৈরভাব ঘুচে যাবে। মানুষে মানুষে অসদ্ভাব মুছে যাবে? শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে এর উত্তর শুনেছি, 'যখন বাইরের লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে। মিশে যেন এক হ'য়ে যাবে—বিদ্বেষভাব আর রাখবে না। ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রীষ্টান—এই ব'লে নাক সিঁটকে ঘৃণা করো না। রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, সবগরু মাঠে গিয়ে এক হয়ে যায়। এক পালের গরু। যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়, আবার পৃথক হয়ে যায়। নিজের ঘরে, আপনাতে আপনি থাকে।' বারে বারে শুনি আমাদের মধ্যে এমন সব দেবোচিত গুণের সমাবেশ করতে হবে যাতে শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীটাই এক সখ্য-সূত্রে গাঁথা হ'য়ে থাকবে। কিন্তু সে গুণগুলি কি? অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন:

অর্জুন, যারা সাত্ত্বিক হবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের ভয়শূন্যতা, পবিত্রতা, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, সামর্থ্যানুরূপ দান, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ প্রকাশ না করা, দীনে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, অসচ্চিন্তা ও অসৎকর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শৌচাদি, অবৈরভাব ও অভিমান-রাহিত্য এই সব গুণ লাভ হয়।

এই কথা শুনলে মনে হয়, এক মহাকুরুক্ষেত্র সমরের পূর্বে দাঁড়িয়ে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনরূপী মানবাত্মাকে বলেছিলেন: অক্রোধ চাই, অদ্রোহ চাই, অহিংসা চাই, তা না হ'লে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিকে—হে মানব, তুমি কিছুতেই সরাতে পারবে না। কিন্তু শান্তি আনবার জন্য হ'তে হবে 'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ'; মমতাশূন্য, অহঙ্কারশূন্য ও নিঃস্পৃহ হ'লে তবেই শান্তি পাবে। নতুবা শত সহস্র ধনাগারেও মানুষের স্পৃহা মিটবে না, বৈরভাব যাবে না। কেবল প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকলেই নিজের প্রবৃত্তিগত স্বভাব কি যায়? শুধু তাই নয়, স্বার্থের খাতিরে, নিজের জন্য, আমরা যেভাবে নিজেকে নিয়োজিত করি, পরার্থে তা করি না। ব্যবহারের বিভিন্নতায় আর স্বার্থপূর্ণ কাজের জন্যই যে শেষে আমরা শান্তি হারাই, নিজেদের মধ্যে হানাহানি করি, তাও গীতায় রয়েছে: 'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে'—আসক্তি থেকেই কামনা, কামনা থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি।

যখন দেশের লোক সহজ ধনাগমের আশায় মনুষ্যত্বকে ভুলে নিকৃষ্টতম কালোবাজারে ঘোরা-ফেরা করছে, যখন জীবনধারণের শ্রেষ্ঠত্বকে টাকার পরিমাপে যাচাই করতে চায়, তখন সে ভাবে না যে এই শ্রেষ্ঠত্ব, এই উচ্চতা একটি হাল্কা জিনিস মাত্র—দাঁড়িপাল্লার হাল্কা দিকটাই উঁচু হয়। এতে সে শুধু নিজে নয়, তার পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সমুখে কি এক ঘৃণ্য আদর্শের পচা-কঙ্কালটাকেই না দাঁড় করাচ্ছে! ঘরের হাওয়া শুদ্ধ হ'লে তবেই ত সেই ঘরে শুদ্ধসত্ত্ব, সত্যিকারের মানুষ জন্মাবে: 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ-ভ্রষ্টোঽভিজায়তে।' জন্মান্তরের সাধক, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন ধনীর গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন। তাই সাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অন্যায় অর্থ সঞ্চয় থেকে সাবধান ক'রে দিতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন:

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

—অসংখ্য আশাপাশে বদ্ধ ও কামক্রোধের বশবর্তী হ'য়ে তারা বিষয়ভোগের জন্য অসদুপায়ে অর্থ-উপার্জনের চেষ্টা করে। আর ভাবে, আমার এই লাভ হয়েছে, ভবিষ্যতে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে; এই ধন আমার আছে, এই ধনও ভবিষ্যতে আমার হবে,...আমি ধনী,—অভিজাত, আমার সমান আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, ভোগ করব। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এই সব মূঢ় অভিমানী লোককে তাদের অধর্মদোষের জন্যই বাসনাময় সংসারপথে অশুভ যোনিতে বার বার নিক্ষেপ করি।

প্রশ্ন উঠবে—যারা ঐ ভাবে অর্থোপার্জন করে, তারা নিজের মনে ঐ সব দোষ দেখতে পাচ্ছে না ত? তার উত্তরে বলতে হয়, ওর ভেতরে অনেকদিন থাকলে হুঁশ চলে যায়। মনে হয় বেশ আছি। প্রথম প্রথম অবশ্য খারাপ কাজ করলেই খারাপ লাগে, মন্দ কাজটি করলেই মন ধুক ধুক করে; পরে আর করে না। আমাদের বিবেক-হীনতাই লোভাদি এনে দেয়, এবং ঐগুলি যে খারাপ, এ বোধও পরে হারিয়ে যায়।

গীতায় বার বার চরিত্র গঠনের উপর এত

জোর দেওয়া হয়েছে। মানুষ তার সকল শত্রুর থেকে দূরে পালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু পারে না তার স্বভাবের কাছ থেকে পালাতে। তাই পৃথিবীর যেখানেই সে যাক না কেন, তার চরিত্র—ভাল হোক, মন্দ হোক, তার সঙ্গে যাবেই। এই চরিত্র যে তার নিজস্ব সৃষ্টি। ভাস্কর যেমন তার মূর্তিকে লোহার ছেনিতে ঠুকে ঠুকে, কেটে কেটে রূপ দেয়, তেমনি আমাদের নিজস্ব চিন্তার ছেনিতে আমাদের চরিত্র-ভাস্কর্য ফুটে ওঠে। ইংরেজ কবি পোপ এক জায়গায় তাই বলেছেন: এই সুন্দর চরিত্র সৃষ্টির জন্য আমাদের ভোগ-বাসনাকে ছেড়ে, বিবেককে আঁকড়ে ধরতে হবে।[১]

এই চরিত্রগঠন প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনেক বছর আগে একবার শত্রুপক্ষ একটি শহর অবরোধ করেছিল, তখনকার নিয়মানুযায়ী তারা এক বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঐ শহরের দেওয়ালে অনবরত আঘাত করছিল, দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলবার জন্য। অবরুদ্ধ সৈনিকেরা দেখল, দেওয়াল একবার ভেঙ্গে গেলে আর রক্ষা নেই, তারা তখন ঐ দেওয়ালের গায়ে আর একটি অধিকতর শক্ত দেওয়াল গেঁথে দিল। শত্রুপক্ষ বাইরের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলল বটে, কিন্তু ভিতরের সুদৃঢ় দেওয়াল ভাঙ্গতে পারল না। সেই রকম, সমাজের শক্ত প্রাচীর আমাদের অনেকখানি রক্ষা করে বটে, কিন্তু নিজ-চরিত্রের সুদৃঢ় প্রাচীর না তুললে, আমাদের মাঝে মাঝে সমূহ বিপদ দেখা দেবে।

আমরা সত্যকার চরিত্রবান কিনা, তা আমাদের চিন্তা, আমাদের ব্যবহার, আমাদের কথাবার্তা অহরহ প্রকাশ ক'রে দিচ্ছে। একই অবস্থায় দুই বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিকে তাই বিভিন্নরূপে দেখতে পাই। একবার সুবিখ্যাত গায়ক মোজার্ট ও আর একজন শিকারী একই বনপথে, একই সঙ্গে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি চাতক সুমিষ্ট গান গাইতে গাইতে তীব্রবেগে সোজা আকাশে উঠে গেল। তা দেখে শিকারী ব'লে উঠল, 'কি চমৎকার তীরন্দাজ!'—আর মোজার্ট বললেন, 'আমি যদি ঐ রকম গানের গলা পেতাম, তাহ'লে কি সুন্দর হ'ত!' তাঁরা ঐ বনপথে আরো এগিয়ে চললেন। মাঝে জোর বাতাস উঠল; গাছপালায় শন্ শন্ শব্দ হ'তে লাগল। তা শুনে শিকারী বলল, 'বাঃ, এই শব্দে খরগোস ভয় পেয়ে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে।' আর মোজার্ট বললেন, 'ঐ শোন, শোন, ঈশ্বরের এই বিরাট বাদ্যযন্ত্রে কি অপরূপ সুর ফুটে উঠছে!' শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন, 'যেমন আকর তেমনি কথাও বেরোয়। মূলো খেলে মূলোর ঢেঁকুর বেরোয়।' তবুও যে আমরা এইসব কথা ভুলে যাই, তার কারণ, আমাদের মনের ময়লা আর্শিতে আমাদের যথার্থ স্বরূপের ছায়া পড়ে না। 'ঘোলা জলে নির্মলি ফেললে পরিষ্কার হয়। তখন মুখ দেখা যায়। ময়লা আর্শিতে মুখ দেখা যায় না।' এইসব অবস্থায় কুতর্ক ছেড়ে যথার্থ বিচার করতে হবে।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সম্মোহনে আমরা আমাদের অন্তরের স্বচ্ছ পূত প্রবৃত্তিকে শেষে অবাস্তব ব'লে মনে করি, স্বপ্নে যেমন বাস্তব জীবনের স্বভাবকে ভুলিয়ে দেয়—অবাস্তব ব'লে মনে করায়। তাই স্বপ্নে ভয় দেখে জেগে উঠলেও বুক দুড়্ দুড়্ করে। বিকারের অবস্থায় রোগীর সত্যকার স্বরূপ ধরা পড়ে না। ছায়া কিছু আলোকের অংশ নয়, শুধু আলোককে বাধা দিয়েই ছায়ার সৃষ্টি। তেমনি আত্মা কিছু পাপময় নয়। আমরা মিথ্যার আচরণ দিয়ে ঐ ভাবে আলোতে ছায়ার সৃষ্টি করছি মাত্র,[২]

১ 'On life's vast ocean diversely we sail,
Reason is the card, but passion is the gale.'

২ 'The stain of sin is not something positive existent in the soul . It is like a shadow which is the privation of light.'
—St Thomas Aquinas

এবং ঐ মিথ্যার সৃষ্টিকেই সত্য মনে ক'রে ভাবছি, সত্যটাই ভুল। ভূতে যাকে পায় সে জানে না যে তাকে ভূতে পেয়েছে।

মানুষমাত্রই শুদ্ধ। বিবেকের আলোক উদ্ভাসিত হ'লেই এটা ধরা পড়ে—অতি বড় পাপীর আত্মাতেও কোন ছাপ পড়েনি; আকাশবৎ আত্মার ব্যাপ্তিতে কোন ছায়া নেই। সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, এসব আত্মার কোন অপকার করতে পারে না। গীতায় পাচ্ছি:

'যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥

যেমন সর্বব্যাপী আকাশ সূক্ষ্ম ব'লে কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেই রকম সকল প্রকার দেহে থেকেও আত্মা দোষগুণে লিপ্ত হন না। তবে সংসারের ভেতর থাকতে গেলেই, ঐ আত্মাকে ভুলে মানুষ নিজেদের কলঙ্কিত মনে করে।

এ যুগের আর একটি প্রধান ব্যাধি—অসন্তোষ; কোন অবস্থাতেই মানুষ আজ সন্তুষ্ট হ'তে পারছে না। বাইরে নিস্তব্ধ আগ্নেয়গিরির মাঝে অন্তরের দহন ধিকি ধিকি জ্বলছে। বারে বারে সে তাই ছুটতে চায় দিকে দিকে—সন্তোষের আশায়। কিন্তু মানুষ তার অন্তরের এই দাহের প্রথম ও প্রধান কারণ খুঁজতে চায় না। বোঝে না, পরশ্রীকাতরতা ও ঈর্ষা না ছাড়লে, বিলাস-লিপ্সা ও অপব্যয় না ত্যাগ করলে, কিছুতেই মনের সেই প্রগাঢ় স্থৈর্য, চিত্তের প্রশান্তি আনতে পারবে না।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥

যে লোক যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বের অতীত, মাৎসর্য-বর্জিত লাভালাভে সমদর্শী, সে কর্ম ক'রেও কর্মে আবদ্ধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন 'বিমৎসর' হ'তে—মাৎসর্যহীন হ'তে, ঈর্ষাশূন্য হ'তে। শুধু তাই নয়, ঐ সন্তোষ আনতে গেলে, আমাদের পরচর্চা পরনিন্দাও ছাড়তে হবে; ছাড়তে হবে বিলাসিতাও। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সুখের জন্তই অর্থাহরণ বর্জন করতে হবে, কারণ এই সুখ আপাতমধুর হ'লেও পরিশেষে বিষবৎ হ'যে উঠে। গীতায় পাচ্ছি:

'বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎতদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥'

বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগ থেকে যে সুখ হয় তা প্রথমে অমৃততুল্য কিন্তু পরিণামে বিষবৎ মনে হয়। এই সুখ রাজসিক সুখ।

অহঙ্কারও ত্যাগ করা একান্ত দরকার। অবিনশ্বর আত্মার উজ্জ্বল প্রশান্ত আলোয় ঐ অহমিকাই নানা রঙের ফুলঝুরি ফোটাচ্ছে। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ আছে, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। তাই আমাদের জীবনে অহঙ্কারাদি ছেড়ে সত্যকার চরিত্র-মাধুর্য ফুটিয়ে তোলা চাই। 'অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।' উৎকর্ষ-সত্ত্বেও আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভশূন্যতা, অহিংসা, ক্ষমা ও সরলতা আনতে হবে। শুধু সংসারত্যাগীদের ভেতরে নয়, সমাজে সংসারের মধ্যেও আত্মশ্লাঘারাহিত্যের উদাহরণ আমরা ইতিহাস থেকেই চয়ন ক'রে নিতে পারি। একবার রোম সম্রাট জুলিয়াস সীজার, নগর ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন। পথের ধারে এক গরীব লোক তাঁকে প্রণাম করল। সীজার তাকে তখন আনত হ'য়ে প্রত্যভিবাদন করায় তাঁর সঙ্গের পার্ষদরা বলল, সম্রাট ঐরূপ সামান্য ব্যক্তিকে আপনার অত নীচু হ'য়ে প্রণাম করা ঠিক হয়নি। সীজার উত্তর দিলেন, বল কি হে, আমি সকল বিষয়েই ওর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আর প্রণতি-বিষয়ে খাট হব কেন?

সমাজে বাস করতে গেলে প্রত্যেককে দেখা উচিত। একের অভাবে তাই অন্যের দান করারও প্রয়োজন আছে। এই দান 'অসৎকৃতমবজ্ঞাতম্' অর্থাৎ প্রিয়বচনাদিশূন্য অবজ্ঞার দান হ'লে চলবে না। সত্যকারের দানে অহমিকার কোন স্থান নেই। যে নিচ্ছে সে-ই সেখানে প্রধান—যে দিচ্ছে সে নয়। স্বামীজী তাই বলেছেন: উচুঁতে

দাঁড়িয়ে পাঁচটা পয়সা হাতে নিয়ে কোন গরীবের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাচ্ছিল্য ক'রে বোলো না, 'ঐ নে'; বরং একজন দেবতারূপী গরীব যে তোমার সমুখে আসায় তুমি কিছু দান ক'রে তোমার নিজ সদ্‌গুণের বৃদ্ধি করতে পারলে, সেজন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ হবে। গীতায় রয়েছে :

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥
যৎতু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥

দান করা কর্তব্য—প্রত্যুপকারের আশা না ক'রে উপযুক্ত পাত্রে, স্থানে ও সময়ে দান করাই সাত্ত্বিক দান। কিন্তু প্রত্যুপকারের বা কোন পারলৌকিক ফল পাবার আশায় এবং অনিচ্ছায় যে দান করা যায় তা রাজসিক দান। আমাদের এই সাত্ত্বিক দানের কথাই চিন্তা করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : 'দানাদি কর্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়—সে ভাল নয়। তবে নিষ্কাম করলে ভাল। নিষ্কাম করা বড় কঠিন।…তবে দয়ার কাজ, দানাদির কাজ কি কিছু করবে না? তা নয়। সামনে দুঃখকষ্ট দেখলে, টাকা থাকলে দেওয়া উচিত।' মহাপুরুষরা জীবের দুঃখে কাতর হ'য়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে দেন। অন্নদানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান আরও বড়। স্বামীজীর বীরবাণী :

'দাও আর ফিরে নাহি চাও,
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল'।

একমাত্র মানসিক উৎকর্ষের কথাই গীতায় রয়েছে, তা মনে করা ভুল। দেহের উন্নতি করার কথাও আছে। কারণ প্রথমেই বলেছি, ভারতের ধর্ম—সর্বাঙ্গীণ ধর্ম; সমস্ত জীবন ঘিরেই সেখানে উৎকর্ষের তাগিদ। তাই ভারতের কোন ধর্ম-সাধন দেহকে বাদ দিয়ে নয়; বরং বলেছে 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম-সাধনম্।' স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন : তোমার স্নায়ুকে দৃঢ় কর, আমাদের দরকার লোহার মত পেশী, ইস্পাতের মত স্নায়ু ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি। গীতায় আছে, কি কি আহার করতে হবে; কি কি আহার করলে সাত্ত্বিকগুণ-সম্পন্ন হওয়া যায়, সুস্থ শরীরে শুদ্ধ মন পাওয়া যায় :

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

কি কি আহার শরীর-মনের অনিষ্টকারী?

'কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥'

শুধু মন, চরিত্র ও দেহকে সুষ্ঠুভাবে তৈরী করাই উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব নয়; মানবকে মৃত্যুভয় জয় করতে হবে, এবং তা করতে হ'লে তাকে 'বিজ্ঞানে'র জন্যও যত্নবান হ'তে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখেই এই বিজ্ঞান-অবস্থা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'বিজ্ঞান, কিনা বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে শুনেছে সে অজ্ঞান। যে দেখেছে সে জ্ঞানী, যে খেয়েছে তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হয়েছে। ঈশ্বরকে দর্শন ক'রে তাঁর সহিত আলাপ—যেন তিনি পরমাত্মীয়; এরই নাম বিজ্ঞান।' আরও উদাহরণ টানা যেতে পারে : 'বিজ্ঞান' কিনা তাঁকে (ভগবানকে) বিশেষরূপে জানা। কাঠে আছে অগ্নি, এই বোধ—এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত বেঁধে খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান; ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান; তাঁর সঙ্গে আলাপ—তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্য ভাবে, মধুর ভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হয়েছেন—এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান। তাই ধর্মশাস্ত্রের ভাষায় মানুষ বিজ্ঞানী না হ'লে কিছুই হ'ল না। বিজ্ঞানী না হ'লে শুধু সঙ্গগুণেই ভাল হওয়া যায় না। 'সাধুর

কমণ্ডলু চারধাম ক'রে আসে, কিন্তু যেমন তেতো তেমনি তেতো।'

জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত জ্ঞানের দিকে ধাবিত ; এবং এইটি যে শ্রেষ্ঠ তাও গীতা বলেছে।

'শ্রেযান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাদ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥

হে অর্জুন, দ্রব্য দিয়ে যে যজ্ঞ হয় তার চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ নিরবশেষ যজ্ঞাদি সকল কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়। তাই মানবজীবনে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে ঐ জ্ঞান লাভ করা। যদিও ঐ উদ্দেশ্যের পেছনে, ঐ আদর্শে আলোক-বর্তিকার দিকে ছোটার লোক মুষ্টিমেয়। গীতায় স্বীকৃত আছে :

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

—হাজার হাজার লোকের মধ্যে একজন কেউ আত্মজ্ঞান লাভ করতে প্রয়াসী হয়। আবার যারা প্রয়াস করে তাদের মধ্যে একজন কেউ ভগবানের স্বরূপ জানতে পারে, অর্থাৎ 'বিজ্ঞানী' হ'তে পারে। 'ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা, হাত চাপড়ি।' ঐ ভাবে ঘুড়ি কাটলেই তবে আমরা মৃত্যুভীতিকে দূরে সরাতে পারব। তখনই বুঝতে পারব, মৃত্যুকে দূর করা নয়, মৃত্যু ধরেই জীবন, মৃত্যু দিয়েই জীবন গড়া, মৃত্যুকে নিয়েই জীবনের পূর্ণত্ব। এর জন্য আমাদের জীবনকে উপলব্ধি করতে হবে। ঋষি ও সন্ন্যাসীদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু এই পার্থিব জীবনে যাঁরা বাঁচার মত বেঁচেছেন, সংসারে সমৃদ্ধ হ'য়েও যাঁরা সমাজকে সাবধানবাণী শুনিয়েছেন—তাঁদের কথা দিয়েও আমরা এ কথা বুঝে নিতে পারি। কবি ব্রাউনিং শেষ সময়ে বলেছিলেন, কখনও বোলো না, আমি মৃত।[৩] ভিক্টর হুগোও এ কথাটি বড় মধুর ক'রে বলেছিলেন : যতই সেই শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই সহজভাবে বুঝতে পারছি, আমার চারিদিকে নানা জগৎ থেকে আমাকে আহ্বান ক'রে অমর সুর ভেসে আসছে—এই সুর কত সহজ, কত মহান![৪] নিজের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা, জীবনের মূল্যবোধ ও কত বেশী আত্ম-সচেতন হ'লে তবে আমরা কবি টেনিসনের মত বলতে পারি : সমস্ত সৃষ্টিই সেই এক আইন, সেই এক বস্তু এবং সেই একমাত্র সুদূর-প্রসারী ঘটনাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে।[৫]

হয়তো প্রশ্ন হবে, ঐ কথা শুনেই কি আমরা আদর্শকে পেয়ে যাব। তাহলেই কি মহাবাগ্মী সিসিরোর[৬] মত বলতে পারব, আদর্শই অমরত্বের সন্ধান দেয়? না তা নয়। আমাদের স্বীকার করতে হবে একটি আদর্শকে, মানতে হবে একজনকে, করতে হবে সেই চাতুরী যে চাতুরীতে ভগবান পাওয়া যায়, 'সা চাতুরী চাতুরী'। একজনকে যেমন ক'রেই হোক মানতে হবে। এই মানার প্রথমে বিচার নয়, বিশ্বাস বড় কথা। ঐ বিশ্বাসের জোরেই আমরা যথার্থ পাওয়ার আস্বাদন পেয়ে যাই। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে : একজন মুমূর্ষু ব্যক্তি চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ডাক্তার, মৃত্যুর পারে কি আছে আমি জানি না। তাই সেখানে যেতে আমার ভয় করছে ; তোমার কি কিছু জানা আছে?' ডাক্তার উত্তর দিল, 'আমারও জানা নেই।' মুমূর্ষু সে কথা

৩ "Never say that I am dead.'—R. Browning

৪ "The nearer I approach the end, the plainer I hear around me the immortal symphonies of the worlds which invite me. It is marvellous, yet simple"—Victor Hugo.

৫ "One law, one element and one far off divine event, To which the whole creation moves"—Tennyson.

৬ "Ideals are overtures of immortality."
—Cicero

শুনে ভয়চকিত নেত্রে সেই স্বল্পান্ধকার ঘরের চারিদিকে তাকাতে লাগল। এমন সময় ডাক্তারের পোষা কুকুরটা খোলা দরজা দিয়ে এসে প্রভুর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডাক্তার তখন রোগীকে বলল, 'হ্যাঁ, উত্তর পেয়েছি ; এই কুকুর এর আগে কখনও এ বাড়িতে আসে নি। এই ঘরেও ঢোকে নি ; এমনকি এখানে কি আছে তাও তার জানা ছিল না। তবুও সে একমাত্র তার প্রভুর গায়ের গন্ধ পেয়েই নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এইরকম প্রভুকে স্মরণ ক'রেই আপনিও ঝাঁপিয়ে পড়ুন, মৃত্যুর পারে কি আছে জানবার তাহ'লে আর দরকার হবে না।' মুমূর্ষু তখন হাসতে হাসতে মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়ল।

এই আদর্শকে ধরবার কথা আমাদের আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে যখন আমরা পড়ি : 'প্রকৃতির আদর্শ মানুষের পক্ষে জড়ত্বের আদর্শ ; সেইজন্য মানবপ্রকৃতিকে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে পৃথক ক'রে দেখার চেষ্টা হয়। কিন্তু আমরা তো প্রকৃতির মধ্যে একটা তপস্যা দেখতে পাচ্ছি—সে তো জড়-যন্ত্রের মতো একই বাঁধা নিয়মের খোঁটাকে অনন্তকাল অন্ধভাবে প্রদক্ষিণ করছে না। এ পর্যন্ত তাকে তো পথের কোন একটা জায়গায় থেমে থাকতে দেখিনি। সে তার আকারহীন বিপুল বাষ্প-সংঘাত থেকে চলতে চলতে আজ মানুষে এসে পৌঁছেছে, এবং এখানেই তার চলা শেষ হ'য়ে গেল, এমন মনে করার কোন হেতু নেই।··· যখন তার পৃথিবীতে জলস্থলের সীমা ভাল ক'রে নির্ণীত হয়নি, তখন কত বৃহৎ সরীসৃপ, কত অদ্ভুত পাখী, কত আশ্চর্য জন্তু কোন্ নেপথ্য গৃহ থেকে এই সৃষ্টি রঙ্গভূমিতে এসে তাদের জীবনলীলা সমাধা করেছে, আজ তারা অর্ধরাত্রির একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই উৎকর্ষের দিকে অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর চেষ্টা, সে থেমে তো যায়নি।··· একটি অনিদ্র অভিপ্রায় কেবলই তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন ব'লে আকর্ষণ ক'রে চলেছে ব'লেই তার বর্তমান এমন একটি অব্যর্থ শৃঙ্খলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পারছে।··· এই জন্যই এত দুঃখ, এত মৃত্যু। কিন্তু সামঞ্জস্যেরই একটি সুমহৎ নিত্য আদর্শ তাকে ছোট ছোট সামঞ্জস্যের বেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই স্থির হ'য়ে থাকতে দিচ্ছে না, কেবলি ছিন্ন ক'রে ক'রে কেড়ে নিয়ে চলছে।··· এই সসীমের তপস্যার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে অবিচ্ছেদে মিলিয়ে দেখাই হচ্ছে সুন্দরকে দেখা। মানব, সংসারের মধ্যে সেই ভীষণকে সুন্দর ক'রে দেখতে চাও ? তা হ'লে নিজের স্বার্থপর ষড়রিপুচালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দূরে এসো। মানব চরিতকে যেখানে বড়ো ক'রে দেখতে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াও।'[৭]

এই 'মহাপুরুষ' শেষ বিচারে একমাত্র ঈশ্বর বা ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিকে স্বীকার করেই দাঁড়াতে পারে, এবং এইরূপ মহাপুরুষকে স্বীকার করতে হ'লে আমাদের অন্তরের বোধিতে তার সুর বাজা চাই। শুধু আমাদের দেশের কবিমনই এই উপলব্ধিতে ভাস্বর হ'য়ে উঠেনি, ওদেশের সমাজ-চেতন মনেও তার ঝঙ্কার উঠেছে দেখতে পাই।

কবি ব্রাউনিং বলেছেন : আমি যে ক'রেই হোক জেনেছি, আমি বুঝেছি (ক্ষুদ্র বুদ্ধির কিংবা সঙ্কীর্ণ অনুভূতির অগম্য এ বোধি ; যদিও এ বোধি চিত্তের নানা স্পন্দনে এবং দেহের প্রতি লোমকূপে ছন্দিত হচ্ছে)—ঈশ্বর কে ? আমরা কে ? জীবনের অর্থ অর্থ কি ? ঈশ্বর কেমন ক'রে সহস্রভাবে সহস্র আনন্দকে উপভোগ করছেন, কেমন ক'রে একই শাশ্বত আশীর্বাদের অসীম আনন্দবার্তা থেকে, সকল জীব সৃষ্ট হ'য়ে, আবার সেই দিকেই এগিয়ে চলেছে। জীবনোদ্বেলিত অসীমতা তথা অতিক্ষুদ্র

৭ রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, বৈশাখ, ১৩৪২, পৃঃ ৪৭৫-৪৭৮।

প্রাণস্পন্দনের মধ্যেও সেই 'এক' সদা জাগ্রত। যেখানেই আনন্দ সেখানেই তিনি।[৮]

এই সর্বব্যাপ্তি, এই আনন্দময়কেই আমাদের আশ্রয় করতে হবে। এঁকে ধ'রে থাকলেই ইনি আমাদের রক্ষা করবেনই। যে যাকে ধ'রে থাকে সে তাকে রক্ষা করেই, ইনি ত আরো মহান্ আরো বিরাট, আরো আপনার। তুলসীদাসের অনুভূতি:

'What God is, what we are,
What life is—how God tastes an infinite joy
In infinite ways—one everlasting bliss
From whom all beings emanate, all power
Proceeds, in whom is life for evermore,
Yet whom existence in its lowest form
Includes, where dwells enjoyment there
is He!'

—R. Browning, Paracelsus

উজান জলেও শরণাগত মাছ অনায়াসে চলাফেরা করে; মহাবল হস্তী সংগ্রাম করে, তাই স্রোতে ভেসে যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন:

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

মায়া অতিক্রম করা শক্ত। কিন্তু যে একমাত্র আমাতেই (ঈশ্বরেতেই) নির্ভর করে, সেই কেবল এই মায়া অতিক্রম করতে পারে। সব কাজই যদি আমাকে ধ'রে করা যায়—হোক্ না সে আহার, হোক্ দান বা তপস্যা—তাহ'লে আর কোন ভয় নেই। আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে দেব—দুঃখ কি? শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্বাস-বাণী অনবরত উদ্‌ঘোষিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে মত্ত হ'য়ে আছি, তাই তো সেই মহাজীবনের স্পর্শ পেয়েও পাচ্ছি না।

রাধা-হিয়া

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কৃষ্ণের মঞ্জীরে— মন্দ মৃদু সমীরে
ধায় কালিন্দী-তীরে
রাধা-হিয়া অভিসারে।
মন্থর আশাকুঞ্জে নন্দনফুল মুঞ্জে,
মর্ম-ভৃঙ্গ গুঞ্জে
বসন্ত-ঝংকারে।

দোল্ দোল্ দোল্ গানে, জয় জয় জয় তানে
উধাও অলখ পানে
রাধা-হিয়া সুখস্বপ্নে।
অচিনের অনুরাগে ঘুমন্ত প্রেম জাগে,
মধুরের ঢেউ লাগে
মিলনতৃষ্ণা-লগ্নে।

অম্বর গন্ধে পুলকে, দ্যুলোক নামিল ভূলোকে,
সন্ধ্যার ছায়া-অলকে
জ্যোৎস্না দোলায় মালা।
অদেখা বঁধুর বাঁশি বাজিল চিত উদাসী:
"আয় আয় ব্রজবাসী,
আয় আয় ব্রজবালা।"

রাধা-হিয়া গায় উছলি': "লহ বল্লভ, সকলি,
শুনি ঘরছাড়া মুরলী
চিনেছি তোমারে স্বামী!
তোমারেই চিরসুন্দর। চেয়েছি যুগযুগান্তর,
তনু মন প্রাণ অন্তর
চরণে সঁপি প্রণামী।"

সন্ত জ্ঞানেশ্বর

ব্রহ্মচারী তেজচৈতন্য

আমাদের দেশ সাধু ও সন্তের দেশ, ত্যাগী ও ভক্তের দেশ। মানবপ্রকৃতির দুটি দিক্—একটি এই জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের উপর নির্ভরশীল, এবং অপরটি এই জগতের অন্তরালে ইন্দ্রিয়াতীত শাশ্বত সত্তার উপর অধিষ্ঠিত। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই দুটি দিক্ই রয়েছে, কারও মধ্যে প্রথমোক্ত ভাবটি বেশী প্রকাশ পায় ও কারও মধ্যে দ্বিতীয়টি। প্রথমোক্ত স্বভাবের খেলা যার মধ্যে বেশী তাকে আমরা স্বার্থপরায়ণ, ইন্দ্রিয়লোলুপ ও জড়বাদী বলি; আর দ্বিতীয়ের প্রকাশ যার মধ্যে বেশী তাকে বলা হয় পরমার্থপরায়ণ, সংযমী ও আধ্যাত্মিক। যার আধার ক্ষণস্থায়ী সে স্বভাবতই ক্ষণস্থায়ী, আর যে শাশ্বত আধারে দণ্ডায়মান সে শাশ্বত। সুতরাং প্রথমোক্ত প্রকৃতির উপর স্থাপিত সংস্কৃতি জড়-প্রধান হয়, বেশী দিন টিকে না; এবং শাশ্বত প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠিত সংস্কৃতি চিরস্থায়ী। মানুষে মানুষে ভেদ এবং তজ্জন্য বিরোধ প্রথমোক্ত প্রকৃতিটিকে নিয়ে, শাশ্বত প্রকৃতিতে ভেদের কোনো প্রশ্নই নেই, কারণ সেখানে এক অদ্বয় পারমার্থিক সত্তাই বিরাজ করেন। আমাদের দেশে যখন ইতিহাসের আরম্ভ হয় নি, তখন থেকে মানুষ এই ইন্দ্রিয়াতীত মানবপ্রকৃতিকে পাবার জন্য চেষ্টা করেছে। সে রাজাই হোক্ বা পথের ভিখারী হোক্, ব্রাহ্মণ হোক্ বা চণ্ডাল হোক্, তার ভিতরের সেই শাশ্বত জ্যোতি বহিঃপ্রকাশের জন্য সতত চেষ্টা করেছে। মানুষ স্থূল দৃষ্টিগোচর ইন্দ্রিয়াভিরাম পদার্থসকলের প্রতি যতই আসক্ত ও আগ্রহশীল হোক্ না কেন, জীবনে এমন একটা সময় আসে—যখন ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য বস্তুসকল তার আদৌ ভাল লাগে না, যখন মন এই রাগ-দ্বেষময় সংসারের বহুমুখী প্রলোভন হ'তে উপরে উঠে এমন একটি জিনিস চায়, যা চিরকালের মত থাকবে, যা হ'তে আর বিচ্ছেদ নেই, যা মনে প্রাণে শাশ্বত শান্তি আনয়ন করবে।

আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ সন্ত জ্ঞানেশ্বরের পিতা বিট্‌ঠলপন্তের জীবনে মনের এই রূপান্তর খুব শীঘ্রই এসে উপস্থিত হয়। ধর্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত বিট্‌ঠলের প্রাণ সেই শাশ্বত শান্তি-লাভের জন্য আকুল হ'য়ে উঠল। নবযৌবনা পতিপরায়ণা সুন্দরী ভার্যা ও জীবনের নানাবিধ প্রলোভন তাঁর অন্তরে প্রজ্বলিত বৈরাগ্যানলকে আর বেশী দিন ঢেকে রাখতে পারল না। তিনি চান অমৃতের আনন্দ, আর জগৎ দেয় গরলের বিষাদ! তিনি চান তুরীয় শান্তি, আর সংসার দেয় জীবনের দ্বন্দ্ব' তৃপ্তির পরিবর্তে আসে বাসনার উদ্দাম নর্তন। ভাবেন তিনি—এ সংসারে শান্তি নেই। শান্তির জন্য সংসার হ'তে উপরে উঠতে হবে। দেহ রয়েছে 'আলন্দী' গ্রামে—পুনা হ'তে ১৪ মাইল দূরে, কিন্তু মন যেন সর্বদা কাশীধামে, হিমালয়ে বিচরণ করছে; কানে যেন ডাক এসেছে সেই ঋষি-মুনিদের ধ্যানপূত হিমানীমণ্ডিত শৈল-শিখরের। তিনি আর নিজেকে আটকে রাখতে পারছেন না। কিন্তু শাস্ত্র যে নিষেধ করছেন! শাস্ত্রে আছে—একটি পুত্র না হওয়া পর্যন্ত গৃহস্থের পক্ষে সংসার ত্যাগ করা ধর্ম-বিরুদ্ধ। বিট্‌ঠলের একটিও ছেলে নেই যে শাস্ত্রের এই বিধান রক্ষা করবে। এদিকে পত্নীও সম্মতা নয় তাঁকে ছেড়ে দিতে। তিনি বিমূঢ়ের মতো অবশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আশার আলো নিয়ে শাস্ত্রের সেই বাণীটিও তো আসে মনের কাছে—'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'। যেন কেউ প্রাণে অমৃত ঢেলে দেয়। স্থির করলেন বিট্‌ঠলপন্ত: জগতের মায়া-মোহ সব ত্যাগ

ক'রে চলে যাবেন সেই শিবক্ষেত্রে, সেই স্বর্ণময়ী বারাণসীতে যেখানে সাক্ষাৎ পরাৎপর শিব সূক্ষ্ম দেহে সর্বদা বিরাজ করেন।

একদিন গঙ্গাস্নানের নাম ক'রে বেরিয়ে পড়লেন বিট্‌ঠলপন্ত বাড়ী থেকে; এলেন প্রয়াগে, ত্রিবেণী-সঙ্গমে মাঘ-স্নান ক'রে মুমুক্ষু বারাণসী চলে যান। সেখানে তখন ছিলেন স্বামী রামানন্দ, বিখ্যাত সাধু। লোকেরা বলে, মহাত্মা কবীর এঁরই শিষ্য। বিট্‌ঠলপন্ত এই সন্ন্যাসীর খোঁজ ক'রে তাঁর বাসস্থানে উপস্থিত হন এবং সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভের জন্য প্রাণের আকুল প্রার্থনা তাঁকে জানালেন। স্বামী রামানন্দ বিট্‌ঠলের আগ্রহ ও বৈরাগ্য দেখে প্রীত হলেন। কিন্তু সন্দেহ জাগল মনে, এর যদি কোনো সাংসারিক দায়িত্ব থাকে, তা হ'লে তো আর সন্ন্যাস দেওয়া চলবে না। সেজন্য স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, 'সাংসারিক কোন দায়িত্ব নেই?' নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন বিট্‌ঠলপন্ত, 'না'। সন্দেহের আর কারণ রইল না। প্রসন্নমনে স্বামীজী তাঁকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়ে 'চৈতন্যাশ্রম' নাম দিলেন।

কথা কানে হাঁটে। বিট্‌ঠলপন্তের স্ত্রী রুক্মিণী বাঈ কালক্রমে জানতে পারলেন যে, তাঁর স্বামী কাশী গিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন। রুক্মিণীবাঈ-এর দুঃখের আর সীমা রইল না, চারদিক্ যেন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠল। দুঃখের প্রবল স্রোতে জীবনের কূল কিনারা ভেসে গেল। নীড়হারা পক্ষিণীর ন্যায় নিরীহা রুক্মিণী হৃদয় জুড়াবার কোনো ঠাঁই-ই খুঁজে পেলেন না। কিন্তু কান্না-কাটি ক'রে আর কি হবে? ধৈর্য ধরতে হবে এবং যাতে স্বামীরই মতো—জীবনের প্রতি অভিনিবেশ ত্যাগ ক'রে মন ভগবানের দিকে যায়, তারই চেষ্টা করতে হবে। অতঃপর তাঁর বারোটি বছরের জীবন তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর তপস্যার জীবন। সোনা আগুনে পুড়ে সমধিক উজ্জ্বল, সমধিক পবিত্র হ'য়ে গেল।

এদিকে স্বামী রামানন্দ ৺রামেশ্বর দর্শন করবার মানসে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করলেন। দৈববশে পথে তিনি আলন্দী গ্রামে এসে উপস্থিত হন এবং ওখানকার দেবালয়ে উঠেন। যোগাযোগ এমনই, রুক্মিণীবাঈ দেবদর্শন করতে এসে সেই দেবালয়ে একজন সন্ন্যাসী দেখলেন। ও দেশের প্রথানুযায়ী তিনি সাধুকে প্রণাম করলেন। স্বামীজীও আশীর্বাদ করলেন, 'পুত্রবতী ভব'। এই শুনে রুক্মিণীবাঈ হাসি চাপতে পারলেন না। স্বামীজী অপ্রতিভ হ'য়ে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তর দিলেন রুক্মিণীবাঈ, 'আমার স্বামী কাশী গিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন। সুতরাং আপনার আশীর্বাদ কেমন ক'রে পূর্ণ হবে, তাই ভেবে আমি হেসে উঠলাম।' স্বামীজীর মনে সন্দেহের একটা অস্পষ্ট ছায়া এসে পড়ল। তিনি তন্ন তন্ন ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, আর যখন নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন যে, তাঁর শিষ্য বিট্‌ঠলপন্ত এই নারীর স্বামী, তখন আর তাঁর চিন্তা ও মানসিক উদ্বেগের সীমা রইল না। বিট্‌ঠল আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে, আর এবংবিধ সন্ন্যাস-দীক্ষাদানে শাস্ত্রের চক্ষে আমিও দণ্ডনীয়, এইরূপ ভেবে তিনি অস্থির হ'য়ে উঠলেন। রামেশ্বর যাওয়া আর হ'ল না। তিনি রুক্মিণী ও তার পিতার সহিত কাশী ফিরে এলেন এবং তাঁদের অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা ক'রে মঠে গেলেন।

গুরুদেবকে এত শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত দেখে বিট্‌ঠল আশ্চর্যান্বিত হলেন। এমন সময় গুরু তাঁর কাছে এসে ব্যথায় ও রাগে অবরুদ্ধকণ্ঠে রুক্ষস্বরে বললেন, 'আমি আলন্দী গিয়েছিলাম, শুনছ?' কণ্ঠস্বর উগ্র হ'য়ে উঠল, 'কিছু বলবার আছে?' বিট্‌ঠলপন্তের সমস্ত চেতনা আলন্দীর নাম শুনে যেন একেবারে লোপ পেল। ভয়ে জড়সড় হ'য়ে তিনি গুরুর শ্রীচরণে পতিত হলেন এবং সমস্ত কথা জ্ঞাপন ক'রে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গুরু যা কিছু দণ্ডবিধান করবেন, তা তিনি সহর্ষে

স্বীকার করবেন। গুরুও এই কথা শুনে আজ্ঞা দিলেন, 'তবে তোমার স্ত্রীকে পুনরায় স্বীকার কর, বাড়ী ফিরে যাও, গৃহস্থ হ'য়ে থাক।'

বিট্‌ঠলের উপর যেন বজ্রপাত হ'ল। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি, গুরুদেব এরূপ দণ্ডবিধান করবেন। তাঁর দারুণ পরীক্ষার সময় এল। একদিকে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা, আর অপরদিকে আজীবন সমাদৃত উচ্চতম আদর্শের পরিসমাপ্তি। শেষে নিরুপায় হ'য়ে তিনি গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করলেন এবং ১২৬১ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন।

বিট্‌ঠলপন্তের পরবর্তী জীবন লাঞ্ছনা ও অপমানে ভরা। আলন্দীর পণ্ডিতশাসিত সমাজ গৃহস্থাশ্রমে পুনঃপ্রবিষ্ট এই পতিত সন্ন্যাসীকে গ্রহণ করল না। বিট্‌ঠলপন্তকে জাতিচ্যুত ক'রে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দেওয়া হ'ল। বন্ধুরা ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। বাকী সকলে তিরস্কার করে, লাঞ্ছিত করে। এই দম্পতির দুঃখ-কষ্টের সীমা নেই। কিন্তু তবুও বিট্‌ঠলপন্তের মুখে প্রতিবাদস্বরূপ একটিও শব্দ নেই। তিনি ভাবেন : আমি তো আর নিজে থেকে স্ত্রীকে স্বীকার করিনি। এ তো গুরুর আজ্ঞাই পালন করছি। কিন্তু পণ্ডিতেরাই বা কি করবেন, যখন আমার মতো গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত সন্ন্যাসীর জন্য শাস্ত্রে কোনো বিধান নেই। এইরূপ ভেবে বিট্‌ঠলপন্ত সমস্ত অপমান ও লাঞ্ছনার জন্য যেন গা পেতে দিয়েছেন; শান্ত মনে নীরবে সব সহ্য ক'রে যাচ্ছেন। এই ভাবে দীর্ঘ বারো বছর কেটে গেল।

এই দুঃখময় পরিবেশে, বর্ষাকালের নিবিড় অন্ধকারে সূর্যের প্রাণপ্রদ রশ্মির ন্যায় পিতা-মাতার শুষ্ক সিক্ত ও অন্ধকার জীবন আলো ক'রে নিবৃত্তিনাথ ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন। এর দু'বছর বাদে জ্ঞানদেবের জন্ম হ'ল, যিনি পরবর্তীকালে 'জ্ঞানেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হন। তারপর সোপানদেব ও মুক্তাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। একদিকে এই চারিটি সোনার ছেলেমেয়ের মুখ ক'খানি দেখে পিতামাতার যেমন হর্ষ হ'ল, তেমনি অপরদিকে তাদের ভবিষ্যতের দুঃখ কল্পনা ক'রে তাঁদের অন্তর বিষম বিষাদে ভ'রে গেল। পিতা-মাতা এত বছর ধ'রে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছেন, কিন্তু তা তাঁরা সহ্য ক'রে নিয়েছিলেন। এখন এই নির্দোষ বাচ্চাদের কি সমাজ গ্রহণ করবে? পাড়ার ছেলেরা এদের সঙ্গে খেলাধুলা করে না, মেলামেশা করে না, 'সন্ন্যাসীর ছেলে' ব'লে এদের ঠাট্টা করে, এটা বাবা-মার চোখে পড়েছে। তাঁদের অন্তরে দুঃখাগ্নি হুহু ক'রে জ্বলে উঠল। আর কোনো সঙ্গী না পেয়ে ভাই-বোনেরা একসঙ্গেই থাকে, ফলে তাদের মধ্যে একটা দৃঢ়তর প্রেম-বন্ধন গড়ে উঠল। তারা সর্বদা বাবা-মার কাছে থাকে, বাবার বৈরাগ্য ও ভক্তিভরা বাণী শোনে, মায়ের সর্ববিধ কাজে একটা নির্লিপ্ততার ভাব দেখে, আর সর্বোপরি দেখে দুঃখে দ্বন্দ্বে বাবা-মার মনের অদ্ভুত সাম্য—সেখানে আর যেন জগতের কোলাহল নেই; মান-অপমানে, সুখ-দুঃখে কঠোর উদাসীনতা। বাড়ীর বায়ু পর্যন্ত যেন ধর্ম-ভাবে ভরা। সেজন্য, যদিও তাদের কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ল না, তবুও পিতা-মাতার স্নেহময় ক্রোড়ে তারা যে শিক্ষা-লাভ করল, তাই তাদের পরবর্তী ধর্ম-জীবনের দৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়াল।

নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানেশ্বরের বয়স এখন দশ ও আট বছর হয়েছে; ব্রাহ্মণ-বালকের জীবনে উপনয়ন-সংস্কার অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। এই সংস্কার না হওয়া অবধি যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব আসে না। সুতরাং ছেলেদের এই সংস্কার-কার্যের জন্য বিট্‌ঠলপন্ত ও তাঁর পত্নী উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলেন। বিট্‌ঠলপন্ত ভাবলেন, স্বামী-স্ত্রী আমরা উভয়ে এতদিন তিরস্কৃত হ'য়ে পর্যাপ্ত ফলভোগ করেছি, হয়তো গ্রামবাসীদের রাগ এতদিনে দূর হয়েছে; সুতরাং ছেলেদের এই মঙ্গল-কার্যে আর কেউ বাধা দেবে না। এই

ভেবে তিনি গ্রামের পণ্ডিতদের সমীপে গেলেন এবং এই অনুরোধটি জানালেন। পণ্ডিতদের গোঁড়ামি ও নিষ্ঠুরতা সমস্ত সীমা অতিক্রম করল; তারা বলল, 'গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত সন্ন্যাসীর ছেলেদের উপনয়ন কোনো মতেই হ'তে পারে না।' বিট্‌ঠলপন্তের এতদিনের যত্নে বর্ধিত আশার উপর যেন সহসা বজ্রপাত হ'ল, হৃদয় ভগ্ন হ'য়ে গেল, দু'চোখ হ'তে প্রাণের বেদনা বিগলিত হ'য়ে ঝরতে লাগল। ছেলেদের ভবিষ্যৎ দুঃখের একটা অস্পষ্ট ছবি চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। তিনি কাতর হ'য়ে পণ্ডিতদের পায়ে পতিত হলেন ও আকুল-কণ্ঠে মিনতি করলেন যে, যে রকম ক'রে হোক্ তাঁরা যেন দয়া ক'রে তাঁর ছেলেদের ব্রাহ্মণ-ধর্মে স্বীকার ক'রে নেন; প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে যা কিছু দণ্ডবিধান করা হবে, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সানন্দে তা স্বীকার করবেন; কিন্তু বাবা-মার একটা অধর্ম আচরণের ফলভোগ যেন তাঁদের ছেলেদের না করতে হয়। কঠোরহৃদয় পণ্ডিতদের অধরে কিন্তু একটা বিদ্রূপের হাসি ও মুখে একই বাক্য—"প্রায়শ্চিত্ত? এর প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু!"

বিট্‌ঠলপন্তের চোখে সখন অন্ধকার নেমে এল। দুঃখ-দারিদ্র্যে আজীবন তাড়িত অসহায় বিট্‌ঠলপন্ত চোখ মেলেও কিছু দেখতে পেলেন না। ভাবলেন, আর বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি আমাদের মৃত্যু ছেলেদের জীবনের পথ থেকে কণ্টক দূর ক'রে দেয়, তো আমরা আর বেঁচে কি করব? এস মৃত্যু, এস! এস কাল! আমাদের সন্তানদের যা কিছু কলঙ্ক ধুয়ে দাও। তুমি তো সর্বসংহারক, এইটুকু কলঙ্ক কি সংহার করতে পারবে না? বিট্‌ঠলপন্ত দেহত্যাগের জন্য কৃতসঙ্কল্প হলেন।

ছেলেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক্ এই তো বাবা-মা চান। যদিও বিট্‌ঠলপন্ত ও রুক্মিণীর দৃঢ় ধারণা ছিল যে তাঁদের সন্তানরা সামান্য নয়, তবুও মায়ায় আবৃত তাঁদের মন চিন্তায় বিহ্বল হ'য়ে গেল।

বিট্‌ঠলপন্ত সে দিনটা ভুলেন নি, যখন বিয়ের আগে তীর্থাটন করতে করতে তিনি আলন্দী গ্রামে এসে উপস্থিত হন ও সেখানে রুক্মিণীর পিতা সিধোপন্তের বাসায় দিনকতক বাস করেন। সিধোপন্তের স্বপ্নের কথাটিও তাঁর বেশ মনে ছিল। তাঁর ওখানে থাকাকালে সিধোপন্ত একদিন স্বপ্ন দেখেন ও আদেশ পান—'বিট্‌ঠলপন্তের সাথে তোমার কন্যার বিয়ে দিয়ে দাও। ওর গর্ভে এমন দৈবীগুণসম্পন্ন সন্তানদের জন্ম হবে যারা তোমার কুল উদ্ধার ক'রে দেবে।' যখন সিধোপান্ত আপনার এই স্বপ্ন বিট্‌ঠলপন্তকে জানান, তখন তিনি বলেন যে, এখন তিনি কিছু ঠিক বলতে পারবেন না। কিন্তু সেই রাতে এবার বিট্‌ঠলপন্ত স্বপ্ন দেখেন, পণ্ঢরপুরের শ্রীবিগ্রহ এসে বলছেন, 'তুমি সে কন্যাকে স্বীকার কর। তার গর্ভে ভগবৎ-শক্তি অবতীর্ণ হ'য়ে তোমার কুলের ও জগতের কল্যাণ করবেন।' বিট্‌ঠলপন্ত ও রুক্মিণী এ সব কথা ভুলে যান নি।

তারপরে রামানন্দ স্বামীর সেই আশীর্বাণীও যেন তাঁদের কানে ধ্বনিত হয়। যখন তিনি বিট্‌ঠলপন্তকে পুনরায় গৃহস্থ-ধর্ম অঙ্গীকার করতে আদেশ দেন, তখন তিনি বলেছিলেন, এই স্ত্রীর সন্তান-সন্ততি ত্রিভুবন-বিজয়ী হবে।

মাঝে মাঝে এই সব কথা এই ভক্তিপরায়ণ সাধুপ্রকৃতি দম্পতির মনে পড়ে। কিন্তু মায়ার খেলা এমনই যে সব কিছু ভুল ক'রে দেয়। নন্দ ও যশোদা কি জানতেন না যে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার? দশরথ ও কৌশল্যার কি এই জ্ঞান ছিল না যে রাম নরদেহে নারায়ণ? কিন্তু মায়ার প্রভাবে স্বীয় সন্তানের মধ্যে তাঁরা ছোট্ট শিশু ছাড়া আর কিছু দেখতে পেতেন না।

এই অবস্থা বিট্‌ঠলপন্ত ও রুক্মিণীর হ'ল। শেষে আর কোনো উপায় না দেখে ভগবানের আশ্রয়ে ছেলে-মেয়েদের রেখে তাঁরা প্রয়াগের পথে যাত্রা করলেন, এবং ত্রিবেণী-সঙ্গমে উভয়ে একসঙ্গে দেহ-রক্ষা করেন।　　(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথ প্রসঙ্গ (২য় সংস্করণ)—শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ. বি. টি. এ. আফিস, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা—৩৬৬+১৬। মূল্য—৩৷৷০।

কোন জাতির যথার্থ ভাবসম্পদের সহিত পরিচিত হইতে গেলে তাহার ভাবরাজ্যের পথিকৃৎ সাধকদিগের জীবনালোচনা একান্তই অপরিহার্য। ভারতবর্ষকে জানিতে গেলেও ভারতীয় ধ্যান-ধারণায় ও সাধ্য-সাধনায় সিদ্ধ মহামানবদের চরিতানুধ্যান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অধ্যাত্ম সাধনাই ভারতীয় ভাবধারার প্রাণস্রোত। যুগে যুগে ইহাই ভারতজীবনকে রূপে রসে উজ্জীবিত করিয়া আসিতেছে। সাধক-ঋষি এবং কবি-মনীষীদের জীবনালোকে আমরা এই তথ্যটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। যদিও বিভিন্ন জীবনে প্রকাশ-তারতম্য আছে, তথাপি মূল সত্যটি এক।

দীপ দিয়া দীপ জ্বালিতে হয়। সিদ্ধসাধকের জীবন-জ্যোতিঃ আরও বহু জীবনকে উদ্দীপিত করে। এক একটি মহাজীবন অগণিত পথিকের পথ চলায় সহায়ক হইয়া থাকে।

ভারতের ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে যোগিবর গোরক্ষনাথজীর অবদান অবিস্মরণীয়। মহর্ষি পতঞ্জলি-নির্দেশিত যোগসূত্র অবলম্বনে বৈরাগ্য, ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসযোগের দ্বারা মানুষ যথার্থ শান্তির অধিকারী হয়, এমনকি সমাধি পর্যন্ত লাভ করিতে পারে—গুরু গোরক্ষনাথজীর জীবন যেন এইরূপ একটি সপ্রত্যয় ঘোষণা। বিষয়মত্ত মানুষকে মোক্ষপ্রদ যোগপথে আনয়ন করিবার জন্যই যোগি-গুরু গোরক্ষনাথ নাথ-যোগি-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। যোগ ও জ্ঞানের গভীর তত্ত্ব-সমূহ ভক্তিপ্রেমে অভিসিঞ্চিত করিয়া এই সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধুগণ দেশব্যাপী এক আধ্যাত্মিক আলোড়ন জাগাইয়া আসিতেছেন। ভারতের বাহিরে তিব্বত, আফগানিস্তান, প্রভৃতি দেশেও এই নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশ্বের নাথই সকল জীবের হৃদয়মন্দিরের অধিদেবতা—সর্বলোকনাথ। তিনি নিত্য নির্গুণ হইয়াও নিত্য সগুণ, নিত্য নিষ্ক্রিয় হইয়াও নিত্য সক্রিয়, নিত্য এক হইযাও নিত্য বহু, নিত্য সর্বাতীত হইয়াও নিত্য সর্বব্যাপী, সকল নামরূপের উর্ধ্বে থাকিযাও সকল নামে ও সকল রূপে বিরাজমান। এই এই নাথই যোগী ও জ্ঞানীর পরমারাধ্য জীবনাদর্শ —সমগ্র জীবনকে নাথময় করিয়া সংসারের সকল বন্ধনের পারে যাওযাই লক্ষ্য। গোরক্ষনাথজীর দার্শনিক মত 'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত' বলিয়া প্রচারিত। ইঁহার অনুবর্তী সাধকগণ সকল দেবদেবী, সকল মত ও উপাসনায় সমান শ্রদ্ধাবান।

শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথজী এই নাথ-সম্প্রদায়েরই অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ—গোরক্ষনাথজীর ভাববাহী সুযোগ্য উত্তরসাধক। আলোচ্য গ্রন্থ যোগী গম্ভীরনাথের অনুপম ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সাধনার এক হৃদয়গ্রাহী আলেখ্য। লেখক স্বয়ং এই মহা-পুরুষের কৃপাধন্য,—তাঁহার ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভে কৃতার্থ। সেদিক হইতে গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। নাথ-যোগিগণের সাধন-প্রণালী ও তত্ত্ব সম্পর্কেও চিন্তাশীল লেখক 'জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ' শীর্ষক একটি অধ্যায়ে অতি সরল-সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থ-গৌরব যথেষ্টই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহার দ্বারা নাথ-সম্প্রদায় সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পরিস্ফুট হইবে সন্দেহ নাই।

গোরক্ষনাথ-মন্দিরে তরুণ যোগার্থিরূপে আগমন-কাল হইতে শুরু করিয়া মহাপ্রস্থান-ক্ষণ পর্যন্ত

গম্ভীরনাথজীর জীবনকে কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করিয়া লেখক শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ একখানি সার্থক চিত্র অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছেন বলা চলে। গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহে লেখকের নিষ্ঠার পরিচয় পাই। যোগিরাজের সাক্ষাৎ শিষ্য বা অনুরাগী ভক্তদের স্মৃতি-কথাই মূল উপাদানরূপে ব্যবহৃত। কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তবে অলৌকিকত্বের চোখ-ঝলসানো ছটায় মহামানবের আসল জীবনকে আচ্ছন্ন করা হয় নাই। গ্রন্থসূচনায় গম্ভীরনাথজীর উদ্দেশ্যে রচিত স্তব দুইটি সুখপাঠ্য। চারখানি সুন্দর ছবি পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রচ্ছদপটে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কাগজ ও ছাপা ভাল; তবে মাঝে মাঝে ছাপার ভুল চোখে পড়ে।

দীর্ঘকাল পরে গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত। লোকোত্তর মহাপুরুষের এ-জীবনী সমাদৃত হইবে আশা করি। আগামী সংস্করণে গম্ভীরনাথজীর উপদেশাবলী হইতে সংকলিত একটি পরিচ্ছেদ সংযোজিত হইলে ভক্তসমাজে গ্রন্থখানির মূল্য আরও অধিক হইবে।

—শ্যামাচৈতন্য

বিদ্যাপীঠ (ছাত্রদের বার্ষিকী—১৯৫৫-৫৬)। প্রকাশক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর; সম্পাদনায় ব্রহ্মচারী আগমচৈতন্য, শ্রীমান প্রতীক বসু প্রভৃতি। পৃষ্ঠা—১২৭।

বৃহত্তর আকারে প্রকাশিত পঞ্চদশ ও ষোড়শ বর্ষের সুমুদ্রিত 'বিদ্যাপীঠ' পাইয়া ও পড়িয়া আমরা আনন্দিত। বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও পরিকল্পনায় 'বিদ্যাপীঠ' পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বাংলা ইংরেজী প্রবন্ধ ও কবিতা নির্বাচন প্রশংসার্হ; দুইটি হিন্দী ও একটি সংস্কৃত প্রবন্ধ পত্রিকার মর্যাদা বর্ধিত করিয়াছে। শিশুবিভাগের অংশ 'কিশলয়ে'র লেখাগুলি কিশলয়ের মতই কচি ও সবুজ।

স্বামী বোধাত্মানন্দের সরল ভাষায় লিখিত 'হিন্দুধর্ম' ও শ্রীসমীর গুহঠাকুরতার 'বিদ্যাপীঠের ইতিকথা' প্রবন্ধ দুইটি উল্লেখযোগ্য। 'আশ্রমিকী'তে বিদ্যাপীঠের দুই বৎসরের ঘটনা-স্রোতের একটি রেখাচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে কয়েকটি ফটো। ছেলেদের আঁকা ছবিগুলিতেও কলা-চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী ধ্যানেশানন্দজীর দেহত্যাগ— আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৮শে অক্টোবর, সকাল ৭টার সময় বারাণসীধামে ৬৩ বৎসর বয়সে স্বামী ধ্যানেশানন্দ (সনৎ মহারাজ) দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯২৪ খৃঃ ভুবনেশ্বর আশ্রমে যোগদান করিয়া ১৯২৯ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল তিনি কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অনলস কর্মী ছিলেন। ঐখানে থাকা কালেই তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। স্যানেটোরিয়ামে দীর্ঘ দিন সুচিকিৎসার ফলে কিছুটা সুস্থ হইয়া তিনি কাশীতেই বাস করিতেছিলেন। শেষে ঐ রোগেই তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

স্বাভাবিক কর্তব্যানুরাগ ছাড়াও সঙ্গীতানুরাগের জন্য কাশীতে উভয় আশ্রমে তিনি প্রিয় ছিলেন; তাঁহার নিষ্ঠাপূর্ণ সেবাভাব ও অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। সেবাব্রতীর দেহমুক্ত আত্মা মাতৃ-অঙ্কে চির-বিশ্রাম লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

রামকৃষ্ণ মিশন বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী

গত ৩রা নভেম্বর বেলুড় মঠে স্বামী নির্বাণানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সভায় সাধারণ সম্পাদকের যে বিবৃতি পঠিত হয় নিম্নে তাহার সারানুবাদ প্রদত্ত হইল।

রামকৃষ্ণ মিশনের ৪৮তম বার্ষিক বিবরণী উপস্থাপিত হইতেছে, ইহা হইতে গত বছরের অগ্রগতি-সম্বন্ধে একটি ধারণা হইবে। প্রথমেই নূতন সম্প্রসারণ-মূলক কার্যাবলী উল্লিখিত হইতেছে:

নূতন কার্য

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় বেলুড় সারদাপীঠে জানুআরি মাসেই S. E. O. T. C. (Social Education Organisers' Training Centre) বা সমাজশিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রের কার্য আরম্ভ হয়। নবনির্মিত একটি ত্রিতল ছাত্রাবাসে থাকিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৮০ জন শিক্ষক এখানে শিক্ষালাভ করিতেছেন।

(২) ঐ মাসেই রেঙ্গুন সেবাশ্রমে বহির্বিভাগের ও পরিচালন-বিভাগের প্রশস্ত গৃহের উদ্বোধন করেন বর্মার প্রধান মন্ত্রী; অস্ত্রোপচার-বিভাগের কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে।

(৩) এপ্রিলে কলিকাতা শিশুমঙ্গল-প্রতিষ্ঠানে ২৫টি সাধারণ বেড লইয়া পুরুষ-বিভাগ সংযুক্ত হওয়ায় উহার নাম পরিবর্তিত হইয়া 'সেবা প্রতিষ্ঠান' হইয়াছে।

(৪) রহড়ায় নবনির্মিত ভবনে গত জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 'বহুমুখী বিদ্যালয়ে'র উদ্বোধন করেন। জানুআরি মাসে জেলা গ্রন্থাগারের কার্য শুরু হয়।

(৫) অক্টোবরে মাদ্রাজ 'বিবেকানন্দ কলেজে'র ৯০ জন ছাত্রের বাসোপযোগী নূতন ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ মহাশয়। তিন বৎসর ডিগ্রিকোর্সের নূতন বিজ্ঞান ভবন নির্মিত হইতেছে।

(৬) দিল্লীতে গ্রন্থাগার ও বক্তৃতাগৃহের শুভারম্ভ করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী। আপাততঃ গ্রন্থাগারে ২৫,০০০ পুস্তক ধরিবে এবং একই সময়ে ১০০ জন বসিয়া পড়িতে পারিবে। বক্তৃতাগৃহে ৭৫০টি আসন আছে, প্রয়োজন হইলে আরও ১০০টির ব্যবস্থা করা সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ-কাজ সমাপ্তপ্রায়; ২৮শে নভেম্বর ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবস।

(৭) পাথুরিয়াঘাটা আশ্রম কলিকাতার দশ *মাইল দক্ষিণে রাজপুরের নিকট 'নরেন্দ্রপুরে' ৪০* একর জমি ক্রয় করিয়া সেইখানে নূতন ছাত্রাবাস নির্মাণে রত।

(৮) বেলঘরিয়া ছাত্রনিবাস নিজেদের জমিতে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

(৯) ইণ্টালিতে জনৈক বন্ধু-প্রদত্ত গৃহে নারী-কল্যাণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ব্রহ্মচারিণীগণ তাহার কার্য চালাইতেছেন।

কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা

গত ডিসেম্বর পর্যন্ত মিশনের তত্ত্বাবধানে ৭২টি কেন্দ্র ছিল, তন্মধ্যে ৮টি পাকিস্তানে, ২টি রেঙ্গুনে; ফিজিতে, সিংহলে, সিঙ্গাপুরে, মরিশাসে ও ফ্রান্সে ১টি করিয়া; বাকী ভারতে: পশ্চিমবঙ্গে ২৫, মাদ্রাজে ৮, উত্তর প্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, ওড়িষ্যায় ২, অন্ধ্রে ২; দিল্লী, বোম্বাই, মহীশূর ও কেরালায় ১টি করিয়া।

এই কেন্দ্রগুলির পরিচালনায় ৯টি (মোট ৭৬২ বেড্-সম্বলিত) অন্তর্বিভাগ-যুক্ত হাসপাতাল, ৪৮টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়, ২টি সাধারণ কলেজ, ২টি শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্র, ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল,

৩২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি কৃষি ও ১টি হোমিওপ্যাথিক স্কুল, ২টি চতুষ্পাঠী, ৪২টি ছাত্রাবাস, ৫৭টি গ্রন্থাগার—মোট ৩১৭টি প্রতিষ্ঠান চলিতেছে।

কার্যধারা

মিশনের কার্য প্রধানতঃ রিলিফ, চিকিৎসা, শিক্ষা, অর্থসাহায্য ও কৃষ্টি—এই পাঁচটি ধারায় প্রবাহিত।

রিলিফ ঃ আলোচ্য বর্ষে জুন মাস হইতে বেলুড় মঠের নির্দেশে ও সাহায্যে শিলং, শিলচর, করিমগঞ্জ, সারগাছি, পাথুরিয়াঘাটা (কলিকাতা), আসানসোল কেন্দ্র ও সারদাপীঠ (বেলুড়) হইতে বিভিন্ন জেলায় বন্যাত্রাণ-কার্য এবং তমলুক ও কাঁথি কেন্দ্র হইতে মেদিনীপুর জেলায় ঘূর্ণিবাত্যায় সেবাকার্য পরিচালিত হয়। মাদ্রাজের মিশন কেন্দ্র হইতে তাঞ্জোর জেলায় বেদারণ্যমে রামনাদ জেলায় পরমকুড়িতে ঘূর্ণিবাত্যায় যে বিরাট সেবাকার্য ১৯৫৫ ডিসেম্বরে শুরু হইয়াছিল—তাহা ১৯৫৬ খৃঃ শেষ হয় নাই। অন্নবস্ত্র বাসনপত্র বিতরণের পর গৃহনির্মাণ-কার্য চলিতেছে। গত জুলাইএ রাজকোট আশ্রমের সহযোগে বোম্বাই আশ্রম কচ্ছের ভূমিকম্পে সেবাকার্য আরম্ভ করে। প্রাথমিক সেবার পর তিনটি গ্রাম নির্মাণের ভার লওয়া হইয়াছে; বছরের শেষ পর্যন্ত তাহা শেষ হয় নাই।

চিকিৎসা : বিভিন্ন দেশে ও রাষ্ট্রে অবস্থিত মিশন-পরিচালিত ৯টি হাসপাতালে ৭৬২ শয্যায় ১৭,৮৫৫ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে (তন্মধ্যে শিশুমঙ্গলে ৫,৪২০, রেঙ্গুনে ৩,৯৭৬)। রেঙ্গুন, কাশী ও বৃন্দাবনে মহিলা-বিভাগ আছে। রাঁচির নিকট ডুরীতে যক্ষ্মা-আরোগ্যনিবাসে ১৬২ শয্যায় ১৪৪ রোগী চিকিৎসিত হয়। দিল্লী আশ্রম দ্বারা পরিচালিত যক্ষ্মা-ক্লিনিকে ২৩৪ রোগী দেখা হয় এবং পর্যবেক্ষণ-শয্যায় ২৮ জন পরীক্ষিত হয়। বিভিন্ন আশ্রমের তত্ত্বাবধানে ৪৮টি দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২১,৮৪,১৪৪ রোগীকে এলোপ্যাথিক, হোমিও ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করা হয়।

শিক্ষা ঃ মাদ্রাজে প্রথম শ্রেণীর কলেজে ছাত্রসংখ্যা ১,৫৬৫, বেলুড় দ্বিতীয় শ্রেণীর আবাসিক কলেজে ছাত্রসংখ্যা ২০৯। কৈম্বাতুর জেলায় ১টি ও ২৪ পরগনার সরিষায় (মেয়েদের) ১টি শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্র; কৈম্বাতুর, মাদ্রাজ ও বেলুড়ে ১টি করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, ২টি চতুষ্পাঠী (ছাত্র ৪৪), ৩টি সমাজশিক্ষা-কেন্দ্র ও ১টি অনাথাশ্রম পরিচালিত হইতেছে।

৪২টি ছাত্রাবাসে	২,৩৩৩	ছাত্র	ও	২৭৯ ছাত্রী
৩২ " হাই স্কুলে	১০,৪৭০	"		৪,১৭৩ "
১১৯ " প্রাথমিক "	১২,৬২৭	"		৭,১৯৪ "

অর্থ সাহায্য : বেলুড় মঠ হইতে ৬৬টি পরিবার ও ১৩১ ছাত্র নিয়মিতভাবে এবং ১৬৭টি পরিবার ও ৪৪ ছাত্র সাময়িক সাহায্য লাভ করে।

কৃষ্টি ঃ প্রায় সকল কেন্দ্রই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে রূপায়িত ভারত-কৃষ্টি প্রচারে যত্নশীল; ক্লাস, সভা, উৎসব, প্রকাশন প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহারা ৫৭টি গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ পরিচালনা করিয়াছে। দেশ-বিদেশের কৃষ্টির একটি মিলনভূমিরূপে কলিকাতা ইনষ্টিট্যুট অব কালচারের কর্মপ্রণালী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষেত্রে দিল্লী কেন্দ্রের কার্যও প্রশংসনীয়।

ভারতের বাহিরে

পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রগুলি কোনও রকমে তাহাদের কাজ বজায় রাখিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে রেঙ্গুনে সেবাশ্রম (হাসপাতাল) ও সোসাইটি (লাইব্রেরি) প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। সিংহল শাখার বিভিন্ন কেন্দ্র ২৪টি বিদ্যালয় (তন্মধ্যে ৪টি হাই স্কুল), ২টি ছাত্রাবাস ও ৩টি অনাথাশ্রম—সিঙ্গাপুর কেন্দ্র ২টি মিড্‌ল্ স্কুল, ১টি ছাত্রাবাস—

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে নাদিতে মিশন-শাখা একটি হাই স্কুল (২১৫ ছাত্র, ৩৭ ছাত্রী) এবং ২টি ছাত্রাবাস (১টি ছাত্রীদের জন্য) পরিচালনা করিয়াছে।

উপসংহার

পরিশেষে স্মরণীয় এই বৎসর মিশনের ৬০ বৎসর পূর্ণ হইল। স্বামীজীর নেতৃত্বে ও শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে যাহার আরম্ভ, সেই সংঘ এই কয়েক বৎসরেই জাতীয় সম্পদরূপে পরিগণিত ; স্বদেশে ও সারা পৃথিবীতে 'বহুজনহিতায়' বহু কাজ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। 'ওঠ, জাগ, যতক্ষণ না লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ ততক্ষণ থামিও না'—স্বামীজীর এই বাণী আমাদের সেই আদর্শলাভে উৎসাহিত করুক। প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য—স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস কলিকাতা 'অদ্বৈত আশ্রম' হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত গ্রন্থপাঠে সংঘের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জনসাধারণের একটি ধারণা জন্মিবে। আমাদের শক্তির উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন ও তাঁহার পতাকা বহন করিবার যোগ্য করুন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে শান্তিরাম ঘোষ—গত ১০ই কার্তিক (২৭.১০.৫৭) বাগবাজারে বলরাম বসু-ভবনে ৯৩ বৎসর বয়সে ভক্ত শান্তিরাম ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন।

হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামে মধ্যবিত্ত ভূম্যধিকারী-বংশে শান্তিরাম জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তারাপ্রসাদ ও মাতা মাতঙ্গিনী ঘোষের এক কন্যা ও তিন পুত্র। কন্যা কৃষ্ণভাবিনীই ভক্ত বলরাম বসুর জায়া ; তিন পুত্র: জ্যেষ্ঠ তুলসীরাম, মধ্যম বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) ও কনিষ্ঠ শান্তিরাম। ঘোষ এবং বসু উভয় পরিবারই শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভক্তিমতী জননী ভক্তিমূল্যেই সন্তানগুলিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে সমর্পণ করেন।

শান্তিরাম বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া ধন্য হন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন, এবং আজীবন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসি-গণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

তাঁহার সন্তানদের মধ্যে একমাত্র কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী বসু ও একমাত্র পুত্র শ্রীভগবান্‌রাম ঘোষ—উভয়েই বিদ্যমান। বিয়োগব্যথিত এই ভক্ত পরিবারকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—নিবেদন—

আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনে'র নূতন (৬০তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক নাম ও ঠিকানা-সহ বার্ষিক ৫৲ টাকা ১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি-তে কাগজ পাঠাইবার অযথা অতিরিক্ত বিলম্ব এবং অতিরিক্ত ডাকব্যয় বাঁচিয়া যায়। কুপনে **গ্রাহক-সংখ্যা** অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। পাকিস্তানের চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ উয়ারী, ঢাকা। ইতি—

কার্যাধ্যক্ষ
১, উদ্বোধন লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা-৩

উদ্বোধন

"এতাবানব্যয়ো ধর্মঃ—"

এতাবানব্যয়ো ধর্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি ॥
অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ ।
যন্নোপকুর্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত—৬।১০।৯, ১০

বিপন্ন দেবতাগণ পালনপরায়ণ নারায়ণ-নির্দেশে তপোমগ্ন দধীচির নিকট গমন করিয়া অশুভ শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য বজ্রনির্মাণের উদ্দেশ্যে তাঁহার তপস্যাদৃঢ় পবিত্র দেহাস্থি ভিক্ষা করিলে লোককল্যাণৈক-মানস দধীচির মুখে সেদিন শাশ্বত ধর্ম এক অপরূপ ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল :

প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যচরিত্র মহাপুরুষগণের দ্বারা উপাসিত আচরিত—ইহাই সেই অব্যয় ধর্ম, অপরিবর্তনীয় চিরন্তন লোককল্যাণকারী মহাশক্তি : এই ধর্ম যিনি পালন করেন তিনি প্রাণিগণের দুঃখে দুঃখিত হন এবং তাহাদের আনন্দে আনন্দিত হন। যাহা পরকীয় অর্থাৎ যাহার উপর নিজের কোনই আধিপত্য নাই, শৃগালকুকুরের ভক্ষ্য এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ এবং যাহা পরম স্বার্থের অনুপযোগী সেই ধন ও আত্মীয় স্বজন দ্বারা যে মৃত্যুশীল মানব সকলের উপকার করে না তাহার কী দুর্ভাগ্য, কি কষ্ট।

শরীর ক্ষণভঙ্গুর, সংসার ক্ষণস্থায়ী। স্বার্থ-সুখভোগে এই অমূল্য জীবনের অপব্যয় না করিয়া সকলের সুখদুঃখের ভাগী হইয়া তাহাদের কল্যাণে দেহমন ধনজন—সব কিছু উৎসর্গ করাই যথার্থ ধর্ম। ইহাই মানুষকে মৃত্যু অতিক্রম করিবার শক্তি দেয়, অমরত্ব দেয়। ত্যাগ ও সেবারূপ ধর্ম কোন দেশে, কালে বা সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নয়, ইহা এক অনস্বীকার্য সার্বকালিক সার্বভৌম ধর্ম,—চিরকাল আছে ও থাকিবে, ইহার ক্ষয় নাই—ব্যয় নাই।

কথাপ্রসঙ্গে

প্রশস্ত পথের সন্ধানে

চৌমাথার মোড়ে আসিয়া পথিক বিহ্বল হইয়া পড়ে—কোন্ দিকে যাইবে, কিভাবে যাইবে! লাল হলদে সবুজ সিগন্যাল আছে—পুলিস আছে—ডোরা-কাটা ক্রসিং-এর রাস্তা আছে, সব দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া তবে নিরাপদে রাস্তা পার হওয়া সম্ভব, একটু ব্যতিক্রম হইলেই লরী, বাস বা মোটরে চাপা পড়িবার ষোল-আনা সম্ভাবনা!

* * *

নানা মত ও পথের চৌমাথায় মানুষ আজ দিগ্‌ভ্রান্ত, বিহ্বল!—কোন্ দিকে যাইবে, কিভাবে যাইবে? একদিন ছিল—ভৌগোলিক সীমানায় ঘেরা দেশ, নদ-নদী গিরি-মরু—ইহাই ছিল এক দেশ হইতে অন্য দেশকে পৃথক্ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। নদী-বেষ্টিত, পাহাড়-ঘেরা অথবা মরুর বুকে—এতটুকু দেশে অনেক বড় মন লইয়া মানুষ বিরাট আকাশ দেখিত, বিশাল পৃথিবী দেখিত, নিজের মনের গভীরে ডুবিয়া যাইত, সেখানকার দুর্জ্ঞেয় রহস্য অপূর্ব ভাষায় অপরূপ ছন্দে প্রকাশ করিত!

এইভাবেই গড়িয়া উঠিল যুগযুগান্ত ধরিয়া কাব্য, সঙ্গীত ও দর্শন! এক এক দেশের বহিঃ-প্রকৃতি অনুযায়ী সেই সেই দেশের মানুষের অন্তঃ-প্রকৃতিও স্পন্দিত বিকশিত হইল; সেই সেই দেশের সমাজে রাষ্ট্রে সাহিত্যে শিল্পে তদনুরূপ ছাপ পড়িতে লাগিল, এক একটি ছাঁচ সৃষ্ট হইল; ইহাই তাহার কৃষ্টি, সভ্যতা ও বৈশিষ্ট্য।

তাহার পর শুরু হইল সংযোগ ও সংঘর্ষ—সমাজের স্তরে স্তরে, জাতিতে জাতিতে, কৃষ্টিতে কৃষ্টিতে। আজও তাহা শেষ হয় নাই, গতিবিজ্ঞানের অগ্রগতির সহিত মানুষ আগাইয়া চলিয়াছে তাহার বেড়াভাঙার অভিযানে; নদী পর্বত সমুদ্রও পারে নাই কোন দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে। চীনের প্রাচীর ডিঙাইয়া মানুষ আসিয়াছে মানুষের কাছে, হিমালয়ের পর্বত-প্রাচীরও তাহা ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জও আজ ইওরো-আমেরিকার ভাষায় ভূষায় অধুনায়িত। আফ্রিকার অন্ধকার ঘন জঙ্গলেও চলিয়াছে বর্তমানের দিবালোকের অভিযান।

সংঘাত ও সংঘর্ষকে এড়াইবার আজ আর কোনও উপায় নাই। নানা আকারে, নানা প্রকারে—নানা নামে, নানা রূপে—ইহা আজ দেখা দিতেছে ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, সভায় সম্মেলনে! কোথাও সংঘাত নূতন ও পুরাতনে, কোথাও বিতর্ক ধর্ম ও বিজ্ঞানে, কোথাও সংগ্রাম শ্রমিক ও মালিকে, কোথাও দ্বন্দ্ব জড়বাদ ও চৈতন্য-বাদে অথবা বাস্তববাদ ও আদর্শবাদে।

এই দ্বন্দ্বময় পৃথিবীতে দ্বন্দ্বাতীত হইবার একটি গোপন অথচ উন্মুক্ত রহস্য রহিয়াছে—আমরা তাহারই সন্ধানে চলিয়াছি।

সংঘাত জীবনের সূচনা করে সত্য, সংগ্রামই জীবনের লক্ষণ—একথাও সত্য; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য কি?—অবিরত সংঘাত? অফুরন্ত সংগ্রাম? এ সিদ্ধান্তে পরিণত মানব-মন কখনও বিশ্রাম করিতে পারে না, পূর্বপ্রাপ্ত গতির ছন্দে সে আগাইয়া চলিবেই।

সমুদ্রে তরঙ্গতাড়িত মজ্জমান ব্যক্তি যেভাবে ভূমিস্পর্শ কামনা করে, বিমানের আরোহী যেমন সর্বক্ষণ মনে করে—কতক্ষণে নিরাপদ মাটির পৃথিবীতে নামিব, তেমনি সংগ্রামশীল মানুষ সর্বদা কামনা করে সংগ্রামের অবসান। সংঘাত কখনও লক্ষ্য নয়—সংযোগই তার অভিপ্রেত।

বর্তমানে বিভিন্ন কৃষ্টির বিশ্বব্যাপী সংঘাতে যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্ট হইতেছে—পরিণামে তাহা এক বিশাল বিশ্বমানব-কৃষ্টিতে রূপান্তরিত হইবে—

এরূপ কোনও সম্ভাবনা আছে কি? বর্তমানের দিগন্তে তাহার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি?

সম্মুখে তো দেখিতেছি, যুযুৎসু প্রতিদ্বন্দ্বী—জড়বাদ ও চৈতন্যবাদ বা নিরীশ্বরবাদ ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ধর্ম। ঈশ্বরবাদ বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত! অতএব জড়বাদ বা নিরীশ্বরবাদকে যাঁহারা মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর মনে করেন, তাঁহাদের প্রথম কর্তব্য ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে তাঁহাদের যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া একমুখী করা, নিজেরা নির্বিরোধ হওয়া; সম্মিলিত ব্যূহ রচনা করিয়া যদি তাঁহারা যুদ্ধ করিতে পারেন তবেই জয় সুনিশ্চয়, নতুবা পৃথক যুদ্ধে প্রত্যেককে ছিন্ন ভিন্ন হইতে হইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহাদের লব্ধ অনুভূতিগুলির কোনটিকে তুচ্ছ বা হেয় না মনে করিয়া সবগুলির একটি সাধারণ ভূমি আবিষ্কার করিয়া তবেই জড়বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন। ঈশ্বরবাদিগণ নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ দূর করিতে না পারিলে নিরীশ্বরবাদীকে কখনই নিরস্ত করিতে পারিবেন না।

'শুধু আমার মতই সত্য—আর সব মত মিথ্যা, ভুল'—এই জাতীয় সংকীর্ণ বুদ্ধি বা শুষ্ক আত্মম্ভরিতাকে আজিকার যুক্তির যুগে টিকিয়া থাকিতে হইবে না! তোমার মত যদি সত্য হয়, তবে আমার মতও সত্য, তোমার মত যতখানি সত্য—আমার মতও ততখানি সত্য। কোন কথার উত্তরে 'আমার শাস্ত্রে বা কেতাবে এই বলিয়াছে' বলিলে তাহার উত্তরে অপর পক্ষও ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিবে। শেষ পর্যন্ত যদি বাক্যবলের পরিবর্তে বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তরবারির সিদ্ধান্তই যদি মানিয়া লইতে হয়, তবে—জড়বাদী হাসিবে! সে বলিবে,—'ঐ জন্যই তো আমি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মানুষকে ধরিয়াছি,—তোমার ঐ মধ্যযুগীয় মনোভাবে আমার আস্থা নাই। তোমার ঈশ্বরকে লইয়া আমার কাজ নাই, আমি মানুষকে ভালবাসিব, মানুষের উন্নতির জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করিব।' একথার উত্তরে ঈশ্বরবাদী কি বলিবেন? তিনি কি বলিতে পারিবেন, হাঁ ভাই, আমিও তোমার মতো মানুষকে ভালবাসিব, মানুষের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিব; তবে তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য—তুমি মানুষকে জড়ের পরিণতি মনে কর, আমি তাহার মধ্যে চৈতন্যকে অনুভব করি, নতুবা কি করিয়া সম্ভব হইল এই বিচারবুদ্ধি—এই হৃদয় অনুভূতি?

নিরীশ্বর জড়বাদকে নিরস্ত করিতে গেলে আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিভিন্ন ধর্মের বিরোধের অবসান। ধর্মে ধর্মে সংঘাত বহু হইয়াছে। কি তাহার ফল হইয়াছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মনীতির স্থানে রাজনীতি বসিয়াছে। ধর্মনীতিকে মানুষ আজও সমাজনীতিতে পরিণত করিতে পারে নাই, তাই এই অশান্তি, অসন্তোষ, অসাম্য ও সংগ্রাম!

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কালে বিভিন্ন ধর্ম উদ্ভূত হইয়া তত্তদ্দেশে তত্তৎসময়ে যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছে—পরবর্তী কালে বিকৃত হইয়া প্রভূত অকল্যাণও সাধন করিয়াছে। অব্যবহিত অতীতে বিভিন্ন ধর্ম পারস্পরিক সংগ্রামে ক্লান্ত। ইসলাম একদিন মনে করিয়াছিল তরবারির জোরে সে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিবে, কিন্তু খৃষ্টধর্ম তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। খৃষ্টধর্ম-প্রচারক মনে করিয়াছিল—সারা পৃথিবী সে যীশুর জন্য জয় করিবে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা বুঝিতে শুরু করিয়াছেন, যীশু তাঁহাদের চিন্তা ও কল্পনাকে ছাড়াইয়া রহিয়াছেন—"তাঁহার স্বর্গীয় পিতার অট্টালিকায় অনেক ঘর আছে"—ঈশ্বর অনন্ত ভাবময়! ঈশ্বর কোন জাতির মধ্যে, ভাষার মধ্যে, পুস্তকের মধ্যে, এমনকি কোন মহামানবেও সীমাবদ্ধ নন। ঈশ্বরীয় ভাব বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার মূলগত ভাব এক। সর্বোচ্চ দর্শন ও অনুভূতির কথা যেখানেই

লিপিবদ্ধ—সেখানেই দেখা গিয়াছে, 'সব শেয়ালের এক রা' ; সত্যদ্রষ্টাদের কথায় ভাবে—কোন বিরোধ নাই, ভাষায় ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য স্বাভাবিক।

এখন, যখন পৃথিবী নানা কারণে সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে—তখন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের মানবের আধ্যাত্মিক অনুভূতির যদি তুলনামূলক অধ্যয়ন করা যায় তবেই দেখা যাইবে—অন্যান্য মৌলিক বহির্বৃত্তির মতো ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাও এক মৌলিক বৃত্তি ; তবে পার্থক্য এই যে ইহা প্রথমে—সাধনাবস্থায় অন্তর্মুখী, পরে সিদ্ধাবস্থায় লোককল্যাণে বহির্মুখী।

বিভিন্ন ধর্ম যাহাতে পরস্পরকে বুঝিতে পারে এবং নিরীশ্বরভাব দূর করিবার জন্য সহযোগিতা করিতে পারে—তদুদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক আয়োজন আজ একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিশ্বব্যাপী চেষ্টা যতটুকু চলিতেছে তাহা আশাপ্রদ, কিন্তু যথেষ্ট নয়।

পর পর দুইটি যুদ্ধের পর সর্বত্র মানুষ ধর্ম সম্বন্ধে নূতন করিয়া চিন্তা করিতে শুরু করিয়াছে, বিশ্বব্যাপারে আজ ধর্ম একটি মহাশক্তি, প্রায় প্রত্যেক দেশেই ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত ভাবে আধ্যাত্মিক-শক্তি লাভের প্রয়াস দেখা যায়। জাপানে বৌদ্ধ এবং শিণ্টো ধর্মেরও পুরাতন গুঁড়ি হইতে নূতন অঙ্কুর উদ্‌গত হইতেছে। যতটুকু জানা যায় চীনেও খৃষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম উন্নতিশীল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাতীয় অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মেরও জাগরণ দেখা দিয়াছে। ব্রহ্মে ও সিংহলে বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ। ভারতে—কলকব্জা ও বিজ্ঞানের দিকে রাষ্ট্রের ঝোঁক যথেষ্ট ; কিন্তু সেজন্য জনসাধারণ ধর্মবিমুখ নয়। ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং প্রাচীনধর্মকে নবীন ব্যাখ্যার অলঙ্কারে ভূষিত করার চেষ্টাও স্পষ্ট। সর্বোপরি নূতন গণতন্ত্রের একটি পুরাতন চিরন্তন আধ্যাত্মিক ভিত্তি রচনায় প্রচেষ্টাও দৃষ্টি এড়ায় না, ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজনীতিতে কাঙ্ক্ষিত সাম্যের উৎস-সন্ধানে আমাদের চিন্তানায়কদের অনেকেই উপনিষদের হিমালয়ে—গীতার মানস-সরোবরে গিয়া থাকেন। আরব রাষ্ট্রগুলিতেও ইসলামকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা চলিয়াছে। আফ্রিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রাচীন গোষ্ঠী-ধর্মের মধ্যে নূতন শক্তির সন্ধান করিতেছেন, প্রয়োজন ক্ষেত্রে কিছু কিছু আদিম রীতিনীতি বর্জন করিতেছেন। আমেরিকায় ধর্মের পুনরুজ্জীবন প্রত্যক্ষ, কোন ধর্মের প্রবক্তাকে শ্রোতার অভাবে চুপ করিয়া থাকিতে হয় না, বেদান্তকেন্দ্রগুলিতে নিত্য নূতন অনুরাগী আসিতেছে, ইহুদী ধর্মও বৎসরে ২০০০ নূতন অনুগামী লাভ করিতেছে। ইওরোপে নানা স্থানে 'নবজীবন কেন্দ্র' ক্রিয়াশীল ; দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত ধর্মকে খাপ খাওয়াইবার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

এই সকল ধর্মীয় পুনরুত্থানে দুইটি ভাব লক্ষণীয়, —একটি নিছক জাতীয় জাগরণ, আর একটি বিশ্বমানবতা। যথাসময়ে সাবধান হইতে না পারিলে প্রথমটিতে রাষ্ট্র ও ধর্ম এক স্বার্থে পরিচালিত হইয়া অনিষ্টের কারণ হইতে পারে, কোথাও কোথাও তাহা হইতেছেও, আর দ্বিতীয়টির উপযুক্ত ভিত্তি না থাকিলে উহা শূন্যে সৌধনির্মাণের মত হইবে। প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক নীতি ভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতি শক্তিহীন, এবং জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বমানবতা নিরর্থক কথামাত্র।

প্রত্যেক জাতির একটি সাধারণ আদর্শের ভিত্তি প্রয়োজন, তাহা দ্বারাই জাতীয় কৃষ্টি নির্ণীত হয় ; কিন্তু 'সত্য' এক বলিয়া 'ধর্ম' বিশ্বজনীন। আণবিক যুগে শুধু জাতীয় স্বার্থ নয়, মানবিক স্বার্থই বিপন্ন। অতএব জাতীয়তা অপেক্ষা আজ ধর্মেরই প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছে। বিশ্বব্যাপী মানুষ আজ এক সুরে চিন্তা করিতে বাধ্য হইতেছে ; এখন আর নাৎসীর বিরুদ্ধে ইংরেজের আত্মরক্ষা নয়—জাপানের বিরুদ্ধে চীনার আত্মরক্ষা নয়, এখন মানুষের

আত্মরক্ষাই বড় প্রশ্ন। সমগ্র মানব-জাতির এক সাধারণ উদ্দেশ্য—সাধারণ নিয়তি—যেন স্পষ্টভাবে ধরা দিতেছে। শুধু বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি ও ভোগ্য-পণ্যের উপর জীবনের বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি রচনা করা যাইতেছে না। শুধু রুটি দিয়া প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না। জাতি ও ব্যক্তির সম্মানের জন্য মানুষ আইন রচনা করিয়া আজ তাহারই জালে জড়িত। দলীয় রাজনীতিতে সংখ্যাধিক্যের যে গণতন্ত্র—তাহাতে যে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বা সম্মান থাকে না—তাহা মানুষ বুঝিয়াছে। সম্মিলিত জাতিসংঘেও সংখ্যাধিক্যের প্রহসন।

মানুষের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে কোথায় কি একত্ব, তাহারই সন্ধান আজ শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাঁহারই সন্ধানে সম্মিলিত ভাবে বাহির হইতে হইবে অনাদি কালের সত্য ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক—ধর্ম-সাধকদের। বিভিন্ন দেশে ও কালে যত ধর্ম বিকশিত হইয়াছে—তাহাদিগকে সযত্নে একত্র করিয়াই মানুষ পাইবে এক অখণ্ড সত্যের সন্ধান; প্রত্যেকে বুঝিতে পারিবে—প্রত্যেকের দৃষ্টিতে সত্যের এক একটি দিক প্রকটিত হইয়াছিল, প্রত্যেকের কিছু নূতন দৃষ্টিভঙ্গি আছে, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ নয়।

হিন্দু মনে করে—সত্য ও মুক্তি সম্বন্ধে তাহার ধারণাই শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধের ধারণা—যুক্তির যুদ্ধে সেই বিজ্ঞানের সমকক্ষ, এবং বিশ্বশান্তি ও বৌদ্ধধর্ম একার্থক। ইসলামের গর্ব তাহার সাম্য ও বিশ্বাস। খৃষ্টান জানে, যে যাহাই বলুক একমাত্র পরিত্রাতা যীশু; কারণ তিনি ঈশ্বরের 'একমাত্র পুত্র' এবং তিনিই মানুষের জন্য নিজেকে 'বলি' দিয়াছিলেন।

'আমার ধর্ম সত্য, আর সকল ধর্ম ভুল ও ভ্রান্ত' এই ধরনের চিন্তা মানুষকে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবে। মিলনের জন্য প্রথম প্রয়োজন পরস্পরকে সম্মান, তারপর প্রীতিপূর্বক হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া ভাব-বিনিময়। দলগত ভাবেই নয়, ব্যক্তিগত ভাবেও প্রত্যেককে শুনিতে হইবে প্রত্যেকের কথা; পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া নয়, একে অপরকে বিচ্যুত করিয়া নয়—পরস্পরের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া, ভাব বিনিময় করিয়া, অপরের উৎকর্ষ দ্বারা নিজের অপূর্ণতা দূর করিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা এক পূর্ণতর ধর্ম সহায়ে প্রশস্ত যাত্রার পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে—যে পথে নিজ নিজ ধর্ম, বিশ্বাস ও আদর্শ লইয়া নিরাপদে চলিতে পারিবে আগামীকালেরউন্নততর মানবজাতি।

স্বামী ওজসানন্দজীর দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৮ই ডিসেম্বর দ্বিপ্রহর ১২টার সময় দিল্লীতে স্বামী ওজসানন্দজী করোনারি থ্রম্বোসিস্ রোগে ৬০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। রোগের লক্ষণ দেখা দিবামাত্র তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যমুনা-তীরে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে।

স্বামী ওজসানন্দ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৩ খৃঃ ২৬ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন পাশ করিবার পর সংসার ত্যাগ করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের ত্রিবান্দ্রম আশ্রমে তিনি যোগদান করেন; শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস লাভ করিয়া তিনি সাধন-ভজনে নিমগ্ন হন।

১৯২৩-১৯৩৮ পর্যন্ত ত্রিবান্দ্রম আশ্রমের উন্নতিকল্পে কাজ করিয়া—স্বামী ওজসানন্দ মহীশূর আশ্রমে আসেন, এবং সেখানে বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। ১৯৪৫ খৃঃ হইতে উতকামণ্ড আশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত ঐ কার্য সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিচালনায় আশ্রম খুব জনপ্রিয় হয় এবং স্নেহপূর্ণ সদয় ব্যবহারের জন্য তিনিও সকলের বড় প্রিয় ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে নূতন তথ্য

[জনৈকা আমেরিকান ভক্ত-সংগৃহীত। ইংরেজী হইতে সংকলিত]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিষ্যবৃন্দ-লিখিত জীবন-চরিতে স্বামীজীর আমেরিকায় প্রথমবাবের অবস্থিতি-প্রসঙ্গ কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদগুলিতে স্বামীজীর প্রচারের প্রথম-দিককার কয়েকটি উদ্দীপনাপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়, পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর প্রতি স্বামীজীর বাণীর কথা সেখানে বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিবৃত হইয়াছে কী প্রভূত পরিমাণ শক্তি ও করুণা তিনি ঢালিয়া দিয়াছিলেন এই দেশে—যেখানে ধর্মের ক্ষুধা ছিল, কিন্তু খাদ্য ছিল না। গ্রন্থ-রচনাকালে চরিতকারগণ স্বামীজীর জীবন যথাসম্ভব সম্পূর্ণ ও যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তবু মনে হয় ঘটনাগুলি মোটামুটিভাবেই বর্ণিত হইয়াছে, খুঁটিনাটি অনেক কিছু সংযোজনের অবকাশ এখনও রহিয়াছে।

ধর্মমহাসভার পরে যখন স্বামীজী সমগ্র মধ্য-পশ্চিম প্রদেশে বক্তৃতারত ছিলেন তখনকার কথা খুব কমই জানা যায়। আবার ধর্মমহাসভার পূর্বে যখন তিনি কয়েক সপ্তাহ নিউইংলণ্ডে কাটাইয়াছিলেন—তখনকার বিষয়ও অজানা। বোস্টনে তিনি যে অনেকবার বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এ কথা জানা থাকিলেও বক্তৃতার বিষয়বস্তু ও তারিখ, সবই অজ্ঞাত। প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে স্বামীজী নিশ্চয়ই আরও অনেক বক্তৃতা ও ঘরোয়া আলোচনা করিয়াছিলেন—যাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আমাদের জানার বাহিরে নিশ্চয় তাঁহার অনেক বন্ধু ছিল—যাঁহাদের চিঠিপত্রে ও দিনলিপিতে তাঁহার জীবন ও বাণীর অনেক কথাই লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলি হয়তো এখনও ধূলি-ধূসরিত কোন চিলাকুঠিতে পড়িয়া রহিয়াছে; বিবেকানন্দের অনন্যসাধারণ পরিচ্ছদ ও আকৃতি দর্শনে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল—এখনও তাহা সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। স্বামীজীর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ একদিকে গভীর বিদ্বেষ, অপর দিকে অন্তরের শ্রদ্ধা জাগরিত করে। সেই কালের উপর স্বামীজীর প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহার পরিচয় ব্যতীত তাঁহার জীবন-চিত্র সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়াও স্বামীজীর সম্বন্ধে নূতন ঘটনাগুলি—যতই ছোট হউক, তাঁহার অনুরাগী-দিগের নিকট উহা কম আদরের নয়, কালক্রমে এগুলি আরও সত্যরূপে প্রতিভাত হইবে। খুঁটিনাটিভাবে তথ্যসংগ্রহের কাজ ক্রমশঃ দুরূহ হইয়া উঠিবে। যাঁহারা স্বামীজীকে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের পরিচয়লাভে যথেষ্ট দেরি হইয়া গিয়াছে, যেসব স্থানে তিনি ছিলেন সন্ধান করিয়া সেই সব স্থানে যাওয়া এখনই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

মানুষ মরিয়া যায়, স্মৃতি ক্রমশঃ মুছিয়া যায়, অট্টালিকা ভাঙিয়া পড়ে, কিন্তু আমেরিকায় স্বামীজী আধ্যাত্মিকতার যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা হইতে উৎপন্ন বৃক্ষশিশু তাঁহার ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টিতে উদ্‌ভাসিতরূপেই উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে, যদিও সেই বপনকালের স্মৃতি বিলীয়মান।

আমেরিকায় স্বামীজীর জীবনের আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত কতকগুলি ঘটনা আবিষ্কার করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে; এইগুলি এখন মূল জীবনী-গ্রন্থে সংযোজিত হইতে পারে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত স্বামীজী-সংক্রান্ত অনেক চিঠিপত্র এবং সাময়িকী ছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে মুদ্রিত, এখন বিনষ্টপ্রায় আমেরিকার সংবাদ-পত্রগুলি এই গবেষণা কার্যের উৎস। মূল সংবাদ-পত্রগুলিতে যেরূপ তথ্য পাওয়া গিয়াছে, সেরূপই প্রকাশ করা হইল, বানানগুলি অপরিবর্তিত

রাখা হইল,—ইহাতে ভারত-সম্বন্ধে তৎকালীন আমেরিকার কাগজগুলির যেরূপ ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাহাও সেইরূপই রাখা হইল। স্বামীজীকে কিরূপ সাংস্কৃতিক পরিবেশের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, এগুলি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। কয়েকটি সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি আংশিকভাবে স্বামীজীর জীবনীতে প্রদত্ত হইলেও পরিপূর্ণতার জন্য সমগ্র বিবরণীর প্রয়োজন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে স্বামীজী ভারত হইতে আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করেন—এই সময় হইতে ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভা পর্যন্ত তথ্য মুখ্যতঃ ভারতে স্বামীজীর লেখা দুই-একটি পত্র হইতেই পাওয়া যায়।

ব্যয়-সংকোচের জন্য তিনি চিকাগো হইতে বোস্টন চলিলেন—কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন বোস্টনে জীবনযাত্রার ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। স্বামীজীর চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, 'ঈশ্বর আশ্চর্য-ভাবেই তাঁহার কাজ করিয়া থাকেন'। সত্যই চিকাগো হইতে বোস্টনে ট্রেনে যাইবার সময় স্বামীজীর সহিত এক বৃদ্ধা মহিলার আলাপ হয়, তিনি স্বামীজীকে ম্যাসাচুসেটস্-এ অবস্থিত তাঁহার 'ব্রিজি মেডোজ্' (Breezy Meadows) নামক পল্লীনিবাসে কিছুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভগবৎ-প্রেরিত এই মহিলার মাধ্যমেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট্ (J. H. Wright)-এর সহিত তাঁহার দেখা হয়। প্রথম দর্শনেই অধ্যাপক রাইট্ স্বামীজীর প্রতিভার পরিচয় পান এবং অর্থাভাব-বশতই চিকাগোয় ফিরিতে তাঁহার অনিচ্ছা জানিয়াও অধ্যাপক তাঁহাকে প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া ধর্মমহাসভায় যোগদান করিতে সম্মত করান। অধ্যাপক রাইট্ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং পরিচয়পত্রে লিখিলেন, 'স্বামী ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি হইবার যোগ্যতম পাত্র—ইনি এমন এক ব্যক্তি, যাঁহার নিকট নিদর্শন চাওয়া আর সূর্যকে কিরণ দিবার অধিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা একই কথা।' ডক্টর রাইট্ কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ না হইলে স্বামীজী ধর্মমহাসভায় যোগদান করিতেন কিনা সন্দেহ।

স্বামীজীর ২০.৮.৯৩ তারিখের পত্রে ধর্ম-মহাসভার পূর্বের আরও কিছু জানা যায়। অতিথিপরায়ণা ঐ মহিলা তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া 'ভারত হইতে আগত অদ্ভুত জীব'কে দেখাইতেন। স্বামীজীর অদ্ভুত পোষাকের দরুনই তাঁহাকে বিস্ময়কর মানুষ ভাবিয়া লোকে তাঁহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। এই কারণে তিনি বোস্টনে পাশ্চাত্ত্য পোষাক ক্রয় করিতে বাধ্য হন। স্বামীজী নিমন্ত্রিত হইয়া একটি বৃহৎ মহিলা-সভায় বক্তৃতা দেন। মহিলা-সমিতির সভ্যেরা রমাবাঈকে খুব সাহায্য করিতেন। এই সমিতির উদ্যোগে নারীজাতির উন্নতিমূলক কার্যাবলীর পরিচয় পাইয়া স্বামীজী খুবই প্রীত হন। এই বিবরণীর সঙ্গে আরও কিছু কথা যোগ করা আবশ্যক,—বিশেষ করিয়া ২০শে আগস্ট হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের অপ্রকাশিত কাহিনী।

যেখানে স্বামীজী গিয়াছেন সেখানেই তিনি সংবাদের বিষয়ীভূত হইতেন, মনে হয় নিউইংল্যাণ্ডও বাদ যায় নাই। ধর্মমহাসভার পূর্বে যে সব শহরে স্বামীজী পদার্পণ করিয়াছেন, সেখানকার সংবাদ-পত্রসমূহে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু না কিছু উল্লেখ থাকিত। ব্রিজি মেডোজের নিকটতম শহর মেট্কাফ, অনুসন্ধানে জানিয়াছি শহরটি ছোট হওয়ার দরুন এখানে কোন সংবাদপত্র ছিল না। মেট্কাফের পরবর্তী বড় শহর হলিস্টন, কিন্তু ইহাও নিজস্ব সংবাদপত্র চালাইবার উপযুক্ত ছিল না। পরবর্তী ফ্রেমিংহাম পুরাপুরি একটি বড় শহর—এখানে সংবাদপত্রও প্রকাশিত হইত, অতএব আমি ফ্রেমিংহামে যাই। এখানকার 'ফ্রেমিংহাম ট্রিবিউন' নামে একখানি সংবাদপত্র পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের

উল্লেখযোগ্য সংবাদ সরবরাহ করিত। স্বামীজীর গতিবিধিও উহাতে অবশ্যই প্রকাশিত হইত। সেই সময়ে 'ফ্রেমিংহাম ট্রিবিউন' সাপ্তাহিক-রূপে প্রতি শুক্রবারে বাহির হইত।

পত্রিকার মাত্র কয়েকখানি সংখ্যা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল বলিয়া আমার পক্ষে এই কার্য বিশেষ আয়াসসাধ্য হয় নাই। এই তথ্য সংক্ষিপ্ত হইলেও অদ্ভুত বলিয়াই রূঢ় বাস্তবতাপূর্ণ।

ফ্রেমিংহাম ট্রিবিউন

শুক্রবার, ২৫শে আগষ্ট, ১৮৯৩। হলিস্টন: পশ্চিম হইতে সদ্যপ্রত্যাগতা মিস কেট স্যানবরন গত সপ্তাহে ভারতীয় রাজা স্বামী বিবেকানন্দ (Vivikananda)-কে সংবর্ধিত করেন। ফিপসের অশ্বযুগলবাহিত যানে মিস্ স্যানবরন এবং রাজা নগরের মধ্য দিয়া হান্‌ওয়েলের পথে অগ্রসর হন।

এই দৃশ্য কিরূপ বিস্ময়কর হইয়াছিল। মাথায় পাগড়ী ও ঝলমলে পোষাক-পরিহিত তরুণ সন্ন্যাসীকে কে না 'রাজা' বলিয়া মনে করিবে! নিউইংল্যাণ্ডের শান্তিপূর্ণ গ্রামের মধ্য দিয়া রাজকীয় সমারোহে অশ্বযানে চলিয়াছেন,—পার্শ্বে 'ব্রিজি মেডোজে'র কর্ত্রী। ইহা ১৮ই আগষ্ট শুক্রবারের ঘটনা। পরের রবিবার স্বামীজী বোস্টনে পাশ্চাত্ত্য পোষাক কিনিতে যাইতেছেন, ভারতে চিঠি লিখিয়াছেন: শত শত লোক আমাকে দেখিবার জন্য রাস্তায় জড় হইতেছে, সেই জন্য লম্বা কাল কোট পরা দরকার মনে করিতেছি, কিন্তু বক্তৃতার সময় গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ীই পরিব।

উপরি-উক্ত সংবাদ হইতে জানিতে পারা যায় স্বামীজী প্রথমে যাঁহার আতিথ্যলাভ করেন সেই মহিলা—মিস কেট স্যানবরন। কোন সন্দেহ নাই যে, মিস স্যানবরন তাঁহার অতিথি 'ভারতের অদ্ভুত মানুষ'টিকে সঙ্গে লইয়াছিলেন ব্রিজি মেডোজ হইতে দশ মাইল দূরে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে।

স্বামীজী কিন্তু আত্মসমর্পণের ভাবে লিখিয়াছেন, '…এই সমস্তই সহিতে হইবে।' বাস্তবিকই কেট স্যানবরনের সামাজিকতা ও তাঁহার 'রাজা'কে (Rajah) লোকসমক্ষে দেখাইয়া বেড়ানোর ক্রমার্হ আমোদের মধ্য দিয়াই স্বামীজী ডক্টর রাইটের দেখা পান এবং পরে সমগ্র আমেরিকায় পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহা সুনিশ্চিত যে, স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানের প্রথম দিকে অমায়িক মিশুক ও সর্বজন-পরিচিতা মিস স্যানবরন তাঁহাকে আতিথ্য প্রদান করিবার ঠিক উপযুক্ত ব্যক্তি, যেহেতু এই মহিলা স্বামীজীকে শুধু ডক্টর রাইটের সহিতই পরিচিত করেন নাই, তাঁহাকে আমেরিকার দৃশ্যপটের ভূমিকা ভালরূপে প্রদর্শন করিবার যন্ত্রস্বরূপও হইয়াছিলেন। মিস স্যানবরন সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে যে, বহুমুখী কর্মময় পরিবেশের মধ্যে এই মহিলা শুধু উৎসাহপূর্ণ এবং অতিথিবৎসলা ছিলেন না, তিনি বক্তা এবং লেখকও ছিলেন। বহু এবং বিচিত্র ছিল তাঁহার আলোচ্য বিষয়। স্বামীজী তাঁহাকে 'বৃদ্ধা মহিলা' বলিয়া উল্লেখ করিলেও স্বামীজীর সঙ্গে যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে তখন আমেরিকার হিসাবে তিনি বৃদ্ধা ছিলেন না; তখন তাঁহার বয়স ৫৪, এবং তিনি খুব উৎসাহপূর্ণা ছিলেন। কাজে কর্মে কথাবার্তায় সপ্রতিভতার জন্য তিনি সুবিদিত ছিলেন।

নিউ হ্যাম্পশায়ার হইতে আসিয়া তিনি ম্যাসাচুসেটসে এই পরিত্যক্ত খামার (ব্রিজি মেডোজ) কিনিয়া এটিকে বাসোপযোগী করেন। তাঁর লেখা দুইটি পুস্তকে এখানকার জীবন লিপিবদ্ধ আছে; তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, স্বামীজী কি পরিবেশে এখানে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, কি সব দৃশ্যাবলী দেখিয়াছিলেন। বাড়ীটির কাছে পাইন বার্চ এল্‌ম্ গাছগুলি তাঁহার লেখায় সস্নেহে বর্ণিত। একটি পুস্তকে বাড়ীটির ছবিও আছে। ব্রিজি মেডোজ আজ অনেক পরিবর্তিত; খানিকটা অংশে নিগ্রো ছেলেদের শিক্ষাশিবির, খানিকটা জাভেরিয়ান পাদ্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। পুরাতন বাড়ীগুলি জীর্ণ, বড় বড় গাছগুলি অদৃশ্য।*

* সম্পূর্ণ প্রবন্ধের জন্য 'Prabuddha Bharata, 1955 দ্রষ্টব্য।

মা সারদামণি ও নবযুগ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নারীতে শক্তির প্রকাশ। নবজীবন জাগাতে হ'লে শক্তি ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্বামীজী বলেছিলেন, 'মা-ঠাকরুণ ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছিলেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।'

গৃহ-প্রাচীরের অন্তরালে ঘরের ছোটো-খাটো নানা কাজে ব্যস্ত ঐ আমাদের মায়েরা আর বোনেরা, আমাদের কন্যারা আর অবগুণ্ঠিতা কুলবধূরা। সুতো কাটছে, সল্‌তে পাকাচ্ছে, কুটনো কুটছে, কাপড় কাচছে, সেলাই করছে, বড়ি দিচ্ছে, উঠান নিকাচ্ছে, ঝুল ঝাড়ছে, ধান ভানছে, গম পিষছে, বাটনা বাটছে, জল তুলছে। আমরা পুরুষেরা মনে করি, আমাদের তুলনায় ওরা কত না তুচ্ছ। ওরা অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করে না, তুষার-ঝঞ্ঝার সঙ্গে লড়াই ক'রে হিমালয়ের শিখরে ওঠে না, কালিদাসের মতো কাব্য লিখে কালজয়ী হয় না, ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে নদীর দুরন্ত জলধারাকে পাষাণ-শৃঙ্খলে বাঁধে না। ওরা রাঁধে আর প্রিয়জনের শোকে কাঁদে। ওরা ছোট, আমরা বড়। বারো হাত কাপড়ে কাছা নেই,—ওরা অবলা মেয়েমানুষ! আমরা দিগ্বিজয়ী কবিতকর্মা পুরুষ। আমাদের সঙ্গে ওদের তুলনা হয়?

দুর্বিনীত অহঙ্কারে পুরুষ নারীকে সরিয়ে রাখল একান্তে। যে তাকে শক্তি দেবে, প্রেরণা দেবে সে হ'য়ে থাকল খেলা-ঘরের পুতুল। দামী দামী শাড়ীতে আর গয়নায় নারীকে সাজিয়ে পুরুষ তাকে ব্যবহার করতে লাগল মনের ভোগেচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্যে। এই নির্বুদ্ধিতার ফলে যে-সভ্যতা আজ গড়ে উঠেছে হৃদয়হীন পুরুষের নীরস বুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে—তার রূপ কী কদর্য! কী হিংস্র! প্রগল্‌ভ যন্ত্র-সভ্যতার এই গর্বোদ্ধত সমারোহ তো দরিদ্রকে দরিদ্রতর এবং বিত্তশালীকে আরও বিত্তশালী ক'রে তুলছে। আর আমরা যে বিজ্ঞানের এত বড়াই করছি—এই বিজ্ঞান চর্চাই বা আমাদের কোন্ স্বর্গে পৌঁছে দিয়েছে? বৈজ্ঞানিকদের মগজের শক্তিকে আজ ব্যবহার করা হচ্ছে নব নব মারণ-অস্ত্র আবিষ্কারের জন্যে। এই সব মারণ-অস্ত্রের ধ্বংস করবার শক্তি কি অপরিসীম—গত মহাযুদ্ধে হিরোশিমার শ্মশানভূমি তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত ক'রে দিয়েছে।

আমরা পুরুষেরা আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং কর্মশক্তির এত অহঙ্কার ক'রেও পৃথিবীকে কি নরকেরই সামিল ক'রে তুলিনি? কল্যাণময় জীবন তো সেই জীবন, যার মধ্যে মিলে গিয়েছে জ্ঞান আর প্রেম। জ্ঞানের দিক দিয়ে সভ্যতা এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত। কিন্তু প্রেমের দিক দিয়ে আমরা কতটুকু আগাতে পেরেছি? আমরা পুরুষেরা তো সেই আনাড়ির হাতের রুটির মতো—যার একটা দিক সেকা হয়েছে ভালোই, আর এক দিকটা একদম কাঁচা ময়দা। আমাদের বুদ্ধির দিকটা প্রখর হ'লে কি হয়? হৃদয়ের দিকটা যে ময়দা হ'য়ে আছে। আণবিক বোমা দিয়ে নারী-হত্যা, শিশুহত্যা করতেও তাই আমাদের কোন কুণ্ঠা নেই।

হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথ্বীর রূপান্তর ঘটতে পারে, যদি সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে নারী—তার হৃদয়ের করুণ কোমলতা নিয়ে। বুদ্ধির দৌড় তো দেখা গেল। হাইড্রোজেন বোমার হাত থেকে জলের গভীরে মাছগুলো পর্যন্ত নিস্তার পেল না! আকাশপথে উড্ডীয়মান বোমারু-বাহিনী—একটি

বারের জন্তেও ভূমি স্পর্শ না ক'রে আট হাজার মাইল উড়ে যাবার ক্ষমতা রাখে। আর সেই সব বোমারু থেকে যে সকল বোমা বর্ষিত হয় তারা শহরের পর শহরকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে পারে যেমন ছাই ক'রে দিতে পারে পিঁপড়ের বাসাকে বোতলের ফুটন্ত গরম জল। পুরুষের গড়া এই পৃথিবীতে আজ আশা কোথায়? আলো কোথায়? আশ্রয় কোথায়?

তমসাচ্ছন্ন দিগন্তে নারীশক্তির উদ্বোধনের মধ্যে আশার কনকরশ্মি দেখেছিলেন বিবেকানন্দ। তাই তিনি বললেন: মেয়েদের আগে তুলতে হবে, mass (জনগণ)কে জাগাতে হবে,—তবে তো দেশের কল্যাণ।

প্রয়োজন—জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা। আমরা পুরুষেরা আমাদের মগজের বুদ্ধি দিয়ে মেশিন-গান বানিয়েছি, হাইড্রোজেন-বোমা আবিষ্কার করেছি, যমের পায়ে অর্ঘ্য দিয়েছি। জীবনকে তো আমরা শ্রদ্ধা দেখাইনি, প্রাণকে তো আমরা ভালো বাসিনি। নারী পরম বেদনায় জীবনকে সৃষ্টি করেছে, আর দেশে দেশে মহারথীরা সেই জীবনকে ব্যবহার করেছে সমর-ক্ষেত্রে 'যোগাতে যমের খাদ্য'।

এযুগের প্রলয়-পারাবারের পারে নবজীবনের উপকূলে পৌঁছে দেবার শক্তি রাখে জীবনের প্রতি সর্বব্যাপী শ্রদ্ধা। নারীই এই জীবনকে পরম বেদনায় সৃষ্টি করে মরণের মুখে এগিয়ে গিয়ে। তাই জীবনের প্রতি মমতা নারীর মজ্জাগত। জীবনকে যারা শ্রদ্ধা করতে জানে প্রাণকে সৃষ্টি করে ব'লে—মানুষের ইতিহাসে গৌরবময় নবযুগ আসবে তাদেরই শক্তিকে আশ্রয় ক'রে। এই কথাই এ যুগের দেশবিদেশের বড় বড় মনীষীদের কথা।

পূজার আসনে মাতা সারদামণিকে বসিয়ে ঠাকুর ষোড়শী পূজা করেছিলেন, তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করেছিলেন নিজ সাধনার ফল এবং জপের মালা। পত্নীর পদপ্রান্তে এইভাবে অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে ঠাকুর স্বীকার করলেন নারীর মধ্যে যে শক্তি রয়েছে তারই অপরিমেয় মহিমাকে।

একথা সত্য যে পশ্চিম ক্ষমতার মদিরা পান ক'রে ভুলে গিয়েছে জীবনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। ওর কণ্ঠে শান্তির বাণী নেই, আছে রণ-হুঙ্কার। শান্তির বাণী ভারতবর্ষের কণ্ঠে। ভারতবর্ষই আজ পৃথিবীকে দেখাতে পারে শান্তির শুভ্রপথ-রেখা। কিন্তু দুর্বলের কথা কে শোনে? শক্তিতে তাকে হ'তে হবে অপরাজেয়। আর এই শক্তি ভারতবর্ষের মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চারিত হবে তার গার্গী আর মৈত্রেয়ীদের নীরব সাধনাকে অবলম্বন ক'রে। ভারতের দিগ্বিজয়ের এই নব অভিযানের পুরোভাগে থাকবে তার নারীশক্তি। মাতা সারদামণির জন্ম এই নূতনতর শক্তিকে জাগাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনালব্ধ সমস্ত ফল শ্রীমাকে সমর্পণ করলেন, তিনি সর্বসিদ্ধির অধিকারিণী হলেন।

ভারতবর্ষে এই নারীশক্তি কোন্ আদর্শকে অনুসরণ ক'রে বিকাশ লাভ করবে, তার পথ দেখিয়ে গেছেন শ্রীমা তাঁর পবিত্র জীবনের শুভ্র আলোয়। পুরুষ এবং নারী—এদের মধ্যে মৌলিক ঐক্য থাকলেও উভয়ের স্বভাব বিচিত্র ধাতুতে গড়া এবং সেইজন্যে উভয়ের কর্মক্ষেত্রও বিভিন্ন হ'তে বাধ্য। নারীকে ভগবান তৈরী করেছেন জীবনকে সৃষ্টি ও পালন করবার জন্যে। সর্বাগ্রে সে মা। পুরুষকে তিনি মুক্তি দিয়েছেন সন্তান ধারণ এবং তাকে লালন করবার দায়িত্ব থেকে। সে মাটিকে করবে হলমুখে বিদীর্ণ, পৃথিবীকে করবে ফলে শস্যে ফলবতী। পুরুষের স্থান বাহিরে যেখানে জড়-প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার নিরবচ্ছিন্ন লড়াই; নারীর স্থান ঘরে, যেখানে ক্লান্ত পুরুষ পাবে বিশ্রাম, কল্যাণ-হস্তের পরিচর্যা, তার সন্তান পাবে মাতৃ-বক্ষের স্নেহসুধা।

শ্রীমা গৃহস্থালির কাজে কোনদিন শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। ভোর রাত্রে তিনি প্রতিদিনই শয্যাত্যাগ করতেন। আর কেউ উঠবার আগেই গঙ্গায় গিয়ে তিনি স্নান ক'রে এসে জপে বসতেন। তারপর আরম্ভ হ'ত ঘরের কাজকর্ম। দুপুরের রান্না রাঁধতেন, সামনে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে খাওয়াতেন, তাঁকে তেল মাখিয়ে দিতেন, পান সাজতেন, সলতে পাকাতেন, সংসারের খুঁটিনাটি সব কাজই নিজে হাতে করতেন। ঠাকুরের সংসার বৃহৎ ছিল। শিষ্যেরা অনেক সময়ে ঠাকুরের কাছে থাকতেন। তাঁদের আহার্য শ্রীমাকেই প্রস্তুত করতে হ'ত। আনন্দের সঙ্গেই তিনি তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্যগুলি ক'রে যেতেন।

নহবৎখানার অতটুকু ঘরের মধ্যেও তাঁকে প্রতিদিনের কর্তব্যগুলি সম্পাদন করতে হ'ত। একটু হাত-পা ছড়িয়ে শোবারও জায়গা ছিল না। খাঁচার মতো একটা ক্ষুদ্র পরিসর ঘরে এক আধদিন নয়, বছরের পর বছর তিনি কাটিয়েছেন ভোরবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত সংসারের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন ক'রে। ঘরে মানুষ আছে—বাইরের লোক কখনো তা টের পায় নি। এতই লজ্জাশীলা, নম্র এবং নীরব ছিলেন তিনি।

একটা শুষ্ক কর্তব্যবোধ থেকে এইভাবে নিঃশব্দে দিনের পর দিন কাজ ক'রে যাওয়া সম্ভব নয়। স্বামীর প্রতি অন্তহীন শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা তাঁকে শক্তি দিয়েছিল ক্লান্তিহীন সেবায় নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করবার। ঠাকুরের দেহকে কেমন ক'রে সুস্থ রাখা যায়—সেই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ভাবনা। রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে ছিলেন ঠাকুর। দক্ষিণেশ্বরে তাঁকেই কেন্দ্র ক'রে চলেছিল এ যুগের সর্বোত্তম লীলা। স্বভাবতই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁর উপরে। নেপথ্যের নিভৃতে দাঁড়িয়ে যে-নারী নিপুণ হস্তের ক্লান্তিহীন স্নিগ্ধ পরিচর্যায় ঠাকুরের দেহকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁর চরিত্রের মহিমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা স্মরণ করবো। তিনি না থাকলে ঠাকুর কতদিন শরীর ধারণ করতে পারতেন—কে জানে?

শ্রীমা নিজের জীবন দিয়ে নারীর কর্তব্যের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সংসারের কেন্দ্রে থেকে সেবার মাধুর্যে সে সকলকে করবে পরিতৃপ্ত। সে হবে নিরলস, নম্র, নীরব, লজ্জাশীলা, সেবাপরায়ণা। তার ব্যক্তিত্বে বুদ্ধির দীপ্তি থাকবে; কিন্তু উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যের উত্তাপ থাকবে না। সে আপনাকে সকলের মধ্যে বিতরণ ক'রে দেবে যেমন ক'রে ফুল নিঃশব্দে নিজের সৌরভকে বিলিয়ে দেয়।

কী শিখিয়ে গেছেন তিনি—নারীসমাজকে—তাঁর জীবনের আচরণ দিয়ে? জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে মর্যাদা দিতে হবে—কারণ নরের মধ্যেই তো নারায়ণ। আমজাদ মুসলমান মজুর, তাকে খেতে দেওয়া হয়েছে। শ্রীমার ভাইঝি নলিনীর কুণ্ঠিত হাত থেকে অন্ন ব্যঞ্জন পাতে পড়ছে। পরিবেশনের মধ্যে শ্রদ্ধার অভাব রয়েছে। মা থাকতে পারলেন না। পরিবেশনের ভার নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। আপন হাতে আমজাদকে তিনি খাওয়ালেন। শুধু খাইয়েই ক্ষান্ত থাকলেন না। তার উচ্ছিষ্ট নিজের হাতে তিনি পরিষ্কার করলেন। জীবনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল এমনই অপরিসীম। যারা জপ করে না, তাদের জন্যে রাত জেগে তিনি জপ করেছেন। পাপীর জন্যে দরজা তাঁর সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। বলতেন, ছেলে যদি ধুলাকাদা মেখে নোংরা হ'য়ে থাকে, মা হ'য়ে আমি তাকে দূরে রাখব?—না, ময়লা ধুইয়ে দিয়ে কোলে তুলে নেব?

মেয়েরা যদি শ্রীমার আদর্শকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ ক'রে তা অনুসরণ করে—ভেদবুদ্ধির শাসন থেকে দেশ মুক্তি পাবে, অস্পৃশ্যতার কালিমা হিন্দু-সমাজের ললাট থেকে চিরতরে মুছে যাবে, সাম্প্রদায়িকতার মহাপাপ অচিরে বিলুপ্ত হবে,

প্রেমের ভিত্তিতে নূতন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে, যার শক্তি হবে অপরাজেয়।

নারীসমাজ গৃহের চতুঃসীমানার মধ্যে তার কর্মধারাকে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ রাখবে,—এমন কথা কোন চিন্তাশীল লোক বলবেন না। সমাজ সেবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ যুগের নারীর ডাক পড়েছে। যুগের এই আহ্বানে তাকে সাড়া দিতেই হবে। পর্দার আড়ালে নিশ্চয়ই সে আপনাকে অবগুণ্ঠিত ক'রে রাখবে না। কিন্তু এই প্রগতির যুগে একটা কথা মনে রাখা দরকার। লেখাপড়া জানা মেয়েরা সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে নারী হৃদয়ের করুণা নিয়ে যদি না আসে—তাব অবস্থাটা হবে সেই কৃষকের মতো যে মাঠে গরু এনেছে, লাঙল এনেছে কিন্তু বুনবার জন্যে বীজ আনে নি। জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধায় তো পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষের অস্তিত্বকে আজ অভিশপ্ত ক'রে রেখেছে। আজকের এই দানবীয় যন্ত্র-সভ্যতার স্রষ্টা পুরুষ। জীবন তাকে সৃষ্টি করতে হয় না। বহু বেদনায় জীবন সৃষ্টি করে নারী নিজের জীবনকে বিপন্ন ক'রে। পুরুষ নারীর সৃষ্টিকে ছিনিয়ে নিয়ে তোপের মুখে তাকে অনায়াসে উড়িয়ে দেয়। জীবনকে যে সৃষ্টি করে সেই দিতে পারে জীবনকে মর্যাদা। শ্রীমার জন্ম নারীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে, আর এই শক্তির উদ্বোধন হবে যে আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে তা হচ্ছে—জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা।

মা

শ্রীমতী দিব্যপ্রভা ভরালী

দেখি নাই এ জীবনে, শুনি নাই বাণী তব অমিয়-স্যন্দিনী
স্নেহ-সুকোমল কোনো কালে হায়,—তবু যে তোমায় আমি চিনি।
বিগত কালের বক্ষে জেগে ওঠে ওই কার প্রেমময়ী বাণী—
যে বাণী জাগাল আজি প্রাণ মোর—নব আলোকের বার্তা আনি!
সে কোন্ অতীত জন্মে স্নেহভরে তুমি মোরে করেছ আপন,
মানসনয়ন পথে আজি পুনঃ তোমারে করিনু দরশন।
লভিনু পরশ দুটি অভয় করের তব সুধা-সুশীতল,
ওই দুটি রাঙ্গা পায় নোয়াইনু মাথা আমি আনন্দ-বিহ্বল,
প্রীতি-পুলকিত মন শুনি তব স্নেহাশিস্ বাণী সুমধুর!
সে সুদূর বিস্মৃত মাধুরী আজি জাগাইলে এ জীবনে মোর।

জননী সারদামণি! কত নামে ডাকে তোমা কত নরনারী—
কেহ বলে মহামায়া, কেহ বলে কালী, কেহ দেবী-মহেশ্বরী,
পরমা-প্রকৃতি বলে কত জনে, আর কত বলে সরস্বতী,
নিজ ভাবভক্তি অনুযায়ী কত জনে গাহে কত তোমার প্রশস্তি!
আমি সবাকার পিছে থাকি—ডাকি যে তোমায় শুধু 'মা, মা' ব'লে!
'মা' এই একটি অক্ষরই শুধু আমি জানি—তব পদতলে
তাই আজি দিনু আনি, লবে কিগো মোর এই দীন উপচার?
আমি জানি না বন্দনাগীতি, স্তোত্র-মন্ত্র কিছু জানি না যে আর!
নামরূপাতীতা—একা, অনির্বচনীয়া, প্রেম-করুণা-আধার,
হে চির-কল্যাণময়ী সন্তান-বৎসলা, মা আমার, মা আমার!

রাজর্ষি ডেভিড ও তাঁহার গীতসংহিতা

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

বাইবেলের Old Testament (পুরাতন নিয়ম)-এ রাজর্ষি ডেভিডের কথা আছে। ইহুদী মেষপালকের বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বেথলেহেম নামক পবিত্র পল্লীতে ইনি তাঁহার পিতার মেষগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। মেষগুলি মাঠে চরিত, আর ডেভিড তাঁহার বাদ্যযন্ত্র (Harp) লইয়া অতি সুমিষ্ট স্বরে এবং ভাবের সহিত ভগবানের গুণগান করিতেন।

যৌবনে ডেভিড একজন নির্ভীক বীরপুরুষ ও একান্ত ভগবদ্ভক্ত হইয়া উঠিলেন। ইহুদীদের রাজা স্যামুয়েল ভগবানের প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া ডেভিডকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ডেভিড রাজা হইয়া নিজের অন্তরে ভগবানের আশিস ও দিব্যজ্ঞান অনুভব করিলেন।

রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকিলেও ডেভিড সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করিতেন এবং ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতেন। অপূর্ব ছন্দে ও ভাবে তিনি যাহা গাহিতেন, তাহাই পুরাতন বাইবেলে লিপিবদ্ধ আছে, এবং উহা The Book of Psalms বা গীতসংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। গীতসংহিতাটি Old Testament (পুরাতন নিয়ম)-এ সর্বাপেক্ষা আদরণীয় পুস্তক (Best loved Book in the Old Testament) বলিয়া খ্যাত। এই ক্ষুদ্র গীত-পুস্তক সম্বন্ধে W. E. Gladstone (গ্লাডষ্টোন) বলিতেন, গ্রীক্ সভ্যতার সকল বিস্ময় একত্র করিলেও উহা এই ক্ষুদ্র গীতসংহিতার চেয়ে কম আশ্চর্যজনক মনে হয়।

"All the wonders of Greek Civilization heaped together are less wonderful than is this simple book of Psalms."

যীশুখ্রীষ্ট এই গীতগুলি খুব ভাল বাসিতেন এবং সেগুলি তাঁহার অন্তরে এতই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তাঁহার মর্মন্তুদ মৃত্যু-সময়ে গীতসংহিতার দ্বাবিংশ গীতটির একটি কলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন : হে ভগবান্! হে আমার ভগবান্! কেন আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? "My God, My God, why hast Thou forsaken me?" যীশু একত্রিংশ গীতটিও আবৃত্তি করিয়াছিলেন, হে সত্যস্বরূপ ভগবান্! আপনার নিকট আমি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতেছি। আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

'Into thine hand I commit my spirit
Thou hast redeemed me,
O Lord God of Truth."

Christian Smart নামক একজন কবি তাঁহার "A Song to David"—ডেভিডের প্রতি একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে গেলে রাজর্ষির গীতসংহিতাটি হৃদয়ে উচ্চ ভাব আনয়ন করিয়া সৎকার্যে প্রেরণা দান করে। যে ব্যক্তি নতজানু হইয়া এই গীতগুলি পাঠ করিবে, সে তাহার ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করিতে পারিবে এবং ক্ষুধার্ত আত্মাকে খাদ্য এবং পীড়িত আত্মাকে ঔষধ দান করিতে পারিবে।

"For adoration, David's Psalms
Lift up the heart to deeds of alms ,
And he, who kneels and chants,
Prevails his passions to control
Finds meat and medicine to the soul,
Which for translation pants"

জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ডেভিড তাঁহার গীতগুলিতে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের প্রধান কাম্য ছিল—তিনি যেন সারাজীবন ভগবানকে লইয়া থাকিতে পারেন।

"One thing have I asked of God, that will I seek after; that I may dwell in the house of God all the days of my life." 97 4

তিনি রাজকীয় নানা আড়ম্বরে পরিবেষ্টিত থাকিলেও পৃথিবীর কোন পদার্থে আস্থা পোষণ করিতেন না। তাঁহার এক গীতে তিনি বলেন: কেহ রথে, কেহ অশ্বে আস্থা স্থাপন করেন, কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বরের নামই করিব।

"Some trust in chariots, some trust in horses; but we will make mention of the name of our God" 20 7

ঈশ্বরই রাজা। তাঁহার রাজত্বে সমস্ত জাতি বাস করিতেছে এই মনোবৃত্তি লইয়া তিনি অভিমান-শূন্য অন্তরে রাজকার্য সম্পন্ন করিতেন।

"God sits as king forever, let the nations know themselves to be but men" 9 7,20

বর্তমান যুগে জাতিতে জাতিতে যে অভিমানপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে তাহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এই কথাগুলি সর্বদা স্মরণীয়।

মেষপালকের কাছে মেষগুলি যেরূপ নির্ভরশীল, ঈশ্বরের কাছে ডেভিডের ব্যক্তিত্ব সেইরূপ নির্ভর করিত। অপূর্ব ভাষায় তাঁহার এক গীতে তিনি এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন:

"The Lord is my shepherd I shall not want. He makes me to lie down in green pastures He leads me beside still waters Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me" 23 1,4

এই নশ্বর মনুষ্যজীবনে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আশ্রিত হইয়া থাকার মত আনন্দের জিনিস আর কিছুই নাই। ডেভিড তাঁহার গীতগুলিতে এক এক সময় একান্ত উল্লাস-সহকারে আনন্দের অভিব্যক্তি করিয়াছেন।

"Let those that take refuge in God shout for joy." 5 11

কঠিন রাজকার্যে দুশ্চিন্তা ও দুর্যোগবশতঃ ঈশ্বরে আস্থাহীন রাজাদের রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, দিবাতে ক্ষুধার হ্রাস পায়। তাহাদের মত সর্বদা চিন্তাকুল হইয়া জীবন যাপন করার নিদারুণ দুর্ভোগ ডেভিডের জীবনে ছিল না। ডেভিড গান গাহিয়া বলিতেন—হে ভগবান্! শান্তিতে আমি শয়ন করি ও নিদ্রা যাই, কারণ তুমিই আমাকে সর্বদা নিরাপদে রাখিয়াছ।

"In peace will I lay me down and sleep, for Thou, Lord, alone, makest me to dwell in safety." 4 : 8

ভগবানে নির্ভরশীল হইলেও ডেভিডের শত্রুর সংখ্যা খুব বেশী ছিল। সর্বদা যুদ্ধের জন্য এবং শত্রুদের পরাজিত করার উৎসাহ তাঁহার কম ছিল না। তিনি একটি গীতে গাহিয়াছেন:

"I will not be afraid of ten thousands of people that have set themselves against me round about." 3 6

ঈশ্বরকে বাদ দিয়া কোন কিছু করা ডেভিডের জীবনে সম্ভবপর ছিল না। ইহা তাঁহার এক গীতে এইভাবে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বর ছাড়া ঘর তৈরী করিলে সে পরিশ্রম ব্যর্থ হয়।

"Except God build the house, they labour in vain that build it" 127 : 1

রাজকার্যে ব্যস্ত থাকিয়া বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলেও রাজা ডেভিড শিশুর মত নিজেকে ভগবানের দ্বারা রক্ষিত মনে করিতেন। পরিণত বয়সে এবং বৈষয়িক কার্যে থাকিয়া মনটিকে শিশুর মত রক্ষা করা—খুব বড় আধার না হইলে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে তিনি নিজের শিশু-প্রকৃতি স্বীকার করিয়া গাহিয়াছেন: মার কাছে শিশু যেমন স্থির ও শান্ত থাকে আমিও নিজেকে সেইরূপ শান্ত করিয়াছি।

"I have stilled and quieted my soul in God, as a child with his mother." 131 · 2

স্নেহশীল পিতা যেমন নিজের সন্তানদের প্রতি

কারুণ্য প্রকাশ করেন, সেইরূপ জগৎপিতাও তাঁহার শরণাগত সন্তানদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন। এই ভাবটি তিনি তাঁহার গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন:

"Like as a father pities his children, so the Lord pities them that fear him For he knows our frame, he remembers that we are dust" 103 13, 14

ডেভিডের গীতসংহিতার প্রতি ছত্রে ঈশ্বরে বিশ্বাস, জীবনের প্রতি পদে তাঁহাকে স্মরণ করা বা ডাকা এবং মানুষের প্রতি ভগবানের স্নেহপূর্ণ কারুণ্য এবং তাঁহার নামে আনন্দে থাকা — এইগুলি পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হইয়াছে। 'Trust' (বিশ্বাস), 'Praise' (বন্দনা), 'Loving kindness of God' (করুণা), 'Rejoice' (আনন্দ), 'Sing' (গান), এবং 'Shout for joy' (হর্ষধ্বনি)—এই শব্দগুলি তাঁহার গীতাবলিতে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে। যীশুখৃষ্ট স্বয়ং এই গীতগুলি ভালবাসিতেন, অন্যে পরে কা কথা! St. Augustine (সাধু অগাষ্টিন) অতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি তাঁহার জীবনে আধ্যাত্মিক অবসাদের সময় এই গীতটি গাহিতেন:

হে ভগবান্! তুমি আমার অপরাধবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিও না, অথবা তুমি অত্যন্ত অসন্তোষসহকারে আমাকে শাস্তি দিও না। তোমার বাক্যগুলি বাণের মত আমাকে বিদ্ধ করে এবং তোমার দণ্ডযুক্ত হস্ত আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়।

"O Lord, rebuke me not in thy wrath neither chasten me in thy hot displeasure. For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore" 38 . 2

নিজের জীবনের গ্লানি অসহ্য হইলে অগাষ্টিনের হৃদয় রাজর্ষি ডেভিডের সুরেই কাঁদিত। হে ভগবান্! তুমি আমাকে ছাড়িও না। তুমি আমাকে দূরে রাখিও না। হে প্রভু! আমার সাহায্যের জন্য ত্বরান্বিত হও, তুমি আমার মুক্তিধাম।

"Forsake me not, O Lord O my God, be not far from me Make haste to help me, O Lord, my Salvation." 38 21-22

Master George Sandys (জর্জ স্যাণ্ডিজ) ডেভিডের হিব্রু গীতসংহিতার ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে বিখ্যাত কবি Thomas Crew (টমাস ক্রু) তাঁহার বন্ধু ছিলেন তিনি বন্ধুর অনুবাদ পাঠ করিয়া এতদূর মোহিত হন যে, তিনি তাঁহাকে একটি ইংরেজী কবিতাতে অভিনন্দিত করেন এবং নিজের জীবনের উপর ধিক্কার দিয়া এইভাবে কবিতায় ঝংকার দিয়া বলেন:

হে বন্ধু! তোমার অনুবাদ পড়িয়া আমি আমার জীবনের পট-পরিবর্তন করিতে চাই। মাটির প্রতিমার (রক্তমাংসের দেহে) মুগ্ধ হইয়া আমি তাহাতেই ভগবানের পূজা করিয়াছি। এখন এই সকল প্রতিমা হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাই এবং ভগবৎপ্রেমে প্রেরণা লাভ করিয়া কবিতা রচনা করিতে চাই।

'Prompted by thy example then, no more,
In moulds of clay will I my God adore,
But tear those idols from my heart, and write
What His blest Sp'rit,
not fond love shall indite"

রাজর্ষি ডেভিডের গীতসংহিতা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অতি প্রিয়। তাঁহার প্রার্থনাগুলি হৃদয়ের রক্তে রঞ্জিত এবং পাঠকের প্রাণে নব জীবন আনয়ন করে। গীতগুলির ভাষা ও প্রকাশ করিবার প্রণালী কখনও একঘেয়ে হইবার নয়। ভক্তের হৃদয়ে নিরুত্তন আকাঙ্ক্ষাগুলি যে ভাবে প্রকাশিত হওয়া উচিত সেই ভাবেই গীতসংহিতায় অমর ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র দিব্য সংহিতাটি মানব সমাজে রাজর্ষি ডেভিডের শ্রেষ্ঠ অবদান। যেখানে প্রাণের ভাষায় মনোভাব প্রকটিত হইয়াছে, সেইখানে দার্শনিক মস্তিষ্কের কষ্টকল্পনা পরাভব স্বীকার করে। গীতসংহিতায় কবির রচনা-চাতুর্য, ভাষার পারিপাট্য, এবং ছন্দের মোহিনী শক্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে এমন এক প্রাণস্পর্শী অমর ধ্বনি আছে—যাহা দ্বারা কি দার্শনিক, কি কবি, কি সাহিত্যিক, কি সাধারণ মানুষ সকলেই দিব্য প্রেরণা লাভ করিতে পারে।

কেমনে চাহিব সুখ?

শ্রীমতী সুজাতা হাজরা

যুগে যুগে তুমি কত না বেদনা সহেছ ভকত তরে,
স্মরি সেই কথা আজিকে আমার নয়নে অশ্রু ঝরে।

বল্কলবাসে বনবাসে আহা কাটায়ে দীর্ঘদিন,
রাজার কুমার কৃচ্ছ্রসাধনে করিয়াছ তনু ক্ষীণ।
কলুষদৃষ্টি মানব মনেরে ক্ষমাভরে দিয়া মান—
সীতারূপধারী আপনার সুখ দিয়াছিলে বলিদান।

প্রেমঘন দেহ ক্রুশের আকারে ক্ষতবিক্ষত ক'রে—
পরমতদ্বেষী নিঠুর মানব হাসে উল্লাস ভরে।
করুণাকাতর ছলছল আঁখি তবু কর নাই রোষ,
নীরবে যাতনা সহিয়া শুধুই মাগিয়াছ সন্তোষ।

জরামরণের ব্যথায় পীড়িত আর্তমানব লাগি
ভ্রমিয়াছ পথে রাজগৃহ ত্যজি—হে মহাবৈরাগী।
হাসিমুখে নিলে ভকত-হাতের বিষমাখা উপহার।
স্মরি সে কাতর ম্লান মুখছবি ঝরিছে অশ্রুধার!

ভক্তহৃদয় প্রেমরস-ঘন করুণা কোমল দেহ—
কৃষ্ণবিলাসী রাধিকাপ্রেমের মূর্ত সে বিগ্রহ।
ধূলিশয্যায় অশ্রুপাথারে শচীর স্নেহের ধন,
দারা-গৃহ ছাড়ি, হে প্রেমভিখারী করেছ আকিঞ্চন।

কামকাঞ্চন-বাসনাদগ্ধ দিক্‌হারা যত প্রাণ,
হেরে সম্মুখে তব সান্ত্বনা—কাশীপুর উদ্যান।
নিদারুণ ব্যাধি রুদ্ধকণ্ঠ চক্ষু নিদ্রাহীন,
নিরুপায় সবে দেখিয়াছে চাহি দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ।

কথা নাহি মুখে—তবু ব'লে গেল ক্ষমাসুন্দর আঁখি,
'দেহের দুঃখ দেহ শুধু জানে, মনে আনন্দ রাখি'।
আপনি প্রভু যে আপন জগতে বদ্ধ বেদনা-পাশে,
কারে অভিযোগ জানাবে মানব শোক-তাপ-মোহে ত্রাসে?

বেদনা-পাথারে সদা ভাসে তব প্রেম-উজ্জ্বল মুখ,
তোমার বক্ষে রক্ত ঝরায়ে কেমনে চাহিব সুখ?

সন্ত জ্ঞানেশ্বর

ব্রহ্মচারী তেজচৈতন্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

পণ্ডিতেরা যে প্রায়শ্চিত্ত চেয়েছিল তা সম্পন্ন হ'ল। পিতা-মাতার এইরূপ করুণ জীবনান্ত ভাই-বোনদের প্রাণে যে কত মর্মান্তিক আঘাত করল তা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। তখন নিবৃত্তিনাথের বয়স দশ বছর ও জ্ঞানেশ্বরের আট। জন্মাবধি নিষ্ঠুর সমাজের কঠোর অনুশাসনে নিপীড়িত নিবৃত্তিনাথের চিত্তে সমাজের নির্মম আইন-কানুনের বিরুদ্ধে একটা হেয় ভাব জাগা খুব স্বাভাবিক। তাই পিতা-মাতার মৃত্যুর পর যখন তাঁদের উপনয়ন সংস্কারের কথা উঠল, নিবৃত্তিনাথ তা গ্রাহ্য করলেন না, ভাবলেন, এই সমাজে পুনরায় ফিরে গিয়েই বা কি হবে? যজ্ঞোপবীত নাই বা হ'ল

কিন্তু জ্ঞানেশ্বর কোনও নিয়ম-শাসন ভাঙতে আসেন নি। তিনি এসেছিলেন শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করতে—সাধারণ লোকদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারময় জীবনে শাস্ত্র-মর্যাদা-সম্পন্ন জীবনের আলো বিকীরণ করতে। তিনি দাদার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেন। এই প্রতিবাদ থেকেই যেন তাঁদের জীবনের গৌরবময় যাত্রা শুরু হ'ল। এই সময় থেকেই মহারাষ্ট্রদেশে ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যার কর্ণধার আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ সন্ত জ্ঞানেশ্বর।

অনেকেই বলে থাকেন, জ্ঞানেশ্বর যে আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন তা জাতিপ্রথা ও ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি সামাজিক অসাম্য ও বিবেকহীন নিপীড়নের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করেন। নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানেশ্বরের এই সময়ের মনোভাব আলোচনা ক'রে দেখলে আমরা এই জিনিসটি সম্যকরূপে বুঝতে পারব।

নিবৃত্তিনাথ খুব উচ্চ ভূমিকার সাধক ছিলেন। তিনি সর্বদাই নিজেকে শিবস্বরূপ মনে করতেন। দৈবাৎ সাত বছর বয়সে তাঁর শ্রীগৈনীনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। গৈনীনাথ আদিনাথ-প্রবর্তিত নাথ-সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। নিবৃত্তিনাথের মতো অত উচ্চ আধার দেখে গৈনীনাথ খুবই প্রীত হন এবং তাঁকে যোগ-রহস্যে দীক্ষিত করেন। গুরুকৃপা লাভ ক'রে নিবৃত্তিনাথ দ্রুতবেগে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। জ্ঞানেশ্বর ছোট ভাই ও বোন সহ বড় ভাইয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে সাধনভজন সম্বন্ধীয় নির্দেশ নিয়ে কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হলেন। দুঃখের বিষয়, এঁদের সাধনেতিহাস লিপিবদ্ধ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে এঁদের উপলব্ধিসকল দেখে বেশ অনুমিত হয় যে, এঁরা গভীর সাধনা ও তপস্যার জীবন অতিবাহিত করতেন। সকল সময় ভগবানের চিন্তা ও ভগবৎ-প্রসঙ্গ নিয়েই থাকতেন। এই ছোট বয়সে এঁদের উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি দেখে আশ্চর্য হ'তে হয়।

জ্ঞানের উচ্চতম ভূমিকায় জাতি বর্ণ বা কোনও রকম ভেদ থাকে না—সাধক তখন বিধি-নিষেধের গণ্ডি পেরিয়ে এমন এক রাজ্যে উপস্থিত হন যেখানে কর্তব্যাকর্তব্য থাকে না; থাকেন একমাত্র সর্বভেদাভেদের পারে অখণ্ড সচ্চিদানন্দঘন বস্তু। নিবৃত্তিনাথ এই অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই যখন তাঁকে উপনয়ন-সংস্কারের সম্বন্ধে বলা হ'ল, তিনি বললেন, "উপনয়নের আমার কি দরকার? আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মস্বরূপ! আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই। আমি মহত্তত্ত্ব বা বিরাট্—কিছুই নই। আমি কুল-অকুলের পারে, ত্রিগুণাতীত। আমি নির্গুণ চৈতন্যস্বরূপ

আত্মা। আমার ধর্মাধর্ম বা বিধি-নিষেধের কোনও প্রয়োজন নেই।

কিন্তু জ্ঞানেশ্বরের দৃষ্টিতে অজ্ঞান সাধারণ লোকদের হীন দশা দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হয়েছিল, তিনি দেখতেন, তারা অজ্ঞান ও কুসংস্কারের পঙ্কে পোকার মত কিলবিল করছে, ভাবতেন, আমরা জ্ঞানী হ'য়ে যদি এরূপভাবে পাশ কাটিয়ে যাই তো কি ক'রে চলবে? তাদের কে বোঝাবে? আমরা যদি শাস্ত্রের মর্যাদা ভাঙি, তা হ'লে এই অজ্ঞানদের কী হবে? হই না আমরা পূর্ণকাম, আত্ম-দর্শনে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাতে এই অজ্ঞান জন-সমাজের কী হ'ল? সুতরাং আমাদের উচিত, নিজেরা শাস্ত্র মর্যাদা রক্ষা ক'রে তাদের পথ দেখানো।

এই ভেবে তিনি প্রত্যক্ষে নিবৃত্তিনাথকে বললেন, "দাদা, তুমি যা বলছ, সত্য, তুমি সত্য সত্যই শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মস্বরূপ। তোমার পবিত্রতায় কে সন্দেহ করতে পারে? সত্যই আত্মার সহিত বিধি-নিষেধের কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এটাও তো শাস্ত্রে আছে যে, অবৈধ আচরণ নিতান্ত দূষিত। স্বধর্ম, অধিকার ও জাতিভেদানুযায়ী যা কর্তব্য, তার অনুষ্ঠান অবশ্যই করতে হয়। সুতরাং লোকসাধারণকে এই শিক্ষা দেবার জন্য সাধুদের এই নিয়ম পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এতে অনাচারের কোন আশঙ্কা থাকবে না। আমরা যতই উচ্চ অবস্থা লাভ করি না কেন, শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা দোষযুক্তই হবে। চল, ব্রাহ্মণদের পায়ে পড়ি ও মিনতি ক'রে উপনয়ন-সংস্কার করিয়ে নিই।"

জ্ঞানেশ্বরের এই কথা হ'তে এটা বেশ বুঝতে পারা যায় যে, তিনি কি ধরনের সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এবং তাঁর জন্ম-গ্রহণের তাৎপর্য কী ছিল।

শেষে ভাই-বোনেরা পণ্ডিতদের সমীপে গেলেন। তারা বলল, "আমরা শাস্ত্রাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করতে পারি না। তোমাদের উপনয়ন হওয়া অসম্ভব। তবে যদি পৈঠনের পণ্ডিতদের কাছ থেকে শুদ্ধি-পত্র আনতে পার, তা হ'লে আমরা তোমাদের ব্রাহ্মণ-ধর্মে অঙ্গীকার করব।" জ্ঞানেশ্বর বললেন, "আচ্ছা, তাই করব।" এই ব'লে ভাই-বোনদের সঙ্গে নিয়ে তিনি পৈঠনাভিমুখী যাত্রা করলেন।

তখনকার দিনে পৈঠন সংস্কৃত-বিদ্যার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। লোকে উহাকে দাক্ষিণের বারাণসী বলত। যথাসময়ে পৈঠনে ব্রাহ্মণদের সভা হ'ল। নিবৃত্তিনাথ তাঁদের সম্মুখে আলন্দীর ব্রাহ্মণদের পত্রখানি রাখলেন এবং শুদ্ধি-পত্র দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু পণ্ডিতেরা সন্ন্যাসীর এই ছেলেদের শুদ্ধির জন্য কোন বিধান খুঁজে পেলেন না। শেষে এই নির্ণয় দেওয়া হ'ল যে, এই ছেলেদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। সুতরাং তারা যে অবস্থায় আছে তাতেই থাকুক, ভগবানের নাম জপ করুক, সংসারের মায়া না বাড়িয়ে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করুক এবং বৈরাগ্য-যোগের অভ্যাস ক'রে সর্বত্র সর্বাবস্থায় শ্রীহরিকেই দেখতে চেষ্টা করুক।

'সন্ন্যাসীর ছেলেদের' দেখবার জন্য সেই সভায় শত শত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোক জমেছিল। যখন নির্দেশ দেওয়া হ'ল তারা ভাবল যে, নিবৃত্তিনাথ উহার প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, নির্দেশ শুনে ভাই-বোনদের মনে দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক—বরং তাঁদের আনন্দই হয়েছে, তখন তাদের আশ্চর্যের আর সীমা রইল না! তারা বুঝল না যে, যাঁরা জন্মাবধি পবিত্র, অল্পবয়স থেকেই যাঁরা বাহিরে ও ভিতরে সেই এক অদ্বয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অনুভব করছেন, তাঁদের জন্যে ব্রহ্মচর্য ব্রতের বিধান দেওয়া—ঠিক যেন স্রোতস্বিনীকে সর্বদা প্রবাহিত হ'তে বলা। ভাই-বোনেরা সমবেত ব্রাহ্মণদের প্রণাম করলেন এবং তাঁদের এই নির্দেশের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

সভা বিসর্জনকালে কেউ রহস্যচ্ছলে তাঁদের জিজ্ঞাসা করে, "ওহে, তোমাদের নামের অর্থ কী?"

নিবৃত্তিনাথ বললেন, আমি নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির সহিত আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি রাজযোগী—অখণ্ড স্বরূপানন্দ ভোগ করি।

জ্ঞানদেব বললেন, আমি জ্ঞানদেব—সর্বত্র আমার গতি ও জ্ঞান, জিগ্‌গেস করলে আমি বার বার এই কথাই বলব।

সোপানদেব উত্তর দিলেন, ভগবানের নামে রুচি উৎপন্ন করা ও ভক্তদের বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়ে দেওয়া আমার কাজ। আমি বৈকুণ্ঠের সোপান।

মুক্তাবাঈও পশ্চাৎপদ হলেন না—বললেন, আমি মুক্তির দ্বার খুলে দিই। ইহলোকে ভগবানের লীলা দেখবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি।

ছোটদের মুখে এইরূপ বড় বড় কথা শুনে অনেকেই হেসে উঠল। এমন সময় রাস্তায় একটা মহিষ যাচ্ছিল। তার দিকে আঙুল দেখিয়ে কেউ একজন জ্ঞানদেবকে উপহাস ক'রে বলল, "দেখ, দেখ, ওই জ্ঞানদেব যাচ্ছে। নামে আর কি আছে? ঐ মোষটাও তো জ্ঞানদেব!" সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠল। কিন্তু জ্ঞানেশ্বর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হ'য়ে ধীর গম্ভীরস্বরে বললেন, "হাঁ, আপনি ঠিকই বলছেন। বাস্তব পক্ষে উহাতে আর আমাতে কোন ভেদ নেই। ঐ মোষটাও আমার আত্মস্বরূপ। সকল দেহে একই চিৎসূর্য প্রকাশমান।"

জ্ঞানেশ্বরের এই কথা শুনে কেউ একজন মহিষের পিঠে চাবুক দিয়ে জোরে আঘাত করল। কি আশ্চর্য! সকলেই চোখ মেলে দেখল, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেশ্বরের পিঠের উপর কালশিরা পড়ে গেছে এবং তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তও পড়ছে। জ্ঞানেশ্বর দেখিয়ে দিলেন যে, একাত্মভাব শুধু মুখের বা বইয়ের কথা নয়, বরং উহা বাস্তব জীবনেও আনতে পারা যায়। যথাযথ সাধনা করলে জীবনে এমন একটা অবস্থা আসে, যখন জীবমাত্রে কোন ভেদ আর অনুভূত হয় না। সে অবস্থায় মানুষের ক্ষুদ্র অহং সেই 'মহান্ অহং'-এ এত দূর লয় পায় যে নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব মোটেই বোধ হয় না। তখন চরাচরে সেই এক অদ্বয় 'আমি'ই অনুভূত হয়।

কিন্তু এইখানেই কথা শেষ হ'ল না। উপহাস করতে বদ্ধপরিকর যারা, তারা এত সহজে ছাড়বে কি ক'রে? বিদ্রূপ ক'রে বলল একজন, "যখন এই মোষটাও জ্ঞানদেব, তখন সেও বেদের ঋক্‌মন্ত্র বলবে।" জ্ঞানেশ্বরের স্বরে যেন মেঘ গর্জন ক'রে উঠল, "কেন বলবে না? আপনারা ব্রাহ্মণ। আপনাদের বাণী কখনও মিথ্যা হবার নয়।" এই বলে তিনি মহিষের সমীপে গেলেন ও তার মাথার উপর হাত বুলাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিষের মুখ দিয়ে বেদের ঋক্‌সকল বহির্গত হ'তে লাগল—কেমন নির্দোষ উচ্চারণ! কি নির্ভুল মন্ত্রপাঠ!! শ্রোতারা তো শুনে স্তম্ভিত।—নয়ন পলকহীন, মুখ শব্দহীন। তারা কাষ্ঠবৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ পরে তাদের চমক ভাঙল। যা দেখছি তা কি সত্য? যা শুন'ছ তা ভ্রম তো নয়? চোখ মেলে দেখল আবার, কান দিয়ে শুনল পুনরায়। না, সব সত্যই। সামনেই মোষটি দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে অনর্গল ঋক্‌সকল—ধীরবাহিনী স্রোতস্বিনীর মত। পণ্ডিতেরা লজ্জায়, ক্ষোভে আড়ষ্ট হ'য়ে গেলেন, তাঁদের অভিমান চূর্ণ হ'ল। বুঝলেন যে এই চারজন সামান্য লোক নন। তাঁদের অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী হ'য়ে পৈঠনের ব্রাহ্মণেরা তাঁদের শুদ্ধি পত্র প্রদান করলেন।

জ্ঞানেশ্বরের পরবর্তী জীবন আধ্যাত্মিক আলো বিকীরণের জীবন। কিছুকাল পৈঠনে থাকার পর তাঁরা চারি ভাই-বোন নেবাসায় এলেন। নেবাসা প্রবরা নদীর তীরে এক প্রাচীন পুণ্যক্ষেত্র—মহালয়াক্ষেত্র বা কালসাপুর নামেও প্রসিদ্ধ। এখানে আসার সময় আর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। যখন তাঁরা নেবাসায় পৌঁছলেন, জ্ঞানেশ্বর দেখেন,

এক সাধ্বী স্ত্রী মৃত স্বামীর শবের কাছে বসে করুণ ক্রন্দন করছে। তিনি খোঁজ-খবর করে যখন জানতে পেলেন যে, মৃত ব্যক্তির নাম 'সচ্চিদানন্দ', তখন বিস্ময়ে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "একি? সৎ-চিৎ-আনন্দ? সৎ-চিৎ-আনন্দকে কি কেউ কখনও মেরেছে? সচ্চিদানন্দের কোন উপাধি হয় না, মৃত্যু কস্মিন্‌কালেও তাকে স্পর্শ করতে পারে না।" এই ব'লে তিনি শবের গায়ে হাত বুলালেন, অমনি মৃত ব্যক্তির চেতনা ফিরে এল, সে উঠে দাঁড়াল, পুনঃ পতিত হ'য়ে জ্ঞানেশ্বরের চরণ দু'খানি জড়িয়ে ধরল। এই লোকটিই পরে 'সচ্চিদানন্দ-বাবা' নামে বিখ্যাত হন, ইনি 'জ্ঞানেশ্বরী' লিপিবদ্ধ করেন।

'জ্ঞানেশ্বরী' শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার উপর জ্ঞানেশ্বরের ভাষ্য। তখন জ্ঞানেশ্বর মাত্র পনেরো পড়েছেন। নেবাসায় থাকাকালে শ্রীগুরু নিবৃত্তিনাথের সম্মুখে জ্ঞানেশ্বর লোকসাধারণের কল্যাণের জন্য মারাঠী ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করেন। সে এক অপূর্ব ব্যাখ্যা—অপূর্ব ভাষায়। যেন অন্তরের অনুভূতিসকল শ্রীগুরু প্রদত্ত উপদেশ ও গীতোক্ত বাণীর সহিত মিলিত হ'য়ে এক ত্রিবেণী সৃষ্টি করল। সেই ত্রিবেণীতে অবগাহন ক'রে সহস্র সহস্র লোকের জীবন ধন্য হ'য়ে গেল। তারা যেন একটা নূতন আলোক পেল। এতদিন বেদান্তের সত্যসকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরই অধিগম্য সংস্কৃত ভাষায় লুক্কায়িত ছিল। ভাগীরথী যেন এতদিন নিজেকে পণ্ডিতদের ভাষা ও ভাবের জটিলতায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। এখন কিন্তু জ্ঞানেশ্বর সকলের কল্যাণের জন্য সেই ধর্ম-ভাগীরথীকে আহ্বান ক'রে সমতল প্রদেশে আনলেন, যাতে ধর্মপিপাসুগণ নিজেদের পিপাসা তৃপ্ত ক'রে সেই এক সত্যে উপনীত হ'তে পারেন। এই কার্যে কিন্তু বাধাও কম হ'ল না। গোঁড়া পণ্ডিতেরা এতে বাধা দিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করলেন না। বেদান্তের সত্য শূদ্র শ্রবণ করবে? না, তা কখনই হ'তে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতদের সকল চেষ্টা বিফল হ'ল। যেখানে ভগবানের ইচ্ছা, সেখানে মানুষের ইচ্ছা আর কী করবে? অমিতাভ বুদ্ধের ন্যায় জ্ঞানেশ্বর পণ্ডিতদের মিথ্যা গর্বে আঘাত ক'রে লোকসাধারণের ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা করলেন। এই ব্যাখ্যার মাধুর্য তাঁরাই অনুভব করতে পারেন যাঁরা মূল মারাঠীতে 'জ্ঞানেশ্বরী' পাঠ করেছেন। কাব্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে পর সে এক আদর্শ কাব্য গ্রন্থ, তত্ত্বজ্ঞানের বিচারে এক গভীর তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থ, ধর্মের দিক দিয়ে দেখলে ধর্মের সূক্ষ্ম রহস্যোদ্‌ঘাটনকারী এক অপূর্ব ধর্মগ্রন্থ ও ভাষার দিক দিয়ে সে এক অনুপম অভিনব ভাষার গ্রন্থ। যে কোনো দিক দিয়ে দেখা যাক্, এমন আর একটিও মারাঠী গ্রন্থ নেই যা এর সমকক্ষ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে।

'জ্ঞানেশ্বরী' লেখা পূর্ণ হবার পর নিবৃত্তিনাথ একদিন জ্ঞানেশ্বরকে বললেন, "জ্ঞান, অনেক কিছু লেখা, বলা ও বিবেচনা করা হ'ল। এখন কিছু মৌলিক রচনা হোক।" গুরুস্থানীয় দাদার এই আদেশে জ্ঞানেশ্বর 'অমৃতানুভবে'র রচনা শুরু করলেন, যাতে নিজের সমস্ত অনুভূতি ঢেলে দিলেন। এও এক অপূর্ব গ্রন্থ।

তারপরে আমরা জ্ঞানেশ্বরকে দেখতে পাই পরিব্রাজকরূপে—নানা ক্ষেত্রে, নানা তীর্থে। সাথে আছেন নিবৃত্তিনাথ, সোপানদেব, মুক্তাবাঈ এবং অন্যান্য ভক্তগণ। এই ভ্রমণকালে জায়গায় জায়গায় ধর্মপিপাসুদের ভিড় লেগে যেত। জ্ঞানেশ্বরের কীর্তির কথা—পৈঠনের সেই অলৌকিক ঘটনার পর থেকে মহারাষ্ট্রের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং যেখানেই তাঁরা যেতেন, সেখানেই স্থানীয় জনগণ তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। সে এক অপূর্ব জাগরণ—যেন সাক্ষাৎ ধর্ম জ্ঞানেশ্বরের রূপ ধরে একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির স্রোতোধারা

বইয়ে দিচ্ছেন। জ্ঞানেশ্বর নিজে নির্গুণ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েও জনসাধারণের জন্য সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা ও নিষ্কাম কর্মের শিক্ষা দিতেন। তাঁর চোখে ঈশ্বর-লাভে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের কোন ভেদ ছিল না। সকলেই সমানভাবে ভগবৎকৃপার অধিকারী। তাঁর ভক্তদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত নামদেব দরজী; নরহরি সেকরা, গোরা কুমোর, সাংবতা মালী যাঁদের নাম আজও গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে নিয়ে থাকেন। এতে আমরা সে জাগরণের পরিমাণ বেশ ধারণা করতে পারি।

এই পর্যটনকালে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কিন্তু এখানে স্থানাভাবে ওসব চর্চা করা হবে না। শুধু দু-একটি মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ ক'রে এই প্রবন্ধটি শেষ করব।

যখন ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান ক'রে জ্ঞানেশ্বর সদলবলে বারাণসী পৌঁছেছেন, তখন মণিকর্ণিকাঘাটে মুদ্গলাচার্য কোন এক মহান্ যজ্ঞের উদ্‌যাপনে ব্যস্ত ছিলেন। সেজন্য সেখানে বহু বড় বড় বৈদিক, শাস্ত্রী ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা সমবেত হয়েছিলেন। সে সময় এক বিবাদ হয়—সেই যজ্ঞে সর্বপ্রথম কাকে বরণ করা হবে? কোন সমাধানই সকলের মনঃপূত হয় না। শেষে মুদ্গলাচার্য এক উপায় ঠিক করলেন। তিনি একটি হাতী আনালেন এবং তার শুঁড়ে একটি পুষ্পমালা ঝুলিয়ে দিলেন। ঠিক হ'ল, হাতি যার গলায় সেই মালাটি পরিয়ে দেবে, তাকেই অগ্রে বরণ করা হবে। প্রত্যেক পণ্ডিতই চাইছে, মালা তারই গলায় এসে পড়ুক, কিন্তু সকলে আশ্চর্য হ'য়ে দেখল, হাতি সেই মালাটি জ্ঞানেশ্বরের গলায় পরিয়ে দিল। ভক্তদের প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। যেখানেই জ্ঞানেশ্বর গেছেন সেখানেই তিনি বন্দিত হয়েছেন। সিংহশাবক যেখানেই যাক না কেন, পশুরাজ ব'লে গণ্য হবে। সূর্যকে আপন গরিমা প্রচার করতে হয় না। যখন যেখানে উঠবে, সকলে চিনে নেবে যে, এই সূর্য।

নানা তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ ক'রে শেষে জ্ঞানেশ্বর ভাই-বোনদের সহিত আলন্দী ফিরে এলেন। তাঁর অলৌকিকত্বের সুগন্ধ সর্বত্র মহান্ বায়ুর সাথে সাথে চারিদিকে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সেই গৌরব সকলের হৃদয়ে একরূপ আহ্লাদের তরঙ্গ উত্থাপিত করল না। অনেকেরই মনে জেগে উঠল পুরাতন হিংসার বিষ। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চাঙ্গদেব। ইনি একজন মস্ত বড় যোগী, যৌগিক সমস্ত সিদ্ধিতে পারদর্শী, যোগবলে তিনি মৃত্যুকে চৌদ্দ বার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ১৪০০ বছর বয়স হলেও তিনি দেখতে ছিলেন যুবকের মতো। কালক্রমে তিনি শুনতে পেলেন জ্ঞানেশ্বরের কথা—তাঁর জীবনের বহুবিধ অলৌকিক ঘটনাবলী।

কেউ এসে একদিন জানিয়ে গেল: পৈঠনে জ্ঞানেশ্বর মোষের মুখে ঋগবেদ বলিয়েছেন, আমি তখন ওখানেই হাজির ছিলাম।—শুনে চাঙ্গদেবের অভিমানে ধাক্কা লাগল। ভাবলেন, আমি ১৪০০ বছরেও যা করতে পারলাম না, এই ছেলেটা তা ক'রে দেখিয়েছে। একবার ওকে দেখা চাই। কিন্তু দেখা কি ক'রে হবে? আমার যাওয়া ঠিক হবে না। সে ওইটুকু ছেলে, আর আমি এত বড় লোক। আমি কি ক'রে যাব? শেষে ঠিক করলেন, একখানা চিঠি পাঠাই। কিন্তু চিঠিতে কি ভাবে সম্বোধন করি? 'কল্যাণবরেষু' লিখতে পারি না, সে এত বড় লোক, এত সব অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়েছে। সুতরাং তা লেখা চলবে না। তবে কি 'শ্রীচরণেষু' লিখি? ছিঃ, তাও কি ক'রে হবে? আমি ১৪০০ বছরের বুড়ো, আর ও সেদিনকার ছেলে।

শেষ পর্যন্ত তিনি কাগজে কিছু না লিখে সাদা কাগজখানাই শিষ্যদের হাতে জ্ঞানেশ্বরের কাছে আলন্দী পাঠিয়ে দিলেন। তাদের দেখামাত্রই জ্ঞানেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, "সাদা কাগজই কি চাঙ্গদেব আমার জন্য পাঠিয়েছেন?" শিষ্যেরা

তো শুনে অবাক্। কি ক'রে জানতে পারলেন ইনি? প্রণাম ক'রে কাগজখানি সামনে রাখলেন। মুক্তাবাঈ সহজভাবে কাগজখানি হাতে নিয়ে দেখলেন—কাগজটি একেবারে সাদা; বললেন, "১৪০০ বছর মাথা কেটে তপিস্যে করেও সে এই কাগজের মত সাদাই থেকে গেল।" সকলেই এই রহস্যোক্তি শুনে হেসে উঠল। নিবৃত্তিনাথ জ্ঞানেশ্বরকে বললেন, "জ্ঞান, সে এত তপস্যা করেও ব্রহ্মজ্ঞানের সম্বন্ধে একেবারে শূন্য। সিদ্ধির গর্ব ও অহংকার ওকে গ্রাস করেছে। তুমি এখন কিছু লিখে পাঠাও যাতে ওর অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন অন্তঃকরণে কিছু আলো আসে।" শ্রীগুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য ক'রে জ্ঞানেশ্বর চাঙ্গদেবকে ৬৫ শ্লোকে একখানি চিঠি লিখলেন। এই ছন্দকে মারাঠীতে 'ওবি' বলা হয়। ঐ চিঠিখানি "চাঙ্গদেব পাসষ্টী" নামে বিখ্যাত। পাসষ্টী অর্থে পঁয়ষট্টি। এতে সংক্ষেপে জ্ঞানেশ্বরের সমস্ত দর্শনের নিদর্শন আছে। এটি আত্মজ্ঞানে ভরা—উপনিষদুক্ত 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অনুপম ব্যাখ্যা ও বিবেচনা।

চাঙ্গদেবের শিষ্যেরা জ্ঞানেশ্বরের সেই চিঠিখানি নিয়ে গিয়ে গুরুর হাতে দিলেন। কিন্তু চাঙ্গদেব তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। স্থির করলেন, জ্ঞানেশ্বরের জ্ঞান পরীক্ষা করা যাক। সহস্রাধিক শিষ্য সহ তিনি সিংহারূঢ় হ'যে, হাতে সাপের চাবুক নিয়ে আলন্দীর দিকে রওনা হলেন।

এদিকে চার ভাই-বোন বাড়ীর বাইরের ভাঙা দেয়ালের উপর বসে আনন্দে গল্প করছিলেন। নিবৃত্তিনাথ চাঙ্গদেবের আসার খবর পেয়ে জ্ঞানদেবকে বললেন, "চাঙ্গদেবের মত বড় মহাত্মা দেখা করতে আসছেন। চল, একটু এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করি।"

কিন্তু কিসে চড়ে যাওয়া যায়? জ্ঞানেশ্বর সেই জড় নির্জীব প্রাচীরকে চলতে আদেশ করলেন, অমনি প্রাচীরটি দ্রুতবেগে চলতে লাগল। এই অসম্ভব ব্যাপার দেখে চাঙ্গদেব বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেলেন। তিনি নিজে এত বড় সিদ্ধ পুরুষ, কিন্তু তাঁর জড় নির্জীব বস্তুর উপর কোনই জোর ছিল না। জ্ঞানেশ্বর যেন এক আঘাতে তাঁর গর্ব খর্ব ক'রে দিলেন।

জ্ঞানেশ্বরকে বললেন চাঙ্গদেব রুদ্ধকণ্ঠে, "ওরে ছোট্ট ছেলে, আয় তাড়াতাড়ি। এত মহত্ত্ব তুই পেলি কোত্থেকে? তোকে দেখলে তো একেবারে ছোট্ট ছেলেই মনে হয়।"

জ্ঞানেশ্বর: ব্রহ্ম কি কখনো ছোট বা বড় হয়?

চাঙ্গ: ব্রহ্ম কি, তুই জানিস্?

জ্ঞানে: ঘটে ঘটে তো তিনিই রয়েছেন। তাঁতে ভেদ কই? চারি বেদ এই কথাই বলেন।

চাঙ্গ: তোর ভেদভাব কিসে দূর হ'ল?

জ্ঞানে: সদ্গুরু চোখ খুলে দিয়েছেন।

চাঙ্গ: চোখ খোলার অর্থ কী রে ভাই?

জ্ঞানে: ওরে বোকা, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

চাঙ্গ: এইটুকু ছেলে, আর তোর এত বুদ্ধি।

জ্ঞানে: এত বড় লোক, আর এইটুকু কথা।

চাঙ্গ: আমার মন কি ছোট হয়ে গেছে?

জ্ঞানে: অজ্ঞানে গর্ব হয়েছে।

চাঙ্গ: তা কিসে যাবে?

জ্ঞানে: সদ্গুরুর শরণ নে।

চাঙ্গ: সদ্গুরুর কৃপা কি তুই-ই পেয়েছিস?

জ্ঞানে: ভূতমাত্রে উহা ভরা, তবুও অশেষ।

চাঙ্গ: তবে বাকী সকলকে যমরাজ কেন টেনে নিয়ে যান?

জ্ঞানে: তারা অবিশ্বাসে হাবুডুবু খাচ্ছে যে।

চাঙ্গ: কি, বিশ্বাসই সার?

জ্ঞানে: পুরাণ তো এই বলেন।

চাঙ্গ: যদি আমি সদ্গুরুর শরণ না নিই?

জ্ঞানে: তো চুরাশির চক্রে পড়বি।

চাঙ্গ : বুড়ো হ'লে পর যদি ভক্তি করি ?

জ্ঞানে : কিন্তু 'কাল' তোর আজ্ঞা মানবে, তবে তো ?

চাঙ্গ : তবে ভজন কোন্ সময়ে করি ?

জ্ঞানে : 'সোঽহং মন্ত্রে' সময়ের কোন নিয়ম নেই।

চাঙ্গ : জপ কোন্ দিন কোন্ মুহূর্তে করা চাই ?

জ্ঞানে : দিন ও রাতের কোন ঝগড়া নেই।

চাঙ্গ : কিন্তু ছেলেমানুষ তুই, বল দেখি ভাই, কত লোক এইভাবে নিস্তার পেয়েছে ?

জ্ঞানে : তার কি ইয়ত্তা আছে রে বোকা ? যেটা বলবার নয় তাই বলে যাচ্ছিস। চুপ কর। বেশী বক্‌বক্ করিসনে। নইলে ডাণ্ডা মেরে তোর সব অজ্ঞান বের ক'রে দেব। 'আমার-তোমার' অনেক হ'ল। পাঁচটি ছেলে কি গণ্ডগোলই না করেছে।

চাঙ্গ : পাঁচটি ছেলে কার ?

জ্ঞানে : আত্মারামের।

চাঙ্গ : এ সমস্ত খেলা কি তাঁরই ?

জ্ঞানে : হাঁ, খেলা খেলেও তিনি সকল থেকে আলাদা।

চাঙ্গ : তুই কি ক'রে বুঝলি এই খেলাটিকে ?

জ্ঞানে : নিবৃত্তিনাথের প্রসাদে।

চাঙ্গদেবের গর্ব দূর হ'ল। তিনি জ্ঞানেশ্বরের শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন এবং 'পাসষ্টি'র অর্থ বুঝিয়ে দেবার জন্ত সাগ্রহ অনুরোধ জানালেন। কিন্তু প্রত্যেকবার জ্ঞানেশ্বর চাঙ্গদেবের এই কথা এড়িয়ে যান। একদিন চাঙ্গদেব ধরেই বসলেন। তখন নিরুপায় হয়ে জ্ঞানেশ্বর বললেন, "বেশ, তা হবে। কিন্তু তোমাকে একটি প্রাণ বলি দিতে হবে।" চাঙ্গদেব নিজ শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ আমার জন্ত প্রাণ দিতে রাজী আছ ? যদি কেউ থাক, সকালে এস।" এই কথা শুনেই শিষ্যদের প্রাণ শুকিয়ে গেল। তারা সকলেই রাত্রে ওখান থেকে পলায়ন করল। সকালে সহস্রাধিক শিষ্যদের মধ্যে একজনকেও না দেখে, ব্যাপারটি বুঝে চাঙ্গদেব নিজেই প্রাণ দেওয়ার সংকল্প করলেন। তাঁর এই সংকল্প শুনে জ্ঞানেশ্বর বললেন, "আমি অন্ত কারও প্রাণ চাইনি তো, তোমারই প্রাণ চেয়েছিলুম। নিজের 'অহং' —যাকে তুমি এত ভালবাসো, ও যার সঙ্গে তুমি জড়িয়ে রয়েছ—তাকেই বলি দাও; তবে 'পাসষ্টী'র মর্ম বুঝতে পারবে। এই আমার অভিপ্রায়।" চাঙ্গদেব তাই করলেন। গুরুবাক্যে বিশ্বাসী হ'য়ে, গুরুকৃপা লাভ ক'রে তিনি শেষে জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করেন।

জ্ঞানেশ্বরের অবতার-গ্রহণের কার্য শেষ হ'য়ে এল। ভগবানের প্রিয় যাঁরা, তাঁরা এ সংসারে আর বেশী দিন থাকেন না। তিনি স্বেচ্ছায় ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২২ বছর বয়সে তাঁর মর্ত্যলীলা সংবরণ ক'রে মহাসমাধিতে লীন হলেন। প্রিয় ভাইয়ের বিয়োগে এ সংসারে থাকা অর্থহীন বুঝে বাকী তিন ভাই-বোনও এক বছরের ভিতরেই দেহত্যাগ ক'রে সেই অখণ্ড ব্রহ্মে লীন হ'য়ে গেলেন।

(সমাপ্ত)

'অমৃতানুভবে'র একটি 'ওবি'

ভেদু লাজোনি অবেডী। য়েকরসীঁ দেত বুডী।
জো ভোগণয়া ঠাব কাটী। দ্বৈতাচা জেঁথে॥

ভেদ লজ্জা পাইয়া প্রেমবশতঃ একরসে ঝাঁপ দিল,
যে (ভেদ) ভোগের সন্ধানে দ্বৈতের কাছে গিয়াছিল।

—শ্রীজ্ঞানেশ্বর

নরেন্দ্র-ব্রজেন্দ্র-প্রসঙ্গ

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলকে নরেন্দ্র-প্রসঙ্গে স্মরণ করা উচিত, তিনি নরেন্দ্রের এক বছরের কনিষ্ঠ (১৮৬৪ জন্ম) হলেও দুজনে একই সময়ে একই কলেজে (General Assembly) F A (১৮৮০) ও B. A (১৮৮২) পাশ করেন। দুজনেই সেকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অধ্যাপক (Dr. Hastie) হেষ্টি সাহেবের কাছে ইওরোপীয় দর্শন (কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি) অধ্যয়ন করেন। তাঁর কাছেই Trance বা 'সমাধি' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নরেন্দ্র শুনেন :

"I have seen only one person—Sri Ramakrishna Paramahansa—who has experienced this blessed state of mind, ·· you can understand if you go there (Dakshineswar) and see for yourself".

বিদেশী অধ্যাপকের এই উক্তি দুই ছাত্র-বন্ধুর জীবনেই গভীর রেখাপাত করে, তাঁরা দু'জনেই জীবন ভরে প্রমাণ ক'রে গেছেন যে বিশ্ব-দর্শনের ইতিহাসে ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা ও সিদ্ধি অত্যুচ্চ স্থান অধিকার ক'রে আছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ আমায় বলেছেন যে সেই সময় থেকে তিনি ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্র মূল সংস্কৃতে পড়তে শুরু করেন ও সে কাজে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁকে উৎসাহ দেন।

সেই তপস্যার প্রথম ফল ছাপার অক্ষরে পেয়েছি ব্রজেন্দ্রনাথের ১৮৯৯ খৃঃ রোমের ভাষণে; সেখানে সে বছর International Congress of Orientalists—প্রাচ্যবিদ্‌দের আন্তর্জাতিক অধিবেশন হয়, সেখানে ব্রজেন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা করেন :

(১) Foundation of the Science of Mythology in Yaska · "Nirukta" with Greek parallels.

(২) Origin of Law (ধর্মশাস্ত্র), Hindu founders of the social sciences.

(৩) Vaishnavism and Christianity —an essay on the study of Comparative Religion

এর মধ্যে শেষ পুস্তিকাটি আমি বহু কষ্টে পেয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু এখন তা প্রায় দুষ্প্রাপ্য। অন্য দুটি রচনার সারাংশ হয়তো রোম থেকে আনা সম্ভব। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও বৈদিক উপাখ্যানের তাৎপর্য নিয়ে সেকালে ব্রজেন্দ্রনাথ গভীর অধ্যয়ন করেন। ১৯১১ খৃঃ লণ্ডনে Race Congress-এর ভাষণে তাঁর দিব্যদৃষ্টির আর এক আভাস পাই—ভগ্নী নিবেদিতা দেহত্যাগের আগে সে বিষয়ে কিছু লিখে গেছেন।

ভগ্নী নিবেদিতার মৃত্যুর পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে "প্রবাসী"তে যে অপূর্ব অর্ঘ্য নিবেদন করেন তা থেকে আমরা বুঝি ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য বিষয়ে রবীন্দ্র-নরেন্দ্র-ব্রজেন্দ্র-যুগের অবদান কত বিশাল ও গভীর। এঁদের সঙ্গে নিবেদিতা (মৃত্যুকাল ১৯১১ খৃঃ পর্যন্ত) বহু আলাপ-আলোচনা করেছেন। তাই নিবেদিতা-রচনাবলীরও ভাল নির্ঘণ্ট (Index) তৈরী করা দরকার; তাঁর গুরু বিবেকানন্দের সহসা দেহত্যাগের পর নিবেদিতা (১৯০২-১১) অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে কত কথাই না লিপিবদ্ধ রেখে গেছেন সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। নিবেদিতা স্কুলের শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের আহ্বান করি - শীঘ্র তাঁর সটীক জীবনী প্রকাশ করতে। "উদ্বোধন" এবং "অমৃতবাজার পত্রিকা" অফিসেও এ সম্বন্ধে বহু তথ্য মিলবে।

রবীন্দ্র-নরেন্দ্র-ব্রজেন্দ্র-যুগের শেষ চিহ্ন আমরা পেয়েছি যখন স্বামী বিবেকানন্দের অবর্তমানে, শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী-উৎসবে কবিগুরুর অপূর্ব ভাষণ (ইংরেজী থেকে আমি অনুবাদ করি "বসুমতী"র আহ্বানে) ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের শেষ উক্তি। এই সব তথ্য ও ভাষণাদি সংগ্রহ ক'রে ইতিহাস রচনার সময় এসেছে।

১৮৯৭ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশে বেদান্ত প্রচার ক'রে বাঙলায় ফিরে আসেন সে তো আজ থেকে ৬০ বছর আগে; তার হীরক-জয়ন্তী স্মরণ ক'রে বিবেকানন্দ-ভক্তবৃন্দকে অনুরোধ করি যে স্বামীজীর শেষ অসমাপ্ত ইচ্ছা—বৈদিক ও সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় বেলুড়ের গঙ্গাতীরে গড়ে তোলার ব্রতে সর্বতোভাবে সহযোগ ও সাহায্য করুন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অনুমোদনে এই নিখিল-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা শুরু হয়েছে—সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার প্রচারে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান চিরস্মরণীয়।

এই প্রসঙ্গে দেশবাসীকে স্মরণ করাই—স্বামী বিবেকানন্দের এবং উদ্বোধন গ্রন্থাবলীর "Subject-index" বা বিষয়-সূচী সংকলিত হ'লে ভবিষ্যৎ গবেষকদের প্রভূত সাহায্য করা হবে।

আকাঙ্ক্ষা*

শ্রীহিমাংশু গঙ্গোপাধ্যায়

হে প্রভু! আমারে শান্তির দূত কর,
দিই যেন প্রেম যেথা ঘৃণা হ'ল জড়।
যেখানে হয়েছে ক্ষতির অঙ্ক জমা
আমি যেন সেথা বিতরিতে পারি ক্ষমা।
সন্দেহ যেথা তুলিতে চাহিছে মাথা
বিশ্বাস-বারি সিঞ্চিতে পারি তথা।
হতাশার বিষ-নিঃশ্বাস যবে বহে
আশার প্রদীপ মোর হাতে যেন রহে।
আঁধার যেখানে ঘনাইয়া আসে কালো
আমি যেন হই সেথায় ক্ষুদ্র আলো
দুঃখ যেখানে আসে নব নিতি নিতি
সেথা যেন আনি সান্ত্বনা, প্রেম, প্রীতি।

* সেণ্ট ফ্রান্সিসের ভাবাবলম্বনে

জনপদ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

সীমাহারা এক মহাসাগরের তীরে,
নিথর নিবিড় নীল আকাশের তলে
ছোট জনপদ,—রহস্যে রাখে ঘিরে;
মুখরিত হয় জীবনের কোলাহলে।
মাঠে-মাঠে সেথা সোনার ফসল ফলে;
আহার-নিদ্রা, দুঃখ-সুখের ভিড়ে
বও ধরে শুধু তনু-মনে পলে পলে;
আনাগোনা সেথা অনিবার ফিরে-ফিরে।
ছোট জনপদ—অথই পাথার পারে;
নিথর নীলিমা—উপরেও পারাবার;
জীবন-মরণ সেথা শুধু বারে বারে
কী যে খেলা খেলে। রহস্য বুঝা ভার।
জোয়ারে ভাঁটায়, আলোয় আঁধারে দেখি,
সিন্ধুর বুকে বিন্দুর লীলা এ কী!

স্বপ্ন-সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মত

ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল

মাণ্ডূক্যোপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে : "সর্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম। অয়মাত্মা ব্রহ্ম। সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।" অভিব্যক্ত প্রপঞ্চের সর্বাত্মক রূপ শ্রুতি চতুষ্পাদ রূপে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন : "জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ।" এর পরের শ্লোকে বলেছেন : "স্বপ্নস্থানো-ঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।" পঞ্চম শ্লোকে বলা হয়েছে : "যত্র সুপ্তো ন কশ্চন কামং কাময়তে ন কশ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ো হি আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ॥" বৈশ্বানর বহিঃপ্রজ্ঞ স্থূলভুক্; তৈজস অন্তঃপ্রজ্ঞ, প্রবিবিক্তভুক্; প্রাজ্ঞ হলেন একীভূত ও আনন্দভুক। বৈশ্বানর ও তৈজসাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম অন্ন-প্রাণ-মনোময় কোষে উপাধিযুক্ত, কিন্তু প্রাজ্ঞ হলেন বিজ্ঞানাত্মা। ইনি চেতোমুখ, জ্ঞানময় প্রকাশশীল যাঁর মুখ। সপ্ত অঙ্গ দুই হাত, দুই পা, মস্তক, বক্ষ ও উদর এই সাত অঙ্গ। একোনবিংশতিমুখ, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার,এই চার বৃত্তি-বিশিষ্ট। বৈশ্বানর অপেক্ষা তৈজসাত্মার প্রকাশ অধিক, সেজন্য তাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। আধুনিকদের মতে শ্রুতি যে স্বপ্নের দ্রষ্টাকে তৈজস শব্দে অভিহিত ক'রে বৈশ্বানর অপেক্ষা উচ্চস্থান নির্ণয় করেছেন, এটা সমীচীন হয়নি। স্বপ্নের জ্ঞান জাগ্রৎকালীন জ্ঞান অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। স্বপ্নের দ্রষ্টাকে উচ্চস্থান দেওয়া যায় না।

স্বপ্ন বিষয়ে এক বিশেষ আলোচনা প্রশ্নোপনিষদে আছে। গার্গ্য মুনি প্রশ্ন করলেন, 'কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি?' মহর্ষি পিপ্পলাদ উত্তর দিলেন : "অত্র এষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি, শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি। দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনঃ প্রত্যনুভবতি। দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ, শ্রুতং চাশ্রুতং চ, অনুভূতং চাননুভূতং চ, সচ্চাসচ্চ, সর্বং পশ্যতি, সর্বঃ পশ্যতি। —অর্থাৎ এই দেব স্বপ্নে মহিমা (বিভূতি) অনুভব করেন। (জাগ্রদবস্থায়) যা কিছু বার বার দেখেন, শুনেন, অনুভব করেন, স্বপ্নে তা-ই বারংবার দেখেন, শুনেন, অনুভব করেন। দিগ্‌দিগন্তে (দেশ-বিদেশে) বার বার অনুভূত বিষয় (স্বপ্নে) পুনঃপুনঃ অনুভব করেন। (আরও) দেখা অদেখা, শোনা না-শোনা, অনুভূত ও অননুভূত, সৎ ও অসৎ, সকল বিষয়-বস্তু দেখেন, এবং স্বয়ং রূপায়িত হয়েও দেখেন।

মহর্ষি পঞ্চমুখে এই দেবের মহিমা কীর্তন করেছেন। এ আমাদের প্রাকৃতিক সৃষ্টির কথা, ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি অথবা তৈত্তিরীয়োপনিষদের ষষ্ঠ অনুবাকের সৃষ্টিতত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।

দুটি প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন হয়েছে। 'এষ দেবঃ' বলতে কাকে বুঝায়? মহর্ষি পিপ্পলাদ কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই দেবের বিভূতি বর্ণন করেছেন? সাধারণতঃ সকলে সক্রিয় মনকেই স্বপ্নের দ্রষ্টা মনে করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য ভাষ্যে লিখেছেন :

এই দেবতা, অর্থাৎ মন-উপাধিক জীব, আপনার মধ্যে ইন্দ্রিয়াদি করণবর্গ সমাহৃত ক'রে বিষয়-বিষয়ি-ভাবাত্মক বিচিত্র মহিমা দর্শন করেন। প্রবিবিক্তভুক শব্দের অর্থ : যিনি কেবল বাসনারূপ প্রজ্ঞাকে ভোগ করেন। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি করণবর্গ, দৃশ্য বিষয়বস্তু এবং বিষয়ী মন একীভূত অবস্থায় থাকে। আমরা ইহাকে নিষ্ক্রিয়, স্থিতিশীল (static) অবস্থা বলতে পারি।

এই দেবতা যে আমাদের জাগ্রৎ সক্রিয়, গতিশীল মন নয়, তা সহজেই বুঝা যায়। মন দশ ইন্দ্রিয়ের রাজা। জাগ্রদবস্থায় আমরা দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে বিষয়ের ভোক্তারূপে দেখি। অন্তঃকরণের চারিটি বৃত্তি: মন সংকল্প ও বিকল্পাত্মক, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, চিত্তবৃত্তি স্মরণাত্মক এবং অহংকার অভিমানাত্মক বৃত্তি। স্থূল দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলির অভিমানী অহংকার ও মন আমাদের অণু-পরমাণুদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রয়েছে। অহরহঃ সকলে 'অহং অহং' করছে। এইটে আমি, আর ঐটে তুমি, এই সব আমার। কিন্তু মনের ন্যায় এই সম্মাননীয় 'অহম্'বৃত্তি—আসলে মাত্র একটি ইন্দ্রিয়, তা নিজেকে তিনি যতই বড় মনে করুন না কেন। ভাতের হাঁড়ির নীচে আগুনের মতো বৈশ্বানর পিছনে আছেন, তাই এঁদের লম্ফ ঝম্প। যেমন কারণ-শরীরের মূল 'অহংকার' ব্যষ্টি জীবকে পরমব্রহ্ম থেকে পৃথক ক'রে দেখায়, তেমনি জাগ্রৎকালে স্থূল শরীরাভিমানী আমাদের আটপৌরে অহংবৃত্তি অপর সকল স্থূল বস্তু থেকে আমাদের পৃথক্ জ্ঞান জন্মায়।

সাধারণতঃ আমরা দেখি জাগ্রদবস্থায় কর্মরত দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ রাত্রে নিদ্রার সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন মনের সংকল্প, বুদ্ধির নিশ্চয়, অহংকার-বৃত্তির অভিমান, সব বৃত্তিই প্রবৃত্তির তমোগুণে আচ্ছন্ন হ'য়ে স্তব্ধ থাকে। শ্রুতি বলেছেন, তখন এই দেহপুরে জেগে থাকেন কেবল মাত্র প্রাণাগ্নি। "প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি।" (প্রশ্ন ৪।৩) মহর্ষি পতঞ্জলি ১০ ও ১১ সূত্রে লিখেছেন: নিদ্রা অভাবাত্মক বৃত্তি। জীবের অনুভূত বিষয়সমূহ চিত্তহ্রদে যে তরঙ্গ উঠায়, তা স্মৃতি বা স্মরণাত্মক বৃত্তি। নিদ্রাবৃত্তি চিত্তহ্রদে যে তরঙ্গ তোলে তাই স্বপ্ন। দেহেন্দ্রিয়াদি, অন্তঃকরণ ও মনের প্রহরী সব নিদ্রিত। এই সময়ে চিত্তভাণ্ডারের উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে অবচেতন মনের গহ্বর থেকে চিত্ত-রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়—দৃষ্ট অদৃষ্ট, শ্রুত অশ্রুত, অনুভূত অননুভূত, দিগ্দেশের, জন্ম-জন্মান্তরের স্পষ্ট-অস্পষ্ট, সৎ ও অসৎ, রূপায়িত প্রাকৃত দৃশ্যাবলী: শ্রুতির স্বপ্ন এই প্রকার মহিমান্বিত, বিভূতিময়। শ্রীশঙ্করাচার্য 'অদৃষ্ট, অশ্রুত, অননুভূত' প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, একেবারে অদেখা, অননুভূত বিষয়ে বাসনা জন্মে না, শ্রুতি জন্মান্তরীণ সংস্কাররূপে অবস্থিত বাসনার ছবি চিত্তদর্পণে যে ছাপ রাখে, তার কথাই বলেছেন।

স্বপ্নসম্বন্ধে মোটামুটি আমাদের জ্ঞান এই রকম:

(১) কঠোর শ্রমজীবীরা শয়নমাত্রেই গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। স্বপ্নের কোন স্মৃতি তারা জেগে জ্ঞানভূমিতে আনতে পারে না। কেহ যদি অসময়ে সুখনিদ্রা ভেঙে দেয়, তবে মানুষ বিরক্ত হ'য়ে বলে—"সুখমহমস্বাপ্সং, ন কিঞ্চিৎ অবেদিষম্"—বড় সুখে ঘুমাচ্ছিলাম, কিছুই জানতে পারিনি। এই সুখের স্মৃতি কোথা হ'তে আসে? শ্রুতি বলেন, "উদানঃ এনম্ অহরহঃ ব্রহ্ম গময়তে।" (প্রশ্ন ৪।৪) পূর্বে লিখেছি, প্রাণাগ্নি দেহপুরে নিদ্রাকালে জেগে থাকে। উদান বায়ু প্রত্যহ তেজোভিভূত জীবকে ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ, আনন্দ-ভুক্ প্রাজ্ঞের সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়। সেজন্য সুষুপ্তি (গাঢ় নিদ্রা)-মগ্ন জীব কিঞ্চিৎ নির্মল আনন্দের স্মৃতি নিয়ে জেগে ওঠে। আচার্য শঙ্কর লিখেছেন, বিদ্বান ও অবিদ্বান, আপামর সকল জীবই সুষুপ্তিকালে এই সুখ প্রাপ্ত হয়। তবে স্বপ্নে মহিমা-দর্শন এবং সুষুপ্তিকালে সুখপ্রাপ্তি দৈনন্দিন প্রাকৃতিক ব্যাপার; এর সঙ্গে চরম জ্ঞানের সংস্পর্শ থাকে না।

(২) বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন, স্বপ্ন খুব কমই দেখি, আর সে সব মনেও থাকে না।

(৩) আবার অতিরিক্ত স্বপ্নাতুর দু' চার জন আছেন, যাঁদের নিদ্রা মানে স্বপ্ন দেখা। আর সে স্বপ্নের বিষয় ভাব ও ভঙ্গি, বিচিত্র এবং বহুমুখী।

মনে থাকুক আর নাই থাকুক, স্বপ্ন সকলেই দেখেন। ডাঃ ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষকেরা স্বপ্নদর্শন সম্বন্ধে যে সকল বিচিত্র কাহিনী প্রকাশ করেছেন, তা এমন প্রামাণ্য যে অবিশ্বাস করার উপায় নেই। তবে এঁরা স্বপ্ন-কাহিনীর মধ্যে সামাজিক ও অসামাজিক নানা ঘটনা ফলাও ক'রে লিখেছেন। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা পরব্রহ্মের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। স্বপ্নের বৈচিত্র্য ও মহিমা তাঁরা অনাদি প্রকৃতির খেলারূপে বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্মা হ'তে কীট পরমাণু, স্থাবর জঙ্গম, সর্বভূতের স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণশরীর, সমস্তই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি নিজে অচেতন ও জড়; কিন্তু যখন পুরুষের সান্নিধ্যে আসেন তখনই বিপুলবেগে তাঁর মধ্যে পরিণাম ঘটতে থাকে। সৃজনধর্মী প্রকৃতির পরমাণুপুঞ্জ বায়ুতাড়িত সমুদ্রের জলকণার ন্যায় তরঙ্গায়িত হয়।

"সে অপার ইচ্ছা-সাগর মাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ, কতই শকতি,
কত গতি স্থিতি কে করে গণন।
কোটী চন্দ্র, কোটী তপন,
লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহা ঘোর রোলে ছাইল গগন,
করি দশদিক্ জ্যোতি মগন।"
(সৃষ্টি,—বিবেকানন্দ)

প্রকৃতিদেবীর এই বিভূতির অতি ক্ষুদ্রাংশও যদি স্বপ্নে উদ্ঘাটিত হয়, তবে তা মহিমার নিদর্শন নিশ্চয়ই। ক্রমোন্নতিবাদ এবং আমাদের শাস্ত্র বলেন, লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে এই মানবজন্ম লাভ হয়। স্বামী বিবেকানন্দ-লিখিত রাজযোগের বাংলা অনুবাদের ৩০২ পৃষ্ঠায় পাই :

"আমাদের পরম কল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি ·· আত্মবিস্মৃত জীবাত্মার হাত ধরিয়া তাঁহাকে জগতে যত প্রকার ভোগ আছে, ধীরে ধীরে সব ভোগ করান।···যত প্রকার বিকার আছে, সব দেখান·· ক্রমশঃ তাঁহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যান···।"

শাস্ত্র বলেন, জন্ম-জন্মান্তরীণ অনুভূতি সংস্কার-রূপে চিত্তভাণ্ডারে পুঞ্জীভূত থাকে। এর মধ্যে অনেক চিত্র হয়তো মুছে গিয়েছে, আরো বহু ছবির উপর ছাপ পড়েছে। জীব যত অভিজ্ঞতা দিগদিগন্তে সঞ্চয় করেছে—কাম-কামনার ছবির আশপাশে তার ছবিও ছড়িয়ে থাকে। এর উপরে বর্তমান জন্মের অনুভূতিগুলি নিশ্চয়ই জীবন্ত আছে।

সাধক যোগী ধ্যানকালে প্রথমে নিজেকে উপাধি-মুক্ত ভাবেন। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন :

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর।

এর পরের অবস্থা : তৈজসাত্মা দেখছেন—

অস্ফুট মন-আকাশে জগৎ-সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর।

এখনও অহংস্রোত রয়েছে, প্রকৃতির সাথে সংযোগ আছে : তার পরে—

ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল · ।

মাণ্ডুক্যের ঋষি তাঁর 'বৈশ্বানর'কে উপাধির সঙ্গে অভিন্ন বোধে স্থূল জগতের জ্ঞান লাভ এবং বিষয় ভোগ করতে দেখেন। নিদ্রাকালে বৈশ্বানর স্বপ্নে চরাচর মনোহর বিশ্বের ছবি দেখেন। লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে প্রকৃতিদ্বারা উপহিত হ'য়ে তিনি যে সব খেলা খেলেছেন, মুগ্ধ হ'য়ে তাই সমগ্রভাবে দেখেন। তখনও কিন্তু—'অস্ফুট মন-আকাশে জগৎ-সংসার ভাসে, ডুবে, পুনরায় ভাসে, এই স্রোত চলে, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। ঋষি দেখছেন, জীব প্রত্যহ সুষুপ্তি-কালে উপাধি-মুক্ত হন ও স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। শ্রুতি বলেছেন, ইনিই ব্যষ্টি জীবাত্মা, প্রাজ্ঞ; ইনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, বোদ্ধা, মন্তা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। (প্রশ্ন ৪।৯)

ঋষি প্রতি প্রাণীর জীবন-নাট্যে প্রত্যহ

জাগরণ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি-পুরুষের খেলা এইভাবে অভিনীত হ'তে দেখেছেন। আমারই এই তিন অবস্থা, তিন স্তরেই নাম-রূপের খেলা। সাধক ধ্যানে যা উপলব্ধি করেন, সর্ব সাধারণের দৈনন্দিন জীবনে অজ্ঞাতসারে তা চিত্রিত হয়। ইহাই জীবকে উচ্চ থেকে উচ্চতর জীবন-লাভের প্রেরণা যোগায়।

দেহের দৈনিক ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য নিদ্রার প্রয়োজন। কিন্তু স্বপ্নের প্রয়োজন কি? শ্রুতি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থায় আত্মার ঐক্যভাব দেখাবার প্রসঙ্গে স্বপ্নের মহিমা কীর্তন করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্রহ্মোপলব্ধির দিক থেকে বর্ণিত। পাশ্চাত্ত্য মনোবিদেরা স্বপ্নকে বিচার করেছেন, প্রধানতঃ মানসিক ব্যাধির দৃষ্টি নিয়ে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা বলেন, স্বপ্নে নিজেদের স্বভাব-চরিত্রের দুর্বলতা, বিশেষ ক'রে ভয়, কাম এবং কাঞ্চনাসক্তির চিত্রই বেশী দেখা যায়। স্বপ্নে বলবান ব্যক্তিও অসহায়, সংযমী পুরুষও বিপন্ন।

কঠোর শ্রমজীবীরা স্বপ্নের কথা ভাবেই না। স্বপ্নে নিজ চরিত্রের বিকৃতি দেখে সংস্কৃতি-অভিমানী ব্যক্তিরাই বিব্রত হন। সদসৎ উপায়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পত্তি অর্জন করেছেন যাঁরা তাঁরাই এই ভাবের স্বপ্ন বেশী দেখেন যে স্বপ্নে ধনসম্পত্তি ডাকাতি হ'য়ে গেল, এই ভ্রমজ্ঞানে তাঁরা এতই বিচলিত হন যে জেগেও তাঁদের কান্না থামে না। এঁদের মধ্যে অনেকে ধর্ম-জীবনের আশ্রয় নিয়ে দান ধ্যান ক'রে বিবেকের তাড়না থেকে রক্ষা পান। স্বপ্নের এই এক মহান প্রয়োজন দেখা যায়। এই ভাবের তাড়না তাঁদের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক, আত্ম-সংশোধনের দিকে দৃষ্টি পড়ে। বিদ্বান্ ব্যক্তির অহংকার-ত্যাগেরও ইহা সহায়ক। সাধক ও শাস্ত্রজ্ঞেরও চরিত্রে যদি বিন্দুমাত্র গলদ থাকে, স্বপ্ন তার আবরণ খুলে দেয়। নিবৃত্তি-মার্গের পথিকের সাধনকালে এক সময়ে জন্ম-জন্মান্তরের পশুভাবগুলি সহস্র ফণা নিয়ে তাড়া করে। সাধক বিমূঢ় হ'য়ে ভাবেন, অদেখা, অননুভূত, সদসৎ এই সকল উৎকট ভাব তাঁর ভিতরে এতকাল ছিল কোথায়? শ্রীবুদ্ধের সাধনকালে মায়া ও মারের আবির্ভাব—এই পর্যায়ের চিত্র।

স্বপ্ন-জগতের এক পরম কল্যাণের দিক আমি পাঠকের গোচরে আনছি। স্বপ্নে কঠিন প্রশ্নের সমাধান, ভবিষ্যতের হুবহু চিত্র, দিব্য মূর্তির দর্শন, ইষ্টমন্ত্র লাভ, কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার ইঙ্গিত—অনেকেই তাঁদের জীবনে পেয়েছেন। এই রকমের কল্যাণময় চিত্র কোথা থেকে চিত্ত-দর্পণে প্রতিফলিত হয়? কারণ-জগৎ থেকে এই চিত্রসকল আসে: এবং ইহা জগদ্‌গুরুর কৃপার নিদর্শন। দিব্য জীবনলাভের প্রেরণাও এই পথে আসে।

স্বপ্নে কঠিন অঙ্কের সমাধান, নূতন তথ্যের সন্ধানলাভ, ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানতে পারা অনেকেরই অভিজ্ঞতার মধ্যে।

পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের মধ্যে ডাঃ ফ্রয়েডই প্রথম স্বপ্ন ব্যাপারটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। বহু মানসিক ব্যাধির মূলে তিনি নিরুদ্ধ কামনার অবস্থান দেখে মনঃসমীক্ষণ (সাইকো-এনালিসিস) প্রণালীতে চিকিৎসা করেন ও বিশেষ সুফল লাভ করেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসক-মাত্রেই তাঁর গবেষণাকে সম্মানের আসন দিয়েছেন। এখন স্বপ্ন-বিষয়ে তাঁর মত উল্লেখ করছি। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের 'স্বপ্ন'-নামক পুস্তক থেকে ফ্রয়েডবাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করলাম।

"মনের প্রহরী (সেন্সর) অসামাজিক কামাদি ইচ্ছাকে অবদমিত করিয়া নির্জ্ঞানে (অবচেতন মনে) অবরুদ্ধ রাখে। নিদ্রাবস্থায়, বা মানসিক অবসাদ অথবা উত্তেজনা-কালে এবং কতকগুলি মানসিক রোগে, এই প্রহরী অসতর্ক হইতে পারে। এই সময়ে অবদমিত রুদ্ধ ইচ্ছা, স্বপ্নে—নানা

প্রতীকের সাহায্যে এবং বিভিন্ন ছদ্মবেশে সংজ্ঞানে আসিতে চেষ্টা করে ; তখনি আমরা স্বপ্ন দেখি।"

এই প্রতীক ও ছদ্মবেশ যে কত বিচিত্র বর্ণে, রসে, গন্ধে ও অদ্ভুত কল্পনায় মণ্ডিত হ'য়ে ফুটে বের হয়, ওঁদের পুস্তকে তার বিবরণী পড়লে, শ্রুতির 'মহিমা'-দর্শনকে খুব অতিশয়োক্তি মনে হবে না। মনঃসমীক্ষকের কাছে রোগী যখন স্বপ্ন-কাহিনী বর্ণনা করে, তখন কত নদনদী উপত্যকা, পাহাড় জঙ্গল, আকাশমার্গে বিচরণের বৃত্তান্ত ব'লে যায়, তা উপন্যাসের গল্পের চেয়েও সরস। এই সকল মনঃসমীক্ষকেরা প্রথমতঃ মানসিক ব্যাধির গোপন রহস্য অনুসন্ধানে রত হন ; শেষে স্বপ্নদর্শন-তত্ত্বে মন দিয়েছেন। এঁরা সেজন্য স্বপ্নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন নি। মানুষের জীবনে ভোগই প্রধান স্থান জুড়ে আছে। এই প্রেয়-তাত্ত্বিকদের নিকটে উচ্চতর জীবনের কোন মীমাংসাও আমরা আশা করি না।

সাংখ্য বলেন, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ-সম্পাদনের জন্য অনাদি প্রকৃতি জগৎ রচনা করেন। পূর্বে এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি উদ্ধৃত করেছি। ডাব্‌উইনের ক্রমোন্নতিবাদ পশু-মানবে এসেই শেষ হয়েছে। যে মানুষ আরও উচ্চস্তরে উন্নীত হ'য়ে সুপার-ম্যান ও দেবমানবের পর্যায়ে এসেছে, তাদের জীবনের ব্যাখ্যা পাশ্চাত্ত্য মনোবিদেরা বিশেষ করেন নি।

ফ্রয়েডবাদ কামবীজকে স্বপ্নের মূল প্রতিপন্ন করবার তাগিদে শিশুর স্তন্যপান থেকে ভয়, ভক্তি, ভালবাসা, সকল ভাবের মধ্যেই তার অঙ্কুর দেখেছেন। শ্রুতি সৃষ্টির মূলে, 'সোঽকাময়ত, বহুস্যাম্ প্রজায়েয়' থেকে শুরু ক'রে প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে প্রকৃতির সৃজন-ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রবিদেরা এই সৃষ্টি-কামনায় পুরুষের ত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের মহান ভাবের দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁদের মতে ত্যাগেই আনন্দ, ত্যাগের দ্বারা সেই অমৃতস্বরূপের উপলব্ধি ঘটে। ভয়ও স্বপ্ন-জগতের এক বড় স্থান জুড়ে আছে : স্বপ্নে বোমায় বিধ্বস্ত হওয়া, ভূমিকম্পে বাড়ি-চাপা পড়া, আততায়ীর ছোরার আঘাতে রক্তাপ্লুত হওয়া—প্রভৃতি স্বপ্নও সাধারণ।

স্বপ্নে ভয় দেখার কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েডবাদীরা প্রধানতঃ ঐ আদিম রিপুটিকেই সনাক্ত ক'রে থাকেন ; আমাদের শাস্ত্র দেহাভিমানী অহমিকাকে কারণ ব'লে নির্দেশ করেন। যখন জীবের সর্বভূতে আত্মার উপলব্ধি হয়, তখনই একজন আর এক জনকে ভয় করে না।

সংক্ষেপতঃ এই প্রবন্ধে স্বপ্ন-বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য মতবাদ উক্ত হয়েছে। এই বিষয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে। ডাঃ ফ্রয়েড মানসিক ব্যাধির নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান-কালে অতৃপ্ত কামনার খোঁজ পান। পরে তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা স্বপ্নতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। এদেশে ডাঃ বসু মহাশয় তাঁর 'স্বপ্ন' পুস্তকে গুরুকেও ছাড়িয়ে গেছেন, তিনি কামবীজের দর্শন আধ্যাত্মিক ভূমিতেও পেয়েছেন ; উপরন্তু স্মৃতি ও তন্ত্র থেকে উক্তি উদ্ধৃত ক'রে তাঁর মত সমর্থন করেছেন। তিনি ঐ সুর সপ্তমে চড়িয়ে, সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের মধ্যেও ফ্রয়েডবাদের কীটাণু দেখেছেন।

'স্বপ্ন-তত্ত্ব' আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ফ্রয়েডবাদ ভোগে আরম্ভ এবং ভোগেই শেষ হয়েছে। শ্রুতির স্বপ্নদর্শন মোক্ষ মার্গের সোপান। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা প্রবৃত্তিমার্গের চাবি-কাঠি ; শ্রুতির তৈজসাত্মা স্বপ্ন থেকে স্বরূপে আরূঢ় হন। ফ্রয়েড-তত্ত্ব যেখানে শেষ হয়েছে, শ্রুতির তত্ত্ব সেখান থেকে আরম্ভ। ফ্রয়েড পশুধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ ক'রে ভোগবিলাসীদের নিকট যশস্বী হয়েছেন ; শ্রুতি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির মধ্যে কার্যপরম্পরা নির্ণয় ক'রে দিব্য জীবনের সন্ধান দিয়েছেন।

মুক্তির প্রার্থনা

শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার ফিরায়ে দাও সেই শৈশব আশ্রয়, ওগো মাতৃসমা,
বিস্মরিয়া যাই সব পূর্বজ্ঞান, দয়াময়ী বিস্মৃতি পরমা !
সুখ ? স্বপ্ন শুধু, জানি মায়া-মৃগ নাহি দিবে ধরা, তবু ছুটে।
প্রেম প্রীতি আশা ? মৃগতৃষা বারংবার মরীচিকা মাঝে টুটে—
শুধু অবসাদ, পরাজয়। শত ব্যর্থতার জ্বালা ক'রে ক্ষয়,
তিলে তিলে হয় জীবনের সকল শক্তির পূর্ণ অপচয়—
আকাঙ্ক্ষার অনির্বাণ অগ্নিমধ্যে। এবে টুটি নীড় বাসনার
চূর্ণ করি জীবনের ভোগপাত্র বাহিরিব ভাঙি রুদ্ধ-দ্বার।
চিনিয়াছি স্বরূপ ইহার, এই সেই প্রজাপতি-মনোদেহ,
আপনারি লাগি রচে—রোগ, শোক, মায়া, মোহ—অনিত্যের গেহ।
সৃষ্টির বিধাতা এই, তাই যোগারূঢ় প্রাণ। হে মোর মৃন্ময়ী !
চিন্ময়ীরূপেতে তুমি জাগ করুণায়, কর মোরে মৃত্যুঞ্জয়ী।

বীরা, বীর্য দাও, দাও জ্ঞান-অসি, ক্ষমাহীন হস্তে ছিন্ন করি—
দলি অরি অন্ধকার কারাগারে, বদ্ধ প্রাণ চিরমুক্ত করি,
এই জীবনেই হোক অমারাত্রি অবসান। যাই ভুলি যত
ব্যথাময় অনুভূতি, সুখ-দুঃখরূপে সম-অন্তরাল মত
যাহা বহে সদা এ অন্তরে। জরা-ব্যাধি-শোক জনম-মরণ
বহি আনে জন্মান্তরে সহস্র সংস্কার বিষ-কীটের দংশন :
দুঃসহ ব্যথার দাহ, অতীত স্মৃতির বন্ধন বেদনা শোক—
দুঃখের রাত্রির দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের মত ত্যজি, হই বীতশোক।
কিবা সত্য মিথ্যা, ধন-মান, জ্ঞানাজ্ঞান সব করি সমর্পণ,
হে প্রবুদ্ধ ! তোমারি প্রসাদে ; শাশ্বত আনন্দ শিশু নিরঞ্জন—
অক্ষয় আনন্দলোকে, চলি পূর্বে মঙ্গল উষার পানে চাহি
বীতকাম বিমুক্ত বিহঙ্গসম, যথা আর জন্ম মৃত্যু নাহি।

সামঞ্জস্য—কেন এবং কোথায়?

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ব্রজবল্লভবাবু কীর্তন শুনিতে বসিয়াছেন। সারাদিনের বৈষয়িক কর্ম এবং সংসারের নানা প্রকার ঝামেলার পর হরিসভায় সন্ধ্যা হইতে দুইটি ঘণ্টা তাঁহার চমৎকার কাটে। নিজে গাহিতে পারেন না, চোখ বুজিয়া শুনেন। স্নায়ুগুলি যেন জুড়াইয়া যায়, প্রাণে কে যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখাইয়া দেয়; যখন বাড়ী ফিরেন সমস্ত হৃদয়ে এক অপূর্ব প্রসন্নতা বিরাজ করে। কিন্তু আজ ব্রজবল্লভবাবু কিছুতেই কীর্তনে মন দিতে পারিতেছেন না। সকাল বেলায় খুড়তুতো ভাই শ্যামকিশোরের সহিত একটি পারিবারিক ব্যাপার লইয়া বড় বচসা হইয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া সেই কথাটাই মনে আসিতেছে। কীর্তনের কথাগুলি কানে ঢুকিতেছে, কিন্তু প্রাণে বাজিতেছে না। গৃহে প্রত্যাগমনের সময় ব্রজবল্লভবাবু আপন মনে বলিয়া উঠিলেন,—কী আপদ, একটু শান্ত মনে ভগবানের নাম ক'বব তা আজ আর হ'ল না।

ব্রজবল্লভবাবুর এই স্বগতোক্তিটি অত্যন্ত মূল্যবান। মনের শান্তি না থাকিলে কীর্তনশ্রবণ সার্থক হয় না। কীর্তন শোনা কেন, কোন কাজই ঠিক ঠিক সম্পন্ন হয় না। আবার শুধু মনের শান্তিও পর্যাপ্ত নয়, দেহের শান্তিও চাই। এই বিষয়েও ব্রজবল্লভবাবুর একটি অভিজ্ঞতা উদাহরণ-স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। একদিন হরিসভায় যাইবার পূর্বে তাঁহার খুব মাথা ধরিয়াছিল। প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যাইবেন না, পরে মনের জোরে গেলেন। কিন্তু সেদিনও বড় ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। যে মন ভগবানে নিবিষ্ট করিবেন সেই মন বার বার পীড়িত শিরোদেশে ঘুরিতে লাগিল।

ব্রজবল্লভবাবুর আর একদিনকার একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলে এই প্রসঙ্গ শেষ হয়। সেদিন তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, মনেও কোন গোলমাল ছিল না। তথাপি কীর্তনানন্দ উপভোগ না করিয়াই তাঁহাকে বাড়ী ফিরিতে হইয়াছিল। কারণটি এই:—

আসর করিয়া সকলে বসিয়াছেন। খোলবাদক বাজনা শুরু করিয়াছেন, করতালও বাজিতেছে, গায়ক গৌরচন্দ্রিকা প্রায় ধরিতে উদ্যত—এমন সময় অকস্মাৎ বাহিরে ভীষণ চীৎকার শোনা গেল—'সাপ' 'সাপ' 'সাপ'। আট দশ জন লোকের চীৎকার। 'ঐ, ঐ হরিসভার ভিতর ঢুকছে, ঐ যাচ্ছে, ঐ ঐ।' গায়ক আব গান ধরিতে পারিলেন না। খোল করতালও বন্ধ হইল। সকলে বাহিরে আসিলেন। হরিসভার সামনে কলুবাড়ী। ওখান হইতেই নাকি বিরাট একটি গোখুরা সর্প হরিসভার মধ্যে ঢুকিযাছে। অনেকক্ষণ হৈ চৈ ও অনুসন্ধান চলিল, কিন্তু সাপকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তা নাই পাওয়া যাক—কিন্তু কীর্তন আর সে রাত্রিতে হইল না। অত্যন্ত বিষণ্ণ ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া ব্রজবল্লভবাবু গৃহে ফিরিযাছিলেন। বুঝিযাছিলেন, মনের শান্তি ও দেহের শান্তির ন্যায় পরিবেশের শান্তিও কীর্তনানন্দ উপভোগের জন্য প্রয়োজন।

শুধু কীর্তনানন্দ কেন, যে কোন সুনিয়ত সুষ্ঠু কার্যের সফলতার জন্য এই তিন প্রকার শান্তি বা সামঞ্জস্য কম বেশী অবশ্যই চাই। যে কাজ যত গভীর উহার জন্য সামঞ্জস্য তত অধিক প্রয়োজন। মাথাধরা লইয়া বাজার করা চলে, কিন্তু কীর্তন শোনা চলে না; মনে দুশ্চিন্তা থাকিলেও অফিস করিয়া আসা যায়, কিন্তু প্রবন্ধ বা কবিতা লেখা সম্ভব হয় না। বাড়ীর পাশে গোলমাল হইলেও কতকগুলি কাজ করিতে বাধা হয় না। কিন্তু কোন কোন কাজ বন্ধ রাখিতে হয়।

আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে এই তিন প্রকার সামঞ্জস্য যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহা আমরা উপাসনার প্রারম্ভিক নিয়মগুলি হইতেই বুঝিতে পারি। স্নান, আচমন, হস্তপদাদি প্রক্ষালন প্রভৃতি দেহশৌচের উপর জোর দিবার উদ্দেশ্য শরীরের ভিতর স্নায়বিক প্রবাহ, রক্তপ্রবাহ এবং বায়ু-প্রবাহকে সুসমঞ্জস রাখিতে সহায়তা করা। মনের সাম্য আনিবার জন্য শান্তিপাঠ, কল্যাণভাবনা প্রভৃতির ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি বৈদিক শান্তিবচনের ভাব কী বলিষ্ঠ! "কানে যেন আমরা মঙ্গল-বাক্য শুনিতে পাই, চক্ষুতে যেন শোভন দৃশ্যই দেখিতে পারি, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শরীর সবল ও সুস্থ রাখিয়া আমরা যেন দেবতার জয়গান কবিতে পাবি।" (ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃনুয়াম—ইত্যাদি)

"বাতাস মধুর হউক, নদীর জলধারা, বৃক্ষলতা গুল্ম মধুর হউক, প্রভাত এবং রাত্রি মধুর হউক। ধূলিকণায় এবং আকাশে যেন শান্তি ছাইয়া থাকে। সূর্যকিরণ যেন লইয়া আসে প্রাণপ্রদ মাধুর্য। সারা প্রকৃতিতে যেন আমরা মাধুর্য খুঁজিয়া পাই।" (মধু বাতা ঋতায়তেই—ত্যাদি)

ধ্যান করিবার পূর্বে আসনে বসিয়া মৈত্রী ও কল্যাণ-ভাবনার তাৎপর্যও মনকে সামঞ্জস্যের স্তরে লইয়া যাওয়া। ধ্যানরূপ সুকঠিন ব্যাপারটি —মনের সামঞ্জস্য না থাকিলে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তাই আসনে বসিয়া এই ধরনের চিন্তা আনিবার চেষ্টা করিতে হয়—'এই পৃথিবীতে কাহারও সহিত আমার বিদ্বেষ নাই। নিকটে বা দূরে যে যেখানে আছে সকলে সুখী হউক, সকলের মঙ্গল হউক। সকলেই আমার মিত্র। সকলের আনন্দে আমার আনন্দ।' এই প্রকার কল্যাণ-ভাবনা দ্বারা মনের পটভূমি তৈরী হয়। পটভূমি ঠিক ঠিক যদি তৈরী হয় তবেই সার্থক ধ্যান করিতে পারা যায়—শ্রীরামকৃষ্ণের কৌতুকভরে উদাহৃত 'বানরের ধ্যান' নয়, তিনি নানা উপমা দিয়া যথার্থ ধ্যানের লক্ষণ যেরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন সেইরূপ। যথা—

"গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্য তাগ করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে; সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোশনাই বাজনা গাড়ী ঘোড়া—কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁশ নাই, সে জানতে পারলে না যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল।

"একজন একলা একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাটা নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত হ'তে লাগল। সে তখন ছিপ হাতে ক'রে টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে মহাশয়, অমুক বাড়ুয্যের বাড়ী কোথায় বলতে পারেন? কোন উত্তর নাই। সে ব্যক্তির হুঁশ নাই। তার হাত কাঁপছে, কেবল ফাতনার দিকে দৃষ্টি। * * *

"ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায় না—শোনাও যায় না। স্পর্শবোধ পর্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, জানতে পারে না। যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না, সাপটাও জানতে পারে না।

"গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না—যেন বার বাড়ীতে কপাট পড়ল।"

শরীরের সমতা, মনের সাম্য এবং পরিবেশের শান্তি এই তিন প্রকার সামঞ্জস্যকে আমরা একটি ত্রিভুজের (triangle) তিনটি বাহুরূপে কল্পনা করিতে পারি। এই ত্রিভুজই যেন আমাদের ভাবী সফলতার বিকাশ-ক্ষেত্র। ক্ষেত্রের বেড়ার কোন অংশ ভাঙিয়া গেলে যেমন ভিতরকার ফসলের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, সেইরূপ সামঞ্জস্য-ত্রিভুজের কোন বাহুতে ঘাটতি থাকিলে জীবনের উন্নতি-বিধায়ক কাজ যথাযথ নিষ্পন্ন হয় না। অতএব কাজ আরম্ভ করিবার আগে সার্থক কাজের এই পরিবেষ্টনীটি ভাল করিয়া গড়িয়া তোলা বিধেয়। কীর্তন-শ্রবণ, ধ্যান ও উপাসনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এগুলি আধ্যাত্মিক কাজ। কিন্তু লৌকিক কাজের ক্ষেত্রেও এই সামঞ্জস্য-পরিবেষ্টনী চাই। পড়াশোনা, চাকরি, চিকিৎসা, ব্যবসা-

বাণিজ্য, অধ্যাপনা, সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাপৃতিগুলির সফলতা অনেকাংশে ঐ ত্রিবিধ সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে। সামঞ্জস্যের বেড়ার বাহিরে গিয়া কাজ করিতে গেলে হাত পা ভাঙিবার সম্ভাবনা!

কিন্তু এই বেড়া নিখুঁতরূপে নির্মাণ সম্ভবপর কি? সামঞ্জস্য-ত্রিভুজের বাহুত্রয়কে ঠিক ঠিক মিলানো যায় কি? আমাদের প্রাত্যহিক সংসারের অভিজ্ঞতা বলে,—না। একটি বাহু যদি ঠিক করিলাম তো অপর বাহুটি নড়িয়া যায়। এক দিককার বেড়া যদি বহুকষ্টে বাঁধিলাম তো আর একদিকের বেড়া মাপে ছোট পড়ে। শরীর যদি অনেক চেষ্টায় সুসমঞ্জস করিলাম তো মনের আঙিনায় যুদ্ধ থামাইতে পারি না। মনের একটি দুর্ভাবনায় যদি নিবৃত্তি হইল তো সঙ্গে সঙ্গে আর চারটি দুশ্চিন্তা উপস্থিত। সুস্থ শরীর ও শান্ত মন লইয়া কীর্তন শুনিতে বসিলেও কলুবাড়ীর ফটক হইতে সহসা 'সাপ সাপ' কলরবের সম্ভাবনা থাকিয়াই যায়। ব্রজবল্লভবাবু একান্তই নিরুপায়। আমরা প্রত্যেকেই নিরুপায়। পুরাপুরি সামঞ্জস্যের বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া জীবনের ব্যাপৃতিগুলি সাধন করিয়া যাইব—এমন সৌভাগ্য হাজার জনের মধ্যে একজনের ঘটে কিনা সন্দেহ। সামঞ্জস্য চাই, কিন্তু পাই না।

আলোক-অন্ধকারময় এই সংসারে সামঞ্জস্য-প্রতিষ্ঠা বড়ই কঠিন সমস্যা। ধরিলাম আমার নিজের শরীর-মনের হেফাজতি আমার হাতে, কিন্তু পরিবেশ? যে গৃহে যে পাড়ার যে গ্রামে আমি বাস করি, যে রাজ্যের আমি অধিবাসী, যে রাষ্ট্রের আমি প্রজা—তাহাদের সাম্য-বৈষম্যের সুখ-দুঃখের সহিত আমার নিজের শান্তি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পাড়ায় আগুন লাগিলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাই কি করিয়া? আমার জাতির কোন ব্যাপক দুর্দশার সম্মুখে আমি কি পলায়ন করিতে পারি? আমার সমাজে কোন দুর্নীতি বা দুর্ঘটনা আমার মনকে চঞ্চল করিতে বাধ্য। রাষ্ট্রের বিপদ বা বিপর্যয়ে আমি নিজেকে পৃথক করিয়া ভাবিতে বা পৃথক্ রাখিতে পারি না, নিজেও বিপন্ন বোধ করি। অতএব সামঞ্জস্য সম্বন্ধে পাকা রায় বোধ করি দাঁড়ায় যে, আদর্শ সামঞ্জস্য সংসারে নাই।

ঢেউ জানিয়াই সমুদ্রে নামিতে হইবে, ফাঁক মতো ঢেউ কাটাইয়া স্নান সারিয়া লইতে হইবে। শরীর মন ও পারিপার্শ্বিকের আনুকূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখিব, কিন্তু ঐ আনুকূল্য ব্যাহত দেখিলে নিরুৎসাহ হইব না। 'সংসরতীতি সংসারঃ, গচ্ছতীতি জগৎ'—'যাহা সরিয়া যায় তাহারই নাম সংসার, যাহা অনবরত চলমান তাহাই জগৎ।' সরিয়া পড়া, চলিয়া যাওয়াই যেখানকার রীতি—সেখানে কায়েমী খুঁটি বসাইব কোন দাবিতে? দেহ বল, মন বল, আর কর্মক্ষেত্রই বল—পুরা সামঞ্জস্য কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, এইটি হৃদয়ঙ্গম করাও একটি মস্ত বড় শিক্ষা। শুধু শিক্ষা নয়, শক্তিও। এই তথ্যটি ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিলে সামঞ্জস্যের দিকেই আগাইয়া যাওয়া যায়। মজার কথা, কিন্তু সত্য কথা।

এই হেঁয়ালির গূঢ় মর্ম এই যে, সামঞ্জস্য জিনিসটি আদপে বেড়া বাঁধিয়া সৃষ্টি করিবার জিনিস নয়। ইহা মূলতঃ একটি অসীম অনন্ত বস্তু। সামঞ্জস্য মানবাত্মার ধর্ম, জগদাত্মারও ধর্ম। সামঞ্জস্যেই মানুষের সত্য নিহিত, সামঞ্জস্যেই সংসার ওতপ্রোত। সামঞ্জস্য দেহ ও মনের অতীত এবং জগৎপ্রপঞ্চেরও অতীত, কিন্তু দেহ মন ও জগৎ সামঞ্জস্যকে ধরিয়াই বাঁচিয়া আছে। জগৎ ও জীবনের এই গভীর পটভূমি জানিতে পারিলে, অসীম ও অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে সামঞ্জস্যকে দেখিতে পাইলে উহাকে কাছে পাইতেও দেরি হয় না। তখন আর আলাদা আলাদা করিয়া দেহ-মনের সমতা সাধন করিতে হয় না। দেহ-মন

সাম্যের উপরই সর্বদা সুস্থির থাকে। পরিবেশের ব্যাঘাতও তখন শান্ত হইয়া আসে। নিরুপদ্রব পরিবেশ আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে, উঠিয়া আর তিরোহিত হয় না।

শরীর, মন ও জগৎ-সংসারের যিনি নির্মায়িক স্বচ্ছন্দ দ্রষ্টা তিনিই মানুষের আত্মা। তাঁহাতে কোন চঞ্চলতা নাই, কোন মলিনতা নাই, কোন বৈষম্য নাই, কোন ক্ষুদ্রতা নাই। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'—সেই কালুষ্যহীন পরম সমতারই নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অনাবিল অক্ষোভ্য প্রশান্তিতে মানুষের জন্মগত দাবি। এই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা যত সচেতন হইব ততই ঐ সম্পদ আমাদের হাতের মুঠায় আসিয়া যাইবে। সামঞ্জস্যের জন্য তখন আর হাহাকার করিতে হইবে না। তখন—

> সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্বেঽপি কল্পদ্রুমা
> গাঙ্গং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
> বাচঃ প্রাকৃত-সংস্কৃতাঃ শ্রুতিশিরো বারাণসী মেদিনী
> সর্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পরব্রহ্মণি॥
>
> ধন্যাষ্টকম্—শ্রীশঙ্করাচার্য।

"সারা জগৎ নন্দনবনের ন্যায় মনোরম, সকল বৃক্ষই কল্পতরুর ন্যায় মহান, সমস্ত জলই গঙ্গাজল, সমস্ত কাজই পুণ্যকাজ। কি কথ্য, কি লেখ্য সকল বাক্যই বেদ-বাক্য, সারা পৃথিবী বারাণসীর তুল্য তীর্থ বলিয়া প্রতীয়মান। যে কোন অবস্থায় থাকা যায় উহা পরম সত্যকে অবলম্বন করিয়াই থাকা।"

এইরূপ একটি সামঞ্জস্য যদি জীবনে নামিয়া আসে তাহা হইলে বাঁচিয়া সুখ, কাজ করিয়াও সুখ। স্বামী বিবেকানন্দ ঐরূপ কাজকে বলিয়াছেন 'অসীম প্রশান্তির পটভূমিকায় প্রখর কর্মপ্রবৃত্তি।' (Intense activity in the midst of eternal calmness)—কঠিন কথা, কিন্তু অসম্ভব কথা নয়,—কেননা উপনিষদের মতে ঐ সামঞ্জস্য আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। আমরা চোখ খুলিয়া দেখিলেই হয়। শুধু আমাদের নিজেদের আবিষ্কারের অপেক্ষা!

আবিষ্কারের বাধা কি? বাসনা। মনের অনন্ত বাসনা। চাওয়ার আর সীমা নাই। চাওয়ার অভ্যাস যত আমরা বর্জন করিতে পারিব তত ভিতরের দৃষ্টি খুলিবে, সামঞ্জস্যকে দেখিতে পাইব। ঐ সামঞ্জস্যই তো পরিপূর্ণতা। অতএব বাসনা-ত্যাগে আমাদের লোকসান নাই, বরং দশগুণ লাভ।

সামঞ্জস্য-লাভের ইহাই রাজপথ। যদি এই রাজপথে চলিতে ভয় হয়, সংশয় জাগে তো অগত্যা শরীর, মন ও পরিবেশকে বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী আলাদা আলাদা সামলাইয়া এই তিনটি দ্বারা একটি ত্রিকোণ কর্মবেষ্টনী রচনা করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। সংসারের নিয়মে নিখুঁত বেষ্টনী হইতে পারে না। ফাঁক থাকিয়া যাইবে, বারে বারে জোড় ভাঙিবে। তবুও তো নিরুদ্যম হইলে চলিবে না। কেননা, সামঞ্জস্যের বেড়ার মধ্যে না থাকিলে সংসার আমাদিগকে একেবারেই গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অতএব সামঞ্জস্য চাইই চাই। যতটুকু পাই ততটুকুই লাভ, ততটুকুই শক্তি।

এই শক্তি দিয়াই আমরা বুঝিব, উন্নতি কারে—কি লৌকিক, কি আধ্যাত্মিক। সামঞ্জস্য-বিযুক্ত কর্ম—অকর্ম। সে কর্মে নিজেরও কল্যাণ নাই, অপরেরও কল্যাণ নাই। সামঞ্জস্যাশ্রিত কর্ম যথার্থ কর্ম, সৎকর্ম। সৎকর্মে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই কল্যাণ।

শূদ্র-যুগ ও সেবাধর্ম

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন শর্মা রায়

হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়—প্রাচীন সমাজে চাতুর্বর্ণ্য বিভাগ ছিল না। পরবর্তীকালে সংস্কারানুযায়ী বৃত্তি অবলম্বনে ব্যক্তির বিকাশের পথ প্রশস্ত হওয়ায় সমাজে চাতুর্বর্ণ্য আপনিই সৃষ্টি হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে বা সত্যযুগে সমগ্র মানবজাতি ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়াই অনুমিত হয়। অতএব ঋগ্বেদের কাল হইতে পৌরাণিক যুগের পূর্ব সময় পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়কে ব্রাহ্মণ্যযুগ বলা যাইতে পারে।

গুণকর্মানুসারে চারিটি বর্ণ নির্দিষ্ট হইত, এরূপ বহু প্রমাণ পুরাণেতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। মানবের জন্মগত সংস্কারানুযায়ী বর্ণ-সকল নির্ধারিত হইত বলিয়া উহারা প্রাকৃত বর্ণবিভাগ, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সমাজপতি কিংবা আর্য-ঋষিগণের দ্বারা বর্ণ-বিভাগ প্রবর্তিত হইয়াছিল এরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা নিরসনকল্পে শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে বলিয়াছেন, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" —অর্থাৎ গুণ ও কর্মানুসারে চতুর্বর্ণ আমাদ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে।

চারিটি বর্ণ সৃষ্ট হইবার কয়েক সহস্র বৎসর পর ক্ষত্রিয়গণ ক্রমশঃ সমগ্র সভ্য সমাজে রাষ্ট্রনায়ক, ধর্মরক্ষক, এমনকি অনেকক্ষেত্রে অধ্যাত্মতত্ত্বেও শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া রাজর্ষি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রাজর্ষিগণের নিকট তপস্যাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণও ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য আসিতেন, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। সেই যুগই ক্ষত্রিয়যুগ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

বৌদ্ধযুগের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রকৃতপক্ষে বৈশ্যযুগের উদ্ভব হইয়াছিল। এযুগে ধর্ম ও রাজশক্তি যাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, তাঁহাদের বৃত্তি প্রধানতঃ ব্যবসাবাণিজ্য; এই বৈশ্যযুগে বণিক-শক্তিই সভ্যতা ও কৃষ্টি দেশদেশান্তরে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

গণতন্ত্রের যুগ শূদ্রযুগ। শূদ্র অর্থে নিকৃষ্ট বা হীন নয়। গভীর অধ্যাত্মশক্তির অধিকারী না হইলেও দৈহিক শ্রমশক্তি, অপরাবিদ্যা বা বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ, একতা, নিয়মানুবর্তিতা ও সঙ্ঘশক্তি শূদ্র-যুগকে মহিমান্বিত করিয়াছে, উহার ফলস্বরূপ আজ সমগ্র বিশ্বে শূদ্রযুগ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামে যেমন চারিটি যুগ পর্যায়ক্রমে ঘুরিয়া আসে—সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে চারিটি বর্ণও পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে, ইহা প্রাকৃতিক বিধান, চতুর্বর্ণান্তর্গত মানবমাত্রেরই স্বীয় সংস্কারানুযায়ী এক একটি ধর্ম আছে, প্রতিটি যুগেরও এক একটি বিশেষ ধর্ম বর্তমান।

মানবেতিহাস সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিশ্বময় শূদ্র-যুগ আসিতেছে। শূদ্রবর্ণের ধর্ম যেমন সেবা, শূদ্র যুগের আচরণীয় ধর্মও "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"। তাই যুগোপযোগী ধর্মকে বরণ করিয়া লইবার নিমিত্ত তিনি পূর্ব হইতেই বিশ্ববাসীকে সচেতন হইতে পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানাইয়াছেন।

হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রে শূদ্র-সংস্কারসম্পন্ন মানবকে বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্মে অধিকার দেয় নাই, কিন্তু দ্বিধাহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়াছে, শূদ্রের আচরণীয় একমাত্র ধর্ম 'সেবা'। ধর্মনির্দেশ সম্বন্ধে হীনদৃষ্টি কদাপি বিধেয় নহে। যুগধর্মকে কেন্দ্র করিয়া তত্তৎ যুগে অগ্রসর হইলে মানবজীবনের চরম সার্থকতা যে অতি সহজে সংসাধিত হইবে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই স্বামীজী সেবাধর্মকে পরামুক্তির উপায়স্বরূপ বলিয়া বার বার ঘোষণা করিয়াছিলেন।

যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণ

বর্ণের ধর্ম ; রাষ্ট্রসংরক্ষণ, আশ্রমধর্মের প্রতিপালন, যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা, ও ঈশ্বরভক্তি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ; গোরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য বৈশ্যের ধর্ম ; সেবা ও সঙ্ঘবদ্ধতা শূদ্রের ধর্ম। শূদ্রযুগে অর্থাৎ গণতন্ত্রযুগে সেবা ও সঙ্ঘবদ্ধতাদ্বারা মানব ব্যষ্টি ও সমষ্টির উন্নতি করিবে, তাহাদ্বারাই ভগবৎসাক্ষাৎকার কিংবা মোক্ষলাভেও সক্ষম হইবে ; ইহাও গীতাদি শাস্ত্রের নির্দেশ।

শূদ্রযুগের শাসনতন্ত্র একনায়কত্ব নহে, উহা জনসাধারণ অর্থাৎ কৃষক, মজুর, শ্রমিক প্রজাসকলের সম্মিলিত একীভূত শক্তিদ্বারা পরিচালিত, শূদ্রযুগের ধর্মও সর্বজনীন। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধার্মিক কেবল স্বীয় মুক্তিলাভে তৎপর হইবেন না, সমগ্র জনগণকে সেবা করার যে মহৎ আদর্শ—তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন এবং সমগ্র জগতের মুক্তির প্রয়াস করিবেন ! ইহাই শূদ্রযুগের বৈশিষ্ট্য।

সঙ্ঘবদ্ধতা বা একতা বিস্তৃত আকারে প্রতি মানবাত্মার সহিত পরস্পর পরস্পরকে আত্মবোধে সহায়তা করে। সঙ্ঘবদ্ধতার মূল সূত্রটি অনুধাবন করিলে ও যথার্থ সেবার ভাবে উহা পরিচালিত করিলে অদ্বৈত সাধনের গূঢ় তত্ত্বও যে উপলব্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক আত্মাই সর্বভূতে বিরাজ করিতেছেন এবং এক আত্মাই বহুরূপে জীব, জন্তু, স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, অচেতনরূপে বিরাজ করিতেছেন, ইহাই বৈদিক ধর্মের মূলতত্ত্ব। তাই একাত্মবোধই হিন্দুধর্মে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া বিঘোষিত। একতা বা সঙ্ঘবদ্ধতার ভাব গভীর হইতে গভীরতম অবস্থায় উপনীত হইলেই উহা জীবভাবকে বিশ্বাত্মবোধে রূপায়িত করিবে। উক্ত সাধনাকে স্বামী বিবেকানন্দ বাণী দিয়া রূপ দিয়াছেন :

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

সেবা বলিতে আমরা কি বুঝি ? নিজের অথবা অপরের অভাব মোচন, প্রীতি উৎপাদন কিংবা বিপদ হইতে উদ্ধারকল্পে যাহা কিছু করা যায় তাহাই সেবা। সেবা ত্রিগুণভেদে তিনপ্রকার : তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক।

আপন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত উত্তম আহার, উত্তম পানীয় বা বহুমূল্য দ্রব্যাদি গ্রহণ আত্মসেবা বা স্বার্থপরতা ; ইহা তমোগুণী, ইহাতে স্বীয় নিম্নতম প্রয়োজনের অধিক সামগ্রী আহরণ করিবার প্রয়াস বর্তমান, তাহাতে অপরের নিম্নতম প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব ঘটিতে পারে। কর্তব্য-বুদ্ধিতে আত্মীয়গণের সেবা, দেশসেবা প্রভৃতির পশ্চাতে কতিপয় যুক্তি বর্তমান। আমাদের আত্মীয়গণ বিপৎকালে, আমাদের শিশুকালে কিংবা আতুর অবস্থায় সেবা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের অনুরূপ সেবা করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য ; এরূপ কর্তব্যের পরিধি বর্ধিত হইয়া সমাজান্তর্গত বা দেশান্তর্গত মানবগণের সেবার প্রেরণা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা রাজসিক সেবা নামে অভিহিত হইতে পারে। যে সেবায় আপন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই, ভোগাকাঙ্ক্ষা নাই, নামযশের কামনা নাই, প্রতিদানে পাইবার কিছু আশা নাই, কর্তব্যাকর্তব্যের বিচারও নাই, একমাত্র সেব্য বস্তুর বা ব্যক্তির প্রীতির জন্যই সাধিত হইয়া থাকে, উহাই সাত্ত্বিক সেবা বলিয়া কথিত। তাই ভগবৎসেবা, শিবজ্ঞানে জীবসেবা, জননী ও জন্মভূমিকে দেবীজ্ঞানে সেবা করা, দেশবাসী এমনকি সমগ্র বিশ্ববাসীকে আত্মবোধে সেবা করা সাত্ত্বিক সেবার আদর্শ।

শ্রীমদ্ভাগবতে সেবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; কারণ, সেবাদ্বারা সেবকের হৃদয় নির্মল ও স্বার্থশূন্য হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন :

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥১২।৪

অর্থাৎ যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, অখিল বিশ্বে আমিই অবস্থিত জানিয়া সর্বত্র সমদর্শী এবং সর্বজীবের কল্যাণ সাধনে তৎপর, সেই সাধকগণ পরমাত্মারূপী আমাকেই প্রাপ্ত হন।

স্বামী বিবেকানন্দ এই সেবাধর্মকে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে এই সাত্ত্বিক সেবাধর্মের আদর্শ মানব উপলব্ধি করিতে ও যথার্থভাবে পালন করিতে সমর্থ হয়, তন্নিমিত্ত "শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ" স্থাপন করত শিবজ্ঞানে জীবসেবার প্রবর্তন করিয়াছেন। গৃহস্থ-ভক্ত, জনসাধারণ ও মুমুক্ষু সন্ন্যাসিগণকে সমবেত-ভাবে এই সেবাধর্ম পালন করাইবার মানসে তিনি সঙ্ঘ প্রবর্তন করিয়া গেলেন। ইহাতে যুগধর্মই প্রকটিত হইয়াছে।

নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম জগতে সংঘবদ্ধভাবে সর্ব প্রথম প্রবর্তিত হয় করুণাবতার শ্রীবুদ্ধের দ্বারা; কিন্তু তৎকালে উহা একমাত্র নৈষ্কর্ম্যসাধন ও হৃদয়ের প্রসারতাই নির্দেশ করিত। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত শিবজ্ঞানে জীবসেবা বা নরনারায়ণ-সেবা সকল ধর্ম-মার্গীর, এমনকি নিরীশ্বরবাদিগণেরও অবলম্বনীয় এক সর্বজনীন নীতিপথ নির্দেশ করিয়াছে।

সেবাধর্ম প্রচার দ্বারা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাই যে জগতে প্রসারিত হইতেছে, এ বিষয়ে অদ্যাবধি অনেকের সন্দেহ বিদ্যমান। শ্রীরামকৃষ্ণের যে সহজ সরল ভাগবত জীবন দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সহিত স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত কর্মধারার স্থানে স্থানে অনৈক্য আছে, অনেকে এরূপ মনে করেন। এমনকি, স্বামীজীকে ব্যাপকভাবে সেবাধর্ম প্রচার করিতে দেখিয়া তাঁহার জীবন্মুক্ত অপাপবিদ্ধ কোন কোন গুরুভ্রাতার মনেও এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। শিবজ্ঞানে জীবসেবা যে "যত মত তত পথের"ই অপর এক ব্যবহারিক ভাষ্য তাহা স্বামীজী প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত সেবাধর্মের মাধ্যমে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, ভগবান যদি প্রেমস্বরূপ হইয়া থাকেন তবে সেবা সেই প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মৃন্ময় প্রস্তরময়, ধাতুময় বিগ্রহে বা প্রতীক প্রভৃতিতে অর্থাৎ জড় বস্তুতে ভগবৎজ্ঞানে সেবা-পূজাদ্বারা যদি তন্মধ্যে পরম-চৈতন্যের দর্শন লাভ হইতে পারে, চৈতন্যময় জীবদেহে শিবজ্ঞানে সেবা করিলে তাহাতেও শ্রীভগবানের পূর্ণ চিন্ময়-মূর্তির প্রকাশ হওয়া কখন অসম্ভব নয়, ইহাতে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।

একমাত্র সেবাধর্ম দ্বারাই জগতের সর্ব সমস্যার নিরসন হইতে পারে। কি রাজনীতিক সমস্যা, কি সাম্প্রদায়িক সামাজিক, আর্থনীতিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল সমস্যাই সেবাদ্বারা মীমাংসিত হইতে পারে। আজকাল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু মানব-হিতৈষী অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন—মানব-সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলেই মানবের সকল সমস্যার সমাধান হইবে। এই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মূলে আর্থনীতিক বিষয়ই মুখ্য, কিন্তু উহা মানব-জীবনের বহিরঙ্গ মাত্র। কোন রাষ্ট্র বা সমাজে আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সমগ্র মানব-মনে সমতা বা সাম্যভাব আনয়ন করা সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ মানবমাত্রেরই যুগপৎ দুইটি জগতে বাস করিতে হয়—একটি বহির্জগৎ ও অপরটি অন্তর্জগৎ। কোন দেশের অধিকাংশ নরনারী আপন অন্তরে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠার সহিত সেভাব গ্রহণ করিলেই বাহিরে ও অন্তরে যথার্থ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অন্যথায় প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া একরূপ অসম্ভব।

অর্ধশতাব্দীরও কিয়ৎকাল পূর্বে, যখন সাম্য-বাদের ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় নাই, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজী তৎকালেই এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, বৈশ্যযুগ শেষ হইয়া শূদ্রযুগ আগত-প্রায়—অর্থাৎ ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়ই যুগধর্ম (গণতন্ত্র) দ্বারা পরিচালিত হইবে। যাহাতে বিশ্ববাসী শূদ্রধর্মের কেবল সাত্ত্বিক ভাবটিকে গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রে, ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায়, শিল্পে

অগ্রসর হয় এবিষয়ে অবহিত হইতে স্বামীজী পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। সেই নিমিত্তই অসাম্প্রদায়িক সঙ্ঘস্থাপন ও অনাসক্ত সেবাকর্ম প্রবর্তন তাঁহার মুখ্য আদর্শ ছিল।

সেবাধর্ম যথার্থভাবে প্রতিপালিত হইলে মানব-জীবনে কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই যোগচতুষ্টয়ের চরমফলও অনায়াসে লাভ হইতে পারে। সেবা নৈষ্কর্ম্যসাধনে বা অনাসক্ত কর্মযোগের এক শ্রেষ্ঠ আদর্শ; কেননা আর্ত, বুভুক্ষু, দুর্গত বা পতিত জীবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার কালে প্রতি জীবকে শিবজ্ঞানে চিন্তা করিতে পারিলে কর্মফল ঐ জীবরূপী শিবে অর্পিত হয়। ইহাতে হৃদয় দীনতায় পূর্ণ থাকে। তখন সেবকের অহংকার হৃদয়ে স্থান পায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন "দাস আমি হ'য়ে থাকলে তাতে কোন দোষ নেই।" স্বর্ণময় অস্ত্র যেমন অস্ত্রের আকার লইয়াই বর্তমান থাকে, উহাদ্বারা কখনও কোন হনন-কার্য সাধিত হয় না, সেবাভাবে মন মগ্ন থাকিলে উহা আপনিই অনাসক্ত ও নিরহংকার হইয়া যায়। সেবাকার্য নিঃস্বার্থ হইলে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে উহা দ্বারা ভালমন্দ কোন ফলই অর্জিত হয় না। ইহাতে মানবাত্মার পুনঃ পুনঃ জন্মলাভের কারণ আপনিই বিদূরিত হয়, এবং মুক্তি লাভ হয়।

শিবজ্ঞানে জীবসেবায় অর্থাৎ সেব্য জীবে আপন ইষ্ট আরোপিত হইলে তন্মধ্যে ভগবৎশক্তি প্রকটিত হয়। এইভাবে সেব্য জীবে ইষ্টদর্শন করত ভক্তিযোগের চরমফল ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। তাই স্বামীজী বলিতেন, "সেবা একাধারে তোর ইষ্টপূজা ও আত্মনিবেদন।"

জ্ঞানীর আদর্শ সর্বজীবে, সর্ববস্তুতে আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শন। সর্বত্র আত্মা (পরমাত্মা) বিরাজ করিতেছেন বিবেচনা করিয়া আপামর সাধারণকে সেবা করিলে যথার্থ আত্মসেবাই যে সাধিত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহারই ফলস্বরূপ সর্ববস্তুতে আত্মোপলব্ধি দ্বারা ব্রহ্মনির্বাণ বা সমাধিলাভে মানব অবশ্যই ধন্য হইবে। তাই জ্ঞানযোগীর পক্ষেও সেবাধর্ম একটি শ্রেষ্ঠ পথ।

রাজযোগীর পক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব বা অভেদাত্ম-প্রতিপাদন করাই আদর্শ। সেব্য জীবে আপন মনপ্রাণ যোগ করিতে পারিলে অর্থাৎ অপরের সুখদুঃখ আপন সুখদুঃখের মতই অনুভব করিতে পারিলে অর্থাৎ অপরের সুখদুঃখের মতই অনুভব করিতে পারিলে সেব্য জীবে আত্মবোধ জাগ্রত হইবে। এইরূপ জীবরূপী শিবের সহিত সেবকের আত্মিক সংযোগ সাধিত হইলেই যোগীর পরামুক্তি বা মহানির্বাণ আপনিই লাভ হইবে।

সেবাধর্ম যেমন কোন জাতি সম্প্রদায় বর্ণে, কোন দেশ কাল পাত্রে আবদ্ধ নয়, যেমন চির উদার ও অনন্ত, তেমনই সর্বযুগোপযোগী--সর্বজনোপযোগী, অতি সহজ ও সরল পথ এবং গৃহী ত্যাগী নির্বিশেষে সকলেরই গ্রহণযোগ্য। ইহাতে কোন যোগকৃচ্ছ্রতা নাই, যাগ-যজ্ঞাদির জটিল পদ্ধতি নাই, সুকঠিন প্রাণায়ামাদি নাই, তন্ত্রমন্ত্রাদির দুরূহ অনুষ্ঠান নাই; শুধু চাই—গভীর হৃদয়ানুভূতি ও অনলস কর্মপ্রচেষ্টা। সর্বকালে, সর্বদেশে, সর্বাবস্থায় সকলের ইহা এক সর্বজনীন মানবতার ধর্ম। বিশেষ-ভাবে সেবাধর্ম বর্তমান যুগের দুঃখতাপহারী সুখ-শান্তিবিধায়ক কল্যাণসাধক যুগধর্ম।

জীবসেবার চাইতে আর ধর্ম নাই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করিতে পারিলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কাটিয়া যায়—"মুক্তিঃ করতলায়তে"।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীসারদা-স্তুতি

মিশ্র ভীমপলশ্রী (একতালা)

কথা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, টি

সুর—সঙ্গীতাচার্য রাজেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বরলিপি—কুমারী আভা সরকার, গীতিভারতী

ভকত-হৃদয়-বাঞ্ছিত মাতা শরণাগতের গতি।
জননী সারদা জগত-ধাত্রী দেহ পদে মম মতি॥
যাহা কিছু আছে অর্পণ করি, সকল কর্মে সদা যেন স্মরি,
শয়নে স্বপনে তোমারই চরণে, করি যেন সদা নতি।
দেবতা-সেবিত চরণ-পরশে কত জড়ে দিলে প্রাণ।
তোমার করুণা-সলিলে ভাসালে চেতনা করিলে দান॥
পঙ্গু লভিল শকতি নবীন, পূর্ণ হইল যেবা ছিল দীন।
মূক লভি বাণী হইল ধন্য নিরখিয়া ভগবতী॥
সারাটি জীবন বেদনা সহিলে ধরিয়া মানবী কায়া।
সন্তান-দুঃখে বিগলিত হিয়া স্নেহময়ী মহামায়া॥
নাই মাগো কিছু পূজা উপচার, অন্তর-ভরা শুধু হাহাকার,
ভক্তি অশ্রু-মালিকাটি মোর নিবেদিনু শিব-সতী॥

স্বরলিপি

০	১	+	৩	০	১
{ পা পা মা	ণা পা পা	মা জ্ঞা জ্ঞা	মা মা মা	ণ্ ‌া সা মা	জ্ঞা জ্ঞা মা
ভ ক ত	হৃ দ য়	বা ন্ ছি	ত মা তা	শ র ণা	• গ তের

+	৩		০	১	+	৩
পা পা -া	মমা জ্ঞা মা }|	{	পধা পধা ণা	ণা ণা ণা	ধণা ধণা র্সা	র্সা া র্সা }||
গ তি •	•• • •		জ• ন• নী	সা র দা	জ• গ• ত	ধা • ত্রী

০	১	+	৩
ণ্ ‌া সা সা	মজ্ঞা জ্ঞা মা	পা পা -া	মমা জ্ঞা মা ||
দে হ প	দে• ম ম	ম তি •	•• • •

০	১	+	৩	০	১
প ধা র্রা	র্রা র্রা র্রা	পা ধা র্সা	র্রা র্জ্ঞা র্রা	র্সা র্সা র্সনা	ধমা পা পা
যা হা কি	ছু আ ছে	অ ০ র্প	ণ ক রি	স ক ল০	ক০ ০ র্মে
প ং শু	ল ভি ল	শ ক তি	ন বী ন	পূ ০ র্ণ০	হ০ ই ল
না ই মা	গো কি ছু	পূ জা উ	প চা র	অ ন্ ত০	র০ ভ রা

+	৩	০	১	+	৩
ধা ণা র্রা	র্সা ণা ধা	ণা ণা ণা	ণা ণা ধা	পা ধা ণা	ধা পা পা
স বা যে	ন স্ম রি	শ য নে	স্ব প নে	তো মা রই	চ র ণে
যে বা ছি	ল দী ন	মু ক্ ল	ভি বা ণী	হ ই ল	ধ ০ ন্য
শু ধু হা	হা কা র	ভ ক্ তি	অ ০ শ্রু	মা লি কা	টি মো র

০	১	+	৩
ণ্‌া সা মা	জ্ঞা জ্ঞা মা	পা পা -া	মমা জ্ঞা মা
ক রি যে	ন স দা	ন তি ০	০০ ০ ০
নি ব খি	যা ভ গ	ব তী ০	০০ ০ ০
নি বে দি	নু শি ব	স তী ০	০০ ০ ০

০	১	+	৩	০	১
সরা সরজ্ঞা জ্ঞা	জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা	সরা রা জ্ঞা	রা সা সা	প্‌া সা সা	সা সা সা
দে০ ব০০ তা	সে বি ত	চ০ র ণ	প র শে	ক ত জ	ড়ে দি লে
সা০ রা০০ টী	জী ব ন	বে০ দ না	স ঁপি লে	স রি য়া	মা ন বী

+	৩	০	১	+	৩
ন্‌সা ন্‌সা রজ্ঞা	রা -া রা	সা গা গা	গা মজ্ঞা রসা	সা রা মা	রা মা মা
প্রা০ ০০ ০০	০ ০ ন্	তো মা র	স্ব রু০ ণা০	স লি লে	ভা সা লে
কা০ ০০ ০০	য়া ০ ০	স ন্ তা	ন দু০ খে০	বি গ লি	ত হি য়া

০	১	+	৩
সা রা মা	রা মা পা	ণদা ণদা না	পা -া পা
চে ত না	ক রি লে	দা০ ০০ ০	০ ০ ন্
স্নে হ ম	য়ী ম হা	মা০ ০০ ০	য়া ০ ০

কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী জীবানন্দ

কল্পতরুর কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়—এই প্রবাদ প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। কল্পতরু তো কবির কল্পনা—বিচারশীল মনে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কল্পতরুর অস্তিত্ব বাস্তবে কি সম্ভব ?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কল্পতরু দেখিয়েছিলেন তাঁর সখাদের। গোচারণের সময় শীতল ছায়াপ্রদ বৃক্ষ-রাজি দেখে তিনি বলেছিলেন, 'এই সব মহাভাগ কল্পবৃক্ষ পরার্থেই একান্তজীবিত। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অক্লেশে সহ্য ক'রে যুগ যুগ ধ'রে অবস্থান করছে বরজন্ম মহাভাগবত এই বৃক্ষসকল,—কোন যাচকই এদের কাছে প্রার্থনা ক'রে বিমুখ হয় না—সর্বস্ব দিয়ে অপরের কল্যাণ-সাধনেরই জন্তে এদের জন্ম।'

কল্পতরুর বাস্তবতা অবাস্তবতা নিয়ে বিচার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যিনি সকল কামনা পূর্ণ করেন তাঁকেই 'কল্পতরু' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

ঈশ্বরই অন্তর্যামী রূপে সকলের হৃদয়মন্দিরে অবস্থিত থেকে সকলের সব কামনা-বাসনা পূরণ করেন। ধন জন মান বিদ্যা বুদ্ধি যা চাওয়া যায় তাঁর কাছে, ঐকান্তিকতা থাকলে নিশ্চয়ই তা পাওয়া যায়। সুখ-দুঃখের পারে শাশ্বত আনন্দের রাজ্যে যেতে চাইলে তিনিই তার উপায় ক'রে দেন। আমাদের অভাব বুঝে ও মনের ভাব জেনে যখন যেটি প্রয়োজন সেটি তিনি দিয়ে থাকেন। অন্তর্যামীর কাছে মুখের প্রার্থনার চেয়ে মনের ভাবই বড় কথা।

ঈশ্বর যখন তাঁর মায়াশক্তিকে আশ্রয় ক'রে লীলাবিগ্রহ ধারণ করেন তখন সমগ্র লীলাকালটিতে লোককল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেন। তাই দেখা যায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কৃপার এত বিচিত্র প্রকাশ। তাঁর সারা জীবনে অযাচিত কৃপা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষে প্রকাশ পেলেও অন্ত্যলীলার একটি বিশেষ দিনে তাঁর কৃপাবারি অজস্র ধারায় ঝ'রে পড়েছিল, ভক্ত অভক্ত ধনী নির্ধন যোগ্য অযোগ্য—সকলেই সমভাবে তাতে অভিসিঞ্চিত হয়েছিল। সেদিন অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' হয়েছিলেন, ভক্তদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন, আত্মপ্রকাশে অভয় প্রদান করেছিলেন।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ অবস্থায় কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অবস্থান করছেন। যে সব ত্যাগী যুবক-ভক্ত শ্যামপুকুরে নিজেদের বাড়ী থেকে এসে পালা ক'রে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন তাঁদের অনেকে সংসার-মায়া বিসর্জন দিয়ে পরমারাধ্য শ্রীগুরুর সেবায় নিরত হয়েছেন। অগ্রহায়ণের শেষ (২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৮৫) অর্থাৎ শীতঋতুর প্রারম্ভ থেকে ঠাকুর উদ্যানবাটীতে আছেন—লোকসমাগমের বিরাম নেই—তাঁর অমৃতময়ী কথারও অন্ত নেই। ভক্তগণের প্রাণপণ সেবাযত্নে ও উপযুক্ত চিকিৎসায় শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু সুস্থ বোধ করতে লাগলেন, সকলের মনে হ'ল তিনি এবার অল্পদিনেই পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হ'য়ে উঠবেন।

ক্রমে পৌষ মাসের অর্ধেক অতীত হ'য়ে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুআরি উপস্থিত।

প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙিব হাঁড়ি যাইব যখন॥
সেই হাঁড়ি-ভাঙা রঙ্গ আজিকার দিনে।
কিভাবে ভাঙিলা হাঁড়ি শুন একমনে॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি)

ঠাকুর ঐদিন বিশেষ সুস্থবোধ করায় কিছুক্ষণ উদ্যানে বেড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ইংরেজী

নববর্ষ উপলক্ষ্যে ছুটির দিন ব'লে গৃহী ভক্তেরা মধ্যাহ্নের কিছু পরেই একে একে বা দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হচ্ছেন। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের মাতুল হরিশ মুস্তফী ঠাকুরের ঘরে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। ইনিই সেই ভাগ্যবান পুরুষ যিনি সর্বপ্রথম এইদিন ঠাকুরের দেব-বাঞ্ছিত কৃপা লাভ করেন। হরিশের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'ল, পরম পুলকে অবিরল ধারায় তাঁর নয়ন দুটি দিয়ে প্রেমাশ্রু ঝ'রে পড়তে লাগল।

হরিষে হরিশচন্দ্র মুখে মাত্র স্ফুরে।
কৃপায় আনন্দ কিবা হৃদয়ে না ধরে॥

হরিশকে কৃপা করার পর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাসিন্ধু উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অন্তরঙ্গ দেবেন্দ্রকে ডেকে বললেন :

স্থিরতর কর কথা তোমরা সকলে।
রাম কি কারণে মোরে অবতার বলে॥ (পুঁথি)

কিন্তু এ-কথার অর্থ কেউই বুঝতে পারলেন না :

কথার সুগূঢ় মর্ম কথায় রহিল।

বিকাল ৩টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ উপর থেকে নীচে এলেন। ত্রিশ জনেরও বেশী ভক্ত এসেছেন —কেহ কেহ ঘরের মধ্যে কেহ কেহ বা গাছের তলায় বসে কথাবার্তায় রত। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে ঘরের সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম ক'রে তাঁর অনুগমন করতে লাগলেন। ঠাকুর নীচের হলঘরের পশ্চিমের দরজা দিয়ে উদ্যানপথে নামলেন, তারপর ধীরে ধীরে দক্ষিণমুখে ফটকের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন, বসতবাটী ও ফটকের মধ্যস্থলে উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন গিরিশ রাম অতুল প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত বৃক্ষতলে উপবিষ্ট। ঠাকুরকে দেখতে পেয়ে গিরিশ প্রভৃতি তাঁর কাছে এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঠাকুরের এই দিনের রূপ-বর্ণনা পুঁথিকারের অনবদ্য ভাষায় :

আজি মনোহর বেশ প্রভুর আমার।
বারেক দেখিলে কভু নহে ভুলিবার॥
পরিধান লালপেড়ে সুতার বসন।
গায়ে বনাতের জামা সবুজ বরণ॥
সেই কাপড়ের টুপি কর্ণমূল ঢাকা।
মোজা পায়ে চটিজুতা লতাপাতা আঁকা॥
শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল॥
কান্তিরূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল॥
দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর।
কিন্তু বয়ানেতে কান্তি বহে নিরন্তর॥
মনে হয় অঙ্গবাস সব দিয়া খুলি॥
নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি॥

কেহ কোন কথা বলিবার পূর্বেই ঠাকুর সহসা গিরিশচন্দ্রকে বললেন, 'তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) ব'লে বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখেছ ও বুঝেছ?'

সত্যই গিরিশ এখানে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নানা কথা ব'লে বেড়াতেন। ঠাকুরের প্রশ্নে গিরিশ বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'লেন না, নতজানু হ'য়ে ঊর্ধ্বমুখে তাঁর শ্রীমুখের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে গদ্‌গদস্বরে ব'লে উঠলেন, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেন নি, আমি তাঁর বিষয়ে আর কি বলতে পারি।'

গিরিশচন্দ্রের অন্তরের সরল বিশ্বাস প্রতিটি কথায় ব্যক্ত হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে হাত তুলে সমবেত সকলকে বললেন, 'তোমাদের কী আর বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।' জীবের প্রতি প্রেম ও করুণায় আত্মহারা হ'য়ে তিনি ঐ কথাগুলি মাত্র উচ্চারণ করেই ভাবাবিষ্ট হ'য়ে পড়লেন।

সেই গভীর আশীর্বাণী প্রত্যেকের অন্তরে প্রবলভাবে আঘাত করল, সকলের চিত্ত আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে উঠল। চারিদিকে 'জয় জয়' রব পড়ে গেল—চৈতন্যের ঢেউ খেলে যেতে লাগল। দেশ কাল দিগ্বিদিক্ মুছে গেল নিমেষে! ভক্তেরা স্থান-কাল ভুলল, ঠাকুরের ব্যাধির কথা বিস্মৃত হ'ল,

ব্যাধি আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে স্পর্শ না করার প্রতিজ্ঞাও ভুলে গেল। সকলের মনে হ'ল—এ যেন সেই শাশ্বত চৈতন্য—যাতে একটুও মালিন্য নেই, যা সর্বদা সর্বাবস্থায় বিশুদ্ধ! মনে হ'ল যেন পরমকারুণিক দেবতা স্নেহময়ী মাতার ন্যায় সস্নেহে আহ্বান করছেন—কে কোথায় আছ স্পর্শ ক'রে যাও এই চৈতন্য-প্রবাহ, হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হ'য়ে যাবে—বন্ধ্যাভূমিতে প্রবাহিত হবে প্রবল জলধারা—জাগ্রতা হবে কুলকুণ্ডলিনী।

সকলেই তাঁর পদধূলি গ্রহণের জন্য ব্যাকুল। প্রণামের প্রেমপুষ্পাঞ্জলি পড়তে লাগল ঠাকুরের শ্রীচরণে। আজ শ্রীরামকৃষ্ণ করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা—অর্ধবাহ্যদশায় দিব্য শক্তিস্পর্শে একের পর এক ভক্তকে কৃতার্থ করছেন। ভক্তগণের আর আনন্দের অবধি নেই।

সকলেই বুঝল শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের দেবত্বের বিষয় আর কারও কাছে গোপন রাখবেন না, পাপী তাপী যে যেখানে আছে এখন হ'তে সকলে তাঁর অভয়-পদে আশ্রয় লাভ ক'রে ধন্য হবে।

এই অপূর্ব ঘটনায় কেহ নির্বাক্ নিস্পন্দভাবে অবস্থান করতে লাগলেন, কেহ বা মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঠাকুরকে নিষ্পলক নেত্রে নিরীক্ষণে রত হলেন, কেহ নিজে ধন্য হ'য়ে অপর সকলকে তাঁর কৃপালাভে ধন্য করবার জন্যে ব্যাকুল, আবার কেহ পুষ্প-চন্দনে শ্রীঅঙ্গের পূজা করতে লাগলেন। সুমধুর স্তব-স্তুতি ও জয়ধ্বনি চতুর্দিক থেকে উত্থিত হ'তে লাগল: 'চৈতন্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ওরে তোরা কে কোথায় আছিস ছুটে আয়—জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য চেয়ে নে। কৃপার পাত্র উজাড় ক'রে দিচ্ছেন প্রভু!'

'এ কাকে দেখছি!'—শিউরে উঠলেন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল। ইষ্টমূর্তির ধ্যানে বসে কখনও তাঁকে সর্বাঙ্গ পূর্ণ ক'রে দেখতে পান নি। যখন পাদপদ্ম দেখেছেন তখন মুখখানি মানস-নয়নের গোচর হয় নি! যখন মুখ দেখেছেন তখন কোথায় বা তাঁর শ্রীচরণকমল! এখন মনে হ'ল সে মূর্তি যেন আপাদমস্তক স্পষ্ট ও অচঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—হ'য়ে উঠেছে বরাভয়প্রদ ও সর্বাঙ্গসুন্দর!

ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে ফুল নিয়ে বার বার ঠাকুরের পায়ে দিলেন, ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ ক'রে ধন্য করলেন।

দুটি জহুরি চাঁপা নিয়ে এসে অক্ষয় সেন শ্রীপাদপদ্মে দিলেন, ঠাকুর তাঁকেও স্পর্শ করলেন। অক্ষয় সেন এই দিন ঠাকুরের কাছে মহামন্ত্রও লাভ করেছিলেন। হারাণচন্দ্র পায়ের কাছে নতজানু হ'যে প্রণাম নিবেদন করতেই ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁর পাদপদ্ম রাখলেন হারাণের মাথার উপর।

যাঁর চরণযুগল সকল কর্ম ও মঙ্গলের নিদান সেই অমৃতের অধিপতির অভয় স্পর্শ লাভ করলেন উপেন্দ্র, অতুল, নবগোপাল, হরমোহন ও কিশোরী।

বৈকুণ্ঠ প্রণাম ক'রে বললেন, 'আমায় কৃপা করুন।'—স্মিতমুখে ঠাকুর বললেন, 'তোমার তো সব হ'য়ে গিয়েছে।' 'আপনি যখন বলছেন হয়েছে তখন নিশ্চয় হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু আমি যাতে অল্পবিস্তর বুঝতে পারি তা ক'রে দিন'—বললেন বৈকুণ্ঠ। 'আচ্ছা বেশ' ব'লে ঠাকুর মাত্র ক্ষণেকের জন্যে বৈকুণ্ঠের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করলেন।

ক্ষণকালের স্পর্শে অপূর্ব ভাবান্তর হ'ল বৈকুণ্ঠের। দেখতে পেলেন চতুর্দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসন্ন হাস্য-উজ্জ্বল মূর্তি। আকাশ বাড়ীঘর গাছপালা মানুষ সবেই সুহাস শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুনের ভয় হয়েছিল। সর্বতো-ব্যাপী মূর্তি প্রতিসংহার করবার জন্যে বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে ভীতিবিহ্বল অর্জুন। সরল সুন্দর সৌম্য মানুষ-মূর্তি যা দেখতে অভ্যস্ত তাই দেখতে চেয়েছিলেন অর্জুন। বৈকুণ্ঠও ভয় পেয়েছেন—তাঁর সর্বাঙ্গ যেন দীর্ণ বিদীর্ণ হ'যে যাচ্ছে—ভাবাবেগ সইতে পারছেন না। ভাবের উপশম প্রার্থনা করলেন বৈকুণ্ঠ।

করুণাময় ঠাকুর তাঁকে শান্ত করলেন।

বেলা যে ব'য়ে যায়—আর কে কোথায় আছ, ছুটে এস—অন্ধ খঞ্জ আতুর বঞ্চিত বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট সকলে এস, এই মহাভাগবত বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় আসন পাত, করুণার নিকেতনে উপবেশন কর—স্পর্শমণিকে একটিবার স্পর্শ ক'রে লৌহ-তনুকে উজ্জ্বল কাঞ্চন করিয়ে নাও।

কে কে আসল—কে কে তাঁর পুণ্য স্পর্শে চৈতন্যময় হ'ল সকলের নাম জানা যায় নি; তবে রান্নাঘরে কর্মরত রাঁধুনি বামুন পর্যন্ত সেই মহাস্পর্শে ধন্য হয়েছিল এইরূপে সেদিন।

'রাশি রাশি কৃপা ঢালি প্রভু ভগবান।
উপরে দ্বিতল ভাগে করিলা পয়ান॥
নিম্নতলে ভক্তদের আনন্দের মেলা।
এখানে শ্রীঅঙ্গে উঠে নিদারুণ জ্বালা॥
শ্রীঅঙ্গেতে জ্বালা কেন শুন বিবরণ।
যে যে পাপীদের আজি করিলা মোচন॥
তে সবার জীবনের যত পাপভার।
সকল লইযা প্রভু অঙ্গে আপনার॥
গঙ্গাজলে অঙ্গখানি করিলে মোক্ষণ।
তবে না হইল পরে জ্বালা নিবারণ॥
গলায় দারুণ ব্যাধি অন্য কিছু নয়।
জীবের মোচন কর্মে পাপের সঞ্চয়॥' (পুঁথি)

কী আশ্চর্য ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের একজনও কিন্তু সেদিন নিকটে ছিলেন না। এর মধ্যে কি রহস্য আছে? তাঁদের অনেকে তাঁর সেবার যোগাড়ে ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন স্বরূপ প্রকাশ ক'রে সকলকে অভয় দিলেন—নিজেকে নিঃশেষে উজাড় ক'রে দিলেন সেদিন সংসারের আবিলতামুক্ত তাঁর চিরকুমার 'হোমাপাখীর' দল তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হলেন? তাঁরা তাঁকে পরিপূর্ণভাবে পেয়েছেন, পেয়েছেন বলেই তো তাঁর জন্য সব ছেড়েছেন—আত্মীয় পরিজন সবকিছু, সব ছেড়ে আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁর সেবায়। তাই নতুন ক'রে দেওয়া-নেওয়ার আর প্রয়োজন হ'ল না। তিনি তাঁদের কাছে পরিপূর্ণভাবে] ধরা দিয়েছেন—তিনিই যে তাঁদের ইহকাল পরকাল। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ তাঁদের কাছে সদা প্রকটিত। অন্তরঙ্গদের সম্বন্ধে তিনি নিজ মুখেই বলেছেন, ওদের—আমি কে, আর ওরা কে—জানলেই হ'য়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ত্যাগী সন্তানদের কিভাবে তৈরী করেছিলেন তা একটি মাত্র ঘটনা থেকেই বোঝা যায়:

একবার দক্ষিণেশ্বরে হাজরা-মহাশয় অল্পবয়স্ক কয়েকটি যুবককে নানা উপদেশ প্রসঙ্গে বোঝাচ্ছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধ মহাপুরুষ—তাঁর নিকট সিদ্ধাই প্রভৃতি নানা শক্তি প্রার্থনা করা চলে। তা না ক'রে শুধু ভাল খাবার-দাবার খেয়ে তাঁর সঙ্গে সুখে বাস ক'রে ফল কি?' ঠাকুর পাশেই ছিলেন—হাজরার কাণ্ড দেখে শুদ্ধসত্ত্ব বাবুরামকে কাছে ডেকে বললেন, 'আচ্ছা, তোরা কি চাইবি? আমার যা কিছু তা সবই তো তোদেরই জন্যে। ভিখারীর মতো ক্যাঙলামি করিস নে—ওতে মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক ক'রে দেয়। বরং আমার সঙ্গে তোদের সম্বন্ধ ভাল ক'রে বুঝে নে এবং সমস্ত ধনের অধিকারী হবার চেষ্টা কর।'

* পূজ্যপাদ লীলাপ্রসঙ্গকার ১লা জানুআরির ঘটনাটিকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'কল্পতরু হওয়া' না ব'লে 'আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান' বলেছেন; এই নাম-করণই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত; কারণ প্রসিদ্ধি আছে, ভাল বা মন্দ যে যা প্রার্থনা করে কল্পতরু তাকে তাই প্রদান ক'রে থাকে; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তো ঐরূপ করেন নি, নিজ দেব-মানবত্বের পরিচয় এবং সকলকে নির্বিচারে অভয় আশ্রয় প্রদান ঐ ঘটনায় সুব্যক্ত করেছিলেন। সংসারের মায়ামোহে মুগ্ধ মানুষ কি চাইতে কি চেয়ে ফেলবে তাই পরমকারুণিক ঠাকুর সকলের কিছু চাওয়ার

আগেই তাদের সকলের স্বার্থ-চিন্তা ঘুচিয়ে দেবার জন্তে 'তোমাদের চৈতন্ত হোক' ব'লে আশীর্বচন উচ্চারণ করেছিলেন।

বৎসরান্তে এই দিনটি আমাদের দ্বারে করাঘাত ক'রে বলে, ওঠ—জাগ। সংসারের অজস্র দুঃখ-দৈন্তের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অমোঘ আশীর্বাণী কালের গণ্ডি ভেদ ক'রে মোহাচ্ছন্ন মানুষের চৈতন্ত সম্পাদন ক'রে চলেছে—সেই ভাবতরঙ্গ সাধকচিত্তে লীলায়িত ভঙ্গিমায় নানাভাবে রূপায়িত হ'য়ে তাকে সর্ববিধ ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উন্নীত ক'রে দিচ্ছে।

জন্মান্তর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

পাখী উড়ে যায় আকাশে ঊর্ধ্বে—শাখীও উড়িতে চায়,
মাটি টেনে রাখে, করে তাই হায় হায়।
জল উড়ে যায় উপরে বাষ্পাকারে,
তপন শুধুই সহায়তা করে তারে।
উঠে অম্বরে বহ্নির শিখা ধূমময় রূপ ধরি'—
অথবা হাউইয়ে চড়ি।
মানুষ বিমানে উঠে
যতদূর পারে মেঘের ওপারে ছুটে।
ঝরা পাতা সেও উপরের দিকে ধায়
বৈশাখী ঝঞ্ঝায়।

এই উত্থানে 'উঠা' বলা নাহি চলে
সকলেই নেমে আসে পুন ধরাতলে।
অনিবার্য যে ধরণী মাতার টান,
পতনেরই তবে সকল সমুত্থান।
মানুষ মরিয়া যায়,
জ্ঞানিগণ বলে আত্মা তাহার ঊর্ধ্বের পানে ধায়।
হারায় তাহারে যাহারা—তাহারা উপরেরই দিকে চায়,
আর করে হায় হায়।
আত্মা তাহার একদিন ধরাধামে
নব জাতকের রূপে কি আবার নামে ?

শ্রীশ্রীশিবানন্দ-স্মৃতিকথা

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

স্থান বেলুড় মঠ, ১৯শে মার্চ, ১৯২৭ সাল।

আজ মঠে আসিয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিয়া বসিলাম, তিনি কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভক্ত: মহারাজ, যতক্ষণ আপনাদের নিকট থাকি, ততক্ষণ সংসারের সকল কথা ভুলে যাই।

মহারাজ: হ্যাঁ এইরূপ যত আমাদের সঙ্গ করবে, সাধু সঙ্গ করবে, তত তোমাদের কল্যাণ হবে। কারণ অবতারপুরুষকে বিশ্বাস করা তো সহজ কথা নয়? তবে আমরা প্রত্যেকে তাঁকে দেখেছি—আমাদের মুখে তাঁর কথা শুনলে ক্রমে তোমাদের ভক্তি-বিশ্বাস পাকা হ'য়ে যাবে। তোমাদের দিন দিন আরও ভগবানলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগবে।

ভক্ত: মহারাজ, 'কথামৃত' পড়ে কত আনন্দ পাই, 'কথামৃত' পড়ে বড়ই উপকৃত হয়েছি।

মহারাজ: হ্যাঁ, তা হবে না? 'কথামৃতে' সব আছে।

পঞ্চানন বাবু: 'মাষ্টার মহাশয়' কত কষ্টে এই 'কথামৃত' লিখেছেন। একদিন আমি তাঁর নিকট গিয়েছিলুম, দেখি তিনি 'কথামৃত' লেখবার জন্ত সেই নোট বুকখানা রেখেছেন। খানিকক্ষণ বাদে তিনি বাইরে গেছেন, আমি তখন খুলে পড়লুম, কিন্তু একটি কথাও বুঝতে পারলুম না।

মহারাজ: হ্যাঁ, তিনি খুব মেধাবী ছিলেন; ঠাকুরের নিকট যেতেন ও সব নোট করতেন। তিনি তাঁর নিজের জন্তেই লিখেছিলেন, ভেবেছিলেন ভবিষ্যতে পড়বেন। কিন্তু ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি ঐ সব কথা নির্জন জায়গায় গিয়ে, ধ্যান করে, পরে লিখেছেন। তাই তাঁর দিনের দিনের সব কথা মনে পড়ত, তারপর লিখতেন, তাই তো এত চমৎকার হয়েছে। এখন কত লোক শান্তি পাচ্ছে।

ভক্ত: 'শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে ব্রজের লীলা মিলে' এই বলিয়া মাষ্টার মশাই একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। (মহাপুরুষজী অতি মনোযোগের সহিত শ্লোকটি শ্রবণ করিলেন)

মহারাজ: হ্যাঁ, ঠিক, ঠাকুরের সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে। আহা! গোপীদের কি ভাব! মান, সুখ, দুঃখ, লজ্জা বোধ নাই। গোপনে তাঁকে দেখবার জন্তে পাগল, প্রেমে বাস্তবিকই মানুষের এইরূপ অবস্থা হয়।

জনৈক ভক্ত: আচ্ছা, যীশুখৃষ্ট—যেমন ত্যাগ প্রচার করেছিলেন, ঠাকুর সেইরূপ করেছিলেন কি?

মহারাজ: কি ক'রে জানলে ঠাকুর করেন নাই? অবশ্য, সকলকে তিনি ত্যাগের কথা বলতেন না, কারণ তিনি জানতেন, সকলের ভাগ্যে ত্যাগ হয় না। তিনি যখন আমাদের উপদেশ দিতেন, তখন অন্তলোক সামনে থাকত না, তুমি কি মনে কর, ঠাকুরের ত্যাগের ভাব আমাদের সেই ক'জনের মধ্যেই থাকবে? কেন দেখছ না—এখন তো ঠাকুরের নামে কত ত্যাগী সন্তান সব সাধু হ'তে আসছে। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ভদ্রঘরের সন্তান, তারা দলে দলে আসছে। পেটের দায়েতে এরা সাধু হয় না। Universityর (বিশ্ব-বিদ্যালয়ের) বড় বড় degree (উপাধি) পেয়েছে। সেই সব ত্যাগ ক'রে এখানে আসছে। এই কি ঠাকুরের জন্ত নয়? অবশ্য দেশ শুদ্ধ লোক তো আর ত্যাগ করতে পারবে না? তবে তারা ঠাকুরের এই ত্যাগের mould (ছাঁচ)কে ideal (আদর্শ) নিয়ে চলবে। নিশ্চয় ক্রমে ক্রমে এই সব হবে। ঠাকুরের জীবনের ত্যাগের ভাব এ

দেশের লোকের ideal (আদর্শ) হতেই হবে, এই বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

এই সব কথা যখন হইতেছিল, তখন উপস্থিত ছিলেন পঞ্চাননবাবু, চক্রবর্তী মহাশয়, নরসিংহ বাবু, নির্মলবাবু ও মহাপুরুষ মহারাজজীর পূর্ব-বঙ্গবাসী জনৈক ভক্ত শিষ্য। সকলে নিস্তব্ধ। ঘর যেন শান্তির নিকেতন হইয়াছে। সকলেরই মন এখন এক ধর্মরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। কোন ভক্ত বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে আর মহাপুরুষজীর কথাগুলি স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে—তাহাতেও বিমল সুখ। এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন জগদ্বন্ধু দাদা আসিয়া। তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম মিস ম্যাকলাউড বোম্বাই হইতে করিয়াছেন। মহাপুরুষজী উহা যত্নের সহিত পড়িয়া খুশী হইয়া বলিলেন, 'চলল এবার, জয় গুরু মহারাজ।' পূজনীয় বিশ্বানন্দ মহারাজের চিঠি (বোম্বাই) হইতে আসিযাছিল—কি ভাবে মিস ম্যাকলাউড সেখানে স্বামীজীর উৎসবের সভা পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আমাদিগকে শুনাইলেন।

জনৈক ভক্ত : আচ্ছা মহারাজ, আমরা তো সংসারী লোক, আমরা জপ-ধ্যান বেশী করতে পারি না—আমরা ঠাকুরের নাম করেই মুক্তি পাব কি ?

মহারাজ : নিশ্চয়ই তাঁর নাম আর তিনি কি পৃথক ? নাম করলেই ত সব হ'য়ে যাবে, আবার কি ? নামই সব, নামই সত্য, নাম করবে, আবার কি ?

এবার ননীলালবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় নিতেছেন। তাহাকে বলিলেন, 'ঠাকুর ঘরে যাও, প্রসাদ নাও। আহা—ননীলাল তুমি বেশ আছ। ঠাকুর তোমায় কোন ঝঞ্ঝাটে রাখেন নাই, বেশ মুক্ত, বিয়ে কর নি। কোন ঝঞ্ঝাটও নেই—কেন আর রয়েছ ? এসে পড় না এইখানে। আমরা জানি তুমি বেশ মুক্ত আছ। আর কেন, তুমি এসে পড়'—কথাগুলি সব জোরের সহিত বলিলেন।

ননীলাল বাবু : হাঁ মহারাজ, এবার একটা বন্দোবস্ত ক'রে এসে পড়ব। আপনার কৃপা।

মহারাজ : হাঁ এসে পড়।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পূর্বোক্ত ভক্তটি মহারাজের জন্য একখানা কাপড়, একটি আম ও একটি খরমুজা আনিযাছিলেন। তাহা মহারাজের পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিলেন, আপনি এই গরীবের কাপডখানা পরিবেন।

মহারাজ : আর কাপড় এনেছ কেন ? কত কাপড় রয়েছে। মহারাজ সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ এই কাপড়খানা বেশ পাতলা, কাল ছুপে দেবে। গরমের দিনে বেশ হবে, ফলগুলি ঠাকুর ঘরে দাও।

মশা খুব জ্বালাতন করে, তাই শঙ্কর মহারাজ বেলা থাকিতেই মশারি টাঙাইতেছেন ও মশা তাড়াইতেছেন।

মহারাজ : মশা বড় জ্বালাতন করে। দুই একটি মশারির ভিতর থেকেই সারা রাত্রি জ্বালাতন করবে।

ভক্ত : মশা পায়ে বড় কামড়ায়।

মহারাজ : উহারা যে ভক্তলোক, তাই পায়ে কামড়ায়। (সকলের হাস্য)

ভক্ত : আচ্ছা মহারাজ, মশা কেন ভগবান সৃষ্টি করিলেন।

মহারাজ : এ কি ক'রে বলব ? এ সব দুর্বোধ্য। ভগবান কেন করলেন, এই সবের উত্তর দেওয়া যায় না। তাঁর ইচ্ছা। (একটি ভক্ত এবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন) আসুন, আপনার গলাটা সারুক, একদিন পদাবলী শুনতে হবে।

ঐ ভক্ত : হাঁ, আমি একদিন শুনাব।

এবার সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরের একটু প্রসাদ গ্রহণ করিয়া মহারাজ নানা ঠাকুরদেবতাদের নাম করিতে লাগিলেন। আমি প্রণাম করিলাম।

মহারাজ : এসো, তুমি কি এখনই যাবে ?

আমি : না মহারাজ ; আরতির পরে যাব। আরতি দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজজীর ঘরে আসিলাম।

মহারাজ : তুমি এখন যাবে ?

আমি : না, আমরা একসঙ্গে যাব।

কথাপ্রসঙ্গে ৺কাশীধামের কথা উঠল। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, হাঁ, আমরা যখন ৺কাশীধামে ছিলুম, তখন গরম পড়লে খুব ক্ষুধা হ'ত, কি আর করি, রান্নার সময় কয়েকখানা রুটী তৈরী করে রাখতুম, সন্ধ্যাবেলা তাই খেতুম। তখন তথাকার আয় খুব কম, তাই ঐ ব্যবস্থা করতে হত।

চন্দ্র মহারাজের কথায় বলিলেন, ও বড় চমৎকার লোক, এমন ভক্তি বিশ্বাস দুর্লভ। দেখ তো, ঐ পঙ্গু শরীর। বসে বসেই ১৫।১৬ জনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ওকে করতে হয়। অতি চমৎকার লোক, বড়ই আশ্চর্য হই।

ভক্ত : মহারাজ, এবার যখন কাশীতে ছিলাম তখন তিনটি রোগীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তা আমরা যে মঠের ভক্ত তা জানতে দিই নাই—তোমাদের এখানে কেমন চিকিৎসা হয় ? সাধুরা কেমন যত্ন করেন ? তারা উত্তর করল, বাবু, এমন চিকিৎসা কোথাও পাই নাই। সাধুরা বড়ই যত্ন করেন।

মহারাজ : হাঁ, সাধুরা তো আর হাসপাতালের মত সেবা করে না। প্রাণের টানে করে—নিজেদের উন্নতির জন্য।

ভক্ত : শুনেছি, আপনাদের নাকি মাত্র চার আনা সম্বল ছিল।

মহারাজ : না হে না—চার আনাও ছিল না। তবে গল্পটা শোন—একদিন চারুবাবু আর একজন গঙ্গার ধারে বিকালে বেড়াচ্ছিলেন। তারা দেখে—রাস্তায় একজন বৃদ্ধ কি বৃদ্ধা পড়ে আছে। অন্তিমকাল উপস্থিত। একটু জল খেতে চাইছে। কিন্তু কারো ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময় চারুই বোধহয় ঐ রোগীর নিকট গিয়ে দেখে যে হাঁ ক'রে জল চাইছে। চারু গিয়ে জল দেয়। এবং দেখে যে কাপড়ও নষ্ট হয়ে রয়েছে। তখন ভিক্ষা ক'রে একখানা পুরানো কাপড় আনে। একটি মেয়ে ঘাটে যাচ্ছিল। তাঁকে বলল, আপনার কলসীটা দেবেন, আমি একঘড়া জল এনে এই রোগীকে পরিষ্কার ক'রে দেব। স্ত্রীলোকটি দয়া ক'রে নিজেই জল এনে দিলেন। ওরা রোগীকে পরিষ্কার ক'রে কাপড় পরিয়ে বোধহয় পরিচিত কারো বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেই সময় বাজারে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে এই রোগীর কথা ব'লে কিছু ভিক্ষা চাইলেন। ঐ ভদ্রলোক পকেট থেকে একটি সিকি দিলেন। তাই দিয়ে পথ্যের ব্যবস্থা হ'ল। কেদার বাবা ও চারুবাবু ভিক্ষা ক'রে প্রায় ১৫ দিন এই ভাবে সাহায্য করলেন। রোগী আরোগ্য লাভ করল। এরপর থেকে মাঝে মাঝে ঘাটে এরূপ রোগী যে সব দেখতে পেত, তাদের সেবা যত্ন করত। তার পরে বাড়ী ভাড়া ক'রে এইরকম সেবা করত। এখন দেখ এই আশ্রমে ১৫০ বেড্ (শয্যা) হয়েছে, তবু কুলায় না।

এইবার আমরা ঘড়ি দেখিলাম। চৈত্র মাস হইলেও ঐদিন বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। দোল পূর্ণিমার পরের দিন—বেশ চাঁদের আলো। আমরা উঠিব এমন সময় মহাপুরুষজী আমাকে বলিলেন—তুমি আলোয়ান আন নাই ?

ভক্ত : না মহারাজ, গতকাল সব গরম জামা তুলে রেখেছি। চৈত্র মাসেও গরম কাপড় লাগবে মনে হয় নি। (মহারাজ হাসিতে লাগিলেন) শনিবার হলেই ছটফটানি হয় কখন আসব ?

মহারাজ : দেখ এই ছটফটানিই আসল জিনিস। এইটি যেন থাকে। এবার আমরা প্রণাম করিয়া চাঁদের আলোয় নয়টার সময় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে আসিয়া বাসের জন্য দাঁড়াইলাম।

মেরী মাতা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

যবে মেরী মাতা ঝুঁকে প'ড়ে আকাশ হ'তে
চাহিল আমার নীল কানন পানে,
না জানি শীতের সেই কুহেলী ক্ষণে
জাগিল কী স্তুতিরব তরুবিতানে।

শাখায় শাখায় ঝ'রে তুষাররাশি
ভূমির মাঝ রে ঢাকা শতেক মাণিক
গুঁড়ি গুঁড়ি বরফের ঝরিছে হাসি,
ছায়ায় ছায়ায় মায়া জাগিছে ক্ষণিক!

মেরী মার মুখে ওই জাগিল আলো,
মেরী মাতা ঝুঁকে পড়ে পৃথিবী 'পরে,
শুভ্র শরীর তার দেখায় ভালো,
অঙ্কুর জাগিল কি জীবন স্তরে!

মেরী মাতা যবে হ'ল মলিনা দুখে
নিবে গেল আকাশের রামধনু ওই,
ভায়োলেট ফুলদল ফুটিল কোথা—
দুঃখ ও ক্ষতি ছাড়া তৃপ্তি সে কই?

মনোরম স্বপ্ন যে ফুলে ও ফলে,
মেরী মাতা পুনঃ ও কি জাল বুনিল?
মরে-যাওয়া লতাগুলি ফাল্গুনে যে
পুনরায় জীবনের ডাক শুনিল।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

গঙ্গায় যে কত অপবিত্র জিনিস ভেসে যায়, তাতে গঙ্গা কি কখন অপবিত্র হয়?

দেখ মা, শরণাগত হ'য়ে পড়ে থাকতে হয় তবে ত তাঁর কৃপা হয়।

(জপ) যেমন ভাবে করবে তেমনি ভাবেই হবে। ঠাকুরকে সর্বদাই আপনার ভাববে।

*

প্রার্থনা করেছিলুম 'ঠাকুর আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও, আমি যেন কারও দোষ না দেখি।' দোষ ত মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।...দোষ কারও দেখ না, শেষে দূষিত চোখ হ'য়ে যাবে।

*

অবিশ্বাস ত আসবেই। সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হবে। এই রকম করেই ত বিশ্বাস হয়। এই রকম হ'তে হ'তে পাকা বিশ্বাস হয়।

*

ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে। বিশেষ বিশেষ লোক তাঁর সঙ্গে এসেছেন। এই নরেন সপ্ত ঋষির মধ্যে প্রধান ঋষি। তিনি ত শত ঋষির মধ্যে বলতে পারতেন, তা না বলে সেই বড় সাতজনের মধ্যে একজন বললেন।

সমালোচনা

গীতা-ধ্যান (দ্বিতীয় খণ্ড)—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রণীত। প্রকাশক—'শ্রীসুদর্শন'-সম্পাদক ৩, অম্বর নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩; পৃষ্ঠা—১২৭; মূল্য—২৲।

গীতা-ধ্যান পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে যজ্ঞ, লোকসংগ্রহ, নৈতিক সমস্যাব সমাধান, দ্বাদশ যজ্ঞ, কর্মসংন্যাস, সমদৃষ্টি, ধ্যান মনঃসংযম আলোচিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের মতই দ্বিতীয় খণ্ডও সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। আশা করি, গীতার বাকী অংশগুলি অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ষট্‌ক অচিরেই প্রকাশিত হইবে।

লোকশিক্ষা সমাচার : লোকশিক্ষা-পরিষদ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর থেকে শ্রীঅনন্তকুমার রাণা-সম্পাদিত এবং শ্রীবিবেকানন্দ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ৬টি ফুলস্ক্যাপে সাইক্লোষ্টাইলে ছাপা নূতন পত্রিকাটি পেয়ে এবং পড়ে মনে হয়েছে এতদিনে বুঝি শিক্ষিত ও তথাকথিত অশিক্ষিতদের মধ্যে বেড়া ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে।

প্রথম পৃষ্ঠায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 'সমাজশিক্ষা' প্রবন্ধে এই পত্রিকাটির দিগ্‌নির্ণয় ক'রেছেন : সমাজশিক্ষার দায়িত্ব ও কল্যাণব্রত। প্রসঙ্গক্রমে সম্পাদক লিখেছেন : আমরা এদেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষা দীক্ষা ও কার্যের কাহিনীকে রূপ দিতে চলেছি 'লোকশিক্ষা সমাচারে'র মাধ্যমে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিষদের সমাজ-শিক্ষামূলক সমাচার-পাঠে আমরা উৎসাহিত। জনৈক গ্রামসেবকের সঙ্গে আমরাও আশা করি 'লোক-সমাচার' শীঘ্রই ছাপার অক্ষরে লোকের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব-প্রকাশিত পুস্তক

History of the Ramakrishna Math and Mission—by Swami Gambhirananda, with a foreword by Christopher Isherwood, Published by Advaita Ashrama, Mayavati, Almora, Pages xii+433+19 (with appendix and index) Price Rs. Ten.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাস, স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত, বিখ্যাত লেখক ক্রিষ্টোফার ঈশারউড-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক : অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, আলমোড়া। [কলিকাতা অফিস : 4, Wellington Lane, Calcutta —13] পৃষ্ঠা xii+৪৫২, মূল্য দশ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থরূপে এই ইতিহাস রচিত হইয়াছে। ইহাতে ১৮৯৭ হইতে ১৯৫৭ এপ্রিল পর্যন্ত মিশনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ, সঙ্গে সঙ্গে মঠের ইতিহাসও বিবৃত হইয়াছে।

অধ্যায় পরিচয় : Inspiration, Inception, Preparation, Bursting Forth, On the March, In the Leader's Footsteps, In Tune with the Past, Weathering a Political Storm, Balanced Evolution, A Quinquennium of Progress. A New Order in Travail, Expansion and Consolidation, Centenary Tributes to the Master, Through National Calamities, Under Independence, Current events, Appendix, Index.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

দিল্লী ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা

গত ২৮শে নভেম্বর (১২ই অগ্রহায়ণ) বৃহস্পতিবার সকালে স্তোত্র ও ভজন-মুখরিত পরিবেশের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ দিল্লী আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে শুভ্র শতদলের উপর উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্ণাবয়ব মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ভারত, সিংহল ও পাকিস্তানে অবস্থিত মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সমাগত শতাধিক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী অধ্যক্ষ মহারাজকে পুরোভাগে লইয়া পুরাতন মন্দির হইতে শোভাযাত্রার আকারে বাহির হইয়া নূতন মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে পর অধ্যক্ষ মহারাজ মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিপ্রহরে ২৯০০ ভক্ত প্রসাদ পান এবং সন্ধ্যায় সমবেত জনগণ মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া অনন্দিত হন।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন (বুধবার) বাস্তুপূজা ও হোম, এবং পরদিন (শুক্রবার) রুদ্রপাঠ ও রুদ্রহোম অনুষ্ঠিত হয়। চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচীর শেষ দিন শনিবার ৩০শে নভেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ আশ্রম গ্রন্থাগার ও মন্দির দর্শনান্তর মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জনসাধারণের একটি সভায় সভাপতিরূপে বলেন: শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার একটি বিশ্বজনীন আবেদন আছে। তিনি ও তাঁহার অনুগামীরা সেবাকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা মনে করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব বা আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে তত নয়—নিঃস্বার্থ সেবার জন্যই তিনি মিশনের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য যে কোন কারণে হউক, যেখানেই দুঃখকষ্ট—মিশনের কর্মীরা সেখানেই মানুষের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য অক্লান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আজ ভারতের চারিদিকে মিশনের শাখা প্রসারিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন: দেশ যখন পুরাতন কৃষ্টিধারা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল এমনই এক যুগে তিনি সশরীরে ছিলেন; তাঁহার ভাবের ভাবুক নয়—এমন ব্যক্তিও তাঁহার সাক্ষাৎ সঙ্গে অবশেষে প্রভাবিত হইত।

সভার প্রারম্ভে সকলকে স্বাগত জানাইয়া স্থানীয় মিশনকেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেন: শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্মের ঐক্য, সহযোগিতা, সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের প্রতীক। সভাপতির ভাষণের পর সাহিত্য আকাদামির সহকারী সম্পাদক ডক্টর জর্জ, অধ্যাপক ত্রিলোচন সিং এবং স্বামী চিদাত্মানন্দ কিছু বলেন। অতঃপর ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ মন্দির-প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থদাতা, মন্দিরের স্থপতি, পরিদর্শক ইঞ্জিনিয়র ও প্রধান মিস্ত্রী—প্রত্যেককে মন্দির-সংক্রান্ত একখানি করিয়া সুন্দর ছবির এলবাম প্রদান করেন। রাত্রি ৮-৩০ মিঃ সময়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিওযোগে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সর্বত্র প্রসারিত হয়।

মাদ্রাজ ঃ দাঙ্গায় রিলিফ

গত সেপ্টেম্বরের শেষার্ধে রামনাথপুর জেলার কয়েকটি তালুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু গৃহ ভস্মীভূত হওয়ায় অনেকে নিরাশ্রয় নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছে। অনেককেই একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছে।

মাদ্রাজ হইতে মিশনের সেবকগণ ৪ঠা অক্টোবর হইতে পর্যবেক্ষণ-কার্য শুরু করিয়া মনমাদুরাই ও পরমকুড়ি তালুকে প্রথমেই বস্ত্রবিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন; তিনটি গ্রামে ৬৩১ শাড়ী ৪৯৬ ধুতি ও ৩১৪ মাদুর বিতরিত হইয়াছে। শিবগিঙ্গ তালুকে ৪০টি গ্রাম পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে, তিনটি গ্রামে প্রায় ১৪৫০ গৃহ ভস্মীভূত; মিশন ৩৫২৫টি

বাঁশ ও ১৮৫০০ নারিকেল পাতার ছাউনি বিতরণ করায় আর্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ গৃহ পুনর্নির্মাণ করিয়া লইতেছে। এখনও ৩৭টি গ্রাম বাকী। অতঃপর আরপ্প কোট্টাই তালুকে পর্যবেক্ষণের পর সেবাকার্য সেখানে বিস্তৃত হইবে।

মাদ্রাজ সরকার ও সর্বদলীয় নেতৃগণ নানা ভাবে সাহায্য করিতেছেন; জনসাধারণের সাহায্য আরও প্রয়োজন, সমাগত বর্ষার পূর্বে গৃহনির্মাণ শেষ না হইলে কষ্টের সীমা থাকিবে না।

ভুবনেশ্বর: রবিবারীয় বিদ্যালয়

ভুবনেশ্বরের রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে ছাত্রদের ধর্ম ও নীতিবিষয়ক শিক্ষা দিবার জন্য রবিবাসরীয় অধ্যাপনার সূত্রপাত-প্রসঙ্গে গত ২০শে অক্টোবর (রবিবার) ওড়িষ্যার রাজ্যপাল বলেন: আপনাদের এই প্রচেষ্টায় আমি আনন্দিত, এরূপ বিদ্যালয়ে বালক-বালিকারা যথার্থই উপকৃত হইবে। এখানে ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত ৮টি শ্রেণী বিভাগ করিয়া প্রার্থনা, ভজন, সাধুসন্তের জীবন প্রসঙ্গ, শেষে সংস্কৃত ভাষায় প্রার্থনা প্রভৃতি দ্বারা ছাত্রাবস্থাতেই বালক-বালিকাদের মনে একটি নৈতিক আধ্যাত্মিক ভিত্তি রচনার চেষ্টা করা হইবে। উচ্চতর দার্শনিক বা কৃষ্টির আলোচনার মাধ্যমে নয়, ভজনগান ও জীবনকথার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মনে স্থায়ী ছাপ পড়িবে বলিয়া আশা করা যায়।

কার্য-বিবরণী

রেঙ্গুন: রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির কর্মধারা প্রধানতঃ ধর্ম সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ে জনসাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করার কাজে সীমাবদ্ধ। এখানকার সুবৃহৎ গ্রন্থশালা ও পাঠাগার সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য উন্মুক্ত। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ: বর্তমানে গ্রন্থাগারে সংস্কৃত, বাংলা, বর্মী, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার পুস্তক-সংখ্যা ১৬ হাজারেরও অধিক ('৫৬ খৃঃ তিন সহস্রাধিক পুস্তক সংযোজিত)। পঠনার্থে প্রদত্ত ১৮১৭৪ ('৫৫ খৃঃ—৯০৭৪)। পাঠাগারে দৈনিক গড়ে দুইশত ব্যক্তি অধ্যয়নরত থাকেন। ৭টি বিভিন্ন ভাষার ২৪টি দৈনিক এবং ৯৭খানি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। লাইব্রেরির উল্লেখ-যোগ্য কর্মবিস্তার সাধারণের মধ্যে পাঠানুরাগ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ভগবদ্গীতা ও উপনিষদ্ সম্বন্ধে ৭৮টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক আলোচনা, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন এবং পাঠচক্রের কাজ যথারীতি চলে। বিভিন্ন ধর্মের মহাপুরুষগণের স্মারক উৎসবগুলিও সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

জলপাইগুড়ি: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৬ খৃঃ (২৭তম বর্ষের) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রমে কার্যপ্রণালী তিন ভাগে বিভক্ত: চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রচার।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথি ও এ্যালো-প্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থায় শহরের ও দূরবর্তী পল্লবাসীর যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে ১৬ হাজারের অধিক নরনারী চিকিৎসিত হইয়াছেন। মিশনের মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল বিভাগ ১৮ বৎসর যাবৎ সেবাকার্যে নিযুক্ত। এ বছর ১২৮ জন প্রসূতি ভরতি হইয়াছিলেন, এবং ৩২০টি শিশু ও ৫৯৪ জন জননী চিকিৎসার্থে আগমন করেন। ৪৭ হাজারেরও অধিক জনকে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়।

আশ্রম-ছাত্রাবাসে ১০টি ছাত্র থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছে। সমাজের অনুন্নত নিরক্ষরগণকে লেখা-পড়া শিখানো ও তাহাদের চরিত্র গঠনের জন্য একটি হরিজন ও একটি নৈশবিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। লাইব্রেরি এবং পাঠাগার বিশেষ জনপ্রিয়।

আশ্রমে প্রতি রবিবার এবং স্থানীয় ভাগবত সভায় প্রতি শনি ও মঙ্গলবার পাঠ ও আলোচনা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসবাকারে অনুষ্ঠিত হয়; জন্মাষ্টমী, বুদ্ধপূর্ণিমা এবং যীশুখৃষ্টের জন্মদিনও পূজাপাঠ এবং আলোচনার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

দেওঘর: রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ৩২তম বার্ষিক (১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের) কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যাপীঠে চতুর্থ হইতে দশম শ্রেণীতে ২৩০টি ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ১৯টি ছাত্র বাহির হইতে আসিয়া অধ্যয়ন করিয়াছে, বাকী আবাসিক। ১৭জন বিদ্যার্থী স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেয়, সকলেই উত্তীর্ণ হয়, ৫ জন প্রথম বিভাগে। বার্ষিক পরীক্ষার পর চারদিনব্যাপী শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় ভাগলপুরে, ৭৭টি বালক ইহাতে যোগদান করে। শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ১৭ জন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে ফ্রি বা কম খরচে থাকিয়া পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী দরিদ্র গ্রামবাসী-দিগকে সেবা করা হয়, দৈনিক রোগিসংখ্যা ছিল গড়ে ৬০।

বিদ্যাপীঠের নবরূপায়ণ

দেওঘর বিদ্যাপীঠ বহুমুখী বিদ্যালয়ে (Multi-purpose School) রূপান্তরিত হইবে, এবং ইহার উপরের তিনটি শ্রেণী (৯ম, ১০ম, ১১শ) পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত হইবে,—কর্তৃপক্ষ এইরূপ স্থির করিয়াছেন। তদুদ্দেশে গত ১৪ই অক্টোবর পুরুলিয়া শহর হইতে দুই মাইল দূরে পুরুলিয়া-বরাকর রোডের উপর সুবিস্তীর্ণ আম্রকানন-সংযুক্ত ১৩০ বিঘা ভূমিখণ্ডের উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব ডাঃ ডি. এম. সেন মহাশয় বিদ্যাপীঠের নূতন শাখার ভিত্তিস্থাপন করেন। এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে পূজনীয় স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ পুরুলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার উপস্থিতিতে শুভানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়।

চণ্ডীগড়: আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন

গত ২৭শে নভেম্বর সকালে এক বিশিষ্ট জন-সমাবেশের মধ্যে রাজ্যপাল শ্রীসিং চণ্ডীগড়ে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেন।

এতদুপলক্ষে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রী বক্তৃতা দেন। সকল ধর্মের মূলগত ঐক্য বিস্মৃত হইয়াই বর্তমানে নানা ধর্ম বাহিরের আচার-অনুষ্ঠান লইয়া বিবাদ করে—মুখ্যমন্ত্রী এই মনো-ভাবের নিন্দা করেন। তিনি আরও বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দই বলিয়াছেন—ভারত নিজের উন্নতির জন্য অন্যান্য কৃষ্টি হইতে শুধু গ্রহণ করিবে না, বর্তমান সভ্যতার বিকাশে দান করিবারও তাহার কিছু আছে।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেণ্টার

স্বামী নিখিলানন্দ ও স্বামী ঋতজানন্দ প্রতি রবিবার নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী আলোচনা করেন:

জুন: চেতনার স্তর, প্রয়োগক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম, ধ্যানের অভ্যাস, ধর্ম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ঈশ্বরদর্শন বলিতে কি বুঝায়।

সেপ্টেম্বর: মনের শক্তি, ঈশ্বরকে কোথায় খুঁজিব? ভালবাসা ও ভগবৎ-প্রেম, মায়া ও সত্য।

অক্টোবর: অতি-মানসিক জ্ঞান, ধর্মানুভূতির সোপানশ্রেণী, সাধনা।

স্বামী ঋতজানন্দ প্রতি মঙ্গলবার গীতা এবং স্বামী নিখিলানন্দ প্রতি শুক্রবার উপনিষদ্ অধ্যাপনা করেন। দুর্গাপূজার সময় বিশেষ উপাসনা ও সঙ্গীতের আয়োজন হইয়াছিল, এবং স্বামী নিখিলানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃরূপে ঈশ্বর ভাবনা' সম্বন্ধে বলেন।

সানফ্রান্সিস্কো: বেদান্ত সোসাইটি

প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় সমিতির ভাষণগৃহে স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ বা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ—নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন:

জুন: ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলন; বেদান্ত-দৃষ্টিতে ব্যক্তি, বুদ্ধের বাণী, অসীম ডাকিতেছে, নিবেদিত জীবন, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তগণ, মনের লুকানো শক্তি, কেমন করিয়া ডাকিব? মানসিক স্বাস্থ্য ও ধর্ম।

জুলাই: স্বামী বিবেকানন্দের মন ও হৃদয়, গুরু ও শিষ্য, তবে ধর্ম কি? শক্তি-রূপে চিন্তা, পবিত্র উপায়, চেতনার বিভিন্ন স্তর।

সেপ্টেম্বর: যা কিছু—সবই ঈশ্বর, তাঁকে খুঁজোনা—তাঁকে দেখ। হারানো সামঞ্জস্য—কিভাবে ফিরে পাওয়া যায়, কুণ্ডলিনী বা সর্পশক্তি।

অক্টোবর: মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা, মন কেন এত চঞ্চল? ঈশ্বরকে কোথায় খুঁজছ? মৃত্যুর রহস্য, মানুষের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের কাছে চল, নিয়তি কি নিয়ন্ত্রণ করা যায়? গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, মরবার আগেই যা ক'রে যেতে হবে, নিম্ন থেকে উচ্চতর সত্তায়।

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়, এবং প্রতি রবিবার শিশুদের মধ্যে উদার সর্বজনীন ধর্মের সাধারণ ভাবগুলি সঞ্চারিত করিবার ব্যবস্থা আছে।

জন্মতিথি: পৌষ মাসে যাঁহাদের জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হইবে:—

স্বামী শিবানন্দ —	২রা পৌষ,	১৭ই ডিসেম্বর,	মঙ্গলবার
„ সারদানন্দ	১২ই „	২৭শে „	শুক্র „
„ তুরীয়ানন্দ	২০শে „	৪ঠা জানুয়ারি	শনি „
„ বিবেকানন্দ	২৮শে „	১২ই „	রবি „

বিবিধ সংবাদ

ভারত-সংস্কৃতি-পরিষদ: বেদপ্রকাশের ব্যবস্থা

ঋগ্বেদ সম্বন্ধে বাংলায় ভাল পুস্তক নাই বলিলেও চলে; এইজন্য ভারত-সংস্কৃতি-পরিষদ্ ৬৩ খণ্ডে বেদ প্রকাশের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে গত ২৫। নভেম্বর সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় রাজা শ্রীনাথ হলে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের পৌরোহিত্যে পরিষদের এক অধিবেশন হয়। শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিয়া স্বস্তিবাচন করিলে পর সভায় ঋগ্বেদ-সম্পাদনার জন্য বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া এক পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়। সম্পাদক ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশের ঠিকানা: পি ৪৬৭ নিউ আলিপুর, কলিকাতা—৩৩।

এ যুগের নিরক্ষরতা

জাতিসংঘের নিরক্ষরতা-গবেষণার বিবরণে (United Nation Illiteracy Study Report) প্রকাশ লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে, কিন্তু লোকসংখ্যাও এমন ভাবে বাড়িতেছে—যে অদূর ভবিষ্যতে অশিক্ষিতের সংখ্যা না কমিয়া বাড়িতে পারে।

UNESCO (জাতিসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-কৃষ্টি সমিতি)র ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর লুথার ইভ্যান্স্ বলিতেছেন: নিরক্ষরতা দূরীকরণ ব্যাপারে আমরা অতি অল্পই অগ্রসর হইতেছি। পৃথিবীর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ লোক সংবাদপত্র পড়িতে ও বুঝিতে পারে। নিরক্ষরের সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করিতে হইলে—

শিশুদের জন্ম আরও বেশি বিদ্যালয় প্রয়োজন, এবং শিক্ষিত হইতে যতদিন লাগে ততদিন তাহাদের বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে।

আফ্রিকার অধিকাংশ জায়গায়, মধ্যপ্রাচ্যের বহু স্থানে এবং এশিয়ার ব্যাপক অংশে বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে লিখিতে বা পড়িতে পারে না—এমন লোকের সংখ্যা শতকরা ৮০—১০০।

আফ্রিকার বাকী অংশে, এশিয়ার এক তৃতীয়াংশে ইওরোপের এক কোণে, ল্যাটিন আমেরিকার অর্ধেকাংশে নিরক্ষরতা শতকরা ৫০—৮০।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা ৭০ কোটি। অর্থাৎ শিক্ষাবিস্তারের এই যুগেও বয়স্ক লোকসংখ্যা'র শতকরা ৪৪ ভাগ নিরক্ষর।

১৯৪৬ খৃঃ এই সমিতির ডিরেক্টর জেনরেল রূপে জুলিয়ন হাক্স্লি বলিয়াছিলেন:

বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য, স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে, কৃষি ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে, মানসিক বিকাশের জন্য, গণতন্ত্র ও জাতীয় অগ্রগতি, আন্তর্জাতিক চেতনা ও অন্যান্য জাতিকে বুঝিবার জন্য প্রথম প্রয়োজন অক্ষরজ্ঞান।

ইওরোপ এবং ইংরেজী-বলা আমেরিকার পরই অক্ষরজ্ঞানের উচ্চহার দৃষ্ট হয় দক্ষিণ প্যাসিফিক অঞ্চলে; মাত্র এক শতাব্দী পূর্বে তাহারা ছিল একেবারে আদিম জাতি। আফ্রিকায় এই হার নিম্নতম, তবে এই ভূখণ্ডের বহুস্থানে যেরূপ শিক্ষা-প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে, আশা করা যায় শীঘ্রই আশ্চর্য রূপান্তর দেখা দিবে।

শিক্ষা-বিস্তার-ব্যবস্থায় একটি গুরুতর ব্যাপার বিশেষ বিবেচনার বিষয়: পৃথিবীর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। বর্তমান বৃদ্ধির হার—শতকরা ১½ এর কিছু বেশী, অর্থাৎ বৎসরে ৪ কোটি ৩ লক্ষ।

ভারতের ১৭ কোটি ৪০ লক্ষ বয়স্ক নিরক্ষরের মধ্যে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ পুরুষ, ৯ কোটি ৫০ লক্ষ নারী; শহরে বয়স্ক নিরক্ষরের হার শতকরা ৭৫, গ্রামে প্রায় ৯২।

উত্তর আফ্রিকায় বয়স্ক নিরক্ষর—৩ কোটি ৪০ লক্ষ, মধ্য ও দক্ষিণে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ; এশিয়ায় চারিটি অঞ্চলে ৫১ কোটি। উত্তর-(শতকরা ৪) মধ্য-(শতকরা ১২) দক্ষিণ-(শতকরা ২৮) আমেরিকায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ; ইওরোপে—২ কোটি ২০ লক্ষ; চীনের লোকসংখ্যা ৫৮ কোটি, নিরক্ষর শতকরা ৫০-এর উপর; সোভিয়েট রাশিয়ার লোক-সংখ্যা ২০ কোটি, নিরক্ষর শতকরা ৫—১০।

দেখা গিয়াছে—অনেক দেশেই শিল্পাঞ্চলে লেখাপড়ার চর্চা বেশি এবং কৃষি-অঞ্চলে নিরক্ষরতা অধিক। গড়ে মাথাপিছু বেশি আয় অপেক্ষা জাতীয় আয়ের সম-বণ্টনই শিক্ষাবিস্তারের সহায়ক।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ বা প্রতিরোধের উৎকৃষ্ট উপায়: সকল শিশুর জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা ও সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। এ সম্পর্কে UNESCO নিজের তত্ত্বাবধানে ল্যাটিন আমেরিকায় বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। অন্যত্র যে সকল স্থানে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম সেখানেও গ্রাম্য, বহিরাগত, ধর্মীয় ও সাধারণ নরনারীদ্বারা মৌলিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে।

[World Illiteracy at Mid-Century, UNESCO হইতে সংকলিত]

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৮শে পৌষ, ১২ই জানুআরি রবিবার, শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইবে।